উৎসর্গ

মেঘ-দুর্দিন পিচ্ছল জীবন-পথে হঠাৎ-জ্বালা বিদ্যুতের আলো ফেলে ফেলে যিনি আমায় নিয়ে চলেছেন পথ হ'তে এক পথের পারে ; দুঃখ, বেদনা ও অশ্রু-জর্জর আত্মিক অনুভূতির তরঙ্গে তরঙ্গে যাঁর ঢেউ খেলার আর অন্ত নেই, সেই অন্তহীন অন্তর্যামীর পায়ের তলায়—

রইল আমার—

"কাদম্বরী ও গদ্য-সাহিত্যে শিল্প-বিচার"

ভূমিকা

সংস্কৃতের সমালোচনা সাধারণতঃ পাঠকের চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণের মধ্যেই নিবদ্ধ। সাহিত্য সহৃদয়-সামাজিকের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাহার স্বরূপ-নির্ণয়ের দ্বারা সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণ প্রাচীন সমালোচনার মূল পদ্ধতি। সাহিত্যিকের যে চিত্তভূমি হইতে সাহিত্যের বিরাট মহীরূহের উৎপত্তি, তাহার উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া সাহিত্যের মূল্যায়ন বড় বেশী কেহ একটা করেন নাই। সহৃদয় পাঠক বা দর্শকের মনে লোকোত্তর আহ্লাদ সঞ্চারিত করিতে গুণ, রীতি, বৃত্তি, অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যের যে যে উপকরণ সাহায্য করে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণের উপরই সাধারণত আমাদের সমালোচকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

অধ্যাপক ডঃ হৃষীকেশ বসুর কাদম্বরী ও গদ্য-সাহিত্যে শিল্প-বিচার নামক গবেষণামূলক নিবন্ধটি এই দিক দিয়া একটি আনন্দদায়ক ব্যতিক্রম। অধ্যাপক ডঃ বসু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচনা-শাস্ত্রের নীতিগুলির আলোকে কাদম্বরী ও গদ্য সাহিত্যের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পরিবেশনে নিবন্ধটি সমৃদ্ধ। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাণভট্ট একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহার চরিত্র-চিত্রণের শৈলী, পরিবেশ-সৃষ্টির নৈপুণ্য, প্রকৃতি-চিত্রণের পদ্ধতি, মনুষ্যচিত্তের গহনে প্রবেশ করিয়া অনুভূতি-বিশ্লেষণের ভঙ্গী—এ সকলই উত্তরসূরীদের প্রশংসাধন্য। কিন্তু বাণভট্টের ঐ শৈলীগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি এবং কেনই বা উহারা লোকোত্তর উৎকর্ষে মণ্ডিত, এইরূপ আলোচনা এতদিন পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। ডঃ হৃষীকেশ বসু সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে এই অভাবটি পূরণ করিয়া বিদগ্ধজনের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ সংস্কৃত গদ্যসাহিত্যকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন —কথা ও আখ্যায়িকা। কিন্তু বাণভট্ট-পূর্ববর্তী গদ্য-লেখকদের রচনাবলীতে এই পার্থক্যের মূল সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। বাণভট্টই এই শ্রেণী-বিভাগের সীমারেখাটিকে তাঁহার পূর্বসূরীদের কুহেলিকাচ্ছন্ন পটভূমি হইতে অপসারিত করিয়া সুস্পষ্ট ক্ষেত্রে সংস্থাপিত করিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্যিকদুর্লভ সমালোচক মনোভঙ্গী পরবর্তী শতাব্দীগুলির মধ্য দিয়া

অলক্ষ্যে প্রবাহিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে উপন্যাস ও রোমান্স এই দ্বিবিধ গদ্যরচনার আধারে আপনাকে পুনর্বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য বাণভট্টের যুগে প্রকৃত রোমান্স-রচনার পরিবেশ ভারতীয় জীবনে অনুপস্থিত থাকিলেও দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্ট, ইঁহারা সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রস্তর-দুর্গের মধ্যে রোমান্সের মুক্ত বায়ু বহাইয়াছেন। শাস্ত্রীয় নিয়মকানুনের দৃঢ়তার জন্য সংস্কৃত-সাহিত্যের চরিত্রগুলির চিত্তবৃত্তি সাধারণতঃ নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত। যেখানে বাঁধা পথ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উৎপথে প্রবাহিত হইয়াছে, সেখানে জন্মান্তরীয় সংস্কারের সন্ধান মিলিয়াছে। বাণভট্ট জন্মান্তরের জটিলতায় কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিলেও তাহার অগ্রগতিকে ব্যাহত হইতে দেন নাই বা জন্মান্তরীয় সংস্কারের সংঘাতে রোমান্সের বায়ুকে প্রতিহত করেন নাই। এই দিক দিয়া বাণভট্ট যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা করায় অধ্যাপক ডঃ বসু রসিক পাঠকের প্রশংসা-ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই।

ডঃ হৃষীকেশ বসু বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিনটি সাহিত্যের সহিতই ভাল-ভাবে পরিচিত। বিভিন্ন সাহিত্যিকের মানসিক গঠন সাহিত্যকে যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেয়, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই। তাই বাণভট্টের মানসলোকে অবতরণ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির উৎস অন্বেষণ করিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করি সংস্কৃত সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি নূতন পদক্ষেপ রূপে কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার স্বীকৃতির দাবী রাখিবে।

নিবেদন

যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে, আন্তরিকতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে ১৯৬৪ সালে পি, এইচ্, ডি ডিগ্রী উপলক্ষে উপস্থাপিত আমার গবেষণা-নিবন্ধ—"কাদম্বরী ও গদ্যসাহিত্যে শিল্পবিচার" প্রকাশিত হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় দীন লেখকের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহে স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ ক'রে আমায় চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করলেন। ভাষায় কৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করে কেউ কোন দিন নিঃশেষ করতে পারেনি, আমিও পারলুম না। হৃদয়ের দান হৃদয়েই পুরে রাখলুম। উক্ত নিবন্ধটির পরীক্ষক ছিলেন যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-ফিল, ডি-লিট, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও দিল্লী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ ও ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব্ আর্টস্ ডক্টর নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় আমার গবেষণার পরিচালক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁর অফুরন্ত স্নেহ ও উদ্দীপ্ত উৎসাহ না থাকলে আমার গবেষণা অত সহজে নিষ্কৃতি পেত না।

তারপরই যাঁদের কথা মনে পড়ছে তাঁদের পৃথক পৃথক করে স্মরণ করা এই স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে যিনি আমার প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশেষ ক'রে 'সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্যশৈলী' যত্ন করে প'ড়ে আমায় নানা উপদেশ দিয়েছেন, তিনি হ'লেন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যক্ষ ডক্টর ডি, সি, সরকার। যে-বন্ধুরা আমায় সতত গবেষণা-কার্যে উৎসাহিত করেছেন, তারা হলেন—চারুচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গত ডক্টর ক্ষেত্রমোহন বসু, ডি, এস্, সি, রবীন্দ্রভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব দি ফ্যাকালটি অব আর্টস ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য, মৌলানা আজাদ কলেজের সংস্কৃত-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর প্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী, রবীন্দ্রভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর ননীলাল সেন, আশুতোষ কলেজের

সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক শ্রীকণক বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটুশনের সংস্কৃতের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, এম, এ, সপ্ততীর্থ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের রীডার পণ্ডিত পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু ন্যায়াচার্য প্রভৃতি।

যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের সম্পাদকমণ্ডলী আমার গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে ও সম্পাদনায় যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তার জন্য আমি তাঁদের সমবেতভাবে শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যাদবপুর-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র গুহ ও রেজিস্ট্রার শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক আমার গ্রন্থখানির উদ্দেশে সুভাষিত রচনা করে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আমি তাঁদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী স্নিগ্ধা বসু, বি, এ, (অনার্স) সাহিত্য-ভারতী, আমার গ্রন্থ-প্রকাশনার কার্যে প্রভূত সাহায্য করেছে। আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি।

যাঁদের নিরবচ্ছিন্ন শ্রমস্বীকারের ফলে আমার গ্রন্থখানি সুষ্ঠুরূপে ও অল্পসময়ের মধ্যে মুদ্রিত হ'ল, অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের সেই সহৃদয় স্বত্বাধিকারীদের আমি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে আমি তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের সহকর্মীদের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

গ্রন্থসম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। যা বক্তব্য, তা গ্রন্থেই আছে। শুধু বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, আমার এ গবেষণা মৌলিক।

একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—আমি কাদম্বরী নিয়ে হঠাৎ মেতে উঠলাম কেন? কাদম্বরী নিয়ে শুধু আমি কেন, বাংলাদেশ মেতে আছে অনেক দিন। তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাল থেকে আজ পর্যন্ত কাদম্বরী বাংলার অভিজাত কাব্যরসিকদের মনের উপর নিয়ত প্রভাব বিস্তার করছে। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। আবার তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অবলম্বনে

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন "কাদম্বরী নাটক" (১৮৭৭), প্রমথনাথ মিত্র লিখলেন "প্রেমপারিজাত মহাশ্বেতা" (১৮৭৯) এবং গৌরসুন্দর চৌধুরী লিখলেন "কাদম্বরী গীতাভিনয়" (১৮৮৫)। তারাশঙ্করকে একটু ডিঙিয়ে অনুবাদ নিয়ে এগিয়ে এলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর প্রবোধেন্দু ঠাকুর দিলেন একেবারে রঙ চড়িয়ে। তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল ১৩৪৪ সালে। সবার উপর যিনি সংস্কৃত-সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য বইয়ে দিলেন বাংলা সাহিত্যে, তিনি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রকাশিত হ'ল—১৩১৪ সালে। সেই প্রাচীন সাহিত্যের 'কাদম্বরী-চিত্র', 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র পত্রলেখা-চরিত্র বাণভট্টের কাদম্বরীকে বাংলার রসিকজনের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল। অতএব বাংলার রসিকমনের একদিগন্ত থেকে অন্যদিগন্ত পর্যন্ত—
—"মেঘৈ র্মেদুরমম্বরম্"।

আমি কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমির চেতনা নিয়ে কাদম্বরীর গবেষণায় নামিনি। আমি নেমেছিলাম চারুচন্দ্র কলেজে বি, এ, বাংলা অনার্স ক্লাসে তারাশঙ্করের কাদম্বরী পড়াতে যেয়ে। আমার সহকর্মী বাংলা অধ্যাপকেরা কেউই কাদম্বরী পড়াতে রাজী হ'লেন না। আমাকে বাধ্য হয়েই কাদম্বরী অধ্যাপনার ভার নিতে হ'ল। আমি আশৈশব সংস্কৃতের ছাত্র। সংস্কৃত-শাস্ত্রের নানা শাখা-প্রশাখার কিছু কিছু আয়ত্ত করতেও পেরেছি। কিন্তু আশৈশব বিদ্যানুশীলনে সংস্কৃতের যে দিকটা আমায় বার বার গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, তা হ'ল সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য। সংস্কৃত-কাব্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ। সেই অনুরাগের নেশায় টলতে টলতে যখন পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের রচনা পড়েছি, তখনই দেখেছি, কাব্য-সাহিত্য নিয়ে তেমন কেউই গভীরভাবে আলোচনা করেন নি। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের কালপঞ্জীর উপর। অবশ্য সেই সময়ে তার প্রয়োজনও ছিল। সংস্কৃত নিয়ে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীর সেই গড্ডালিকা প্রবাহ আজও গুণটেনে সমানে এগিয়ে চলেছে। সংস্কৃতকাব্য আজও সংস্কৃত গবেষকদের কাছে তেমনি অবহেলিত, অনাদৃত। তাই সংস্কৃত-কাব্যের গবেষকদের সংখ্যা খুব সীমিত। সংস্কৃত গবেষকদের নজর ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও দর্শনের উপর। সেইজন্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনেকের কাছেই সংস্কৃত সাহিত্যে কী আছে জিজ্ঞাসা করেও যুগের পর যুগ কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে নিন্দা চলে আসছে আধুনিক মহলে। সাহিত্য চলে জনতা নিয়ে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও দর্শনের অনুশীলন সীমাবদ্ধ থাকে জাতীয় সংহতির কতিপয় পারদর্শীর মধ্যে। তা ছাড়া ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে যখন

অনবরত য়ুরোপীয় সাহিত্যের ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসছে, তখন সেই ঢেউখেলার জন্য ডাক দিলেন না কেউ সংস্কৃত-সাহিত্যকে। সংস্কৃত-সাহিত্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের ঢেউখেলায় যোগ দিতে না পেরে কোণ-ঠাসা হ'য়ে রইল। তারপর বাংলা যাঁরা পড়েন ও পড়ান, তাঁরা সংস্কৃত-সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে বিদ্যাভারতীর পূজা-অঙ্গনের দেউড়ি থেকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিতাড়িতে করতে কসুর করেন না। তাঁরা ভুলে যান সংস্কৃত জ্ঞান না থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণাঙ্গ হ'তে পারে না। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে সংস্কৃতের উপর বাংলা সারস্বতেয়দের দৃষ্টি ফিরছে। এর মুখ্যতম কারণ কালের প্রতিক্রিয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌম প্রভাব। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের দরদী মরমিয়া সাধক। সংস্কৃত সাহিত্যের 'মনের মানুষ'কে তিনিই টেনে বের করেছেন। বাঙালীর সংস্কৃতমুখী যে চেতনা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই চেতনাকে তুলে ধরলেন আপন প্রতিভার স্বচ্ছ আলোকে। সংস্কৃত সাহিত্যের কঠিন আবরণ ভঙ্গ ক'রে তিনিই দেখিয়ে দিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য ও রস কোথায় —হৃদ্‌পিণ্ডের কোন্ নাড়ীতে বাজে ভারতীয় অনুভূতির মর্মশেষ স্পন্দন। মধুকোষের উপরকার মৌমাছির ভীড়ের অপসারণে দেখা দিল মধু। বাঙালী মানস তৃপ্ত হ'ল, পেল অনাস্বাদিত মধুর আস্বাদ। রবীন্দ্র-আবিষ্কৃত সেই আস্বাদের ঝিরঝিরে ঝরাবিন্দু অনুকূল হাওয়ায় উড়ে উড়ে আধুনিক বাঙালী রসিকদের রসনায় যেন একটু ইসারা হানছে।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বলেও বটে, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত অধ্যাপক বলেও বটে, আমি বাংলা-সাহিত্যের ছাত্র ও অধ্যাপকদের কথা মনে রেখেই আমার গবেষণাকে রূপ দিয়েছি; আর দিয়েছি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের চেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের চেতনার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের চেতনার তুলনামূলক আলোচনার সমন্বয়ী ধর্মের অনুপ্রেরণায়। কতদূর কৃতকার্য হয়েছি জানি না। তবে এইটুকু জানি পথ একটা হয়তো বাতলাতে পেরেছি। এই পথের ধারে উত্তর সাধকদের পায়ের ধ্বনি শোনবার জন্য কান পেতে রইলাম।

যাঁরা নির্জলা সংস্কৃতের ছাত্র ও গবেষক, তাঁদের কাছেও পৌঁছে দিয়েছি সংস্কৃত সাহিত্যের নাড়ীর খবর। সূত্র, বৃত্তি, কারিকা ও শ্লোকের মধ্যে সংস্কৃত-শাস্ত্রকে আবদ্ধ না রেখে জীবন ও শিল্পের সমন্বয়ী যে মানসিকতা থেকে শাস্ত্রের উৎপত্তি, আমি প্রাচীনের সেই মানস ধর্মটি আধুনিকের চাবিকাঠি দিয়ে যেমন খুলে দেখিয়েছি, তেমনি দেখিয়েছি সুদূর অতীতের তাপস ভাব-ভাবনার দিক থেকে। কাদম্বরীর

উপলক্ষে বললেও সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শনের নানা কথার ভীড় জমেছে আমার প্রবন্ধে। তাতে প্রাচীন সাহিত্য-চেতনার মধ্যে একটা স্বচ্ছ আলো সাবলীল হ'য়ে ফুটে উঠেছে ;—যে আলো কেবল কাদম্বরীর পথ চলার প্রদীপ নয়, নিখিল সংস্কৃত সাহিত্যেরও।

যাঁদের জন্য এত আগ্রহ, এত পরিশ্রম, এত অধ্যবসায়, তাঁদের কিছু উপকার হ'লে শ্রম সার্থক মনে করব।

শ্রীহৃষীকেশ বসু

পরিচায়িকা

গবেষণা-প্রবন্ধটির চার পরিচ্ছেদ :

প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—আঙ্গিক। মূল বিষয়ের অঙ্গ হিসাবে ইহার তিনটি উপবিভাগ : ১। সংস্কৃত-সাহিত্যে গদ্য-শৈলী, ২। কথা ও আখ্যায়িকা, ৩। গল্পের প্রকৃতি বিচার।

কাদম্বরী-উপন্যাসের শৈলী বুঝাইবার জন্য ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপত্তি কাল হইতে বাণপূর্ব ও বাণের সমসাময়িক সাহিত্যে কাব্য-রীতির উন্মেষ ও বিকাশের ঐতিহাসিক ধারার আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের আলোচনা থিয়োরী-বিধৃত আলোচনা নয়। কাব্যের আকৃতি-প্রকৃতির অনুসন্ধানের পথে চলিতে চলিতে সাহিত্যের ফসলে যে পরিচয় মিলিয়াছে, ইহা তাহারই আলোচনা। ইহা কাব্য-শরীরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-জাত কাব্য-ধারায় উদ্ভিন্ন ও ক্রমাভিব্যক্ত শৈলীরই আলোচনা। এ শৈলীর নাম দিয়াছি কাব্য-রীতি। উপন্যাসের টেকনিকের প্রসঙ্গে কথা ও আখ্যায়িকার আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে কেবল আলঙ্কারিকদের মতবাদ বিধৃত হয় নাই, নানা দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাদের আলোচনা করা হইয়াছে, বিচার করা হইয়াছে, বিচারের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। উপন্যাসও গল্প, তাই কাদম্বরী-পূর্ব সংস্কৃত-সাহিত্যের গল্পেরও প্রকৃতি বিচার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম—অঙ্কুর। ইহাতে ৮টি উপবিভাগ আছে : ১। বাণের জীবন-চরিত ২। প্রকৃতির কবি বাণভট্ট ৩। বাণের রীতি ৪। বাণের কামশাস্ত্র-জ্ঞান ৫। অলঙ্কার প্রয়োগে কবি বাণভট্টের বৈদগ্ধ্য ৬। বাণের রস-চেতনা। ৭। বাণের নীতিশাস্ত্র জ্ঞান। ৮। বাণের প্রতিভা।

বাণের জীবন-চরিতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতীয় জীবন-দর্শনে কবির ক্রান্ত দৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে বাস্তবতার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং কবির চিত্ত-ধারার সহিত সহৃদয়ের হৃদয়-সংবাদ দেখাইয়া কবি-মানসের নিত্য বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কাদম্বরী-কাব্যে পৌরাণিক তত্ত্বের আতিশয্যের পক্ষ হইতেও যুক্তি দেখান হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম—আকাশ। এই পরিচ্ছেদের দুইটি উপবিভাগ: ১। কিংবদন্তী ও কাদম্বরী ২। কিংবদন্তীর উপাদানে উপন্যাসের উপাদান।

এই পরিচ্ছেদে দেখান হইয়াছে যে উপন্যাসের চরিত্রগুলিই যে কেবল কিংবদন্তীর অন্তরসপুষ্ট, তাহা নহে, জীবন-সংবেদনার নিখিল উপাদানও কিংবদন্তী হইতে আগত। কিংবদন্তীর বাহিরে কেবল কাদম্বরীর নয়, ভারতীয় জীবনানুভূতিরও কোন অস্তিত্ব নাই। উপাদানগুলি হইল জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, অভিশাপ, ইন্দ্রজাল, দৈববাণী, দেহান্তর, রূপান্তর, স্বপ্ন ও প্রেম। এগুলি বৈদিক যুগ হইতে বাণের কাল পর্যন্ত ভারতীয় পাঠক-মানসের অচ্ছেদ্য অংশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম—বিশ্লেষণ। এই পরিচ্ছেদের পাঁচটি উপবিভাগ: ১। কথাসংক্ষেপ ২। কাদম্বরী কাহিনীর উৎস ৩। ঘটনা-বিন্যাস ৪। চরিত্রায়ণ ৫। উপসংহার।

ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্রায়ণে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।

কাদম্বরী লইয়া ইতিপূর্বে কোনও গবেষণা হয় নাই। আমাদের গবেষণাই মৌলিক। আমরা প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় শাশ্বত মানস পটভূমিকার আলোকে বাণভট্টের কবি-সত্তার আবিষ্কার করিয়াছি। ভারতীয় জীবনের ঐতিহ্যবাহিনী নানা অনুভূতির সহিত বাণের জীবনানুভূতির সমন্বয় দেখাইয়াছি। আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনায় সম্পূর্ণ নূতন। আলোচনার দুইটি ধারা—একটিতে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনের সহিত কাদম্বরী কাব্যের নাড়ীর যোগ উদ্‌ঘাটন, অপরটিতে আধুনিক কালের ঐতিহাসিকী ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যার আলোকে কাদম্বরীর মধ্যে ভারতীয় জীবন-দর্শনের প্রত্যক্ষীকরণ। ভারতীয় অধিমানস জীবন যে কাদম্বরীতে প্রতিবিম্বিত, ইহারই আবিষ্কারের মধ্যে আমাদের গবেষণার মৌলিকত্ব।

বিষয়সূচী

সংস্কৃত-সাহিত্যে গদ্য-শৈলী

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য বলিতে কেবল কবিতাকে বোঝায় না—কবিতা ও গদ্য উভয়কেই বোঝায়। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—অলঙ্কার-শাস্ত্রের এই সংজ্ঞাটি তাহার প্রমাণ। কাজেই পদ্য হউক, গদ্য হউক, রসোত্তীর্ণ হইলেই তাহা কাব্য। গদ্য-শৈলীর ইতিহাসের প্রসঙ্গে তাই একথা বলিয়া রাখা ভাল যে স্বতন্ত্র হইলেও ইহা মূলতঃ কাব্য-শৈলী। ইহার ইতিহাসের আলোচনা প্রকৃতপক্ষে কাব্য-শৈলীরই আলোচনা। সংস্কৃত কাব্যের ভাষা অলঙ্কৃত ভাষা। ইহাকে অভিজাত দরবারি ভাষা বলা উচিত ; কারণ, ইহার পটভূমিকার বৃহত্তর অংশ জুড়িয়া আছে রাজদরবারের প্রভাব। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে ornate court-poetry আখ্যা দিয়াছেন।

প্রাচীন কবিতাগুলি ছিল—বীররসাশ্রয়ী। আর্য-অভিযানের জীবন-ভূমিকার সহিত এইসকল কবিতার ছিল নাড়ীর যোগ। বৈদিক সাহিত্যের ইন্দ্রবৃত্ত ঋক্‌গুলির মধ্যে জাতীয় যুযুৎসার সেই উষ্ণ প্রেরণার অগ্নিরস সার্থক বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। এই দিক দিয়াই বোধ হয় অভিনব গুপ্ত অভিনব-ভারতীতে বীররসকে প্রাচীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। শৃঙ্গাররসে জৈব প্রেরণার আদিমত্ব, বীররসে আভিযানিক মত্ততার প্রাচীনত্ব। রামায়ণে ও মহাভারতে বীররসাশ্রয়ী যে-সকল প্রাচীন কবিতার সন্ধান মেলে, সেগুলি রাজদরবার-কেন্দ্রিক। রাজদরবারে সূতগণ বা চারণগণ থাকিতেন। বীর-রসাশ্রয়ী প্রাচীন কবিতাগুলির তাঁহারাই ছিলেন পালক-পিতা। রাজদরবারে থাকিয়া তাঁহারা রাজগণের বন্দনা গাহিতেন। বীরত্ব-ব্যঞ্জক গাথা রচনার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সংগ্রামমত্ত ভীষণ ভয়াল ভয়ঙ্কর বীরগণের বীরত্বব্যঞ্জনা চোখে দেখিবার সুযোগ যেমন গ্রহণ করিতেন, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধযাত্রার পথে বীরগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারা এমন বীরত্বব্যঞ্জক গাথা গাহিতেন, যাহার প্রেরণার অগ্নিরস-মত্ততায় উত্তেজিত বীরগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বিবক্ষু পতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধ-তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে গাথা-রচনার জীবন্ত প্রেরণা তাঁহারা লাভ করিতেন। তাঁহারা বীরগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া সমরাভিযানেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা কেবল গান গাহিতেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে যুধ্যমান বীরের

রথচালনাও করিতেন। অবশ্য জীবনের আনন্দঘন পরিবেশে—ছুটির মেজাজে এই গাথাগুলি রচিত হয় নাই। মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া ও পুরস্কার-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি যখন রাজগণের অন্যতম বিলাস-ব্যসন ছিল, এই গাথাগুলি সেই কালের রচনা। কোন এক উৎসব উপলক্ষে—সে বিজয়োৎসবই হউক, আর যজ্ঞীয় উৎসবই হউক, সেই বিশিষ্ট জনসমাবেশে চারণেরা গান গাহিতেন। কালে কালে এই চারণী প্রতিভার একচেটিয়া খদ্যোত-দীপ্তি ম্লান করিয়া নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার আলোক-সমুদ্র-মথিত অমৃত-কিরণ দিকে দিকে বিকীর্ণ করিয়া রাজসভায় যখন সরস্বতীর বরপুত্র সর্ববিদ্যাধর কবিগণের অভ্যুদয় হইতে লাগিল, তখন আর চারণগণের গান শুনিয়া রাজগণ তৃপ্ত হইতেন না। সভ্যতার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবোধ ও রুচিবোধ উন্নত হওয়ায় প্রতিভাধর কবিগণের আসন রাজসভায় কায়েমী হইতে লাগিল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আওতায় পরিবর্ধিত হইলেও বিদ্যাবত্তায় ব্রাহ্মণগণের প্রতিযোগী ছিলেন। ইঁহাদের কল্পনা-ঘন লেখনী-মুখ হইতে যুদ্ধ-বর্ণনার যে ভাষাচিত্র উৎসারিত হইতে লাগিল, তাহার মূলে প্রত্যক্ষ-দর্শনজাত সজীব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, ছিল কিংবদন্তীর কুহেলীভরা আশ্রয় অথবা গতানুগতিক আদর্শের একান্তনির্ভরতা। তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে অপূর্ব-নির্মাণক্ষমা কবি-প্রতিভা সৃজনী-শক্তির (creation) স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া আঙ্গিক ও পাণ্ডিত্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। যাঁহাবা প্রশস্তি-রচনায় সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহারা জানিতেন, কীভাবে মহিমা কীর্ত্তন করিলে রাজা খুশি হইবেন। প্রশস্তি-রচনায় কবিদেরই ডাক পড়িত। প্রশস্তি-রচনার প্রেরণা হইতেই মহাকাব্য-রচনার প্রেরণা জন্মলাভ করে। এই প্রশস্তির অনুশীলন রাজদরবারে অধিক পরিমাণে হইত।

আরও পশ্চাতে ফিরিয়া উপনিষদের যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, সেকালের ক্ষত্রিয় রাজগণের সভায় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মতত্ত্বের আলোচনা হইত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিগীষু ঋষিগণ সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। দার্শনিক তত্ত্বের বিতর্ক-যুদ্ধে যিনি জয়লাভ করিতেন, তিনি স্বর্ণ-বিমণ্ডিত-শৃঙ্গ দশ সহস্র ধেনুর ন্যায় উপযুক্ত পারিতোষিক লাভ করিতেন। এরূপ কল্পনা করা চলে যে, সেই সভায় পুরস্কার-বিজয়ী ঋষি নিশ্চয়ই পুরস্কার গ্রহণ কালে রাজার ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের প্রশস্তি শোনাইতেন। শুধু এই অবসরে নয়, সময়ান্তরেও এইভাবে রাজগণের আত্ম-কীর্তি ও পূর্ব-পুরুষগণের কীর্তিগাথা শুনিবার লালসা পরিতৃপ্ত হইত। যাঁহারা মুখে মুখে

এইরূপ প্রশস্তি রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কবি ছিলেন এবং এই প্রশস্তি-কবিগণ মনোজ্ঞ রাজ-উপহারে সম্মানিত হইতেন। বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত নারাশংসী কবিতাগুলি এই সত্যেরই সমর্থক। পৃষ্ঠপোষক রাজা ও দেবগণের উদ্দেশে রচিত দানস্তুতি প্রচলিত প্রথার অন্যতম প্রমাণ। রাজা যেমন ছিলেন দানে মুক্তহস্ত, তেমনি প্রশস্তিকার ও নিশ্চয়ই একজন থাকিতেন না। তাই প্রতিযোগিতা হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ প্রতিযোগিতায় প্রশস্তিকারগণের লক্ষ্য থাকিত প্রশস্তির উন্নত মানের দিকে। যাঁহার রচনা যত উৎকৃষ্ট হইত, তিনি তত কবি-খ্যাতির অধিকারী হইতেন। রচনা-নিষণ্ণ এইরূপ প্রতিযোগিতা হইতে রচনার ক্রমোদ্‌ভিন্ন আঙ্গিক সৌন্দর্যের দিকে সেদিনকার কবিগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনার সাহায্যে আমরা এই কথাই প্রতিপন্ন করিতে চাই যে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় কেবল কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ নয়, আত্ম-তত্ত্বের সকল বিসংবাদেরও চূড়ান্ত মীমাংসা হইত। বৈদিকযুগে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণগণ আত্মতত্ত্ব-নির্ণয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ-মতবাদী হইলে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য ক্ষত্রিয় রাজারই শরণাপন্ন হইতেন।[১] এই প্রসঙ্গে যেমন রাজর্ষি জনকের রাজসভার উল্লেখ করা যায়, তেমনি পরোক্ষভাবে রামায়ণের কাব্যকলার উৎকর্ষের রাজকীয় স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাজা রামচন্দ্রের সভারও উল্লেখ করিতে হয়। ক্লাসিক্যাল যুগের তো কথাই নাই। রাজশক্তির সমর্থনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যকলার চরম অভ্যুন্নতি।

বৈদিক যুগের লোক-জীবনের কোন কাব্য আমরা পাই নাই। ঐ সময়ে কোন লোক-কাব্য রচিত হইলেও তাহার ভাষা-রূপ কী ছিল, তাহাও অজ্ঞাত। তবে মনে হয়, কাব্য তখনও ছিল। সে-কাব্য আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত না হইতে পারে। লোক-জীবনের সুখ-দুঃখের বাহন, অবসর-বিনোদনের সামগ্রী, অকথিত কথা, অগীত গান, ব্যর্থবেদন-রাশির মানসিক চরিতার্থতায়-ভরা কাব্য তখন ছিল। তাহার ভাষা কী ছিল—ঠিক জানিনা। তাহাতে কোন শিল্প-কলার উন্মেষ ছিল কিনা, তাহাও জানি না। তবে এইটুকু জানি যে

১। "In the Upanisads, however, we are repeatedly told that Kings or warriors are in possession of the highest knowledge, and that Brahmans go to them for instruction. Thus the Brahman Gautam, father of Svetaketu, goes to king Pravāhana in order to be instructed by him concerning the Beyond."

—H. I. L. V. PI. P. 20

ঐ কাব্যগুলির প্রেরণা ও দাবি সংবাদ-সূক্তে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যজ্ঞীয় ও গার্হস্থ্য উৎসবে যে কাব্য-নাটকের আবৃত্তি হইত, তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ ও শিল্পসুন্দর না হউক, তাহাদের পূর্বরূপ যে লোকজীবনের অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রাম্য কবির অপটু হাতের অজানা ভাষায় রচিত, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন লোক-সাহিত্যের আদিমতম উন্মেষ বিস্মৃত অতীত অন্ধকারের এক শীর্ণ-শিখ প্রদীপের আলোকে। বৈদিক অভিজাত সাহিত্যের আকস্মিক ঝড়ে সে-দীপ নিভিয়া গিয়াছিল কিনা, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, সেদিনকার ঝড়ের বেগকে চ্যালেঞ্জ দেবার মত শক্তি তাহার ছিল না; তাই লোক-জীবনের জীর্ণ কুটীরে আপন চিত্তের অসহায় ক্রন্দনে স্নেহহীন পাত্রে জাগিয়া থাকিয়া সে নিভু নিভু করিতেছিল। কিন্তু অভিজাত মহাঝঞ্ঝা সেই ক্ষীণ আলোক-শিখাকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। সভ্যতার নবীন ঊষা আলোক-নর্তকীর অলঙ্কারের মধ্যে তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ঋগ্বেদের ঊষা-সূক্তের ঊষা যখন নর্তকীবেশে অরুণরাগরঞ্জিত নীলাকাশের রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে লীলায়িত দেহলতাকে ক্ষণে ক্ষণে আকুঞ্চিত, ক্ষণে ক্ষণে বিস্ফারিত করিয়া অনাবৃতবক্ষে অধরের মৃদু মৃদু হাসি দিয়া প্রেমিককে অভ্যর্থনা জানাইতেছিল, সেদিনকার সেই চিত্রখানি ঋগ্বেদের বক্ষে প্রোথিত থাকিয়া দুইটি ইঙ্গিত বহন করিতেছে: প্রথম ইঙ্গিতটি পরবর্তী লৌকিক প্রেম-কবিতার ধ্রুবতারার বাণীতে পরিপূর্ণ; দ্বিতীয় ইঙ্গিত লোক-জীবনের বাসনালোকের বাণীর শিল্প-সুশ্রী আত্মপ্রকাশে গুঞ্জনমুখর। একথা বহু-স্বীকৃত যে বেদের কবিতাগুলি লৌকিক সংস্কৃত কাব্যের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শুধু কবিতা কেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ছোট ছোট বাণীগুলি পরবর্তী কালের গীতি-কবিতার অনুশীলনে যেমন প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তেমনি কবিতার সম্প্রসারিত রূপ ও পরবর্তী গদ্যরীতির উপর বাঁধনছেঁড়া মুক্তির আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল; অন্ততঃ পরবর্তী গদ্য লেখকগণকে একটা পথের সন্ধান দিয়াছিল; আবার বৌদ্ধ থেরী গাথা ও জৈন আচারাঙ্গ সুত্ত পরবর্তীকালের সাহিত্যের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। থেরী গাথার প্রাথমিক কবিতাগুলি ভগবান্ বুদ্ধের জন্মের পূর্বেই রচিত এবং জৈন আচারাঙ্গ সুত্ত খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের নিকটবর্তী কালে রচিত বলিয়া মনে হয়।

এখন প্রশ্ন, যে-সংস্কৃত-ভাষার যৌবন-জলতরঙ্গে মহাকবি কালিদাস, ভারবি,

মাঘ, বাণভট্ট প্রভৃতিকে পাইয়াছি, সে-ভাষার উৎপত্তি কবে হইয়াছিল? অতি প্রাচীনকালে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি যাহার রূপকে শিষ্ট-সম্মতরূপে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পূর্বে মহর্ষি বাল্মীকি যখন 'মা নিষাদ'-চিহ্নিত লৌকিক সরস্বতীর আবাহন করিয়া 'কিমিদং ব্যাহৃতম্ ময়া'—বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন,—ঐ ভাষার উৎপত্তি নিশ্চয়ই তাহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। আবার তর্ক ওঠে, ছিল যদি, তাহার সাহিত্য কোথায় গেল? ছিল না বলিয়া যাঁহাদের ধারণা ছিল, তাঁহাদের অন্যতম আচার্য মোক্ষমুলর। মোক্ষমুলর-পন্থীদের ধারণা ছিল, পাণিনি ও মহাকবি কালিদাসের মধ্যবর্তী সময়ে প্রাকৃতেই লৌকিক সাহিত্য রচিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য উত্থানের কালে ঐ প্রাকৃত রচনাগুলি সংস্কৃতে অনূদিত হয়। এমত নাকচ হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃতের শূন্য আসনে যাঁহারা প্রাকৃত ভাষাকে রাজচক্রবর্তিরূপে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য-পালনের দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের জানা ছিল না যে প্রাকৃতের মিথ্যা-অহঙ্কৃত সার্বভৌমত্বের কালেও সংস্কৃতের চতুরঙ্গ সমর-বাহিনী ভাষা-শিল্পের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সমান অভিযান চালাইয়াছিল। সে অভিযানের যে গোপন তথ্য কাল-পুরুষের মসীকৃষ্ণ চাবিকাঠির মধ্যে বাঁধা ছিল, পতঞ্জলি সেই গোপন তথ্যের খানিকটা হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ ১৫০ এর পূর্বে ও যে লৌকিক সংস্কৃতের অনুশীলন হইত, তাহার প্রমাণ মেলে মহাভাষ্যে। আরও পূর্বতন নজির হইলেন ব্যাকরণকার পাণিনি। পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর লোক। রাজশেখরের কথা সত্য হইলে পাণিনি দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—(১) জাম্ববতী-বিজয় ও (২) পাতালবিজয়। সাহিত্য-সংকলনে ঐ দুইখানি কাব্য হইতে কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। 'পাতালবিজয়ে'র একটি শ্লোকে ব্যাকরণ-অশুদ্ধি থাকায় পাণিনিকে উহার কবি বলিয়া স্বীকার করা চলে না। অতএব দুইজন পাণিনিকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু একাধিক পাণিনিকে স্বীকার করিলে উক্ত দুইখানি কাব্যের কর্তৃত্ব অনাবিষ্কৃত ও অখ্যাত পাণিনির স্কন্ধে চাপাইতে হয়। তাহাতে অসুবিধা হয় এই যে, পাণিনির কাল ধরিয়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের প্রবর্তনার ঐতিহাসিক কালদণ্ড হস্তস্পর্শের বাহিরেই থাকিয়া যায়; কারণ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বলিতে পাণিনি-অনুশাসিত ভাষার সংস্কৃত সাহিত্যরূপকেই বোঝায়।

মহাভাষ্যের মধ্যেই আমরা পতঞ্জলির এবং তাঁহার পূর্ববর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার খবর জানিতে পারি। জীবন-মঞ্চের নেপথ্য-ভূমিতে বিস্মৃতির

আড়ালে যে সারস্বত সাধনা নানা বৈচিত্র্যের আসরে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল, পতঞ্জলি সেই সাধনার চীনাংশুক অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বাস্তবের যজ্ঞভূমিকে আমাদের চোখের উপর আনিয়া হাজির করিলেন। পতঞ্জলি যে কেবল মহাভারতের কথাই জানিতেন, তাহা নহে, তিনি নাট্য-কাব্য ও তাহার অভিনয় বা আবৃত্তি, চারণ-মুখনিঃসৃত গাথাকাব্য ও নানা আখ্যায়িকার কথাও জানিতেন। নাট্য-কাব্যের মধ্যে কংসবধ ও বলিবন্ধের ও যেমন তিনি নাম করিয়াছেন, তেমনি আখ্যায়িকার মধ্যে যবক্রীত, যযাতি, প্রিয়ঙ্গু, বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভৈমরথীরও উল্লেখ করিয়াছেন। বাররুচ কাব্যের কথাও আমরা শুনিয়াছি। যে-সকল কবিতা তখন প্রচলিত ছিল, তাহাদের কতকগুলির একটি মাত্র করিয়া পংক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি সে-কালের কাব্য-স্রোতের বহতা ধারার কথাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। 'সা হি তস্য ধনক্রীতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী,' 'বরতনু সম্প্রবদন্তি কুক্কুটাঃ,' প্রিয়াং ময়ূরঃ প্রতিনর নৃত্যতি...' 'আবনান্তাৎ ওদকান্তাৎ প্রিয়ম্ পান্থমনুব্রজেৎ' 'প্রথতে তয়া পতিমতী পৃথিবী' 'জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ,'... 'সোঽয়ম্ উঞ্ছেন জীবতি' 'বুভুক্ষিতম্ ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ'—প্রভৃতি সেই অবলুপ্ত মুক্তাখচিত কাব্য-অলঙ্কারেরই দুই একটি চ্যুত মুক্তাফলক।

আবার এই সময়কার কবিতাগুলির ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই কথাই মনে স্বতঃই উদিত হইবে যে তাহারা যেমন বৈদিক ছন্দ হইতে স্বতন্ত্র গোত্রের, তেমনি যে আদর্শের (motif) দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজনের অনুপাতে ঐ ছন্দগুলি রচিত হইয়াছিল, কবিতার সেই আদর্শ ও তেমনি ভিন্ন গোত্রের। বৈদিক ছন্দগুলির মধ্যে আছে দেবতা ও যজ্ঞক্রিয়ার রহস্য-উদ্‌ঘাটনের নাড়ীর যোগ। গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, জগতী, দ্বিপদাবিরাজ, উষ্ণিঃ, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দের নামগুলিই ইহাদের আদর্শ ও প্রয়োজনের প্রাচীরপত্র। কিন্তু পতঞ্জলির ও তাঁহার পূর্ববর্তীদের কালের ছন্দগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই যুগের উদ্ধৃত কবিতার সংখ্যা সামান্য হইলেও তাহাদের ছন্দগুলির মধ্যে নূতন খবর আছে। সাধারণতঃ প্রচলিত শ্লোক ও ত্রিষ্টুভ্ ছাড়া মালতী, প্রহর্ষিণী, প্রমিতাক্ষরা, বসন্ততিলক ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়কার কারিকাগুলির ও ছন্দের দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে, ইহারা স্থির-আশ্রয় বৈদিকবৃক্ষের শাখা ছাড়িয়া মানব-বাসনা-লোকের বর্ণরাগ-রঞ্জিত নীলাকাশে উড়িবার জন্য পাখা মেলিয়াছে ;—প্রকৃতি ও মানুষের রাখীবন্ধনে অপেক্ষিত জীবন-লীলার

রঙ্গীন স্বপ্ন যেন তাহাদের হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। কারিকার ছন্দগুলির মধ্যে শ্লোক ও বক্ত্র ছাড়া ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, শালিনী, বংশস্থা, সমানী, বিদ্যুন্মালা, তোটক, দোধক ছন্দ আছে। বৈদিক ও মহাকাব্য-সাহিত্যের ছন্দচারণার স্বাধীনতার তুলনায় কাব্য-সাহিত্যের স্বাধীনতার ক্ষেত্র যে অনেক প্রশস্ত, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবন যখন বৈচিত্র্যের আঘাতে আঘাতে একটু একটু করিয়া কোরকের বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া আত্মপ্রকাশের পথে নামিয়া রঙ বেরঙের পাগ্ড়ি মেলিতেছিল, তখনই এই সকল ছন্দের ডাক পড়িয়াছিল ; সৃষ্টিশীল কবি-মনীষার অপূর্ব নির্মিতির মন্ময়লোকে যে আলোড়ন উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই ইহাদের জন্ম।

যাহা হউক, পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে যে কেবল কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা নহে, 'অজাকৃপাণীয়' 'কাকতালীয়' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখের মাধ্যমে পশুপক্ষি-গল্পেরও ইসারা পাওয়া যায়। ইহাদের সংগ্রহের উপরেই হয়ত পঞ্চতন্ত্রের পত্তন।

পতঞ্জলি সংস্কৃত কাব্যের অস্তিত্বের যে নজির আনিয়া হাজির করিলেন, তাহার পাশে পিঙ্গলের ছন্দসূত্রখানি রাখিয়া চিন্তা করিলে বৃহত্তর-সংস্কৃত-কাব্য-জীবনের উৎসবের ঘটা যেন চাক্ষুষ হইয়া ওঠে। পিঙ্গলের ছন্দসূত্র বেদাঙ্গের অন্তর্গত হইলেও উহা মুখ্যতঃ লৌকিক ছন্দেরই শাস্ত্র। পিঙ্গলকে প্রাচীন মুনি বলিয়াও মনে করা হয়। অনেকে তাঁহাকে পতঞ্জলি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার ছন্দশাস্ত্রখানি যে কবে রচিত হইয়াছিল, তাহাও বলা কঠিন ; তবে এইটুকু বলা যায়, তাঁহার গ্রন্থে সংস্কৃত কাব্য-চর্চার যুগ-পরিবর্তনের সাক্ষ্য মেলে। গ্রন্থখানির রূপ দিতে অনেক কাল লাগিয়াছিল। যে-ছন্দগুলির উল্লেখ উহাতে আছে, সেগুলি কেবল কাব্য হইতে গৃহীত নয় ; তাহাদের উজ্জ্বল ললাটে যুগান্তরের কাব্য-চর্চার ভাস্বর তিলক মুদ্রিত হইয়া আছে। সে-তিলক শৃঙ্গার-গীতি-কবিতার তিলক। শৃঙ্গার-গীতি-কবিদের প্রেমিক-প্রেমিকার নানা মেজাজ (mood) লইয়া নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নানা ছন্দের আবির্ভাব। বাস্তব প্রেমের বিশেষ বিশেষ ভাব-প্রকাশনার জন্য—বিশেষ বিশেষ মেজাজ ঘনাইয়া তুলিবার জন্য ছন্দের মধ্যে ব্যক্তি-দৃষ্টিভঙ্গী (individual out-look) আসিয়া পড়ায় ছন্দরূপের মধ্যে নিয়ত নূতন পদধ্বনি শোনা গিয়াছে—নূতন ছন্দের ঘন ঘন ডাক পড়িয়াছে। মহাকাব্যের কবিরা একটি ছন্দের বাহনে অনেকটা পথ চলিতে পারিতেন, কিন্তু প্রেমকাব্যের কবিরা দেখাইলেন—যত ভাব, তত ছন্দ।

পিঙ্গলের ছন্দগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মধ্য হইতে ব্যঞ্জনার মত ভাসিয়া ওঠে সেদিনকার কবিগণের জীবন-পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-বোধের রস-চেতনা। দেবতা নয়, যজ্ঞ নয়, ব্রহ্মানুভূতির রহস্যময় জঙ্গম পথ নয়, একেবারে প্রাণ-প্রাচুর্যে-বলবান্ জীবিত মানুষ সেদিনকার কবিগণের সকল কৌতূহল, শ্রান্তিহীন জিজ্ঞাসা, জ্ঞান, কলা-কুশলতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, মনীষা—এক কথায় সামগ্রিক জীবনবোধ-প্রকাশনার অদম্য ইচ্ছাকে শাশ্বত মঙ্গলের রজ্জু ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিয়াছে। সেই আকর্ষণে যে আলোড়ন জাগিয়াছিল, যে কম্পন-স্পন্দন ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই দ্যোতনার মধ্যে মানুষ, প্রকৃতি ও পশুপক্ষীর যে মেলবন্ধন হইয়াছিল, তাহা বাহ্য নয়, সম্পূর্ণ আন্তর। প্রকৃতি, পশুপক্ষী ও মানুষ অখণ্ড জীবনবোধে যে পরস্পর পরস্পরের আপেক্ষিক এই নব চেতনার রস-সঞ্চার হইয়াছিল যে কাব্যে, ছন্দ-সূত্রের ছন্দগুলি তাহার আত্মিক বাহন। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমিকার জগৎ-জোড়া রূপানুভূতি হইতে জন্মিল—চঞ্চলাক্ষিকা, কান্তোৎ-পীড়া, কুটিলাগতি, তনুমধ্যা, চারুহাসিনী, বসন্ততিলক প্রভৃতি ছন্দ। মঞ্জরী, মালা প্রভৃতি ছন্দের মুক্ত দ্বারা দিয়া নিখিল প্রকৃতির রূপলোক নারী-দেহের লাবণ্যের সহিত মিশিয়া পুরুষের চিত্তলোকের চমৎকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। দেহের সৌন্দর্য মনের বৃত্তিনিচয়ের পুষ্পিত বাসনার সহিত একাত্ম হইয়া এক অখণ্ড জীবন-সৌন্দর্যের ক্ষুরধার ইশারা হানিয়া গেল। পশুপক্ষীর জীবনবোধকে ও অশ্বললিত, কোকিলক, সিংহোন্নতা, শার্দূল-বিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দের মাধ্যমে মানুষী চেতনায় ভরিয়া তুলিয়া তাঁহারা কাব্যবোধের সহিত জীবনবোধের মৈত্রী সাধন করিয়াছিলেন।

অতএব তর্ক না তুলিয়াই মানিয়া লওয়া উচিত যে খ্রীষ্টীয় শতকে, হয়তো বা তাহার পূর্ববর্তী কালেও শৃঙ্গারগীতি-কবিতার অস্তিত্ব ছিল এবং খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দে যে মহারাষ্ট্রী গীতি-কবিতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মূলেও হয়ত ঐ কবিতাগুলির সক্রিয় প্রেরণা ছিল।

তাহা হইলে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত যে সংস্কৃত-সাহিত্য অনুশীলিত হইত, এ প্রমাণ পাওয়া গেল। আরও পাওয়া গেল, এই কাব্যানুশীলনের দুটি ধারা ছিল ; একটি গীতি-কাব্যের (Lyrical pcetry), অপরটি মহাকাব্যের। গীতিকাব্যের আলোচনা করিয়াছি, এখন মহাকাব্যের আলোচনায় আসা যাক।

প্রাচীন মহাকাব্য বলিতে আমরা রামায়ণ ও মহাভারত বুঝি।—তাই, রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া প্রাচীন মহাকাব্যের আলোচনা আরম্ভ করিতে হয়। রামায়ণ ও মহাভারত কোন বিশেষ কালের ও বিশেষ ব্যক্তির রচনা নয়। নানা সময়ের কবিগণের দানে উহারা সমৃদ্ধ। তাই ঐ কাব্য-দুইখানিকে যুগ-মহাকাব্য বা epic of growth বলা উচিত। রামায়ণ ও মহাভারতের সংগঠনের সূত্রপাত হয় ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্য-যুগের শেষের দিকে। বৈদিক ইতিহাস, আখ্যান ও পুরাণের মধ্য দিয়াই ঐ মহাকাব্য-দুইখানির জন্ম। প্রাচীন কাব্যের উৎকর্ষের সন্ধান মেলে ঋগ্বেদের সংবাদ-সূক্তে। ব্রাহ্মণ-পাঠে জানা যায় যে যজ্ঞীয় ও গার্হস্থ্য উৎসবের একটি অংগছিল—কাব্যনাটকের আবৃত্তি। মহাভারতের রচনা-কাল -সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মত মোটামুটি খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। রামায়ণের রচনাকাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পূর্বে। মহাভারতে উল্লিখিত কিছু কিছু নাম অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়,—যেমন পরীক্ষিৎ, জনমেজয়। এমন কি, জানা যায় যে 'পারীক্ষিতাঃ' বলিতে একটি সম্প্রদায়কে বুঝাইত। কিন্তু রামায়ণের উল্লেখ কোথাও নাই। রামায়ণের কোন চরিত্রের নাম বৈদিক সাহিত্যের কোথাও নাই। যাহা হউক, ঐ দুইখানি কাব্যের মধ্যে আবার রামায়ণকে আদি কাব্য বলা হয়। রামায়ণ বাল্মীকির রচনা। পরবর্তী ক্লাসিক যুগের মহাকবিরা বাল্মীকিকে আদি কবি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আদি কবির রচনার সূত্রে রামায়ণ আদি কাব্য। আরও তাৎপর্য আছে। কেবল মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিয়া যে রামায়ণ আদি কাব্য, তাহা নহে। মহাভারত কাব্য হইয়াও ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম, রাজনীতি, দর্শন, আখ্যায়িকা ও শৌর্যবীর্যের উপকথায় যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্তৃত। তাই বলা হয়, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' মহাভারতে ঘটনার ঐক্য নাই, রামায়ণে ঘটনার ঐক্য সংহত। তুলনায় রামায়ণ পুরাপুরি কাব্য। ভারতে আর্যগণের দক্ষিণমুখী অভিযানের ব্যাখ্যা, সীতা, রাম ও ধরিত্রীর রূপকতত্ত্বের বিশ্লেষণ, রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে আর্য-অনার্য-দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক আলোকপাত যত মুন্শীয়ানার সহিতই করা হউক না কেন, মূলতঃ রামায়ণ কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। উহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ভারতবাসীর চোখের জলে উহার অভিষেক, হৃদয়ে উহার প্রতিষ্ঠা। মহাভারতেও যথেষ্ট কাব্য-সৌন্দর্য্য আছে। তাই পরবর্তী কালের ক্লাসিক কবিরা রামায়ণ-মহাভারত হইতে তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল শৌর্য-বীর্য,

আত্মত্যাগ ও প্রেমের উপাদান নয়, ছন্দ, অলঙ্কার ও বর্ণনার প্রেরণা যোগাইয়াছে রামায়ণ-মহাভারতের কয়েকটি আদর্শ কবিতা। তাই অধ্যাপক winternitz বলিয়াছেন—The first traces of this ornate court-poetry are to be found in the Ramayana.

রীতির দিক দিয়া দেখা যায় জনপ্রিয় প্রাচীন কাব্যগুলি বিষয়বস্তুর প্রাধান্যের দিকে ঝুকিয়াছে বেশী। আঙ্গিকের দিকে তাহাদের নজর তেমন ছিল না। কিন্তু রামায়ণে আঙ্গিকেরই প্রাধান্য। বাল্মীকি উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার যেমন ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বর্ণনার ও প্রাধান্য দিয়াছেন। এক কথায়, পরবর্তী কালের অলঙ্কৃত রীতির প্রথম অভ্যুদয়ের সাক্ষ্য বহন করে রামায়ণ। রামায়ণেরই রচনারীতির ধারা পরবর্তী কালের কবিগণের হাতে পড়িয়া শিল্প-শোভার প্রাচুর্য বহিয়া আনিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল,—এই যে আঙ্গিকের প্রাধান্য, ইহা কি কেবল রামায়ণে ছিল? গীতিকাব্য, নীতিশ্লোক, কারিকা প্রভৃতিতে ছিল না? গীতিকাব্য প্রভৃতিতে দেখা যাইতেছে ছন্দো-বৈচিত্র্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ঐ ছন্দো-বৈচিত্র্যের পশ্চাতে যেমন একদিকে ছিল জগৎ ও জীবন-দর্শনের আকুল আগ্রহ, তেমনি অন্যদিকে ছিল—মনের একটি বিশেষ মেজাজ লইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এবং সূচীশিল্পের অলংক্রিয়া। ভাব-অনুসারে ছন্দের আবর্তনের মধ্যে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সঙ্গতি ও সামগ্রিকতার মাধ্যমে ঐ বিবিক্ত অংশকে শিল্প-পূর্ণতায় ভরিয়াতোলাই ছিল সেদিনকার কবিগণের শিল্প-চেতনার একমাত্র অধ্যবসায়। জীবনের খণ্ড রূপের প্রত্যেকটিকে (unit) নানা দৃষ্টিকোন হইতে সমগ্র করিয়া দেখিবার যে আনন্দ, সেই আনন্দকে ধরিয়া রাখিবার জন্য পাত্রের ও প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়। সেই পাত্রটি হইল, তখনকার কাব্যের আঙ্গিক বা রূপ-প্রকৃতি (form)।

অতএব স্বীকার করিতে হয়, কাব্যানুশীলনের দুইটি ধারা তখন পাশাপাশি বহিতেছিল—একটি রাজদরবারকে কেন্দ্র করিয়া, অপরটি লোক-জীবনকে মূলধন করিয়া। এই দুইটি ধারা স্বীয় স্বীয় সাধনায় নিত্য-উদ্ভাবিত সৌন্দর্যের যে সাক্ষাৎ পাইতেছিল, তাহা দিয়াই গড়িয়া তুলিতেছিল স্বীয় স্বীয় সাধ্য বস্তুর আঙ্গিক। অতএব সাহিত্যের আঙ্গিক-রূপায়ণে ঐ দুইটি ধারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করিতেছিল। উহার একটি ধারার সম্পন্ন রূপের মধ্যে পরবর্তী কালে যেমন কাব্য, নাটক, চম্পূকাব্য, কথা-আখ্যায়িকা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছিল, অপর ধারায় তেমনি শতক কাব্যের রসবন্যার একটি সর্বব্যাপী

আপ্লাবন দেখা দিয়াছিল। প্রথম ধারাটি রাজপৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট বলিয়া উহাতে দরবারি বা ধ্রুপদী ঢঙের প্রভাব পড়িয়াছে। তাহাতে ঐশ্বর্য্য, সমারোহ, চাকচিক্য অলঙ্করণ ও অনৈসর্গিকতা দেখা দিয়াছে। অতএব রামায়ণ সম্পর্কে winternitz-এর মন্তব্য সমর্থন-যোগ্য। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যানুশীলনের নিষ্ঠার সমতা থাকিলেও রাজদরবারে বিষয়বস্তু অপেক্ষা আঙ্গিকের প্রাধান্যের দিকে বিশেষ ঝোঁক পড়ায় সংস্কৃত-কাব্যকে ornate court-poetry বলা হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীন ধারা-দুইটির আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা কাব্য-শিল্পের আঙ্গিকের যে খবর পাইলাম, তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে কাব্যের আঙ্গিক-রূপায়ণে ত্রিবেণীসঙ্গম হইয়াছিল,—একদিকে রাজদরবার-ঘেষা প্রশস্তি, অন্যদিকে প্রেম-কবিতার উদ্দেশে উদ্ভাবিত ছন্দোবৈচিত্র্য, অন্যত্র অলঙ্কার-শাস্ত্রের উন্মেষ। মুখ্যতঃ এই তিনটি উপাদান স্বীয় স্বীয় আনুষঙ্গিক উপায়ন হাতে লইয়া একত্র সমবেত ও সংহত হইয়া কাব্যে যে তুরীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই সৌন্দর্যের রূপায়ণে আকৃতিগত সংগঠনার নাম আঙ্গিক। এই আঙ্গিক এক দিনে একটি বিশিষ্ট স্থানে গঠিত হয় নাই। ইহার জন্য লাগিয়াছে—দীর্ঘকাল। এই দীর্ঘকালে সাধনার নানা পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ লইয়া সাহিত্যে যে কঠোর তপস্যা চলিতেছিল, সে তপস্যার সিদ্ধি একদিনে আসে নাই, আসিয়াছে একটু একটু করিয়া—আসিয়াছে তিলে তিলে। তাই অনেক পরবর্তী কালে আমরা সেই অভীষ্ট সুগঠিত সৌন্দর্যের তিলোত্তমার সন্ধান পাইয়াছি।

কোন অতি প্রাচীন গ্রন্থে অলঙ্কার-শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রন্থ 'ললিত বিস্তরে' নানা শাস্ত্রের উল্লেখ-প্রসঙ্গে 'কাব্যকরণ' শাস্ত্র বলিয়া একটি শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। পাণিনি কৃশাশ্ব ও শিলালিন্ নামক দুইজন নটসূত্রকর্তার উল্লেখ করিয়াছেন। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে এ অনুমান করা চলে যে, বোধ হয়, খৃষ্টপূর্ব শতকে কোন অলঙ্কার-শাস্ত্র লিখিত হয় নাই।[১] ভরতের নাট্যশাস্ত্র একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। গ্রন্থখানি প্রথম কখন রচিত হয় এবং কোন্ সময়ে বা কোহল প্রভৃতির দ্বারা তাহা পরিবর্তিত হয়, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তবে এরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের পরবর্তী কালে রচিত নয়। নাট্যশাস্ত্রের তথ্যগুলি পূর্বে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ভরত

(১) কা, বি

সেগুলি শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। ডাঃ কে, সি, পাণ্ডের মতে ভরত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী কালের লোক। যাহা হউক, প্রাচীন কোন অলঙ্কার-শাস্ত্র পাওয়া যায় নাই। একমাত্র ভরত-মুনির নাট্য-শাস্ত্রেই বাচিক অভিনয়ের প্রসঙ্গে কিছু কিছু অলঙ্কারের আলোচনা আছে। আবার নাট্য-শাস্ত্র যখন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেক পূর্বেই শাস্ত্রখানি রচিত হইয়াছে। অতএব যে বা যে-সকল গ্রন্থ হইতে নাট্যশাস্ত্রে অলঙ্কার গৃহীত হইয়াছে, সে-সকল গ্রন্থ মহাকালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে winternitz-এর মন্তব্যটি ভাবিয়া দেখা উচিত। তিনি বলেন—**At all events, however, we are bound to assume that poetics arose from the study of cartin model poems—the Mahābhārata and especially the Rāmayāna.**

তাঁহার মতে রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি আদর্শ-কবিতার শিল্প হইতেই অলঙ্কার-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং কামশাস্ত্রের প্রভাবে তাহার পরিপুষ্টি। বাল্মীকি কোন অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া জানা যায় না। অশ্বঘোষ অলঙ্কার-প্রস্থানের কথা জানিতেন। পরবর্তী কালের অলঙ্কৃত কাব্য নিশ্চয়ই অলঙ্কার-শাস্ত্রের আওতায় গড়িয়া ওঠে। ভাসও কালিদাস ভরতের নাট্য-শাস্ত্রের কথা জানিতেন।

ভাষার রীতির আলোচনার সময় একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে অলঙ্কৃত কাব্যের রীতিকে আদর্শ করিয়া যে সকল কবিই কাব্য রচনা করিতেন, তাহা নহে। অনলঙ্কৃত ভাষায় ও অনেকে কাব্য রচনা করিতেন। এই সকল কবি, হয় অলঙ্কার-পূর্ব যুগের কবি, না হয়, উন্নত রুচির কবি। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে অনেক রীতি বা "প্রবৃত্তি"র উল্লেখ আছে। মনে হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কবিগণের কাব্যানুশীলনের বহুপূর্বে কেবল প্রাচ্য অঞ্চলেই রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় কাব্যরীতির অনুশীলন হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের গুপ্ত রাজগণের আমলেই পশ্চিম অঞ্চলের কবিরা অলঙ্কৃত কাব্যের কবিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।

বাল্মীকির রামায়ণই যখন সাহিত্যের প্রাচীনতম নজির এবং যখন রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি আদর্শ কবিতার মধ্যে আঙ্গিকের উন্মেষ দেখা যায়, তখন বলা যাইতে পারে যে রামায়ণের কাল হইতে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পূর্ব হইতে আঙ্গিকের উদ্ভব হইয়াছে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলির আবির্ভাব

ইহার প্রাচীনত্বকে আর একটু পিছনে ঠেলিতে চায়। অতএব খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের পূর্বেই যে আঙ্গিকের উদ্ভব হইয়াছে, এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মে। এই সময়কার কাব্যরীতির অস্তিত্বের অপর একটি নজির হইল প্রাকৃত কাব্যের রীতি। রামগড়-পাহাড়ের সীতাবেঙ্গা ও যোগীমারা গুহার ও কলিঙ্গের খারবেলরাজের হাথিগুম্ফা শিলালিপিতে কাব্য-রীতির সন্ধান মেলে। হাথিগুম্ফা[১] লিপিখানি সাহিত্যিক গদ্যে রচিত। কাব্য রীতির অনুপ্রাস, দীর্ঘ সমাস ও অপরাপর বৈশিষ্ট্য ইহাতে লক্ষিত হয়। বৌদ্ধ থেরীগাথা ও জৈন আচারাঙ্গ সুত্ত কাব্যরীতির অপর নিদর্শন।

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কবি। ভাসের কাল খ্রীষ্ট্রীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক। পঞ্চতন্ত্র রচিত হয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে। অতএব যুগ বিভাগ করিলে ক্লাসিক-পূর্ব বা ক্লাসিক সূচনা-যুগের মধ্যে পড়েন অশ্বঘোষ ও তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ, হাল, গুণাঢ্য, পঞ্চতন্ত্রকার ও ভাস। নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলেও বলা চলে যে পরবর্তী অন্ধ্র-রাজগণ, প্রতীচ্য ক্ষত্রপ-রাজগণ, কুষাণ-রাজগণ, বাকাটক ও আদিযুগের গুপ্ত-রাজগণের রাজদরবারে ক্লাসিকপূর্ব বা প্রথম যুগের ক্লাসিক কাব্যের উৎপত্তি ঘটে। অতএব উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে অলঙ্কৃত কাব্যের উৎপত্তিকাল খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের ও পূর্বে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে অলঙ্কৃত কাব্যরীতির যে-যুগ সূচিত হইয়াছে, তাহাকে অলঙ্কৃত কাব্যের সুবর্ণযুগ বলা যায়।

এখন প্রশ্ন এই, কাব্যরীতি বলিতে আমরা কী বুঝিব? ইহার জন্য সংজ্ঞা রচনা নিষ্ফল। তাই ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করিতেছি।

এ রীতির বৈশিষ্ট্য— ১। উৎপ্রেক্ষাও উপমা; ২। দীর্ঘায়িত বর্ণনা;— বিশেষ করিয়া ঋতু, সূর্যোদয়, চন্দ্রোদয়, রজনী প্রভৃতির বর্ণনা; ৩। ছন্দো বৈচিত্র্য; ৪। অপ্রচলিত শব্দ ও শ্লিষ্ট পদের ব্যবহার, দীর্ঘ সমাস, শ্লেষ ও প্রহেলিকার প্রতি প্রবণতা; ৫। অর্থের তির্যক গতি, ৬। একটি মাত্র শব্দে বা

১। (ক) ঐরেন মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংসবধনেন পসথসুভলখণেন চতুরন্তলুঠনগুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা সিরিখারবেলেন পন্দরস বসানি সিরিকড়ারসরীরবতা কীড়িতা কুমারকীড়িকা।

খ। ততো লেখরূপগণনাববহারবিধিবিসারদেন সববিজাবদাতেন নব বসাণি যোবরজং পসাসিতং।

বাক্যে একাধিক শব্দ বা বাক্যের অর্থকে সঙ্কুচিত করিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা; ৭। সমাপিকা ক্রিয়ার স্বল্প ব্যবহারে ও তাহার বিশেষণীয় রূপান্তরে বিশেষ্য-পদের সার্বভৌমত্ব।[১]

প্রথমে ধরা যাউক উপমার কথা। বেদেও উপমার অভাব নাই। ভাষ্যকার যাস্ক ও ব্যাকরণকার পাণিনি কেহই উপমা ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই। যাস্ক তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে ভূতোপমা, রূপোপমা, সিদ্ধোপমা, লুপ্তোপমা বা অর্থোপমার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে গার্গ্যের উপমা লক্ষণের ও উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, গার্গ্যের এই উপমালক্ষণই উপমার সর্বপ্রথম লক্ষণ। মনে হয়, এই সময় হইতেই বাক্যালঙ্কাররূপে উপমা গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার পর পাণিনির সূত্রে, কাত্যায়নের বৃত্তিতে, শান্তনবের ফিট্‌সূত্রে ও মহাভাষ্যে উপমান ও উপমেয়ের নানা সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। 'উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে' 'উপমানানি সামান্যবচনৈঃ' 'উপমানাদাচারে' 'তেনতুল্যং ক্রিয়াচেদ্বতিঃ'। জৈন ও বৌদ্ধগণের ধর্ম-গ্রন্থে উপমা ছিল শিক্ষার মাধ্যম। কাব্যের অলঙ্কৃত ভাষায় তাই কবিগণ উপমার বেড়াজাল ফেলিয়া পাঠক বা শ্রোতার মনকে বিস্ময় ও চমৎকারিতার মধ্যে ধরিবার জন্য ব্যগ্র ও ব্যস্ত হইয়া ওঠেন। দ্বিতীয়তঃ বর্ণনার এমনি ঘনঘটা, এমনি যোজন-ব্যাপী রাজকীয় শোভাযাত্রা যে তাহার তলে পড়িয়া গল্পবেচারা দুর্লক্ষ হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ ছন্দোবৈচিত্র্যের পশ্চাতে আছে—কামশাস্ত্র-অনুশীলনজাত শৃঙ্গার-প্রবৃত্তির চাহিদা ও সভ্য সমাজের রুচির উপর কলাকুলীন 'নাগরকগণে'র প্রভাব। শুধু কামসূত্র নয়, পাণিনি ও 'নাগরকে'র কথা জানিতেন।[২] চতুর্থতঃ সমাস। বৈদিকে সমাস যে ছিল না, তাহা নহে, তবে সংস্কৃতের তুলনায় অতি অল্পই ছিল। দুইটির অধিক পদের সমাস ছিল না বলিলেই চলে। চারিটি বা তাহার অধিক পদের সমাস একেবারেই ছিল না। সংস্কৃতেই সমাসের ঘন ঘন চাষ হইত এবং সেই চাষের পুরা ফসল সুবন্ধু ও বাণভট্টের সাহিত্যে। কাব্য শৈলীতে এই সমাসের সুবর্ণ সুযোগ আসিল সমাপিকা ক্রিয়াপদের স্বল্প ব্যবহারে অর্থাৎ প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্য পদের রূপ ছাড়িয়া ক্রিয়ার বাহুল্য লোপ করিয়া বিশেষণের বিচিত্র ভূমিকায়

১। The development of this style can be explained in part by the peculiarities of the Sanskrit language, in which, from the very beginning, nouns preponderate greatly over verbs. —H. I. L. F. I.

২। A. I. E.

বাক্যগুলির সংহত, সংযত ও বিস্ফারিত রূপ দেখা দিল। এইভাবে বিশেষ্য পদের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল। ইহাতে যে কেবল সমাসের দীর্ঘায়িত মালা-গাঁথার হিড়িক পড়িল, তাহা নহে, বর্ণনার শোভাযাত্রায় বিশেষণজাতীয় পদগুলি বাক্যরথের রজ্জু টানিয়া পথের পরিমাপ ঠিক করিবার জন্যই যেন আগে আগে ছুটিবার সুযোগ পাইল। ইহাদের যত দোষই থাকুক না কেন, ইহারা যে ভাষা-শিল্পে একটা অপূর্ব বেগ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে কবিগণের কাব্যরচনার প্রস্তুতি সম্পর্কে একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। কবিকে জ্ঞানের নানা শাখায় কৃতবিদ্য হইতে হইত। তাঁহাকে অভিধান কণ্ঠস্থ করিতে হইত। কারণ, অপ্রচলিত শব্দ ও একাধিক অর্থযুক্ত শব্দের সংগ্রহ হইল—অভিধান। অবশ্য এই অপ্রচলিত শব্দের প্রতি যে কবিগণের অন্ধ মোহ ছিল, এমন কথা বলি না। ছন্দের অনুরোধে ও ওজোগুণের প্রতি লক্ষ্য থাকায় সময়ে সময়ে অপ্রচলিত শব্দগুলির ব্যবহারের প্রতি কবিগণের প্রবণতা দেখা যায় এবং সেই প্রবণতার ছদ্মবেশে যে কখন না-বোঝা পাণ্ডিত্যের অভিমান ভূতের মত কাঁধে চাপিত, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। বিশুদ্ধ বাক্যরচনার জন্য তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান অত্যাবশ্যক। অর্থ-শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার থাকা চাই। শৃঙ্গাররস পরিবেশনের জন্য কামশাস্ত্র ভালভাবে জানা চাই; কারণ, যৌনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাম-সূত্র ভিন্ন অন্য কোথাও ছিল না। সর্বশেষে তাঁহার জানা চাই ছন্দঃ-শাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্র। ছন্দের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে মাত্র একটি কথা বলিয়া রাখি। কাব্য-শিল্পের নানা চিন্তায় খচিত হইলেও অলঙ্কার-শাস্ত্র কামশাস্ত্র--ভিত্তিক। ইতিহাস (Traditional knowledge) ও পুরাণের জ্ঞান তাঁহার সকল জ্ঞানের পরিপূরক রূপেই থাকিবে।

শিল্পে কাব্যরীতির অনুসন্ধানে অশ্বঘোষকে লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কবি। তাঁহার পূর্বেই কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠিত; নতুবা বৌদ্ধ অশ্বঘোষ লোক-জীবনের বাসনারঙ্গীন কুসুমাস্তীর্ণ পথ বাহিয়া বৌদ্ধ-ধর্মের উৎকর্ষের দুন্দুভিধ্বনি করিবার জন্য তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমরূপে সংস্কৃত-ভাষাকে এবং সংস্কৃত-ভাষার রচনারীতি হিসাবে কাব্য-রীতিকেই বা কেন গ্রহণ করিবেন? তাহার উত্তর হইল এই যে, সংস্কৃত ভাষা তখন সর্ব-ভারতীয় জনগণের সাহিত্যের ভাষা এবং রীতির ক্ষেত্রে কাব্য-রীতিই তখন

সাহিত্য-রসপিপাসু জনগণের অভিপ্রেত। স্বীয় কাব্যের বহুল প্রচারের মুখ চাহিয়া অশ্বঘোষকে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার কাব্যরীতিকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কাব্যের দিক দিয়া অশ্বঘোষের মধ্যে আমরা এই রীতির প্রথম সাক্ষাৎ পাই। অশ্বঘোষকে কণিষ্কের সমসাময়িক ধরিলে তাঁহার আবির্ভাব-কাল হইবে খ্রীষ্ট্রীয় প্রথম শতকের শেষ ভাগে অথবা দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকেই কাব্যরীতি রীতিমত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিত-গ্রন্থে কাব্যের যে আঙ্গিকের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা কাব্যের অনুশাসিত আঙ্গিক। তাঁহার রচনায় বৈদর্ভী-রীতির প্রাথমিক স্তরের সন্ধান মেলে। নিছক অলঙ্কারপ্রিয়তা অপেক্ষা অর্থ-ব্যঞ্জনার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল অধিক। তাঁহার কাহিনী নির্জীব ও বর্ণ-স্বাদহীন কেবলমাত্র তথ্য নহে, উহার মধ্যে কবিমানসের ঔৎসুক্য স্পষ্ট। যে-সকল শ্রোতার মনে ভ্রাম্যমান গাথা-কবির নিঃসাড় কাব্য নিষ্ফল হইত, তাহাদের নিকট স্ফুটতা, অর্থ-ব্যক্তি ও প্রসাদগুণের ফলে অশ্বঘোষের কাব্য চমৎকার আবেদন আনিয়া দিত। রচনায় মনের তড়িৎবার্তার স্বাক্ষর ছিল বলিয়া সাম্য-বিধির (Total effect) জন্য ভাষায় রংমশালের জৌলুষ বা সতর্ক সযত্ন ভাস্কর্য-শিল্পন্যাসের কোন প্রয়োজনই ছিল না এই কারণেই তাঁহার রচনা পাঠকমহলে অভূতপূর্ব আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কালিদাসের তুলনায় কোন কোন অংশে অশ্বঘোষের রীতি অনেক সহজ। রামায়ণের উপমা ও উৎপ্রেক্ষা অশ্বঘোষের হাতে অনেক মার্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অশ্বঘোষে যমকের অভাব নাই[১]। বুদ্ধচরিত আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি কাব্যরীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাচীন উৎস হইতে গৃহীত, বিচ্ছিন্ন ও ঐক্যহীন কাহিনীকে প্রামাণ্য শিল্পের মাধ্যমে একটি বিশেষ পূর্ণায়ব রূপ দিতে পারিয়াছিলেন। শুধু অশ্বঘোষ কেন, তাঁহার সমসাময়িক মাতৃচেত ও কুমারলাটও এই রীতিরই অনুবর্তী ছিলেন।

অশ্বঘোষের কাব্যে কাব্য রীতির যে উন্মেষ দেখা দিল, শিলালিপিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ প্রথম দ্বিতীয় শতকে খারবেলরাজের

১। ন চাজিহীর্ষীদ্ বলিমপ্রবৃত্তং ন চাচিকীর্ষীৎ পরবস্তুভিধ্যাম্।
ন চাবিবক্ষীদ্ দ্বিষতামধর্মং ন চাবিবক্ষীদ্ধৃদয়েন মন্যুম্ ॥ (যমক) বু, চ, ২. ৪৪

চলকুণ্ডলচুম্বিতাননাভিঘননিশ্বাসবিকম্পিতস্তনীভিঃ।
বণিতাভিরধীরলোচনাভির্মৃগশাবাভিরিবাভ্যুদীক্ষ্যমাণঃ। (শ্লেষ)

হাথিগুম্ফা লিপিখানি প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইলেও ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—কাব্য-রীতির অনুগত অনুপ্রাস, দীর্ঘসমাস ও অপরাপর আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্য। খ্রীষ্টীয় ১৫০ অব্দে রুদ্রদামার গির্ণার-প্রশস্তিতে[১] সংস্কৃত কাব্য-রীতির পরিচয় মেলে। ইহাতে এপিক সরলতার কাব্য-রীতিতে পরিণতির স্বাক্ষর আছে। ব্যাকরণের আনুগত্য থাকিলেও এপিকসুলভ অশুদ্ধিও দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষার প্রভাবও ইহাতে আছে। প্রশস্তিটি গদ্যে রচিত। গদ্যাংশে দীর্ঘ সমাস—কোথাও তেইশটি অক্ষরের নয়টি পদ, কোথাও চল্লিশটি অক্ষরের সতেরটি পদ। বাক্যগুলি দীর্ঘ—কোথাও ৩২টি অক্ষরের ২৩টির ও অধিক গ্রন্থ। শব্দালঙ্কারের মধ্যে যমক ও অনুপ্রাসের আধিক্য; অর্থালঙ্কারের মধ্যে দুই শ্রেণীর উপমা। রচনা-রীতি বৈদর্ভী। বৈদর্ভী রীতির অন্তর্গত কয়েকটি গুণেরও পরিচয় মেলে—"স্ফুটলঘুমধুরচিত্রকান্তশব্দসময়োদারলঙ্কৃতগদ্যপদ্যকাব্যবিধানপ্রবীণেন—"। ভরত-কথিত দশটি গুণের মধ্যে মাধুর্য, কান্তি, উদারতা, অর্থব্যক্তি ও প্রসাদগুণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে ক্ষত্রপের সভাকবি অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যে অলঙ্কৃত কবিতার রীতি গদ্যে গৃহীত হইল এবং শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, ইহা হইতে এই প্রমাণ মেলে যে ঐ সময়ের পূর্বেই কাব্যরীতি যথোপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৪৪ অব্দে রচিত সিরিপুলমায়ির নাসিক শিলালিপিতে কাব্য-রীতির অনুরূপ সাক্ষ্য মেলে। প্রশস্তিটি প্রাকৃত গদ্যে রচিত হইলেও ইহা যে কোন সংস্কৃতজ্ঞের রচনা, তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। মূল প্রশস্তিটি সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল, পরে উহা প্রাকৃতে পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে দীর্ঘ দীর্ঘ সমস্তপদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট পদের বিন্যাস আছে। অবশ্য এই প্রশস্তিখানির শিল্পকর্ম সুবন্ধু ও বাণের গদ্য-শিল্পের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট কিন্তু উভয়তঃ ধারাটি এক। বাণকেও দীর্ঘ দীর্ঘ সমস্তপদের মধ্যে শ্বাস-ক্রিয়ার বিরতিসূচক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। লিপির প্রারম্ভে সাড়ে আট পঙক্তির বাক্য। দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ পঙ্ক্তি ব্যাপিয়া দীর্ঘ সমাসের ঘটা। তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দের বিন্যাস। পরে ৪৩টি অক্ষরের ১৬টি-পদে-রচিত সমাসে বাক্যটির বিশ্রান্তি। শিল্পের দিক্ দিয়া ইহা অযত্ননির্বর্ত্য নহে, কষ্টকল্পিত। অনুপ্রাসের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার

(১) (ক) একার্ণবভূতামিব পৃথিব্যাম্; গি

(খ) পূর্বাপরাকরাবন্ত্যনূপনিবৃদানর্তসুরাষ্ট্রশ্বভ্রমরুকচ্ছসিন্ধুসৌবীরকুকুরাপরান্তনিষাদাদীনাং সমগ্রাণাং তৎপ্রভাবাদ্যথাবৎপ্রাপ্তধর্মার্থ-কামবিষয়াণাং বিষয়াণাং পতিনা........ গি

—"মহাদেবী মহারাজমাতা মহারাজপতামহী"। পরবর্তীকালের কাব্যসুলভ হিমবৎ, মেরু ও মন্দর শব্দের উপমানরূপে ব্যবহার। কিংবদন্তীসুলভ এপিক বীরগণের সহিত তুলনা ইহার কাব্য-রীতির অপর বৈশিষ্ট্য; মর্ত্যমানবের সহিত অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতিভূ সূর্য-চন্দ্র-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর প্রভৃতির কাল্পনিক মিশ্রণ ইহার কাব্যসুলভ চরিত্র। সংস্কৃত কাব্যের ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অস্তিত্ব যে তখন ছিল, এই শিলালিপিখানি তাহার পরোক্ষ প্রমাণ। খ্রীষ্টীয় ৩৫০ অব্দের কিছুপূর্বে রচিত এলাহাবাদে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের হরিষেন-প্রশস্তির লিপিখানি সম্পূর্ণ কাব্যধর্মের দ্বারা[১] প্রভাবিত। রীতিটি নিঃসন্দেহে বৈদর্ভী। প্রথমে আটটি স্তবকের কবিতা, তাহার পরে গদ্য এবং আবার একটি কবিতা। সবটা মিলিয়া একটি সুদীর্ঘ বাক্য। সমস্তপদ ও পদান্বয়ী বাক্যাংশের যোজনায় বাক্যটির দীর্ঘতা পরিকল্পিত। গদ্যাংশে দীর্ঘ সমাসের প্রবণতা। ১৩৩টি অক্ষরের সমস্তপদ থাকিলেও উচ্চাবচ ছন্দঃস্পন্দের মাত্রার ঐক্য থাকায় রচনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সাতটি কবিতায় স্রগ্ধরা, শার্দূলবিক্রীড়িত, মন্দাক্রান্তা, পৃথ্বী—এই চারিটি ছন্দ আছে। অনুপ্রাস খুব বেশি নাই, কিন্তু উৎপ্রেক্ষা ও উপমা বড় কম নাই। সব চাইতে আশ্চর্য ঘটনা, ইহাতে শ্লেষের নামগন্ধ নাই। উপমা যাহা আছে, তাহার ঢঙ্‌টি সম্পূর্ণ মহাকাব্যসুলভ। খ্রীষ্টীয় ৩৫০ হইতে ৫৫০ পর্যন্ত গুপ্তরাজগণের রাজত্বকাল। এই রাজবংশের বিভিন্ন রাজার সম্পর্কে যে সকল প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি কাব্য-রীতিরই রসোত্তীর্ণ কবিতা। এই যুগেই মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব! তাঁহার কাব্য-রীতির আলোচনার পূর্বে আমরা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের আরও দুই-এক জন কবির কাব্য-রীতির আলোচনা সারিয়া লইব।

অশ্বঘোষ প্রস্থানের অপর বৌদ্ধ কবি হইলেন আর্যশূর। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের কবি। আর্যশূরের জাতকমালার সংস্কৃত গদ্য নিঃসংশয়ে কাব্যগন্ধি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায়ই তাঁহার সংস্কৃত গদ্যের ভঙ্গীটি পরিকল্পিত। গ্রন্থকার চতুর্থ শতকে গ্রন্থখানি রচনা করিলেও ইহার রচনারীতিতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কাব্যসুলভ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর্যশূরের রচনারীতি ক্লাসিক্যাল। সাহিত্যশিল্পের উপযোগী সকল উপাদান যে তাঁহার করায়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয় রচনা-রীতির মধ্যে আছে।

(১) (ক) কৌসলকমহেন্দ্র..............ভাগ্যস্য—১৩৩ অক্ষর

(খ) সর্বপৃথিবীবিজয়জনিতোদয়ব্যাপ্তনিখিলাবনিতলাং কীর্তিমিতস্ত্রিদপতিভবনগমনাবাপ্ত-ললিতসুখবিচরণামাচক্ষাণ ইব ভুবো বাহুরয়মুচ্ছি তঃ স্তম্ভঃ। হ, সে,

ক্লাসিক্যাল হইলেও পরবর্তী কালের সংস্কৃত গদ্যশিল্পীদের ন্যায় তাঁহার রচনায় অসংযম ও আতিশয্য নাই। এই সংযম ও পরিমিতত্বের জ্ঞান হইতেই তাঁহার উচ্চতর সাহিত্যিক রুচির প্রমাণ মেলে। গদ্যে ও পদ্যে উভয়তঃ তিনি ঔচিত্য-বোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনা মসৃণ। পদ্য অপেক্ষা গদ্যেই তিনি অধিকতর দীর্ঘমাপের সমাস ব্যবহার করিলেও রচনা কোথাও অস্বাভাবিক ও দুর্বোধ হইয়া ওঠে নাই। তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে পালির প্রভাব থাকিলেও ভাষার বিশুদ্ধি নষ্ট হয় নাই। গদ্যে কবিতাসুলভ মণ্ডনশ্রী দেখা যায়। আর্যশূর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাব্য-রীতিরই অনুবর্তী ছিলেন।

'দিব্যাবদানে'র রচনাকাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বে হইতে পারেনা। ইহার সংস্কৃত গদ্যভাষা সহজ ও সরল হইলেও আলঙ্কারিকগণের অনুমোদিত দীর্ঘ সমাস-বদ্ধ পদের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহার রীতিও কাব্যরীতি।

ভাসের রীতিতে এপিক রীতির, বিশেষ করিয়া বাল্মীকির রীতির প্রভাব দেখা যায়। এপিকের বিষয়বস্তু লইয়া রচিত নাটকগুলির মধ্যেই যে এই রীতির সন্ধান মেলে, তাহা নহে, তাঁহার সকল নাটকের মধ্যেই ইহার স্বাক্ষর আছে। এপিকের এই প্রভাব ভাসের প্রয়োজনের উপকারক হইয়াছে। তাঁহার রীতির ভিত্তি এপিকরীতি হইলেও নাটকের প্রয়োজনে তিনি এপিকরীতি হইতেও যেন খানিকটা সরিয়া আসিয়াছেন—অর্থাৎ এপিকরীতির যে দোষ, সেই দোষ হইতে তাঁহার রীতি মুক্ত। রামায়ণে বাল্মীকি ২৯টি উপমার সাহায্যে বন্দিনী সীতার শোক বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ভাস 'অভিষেক' নাটকে করিয়াছেন মাত্র একটির সাহায্যে।[১] পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার রীতিতে সহজ সাবলীলতার মসৃণতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং ইহার জন্য কাব্যরীতির আতিশয্যের নেশাও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছেন। দীর্ঘ সমাস নাটকে খাপ খায় না এবং নাটকের কবিতায় ইহার আতিশয্য ঘটিলে বিদগ্ধ ও সুরসিক সামাজিকেরও অর্থবোধে বিলম্ব ঘটে। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের তুলনায় ভাসের নাটকের গুণ হইল শ্রুতিমাত্র অর্থবোধের অধিকতর দ্রুততা। কাব্য-রীতির প্রধান গুণ যে স্পষ্টতা, তাহা ভাসে পুরামাত্রায় উপস্থিত।

---

(১) অসিতভুজগকল্পাং ধারয়ন্ত্যেকবেণীং
করপরিমিতমধ্যা কান্তসংসক্তচিন্তা
অনশনকৃশদেহা বাষ্পসংসিক্তবক্ত্রা
সরসিজবননালেবাতপে বিপ্রবিদ্ধা॥

অ, ক, —২. ৮.

অপরাপর নাট্যকারদের ন্যায় তাঁহার নাটকে অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান-প্রদর্শনীর সজ্ঞান সযত্ন চেষ্টা নাই। নাটকে ভাস অপেক্ষা অশ্বঘোষের রীতি অনেক জটিল : কাব্যেও শৈল্পিক জটিলতার শিথিলতা নাই। ভাস ছিলেন কাব্য-কলায় সুনিপুণ শিল্পী। নাটকে তিনি যে দরবারি কাব্যের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহার রুচিবোধকেই প্রমাণিত করে। নাটক অভিনয় দেখিয়া বুঝিবার জিনিস, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য অবসর-বিনোদনের উপায়ন। ভাসের রীতির সঙ্গতি ও সঙ্গীতমাধুর্যটি কালিদাসে অনুকৃত হইয়াছে। ভাসের ভাষাটি অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যগা। তাঁহার রীতি সহজ, সতেজ ও জীবন্ত বলিয়া কাব্য-রীতির উৎকর্ষের প্রতি উদাসীন। কাব্যরীতির শিল্পধর্মের মোহান্ধকারিতা ভাসে নাই। তাহাতে এপিকরীতির স্বচ্ছতা আছে, কিন্তু পরবর্তীকালের কাব্য-রীতির জৌলুষ ও চাকচিক্যের পূর্বাভাস নাই। অলঙ্কৃত সহজ সৌন্দর্য ও প্রাণাবেগ —ভাসের রচনার বৈশিষ্ট্য। স্বচ্ছতা ও স্ফুটত্ব তাঁহার রচনার দিগ্দর্শন। পরবর্তী-কালের দরবারি মহাকাব্যে ও গীতিকবিতায় রচনারীতির যে ভাস্কর্য সাধারণতঃ কবিগণের দৃষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ভাসের দৃষ্টি তাহা হইতে মুক্ত ছিল। তাঁহার রচনায় প্রবচন ও বাগ্‌ধারার আধিক্য দেখা যায়। লৌকিক ছন্দ তিনি প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন এবং অলঙ্কারের দিক দিয়া শব্দালঙ্কার অপেক্ষা অর্থালঙ্কার ব্যবহারে তিনি মুক্তহস্ত। তাঁহার রচনায় কিছু কিছু অনুপ্রাস ও যমকের নিদর্শন পাওয়া যায়।[১] দীর্ঘ ও জটিল সমাস খুব কম। তাঁহার রীতিকে মোটামুটিভাবে কাব্য-রীতির আদিম স্তরের অন্তর্গত বলা যায়।

গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ উপহার সচন্দন সারস্বত অর্ঘ্য মহাকবি কালিদাস। তিনিও এই কাব্য-রীতিরই কবি এবং তাঁহারই হাতে কাব্য-রীতির চরম উৎকর্ষ। কেবল প্রাচ্য জগতেই কালিদাস মহাকবি নহেন, প্রতীচ্য জগতের নিকটও মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে ও নাটকে অলঙ্কৃত কাব্যধারার ভারতীয় কবিগণের মধ্যে সার্বভৌম।

---

(১) মণিবিরচিতমৌলিশ্চারুতাম্রায়তাক্ষো
মদসললিতগামী মত্তমাতঙ্গলীলঃ। অনুপ্রাস ও যমক
যুবতিজননিকায়ে ভাত্যসৌ রাক্ষসেশো
হরিরিব হরিণীনামন্তরে চেষ্টমানঃ॥
—অ. ক. ২. ৯.

উদয়নবেন্দুসবর্ণাবাসবদত্তাবলৌ বলস্য ত্বাম্।
পদ্মাবতীর্ণপূর্ণৌ বসন্তকম্রৌ ভুজৌ পাতাম্॥
—স্ব, বা ১. ১.

কালিদাস নাট্যশাস্ত্রের কথা জানিতেন। কালিদাসের কাব্য হইতে আলঙ্কারিকেরা তাঁহাদের 'মতবাদের সমর্থন-রূপে অনেক কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কখনও অলঙ্কারকে প্রাধান্য দেন নাই। অলঙ্কার অপেক্ষা রসের মূল্য দিয়াছেন বেশি। তাঁহার মতে অলঙ্কার হইল রসপরিপোষক। কাজেই কেবল অলঙ্কারের ঘনীভূত পরিপাট্যে রসকে গৌণ করিয়া রাখেন নাই বলিয়া তাঁহার ব্যবহৃত কাব্য-রীতিতে যত্নসাধ্য শিল্পকর্ম অপেক্ষা অযত্ননির্বর্ত্য স্বাভাবিকতা ফুটিয়াছে বেশি। তিনি জানিতেন রসই কাব্যের আত্মা। সৌন্দর্য-সৃষ্টির অনুরোধে সাহিত্যে অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ করিলেও যাহাতে উপায়ের চাপে উপেয় মারা না পড়ে, এ বিষয়ে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যতত্ত্বের প্রথম যুগে উপায়কেই উপেয় বলিয়া মনে করায় অলঙ্কারের প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে। আলঙ্কারিকগণের প্রচেষ্টা দেখিয়া কবিরাও মনে করিয়াছিলেন, অলঙ্কার ছাড়া কাব্য হইতে পারে না। যাহা হউক, কালিদাস রসের খবর জানিতেন বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিমুখী কল্পনায় জাগিয়াছিল সুন্দরের জগৎ—কাব্যের জগৎ—কল্পনার জগৎ—অলৌকিকের জগৎ। সেই জগতে চলার পথে মানবচিত্তবৃত্তির জিজ্ঞাসা ছিল তাঁহার নিখিল সৃষ্টির লক্ষ্য। তাই তাঁহার অনুভূতিতে প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। "...যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর তারে তারে নর-নারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম জাগানো—ফুল ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক।"[১]

প্রকৃতি ও মানবমনের মধ্যে সেতুবন্ধনের উদ্যোগে তাঁহার কাব্য কালজয়ী শাশ্বত কাব্য হইয়া রহিয়াছে। তিনি গীতিকবি বলিয়াই মানবমনের বিশেষ মেজাজের সহিত প্রকৃতির মেজাজ বাঁধিয়া দিয়া হৃদয়-জগতের গানের মজলিসে ঐকতান তুলিতে পারিয়াছিলেন। তাই কী মহাকাব্যে, কী নাটকে, কী খণ্ড কাব্যে প্রকৃতি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি কেবল সুখ-দুঃখ-ব্যথা-আনন্দ উদ্দীপনের পরিবেশ নয়, তাহা মানুষী চেতনার রূপকও নয়। তাহা আপনার সত্তা বজায় রাখিয়া মানুষী চেতনায় মথিত হইয়া আপন কণ্ঠে মানুষী চেতনারই সংলাপ তুলিয়াছে এবং সেই সংলাপের বসন্তরাগিনীতে বিধৃত হইয়া স্থাবর-জঙ্গম, মর্ত্য ও স্বর্গ, ফুল ও ফল একাকার হইয়া গিয়াছে। তাই নব-জাগ্রত

(১) স, ন,

বসন্তের নবীন প্রাণের দ্যোতনায়, প্রাবৃটের ঘনঘটায়, আষাঢ়ের প্রথম মেঘের চকিত দীপ্তিতে, উষার গানে ও অরুণের অভ্যুদয়ে—অরণ্যে ও গিরিকন্দরে জীবন-যাত্রার মধ্যে প্রকৃতির জীবনাবেগের সহিত মানুষী অনুভূতির এমনি এক রাখী-বন্ধনের উৎসব তিনি ঘনাইয়া তুলিয়াছেন যাহার মধ্যে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির জীবনস্পন্দ একত্র সংহত হইয়া এক জ্যোতির্ময় আনন্দঘন জীবন-বোধ জাগাইয়া তুলিয়া পাঠককেও তন্ময় করিয়া ফেলে। প্রেমিকমনের বিশেষ মানসিকতার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্ব-সাহিত্যের একটি দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাসের দানে কাব্যরীতির ভরা যৌবনের জলতরঙ্গ বাজিয়া উঠিয়াছিল।

এখন কালিদাসের প্রসঙ্গে কাব্য-রীতির কালোচিত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আসা যাক। 'রঘুবংশে'র নবম সর্গে কবির অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সর্বাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। এই সর্গেই কবি চৌদ্দ প্রকার ছন্দের পরিবেশন করিয়াছেন। যমক, শ্লেষ, অর্থান্তরের সহিত নানা আকৃতির মাধ্যমে যুগপৎ উচ্চারিত পদাংশ প্রভৃতির ব্যবহার তাঁহার অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের স্বচ্ছ মুকুর। 'রঘুবংশে'র অষ্টাদশ সর্গে তাঁহার অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। কেবল রঘুবংশের নবম ও অষ্টাদশ সর্গে নয়, কবির 'বিক্রমোর্বশী' ত্রোটকের চতুর্থ অঙ্কে যেমন অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষের উগ্রতর প্রয়োগ পাওয়া যায়, তেমনি ভিন্ন শব্দের এক অর্থ এবং এক শব্দের ভিন্ন অর্থেরও পরিচয় আছে।[১] অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক কালিদাসেও যে অনুপস্থিত নাই, তাহাও উক্ত রচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে বোঝা যায়। তবুও বলিতে হইবে কালিদাসের রচনার বাগর্থ-সম্পৃক্তির অপূর্ব সৌন্দর্য। কালিদাস ছিলেন অলোকসামান্য প্রতিভার কবি। প্রতিভার গুণই হইল, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাকেই সজীব করিয়া তোলে। তাই বলিতেছিলাম, কালিদাসের যাদু হাতের গুণে অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক প্রভৃতি

অনুপ্রাস ও যমকের উদাহরণ—

স ক্ষেমধন্বানমমোঘধন্বা পুত্রং প্রজাক্ষেমবিধানদক্ষম্।

ক্ষ্মাং লম্ভয়িত্বা ক্ষময়োপপন্নং বনেতপঃ ক্ষান্ততরশ্চচার॥ রঘু, ৯।১৮

শ্লেষের উদাহরণ—মামাহুঃ পৃথিবীভৃতামধিপতিং নাগাধিরাজো ভবান্

অব্যুচ্ছিন্নপ্রথুপ্রবৃত্তিভবতো দানং মমাপ্যর্থিষু।

স্ত্রীরত্নেষু মমোর্বশী প্রিয়তমা যূথে তবেয়ং বশা

সর্বং মামনুতে প্রিয়াবিরহজাং ত্বং তু ব্যথাং মানভূঃ॥ বি. উ ৫৪।২৫

তাহাদের স্বীয় স্বীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে বেশ মানাইয়া গিয়াছে। অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কবি-প্রতিভার প্রভাতরল জ্যোতিরই স্বাক্ষর পাই।

'উপমা কালিদাসস্য'—এ উক্তি কেবল প্রশংসাবাদ নয়, ইহা পরীক্ষিত মহাসত্য এবং এই সত্যে মহাকবির দাবি অপ্রমাণ্য নয়। তাঁহার উপমা ও উৎপ্রেক্ষার যেমন বিশেষ দ্যুতি আছে, তেমনি আছে বেগবত্তা, আছে জীবনাবেগ, আছে বলাধানের শক্তি। সমাসোক্তি-ব্যবহারে কবি কেবল তাঁহার অর্থালঙ্কার-ব্যবহারের নিপুণতারই পরিচয় রাখিয়া যান নাই, সমগ্র প্রকৃতিকে মানবীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি প্রকৃতি ও জীবনের শাশ্বত যোগসূত্রের উপর এক নূতন আলোকপাত করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য একই বিষয়ের উপর উপমার মালা গাঁথা কালিদাসের মধ্যেও অনুপস্থিত নাই। এমনকি নাটকে হাস্যরসাত্মক উপমারও অভাব নাই। নানাবিধ অর্থালঙ্কারের মধ্যে অর্থান্তরন্যাস-অলঙ্কার বিন্যাসে কালিদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহার অর্থান্তরন্যাস জীবনসত্যের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর।[১] কালিদাসের রীতির প্রসঙ্গে হরিষেণের প্রশস্তির রীতি আলোচনা না করিলে কালিদাসের রীতিকে ঐতিহাসিক প্রচ্ছন্নতায় দাঁড় করান যায় না। হরিষেণের প্রশস্তির কাল খ্রীষ্টীয় ৩৫০ শতকের কিছু পূর্বে। তাঁহার রচনার রীতি কালিদাস ও দণ্ডীর রীতিরই সগোত্র। প্রশস্তির কবিতাংশের রীতিটি হইল বৈদর্ভী। এই রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল দীর্ঘ সমাসের প্রতি ঔদাসীন্য। এই রীতিতেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেনও লিপি রচনা করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অলঙ্কৃত কাব্যরীতি বলিতে যাহা বোঝায়, তাহার বাহিরে আরও অনেক রীতি ছিল। অনেক রীতি যে ছিল, তাহা দণ্ডীও বলিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় যে দণ্ডী কথিত বৈদর্ভীরীতির বৈশিষ্ট্যের সহিত নাট্যশাস্ত্রোক্ত কাব্যরীতির সাধারণ ধর্মের মিল আছে। আবার অশ্বঘোষ যে রীতিতে তাঁহার সাহিত্য রচনা করেন, তাহাতে বৈদর্ভী রীতির আদিম স্তরের সন্ধান মেলে। ভাসের রচনায়ও অলঙ্কৃত রীতির যথেষ্ট অভাব আছে। দাক্ষিণাত্য-রীতির সহজ, সরল সাবলীলতা অধ্যাপক জেকবিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শুধু স্বীকৃতি নয়, দাক্ষিণাত্য-রীতির সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল রূপটির কারণ সম্পর্কেও তিনি মহারাষ্ট্র-গীতি-কবিতার প্রভাবের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে অশ্বঘোষের কাল হইতে যে বৈদর্ভী রীতির ধারাটি অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রমবিকাশের স্রোতে আহত ও উদ্ভিন্ন

(১) আপন্নার্তিপ্রশমনফলাঃ সংপদো হ্যুত্তমানাম্। মে, দূ

হইয়া বর্দ্ধিত শক্তিতে বহিয়া আসিতেছিল, মহাকবি কালিদাসের হাতে অসামান্য প্রতিভার কারুকার্যে তাহা এক অভূতপূর্ব অপরূপ শিল্পশোভায় মণ্ডিত হইয়া ওঠে। তবুও বলিতে হইবে, তৎকালীন কবি-কুলের পরিসংখ্যান গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ কবিই,—তিনি কাব্যকারই হউন, আর প্রশস্তিকারই হউন, গৌড়ী রীতিরই অনুবর্তী। হরিষেনের প্রশস্তিতে আর একটি সত্য ধরা পড়ে। তাঁহার প্রশস্তিটি কেবল পদ্যে রচিত নয়, গদ্যেও রচিত। গদ্যাংশ মূল প্রশস্তির প্রায় অর্ধাংশ। ইহা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিরিখে রচিত। ইহাতে দীর্ঘ পরিমাপের সমাস আছে। উহাদের মধ্যে একটির অক্ষর সংখ্যা ১৩৩। দীর্ঘ সমাস-বিন্যাস যদি গৌড়ী রীতির একটি লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে হরিষেনের কালে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির সমান প্রভাব ছিল। অবশ্য দণ্ডীর জোবানবন্দীতে বলা যাইতে পারে যে, দীর্ঘ সমাস ব্যবহারের ঝোঁক কেবল গৌড়ী রীতির নয়, বৈদর্ভী রীতির গদ্যেও এ ঝোঁক সমান দেখা যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে মনে হইবে যে গৌড়ী রীতির দাবির খানিকটা অংশ বৈদর্ভী রীতি তাহার গদ্যে মানিয়া লইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে গৌড়ী রীতির উল্লেখ থাকুক বা না থাকুক, রীতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে মনে হইবে গৌড়ী রীতি প্রাচীনতর এবং ইহার প্রাচীনত্বের মান হইল দরবারি সাহিত্যের উৎপত্তির মান। রাজ-দরবারেই কাব্যকলার উৎকর্ষ ঘটে এবং সেই উৎকর্ষ যতটা বহিরঙ্গজাত, ততটা অন্তরঙ্গ নয়। তাই কাব্যের দেহসৌন্দর্যের ভাস্কর্যে তখনকার কবিগণ তাঁহাদের বুদ্ধির পূর্ণ দীপ্তি ঢালিয়া দিয়া দেহচর্চ্চায় জৌলুষ হানিয়া কাব্যামোদীদের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়াছেন, বুদ্ধির অপরিমেয়তা দেখাইয়া তাহাদিগকে হতবাক্ করিয়া দিয়াছেন। তাই অধ্যাপক জেকবিও মনে করিয়াছিলেন যে পূর্বাঞ্চলেই সর্বপ্রথম কাব্যচর্চ্চা সুরু হয় এবং সেইখানেই ইহার উপর প্রাচীন যুগের প্রভাব পড়ে; পরে ঐ ধারা পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রসারিত হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, মহাকবি কালিদাস বৈদর্ভী রীতির কবি হইলেও তাঁহার রীতিতে কালের চাহিদা মিটাইতে হইয়াছে। যমক, শ্লেষ, অনুপ্রাস প্রভৃতির সংযত বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি তাঁহার কালের যুগরুচিকেও মান্য করিয়া গিয়াছেন।

অশ্বঘোষ হইতে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত আমরা বৈদর্ভী রীতির ক্রমবিকাশ সাহিত্যে ও প্রশস্তি-কাব্যে দেখিয়া আসিলাম। গৌড়ী রীতি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণার কথাও বলিয়াছি যে দরবারি সাহিত্যের পত্তনের যুগে এই রীতির উদ্ভব এবং অন্ততঃ হরিষেনের সময় পর্যন্ত বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির সমান জন-

প্রিয়তা। গৌড়ী রীতির ঐতিহাসিক প্রস্তুতির জন্য বৎসভট্টির প্রশস্তিখানি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।[১]

বৎসভট্টির লিপিখানি খ্রীষ্টীয় ৪৭২—৭৩ অব্দের। কালিদাসের কাল-নির্ণয়ে এই লিপিখানির গুরুত্ব অনেকখানি। লিপিখানির কবিত্ব নিম্নমানের। দণ্ডী কাব্যাদর্শে গৌড়ী রীতির যে পরিচয় দিয়াছেন, আলোচ্যমান লিপিখানি তাহার উদাহরণ। কবিতাটি স্বয়ংস্ফূর্ত নয়, কবিকে যে বেশ মেহনত্ করিয়াই লিখিতে হইয়াছে, প্রশস্তিতে উল্লিখিত 'প্রযত্নেন' শব্দটি তাহার প্রমাণ। তিনি যে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা জানাইবার ত্রুটি করেন নাই। ৪৪টি শ্লোকে লাট-দেশের কথা, দশপুরনগর এবং বসন্ত ও শীতের কাব্যবিধি অনুসারেই বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি ১২টি ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন এবং 'বসন্ততিলক' ছন্দকে প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রাচ্য-প্রস্থানের গৌড়ী রীতির অনুবর্তী বলিয়া কবির কবিতায় দীর্ঘ সমস্ত পদ পাওয়া যায়। কোথাও সমস্তপদের বিস্তৃতি শ্লোকার্ধ ব্যাপিয়া, কোথাও পঙ্‌ক্তি ব্যাপিয়া, কোথাও বা একটি সমাসেই একটি শ্লোকের নির্মিতি। কাব্যের দিক্ দিয়া শ্লোকটি অচল হইলেও সমাসের সার্ব্বভৌমত্বে যে উহা চীনাংশুককেতু, ইহা মনে রাখা উচিত। ইহা হইতে গৌড়ী রীতির সমাসের ঝোঁকটি বোঝা যায়। কবিতায় যদি সমাসের ব্যাপ্তি 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য' তাহা হইলে গদ্যে সুবন্ধু-বাণের অপরাধটা যত গুরুতর বলিয়া ঘোষণা করা হয়, ঠিক তত গুরু ওজনের নয়। বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির মৌলিক পার্থক্যের সূত্রটি এই লিপিতেই পাওয়া যায়। ২৬ সংখ্যক শ্লোকে রসের অনুপাতে কবিকে বর্ণ-বিন্যাস ও সর্বশেষে 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহারে'র শ্লোক ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

আলোচ্যমান প্রশস্তির পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, যে কয়টি বিশেষ দিকের ঝোঁকে গৌড়ী রীতি বৈদর্ভী রীতি হইতে সরিয়া আসিল, সরিয়া আসিয়া

---

(১) (ক) চতুস্সমুদ্রান্তবিলোলমেখলাং
সুমেরুকৈলাসবৃহৎপয়োধরাম্।
বনান্তবান্তস্ফুটপুষ্পহাসিনীং
কুমারগুপ্তে পৃথিবীং প্রশাসতি॥

(খ) একটি সমস্তপদে একটি কবিতা—

স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনবিপুলকান্তপীনোরু-
স্তনজঘনঘনালিঙ্গননির্ভৎসিততুহিনহিমপাতে

আপন পথের নিশানা ঠিক করিয়া লইল, তাহারা হইল ভাষার অনৈসর্গিকতা, বিষয়বস্তুর তুলনায় সুদীর্ঘ বর্ণনার মোহ, শব্দাড়ম্বর, অনুপ্রাস, দীর্ঘ সমাস এবং গূঢ় ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি।

বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির সীমারেখা টানিতে যাইয়া দণ্ডী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সীমারেখা যে তিনি সুষ্ঠুভাবে টানিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার কথা হইতে বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির পার্থক্য সম্বন্ধে এই মনে হয়, একই গুণের অন্তরঙ্গ বিকলনে বৈদর্ভী রীতির বৈশিষ্ট্য এবং বহিরঙ্গ বিকলনে গৌড়ী রীতির বিশেষত্ব। আমরা বরাবরই কাব্যরীতির নাম করিয়া আসিয়াছি। ঐ রীতিটি বৈদর্ভী-গৌড়ীর উর্ধ্বে গোমুখী-প্রবাহ। পরবর্তী কালের বৈদর্ভী-গৌড়ীর মৌলিক উপাদান উহার মধ্যে আছে। পার্থক্য যাহা, তাহা কেবল মাত্রাতারতম্যের। রাজদরবারে পুষ্টিলাভ করায় কাব্যরীতির যে বৈশিষ্ট্য-গুলির উন্মেষ ঘটে, তাহারা যেমন গৌড়ী রীতিতে আছে, তেমনি বৈদর্ভীতেও আছে। সকলেই অলঙ্কৃত রীতিতে কাব্যরচনা যে করিতেন না, তাহাও আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের সেই অনলঙ্কৃত রীতির উপর কাব্য-রীতির প্রভাব পড়িয়া বৈদর্ভী রীতি অভিজাত হইয়া উঠিয়াছে—কালে কালে রাজসভায় আসন পাইয়াছে। আসন পাইবার পর কালিদাসের হাতে পড়িয়া একটা যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। কালিদাসের পর বৈদর্ভী রীতির আবার ভাঙন ধরিয়াছে। পরবর্তী কালে তাই দেখা যায় গৌড়ী রীতিই রচনার একচেটিয়া রীতি। তাই আমরা বলিতে চাই, কাব্য-রীতিই গৌড়ী রীতি এবং এ রীতি ক্রমাভিব্যক্ত। রাজদরবারের প্রভাবে ইহার উৎপত্তি, রাজদরবারেই ইহার পরিপুষ্টি এবং রাজ-দরবারের নিলামের উচ্চ মূল্যের হাঁকাহাঁকিতে ইহার ব্যর্থ পরিণাম সূচিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাসের পরবর্তী কালের মহাকাব্যগুলিকে রীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মহাকাব্যগুলির আদর্শের যেমন পতন ঘটিয়াছে, তেমনি রীতিতে দেখা দিয়াছে রুচি-বিকৃতি এবং আঙ্গিকের ক্রমবর্ধমান অনৈসর্গিকতা। কালিদাসের সমসাময়িক প্রাকৃত মহাকাব্য 'রাবণবহ' বা 'সেতুবন্ধ' কালিদাসের রচিত, এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা কোন কোন মহলে কিছু কাল চলিয়াছিল। রচয়িতা যেই হউন না কেন, কাব্য-রীতির ইতিহাসে ইহার একটা স্থান আছে। কালিদাসের সময় পর্যন্ত যে-রীতিতে কাব্য-রচনা হইতে লাগিল, ইহা সেই রীতি। প্রাকৃত হইলেও সংস্কৃত রীতির সহিত ইহা অভিন্ন। ইহা

হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রীতিগত মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত কি প্রাকৃত, সে কথা বড় নয়; কাব্যখানির রীতি যে গৌড়ী রীতির দিকে ঝুঁকিয়াছে, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ। কষ্টকল্পিত উৎপ্রেক্ষা, শব্দ-চাতুরী, অনুপ্রাস, পঙ্‌ক্তিব্যাপী দীর্ঘ সমাসের বহর ইহার বৈশিষ্ট্য। কবির অসামান্য শক্তির ফলেই ভাষার অনৈসর্গিকতা এবং রীতির রূঢ়তা দেখা দিয়াছে। কুমারদাসের 'জানকীহরণ' কাব্যখানির রীতি কালিদাস ও মাঘের রীতির মধ্যবর্তী। কুমারদাসের রীতি কালিদাসের রীতির ন্যায় অত স্বচ্ছন্দ-চারিণী নয়। অনুপ্রাসের প্রতি কবির দুরন্ত মোহ। অনুপ্রাসের বহতা ধারায় তাঁহার কবিতা বৈদর্ভী রীতির দুইটি গুণ পাইয়াছে—মসৃণতা ও পেলবতা। কথার প্যাঁচে তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং শব্দসজ্জায় তিনি যেমন শব্দাড়ম্বরের পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি দিয়াছেন বাচংযমিতার। কবির উপর কালিদাসের প্রভাব পড়িলেও অপ্রচলিত শব্দ এবং ব্যাকরণ-সিদ্ধ অপরিচিত পদের ব্যবহারে ইনি নিষ্ণাত।

ইহার পরেই ভারবির নাম করিতে হয়। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইহোল্ শিলালিপিতে কালিদাসের সহিত ভারবির নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যগুলির মধ্যে ভারবির 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' অন্যতম। শরৎবর্ণনায়, সূর্যাস্ত ও রাত্রির বর্ণনায় বিদগ্ধ হৃদয়ের রসদৃষ্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকিলেও কবি পঞ্চদশ সর্গে রচনা-রীতিতে যে যান্ত্রিকতা আনিয়াছেন, তাহা চরম বিরক্তিকর। ভারবি যেন অবসর ও সুযোগ পাইয়াই শব্দ-চাতুরীপ্রিয় ভারতীয় পণ্ডিতগণের সম্মিলিত সভায় বাজীকরের মঞ্চে দাঁড়াইয়া শব্দের ভোজবাজী দেখাইতেছেন।[১] গোমূত্রিকাবন্ধ, অর্ধভ্রমক, সর্বতোভদ্র প্রভৃতি রচনা-বন্ধের নানা খেলা দেখাইয়া তিনি শব্দ-চাতুরীপ্রিয় ভারতীয় পণ্ডিতগণকে কেবল তাক লাগাইয়া দেন নাই, শব্দ-চাতুরীর উপরেও যেন একটা কৃষ্ণ যবনিকা টানিতে চাহিয়াছেন। শব্দসজ্জা কতদূর কৃত্রিম হইতে পারে, এ যদি কেহ জানিতে চাহেন, ভারবিতে তিনি তাহা পাইবেন। অলঙ্কারের ঘনপিনদ্ধ পাণ্ডিত্য দেখাইতেও তিনি ছাড়েন নাই। তবুও ভারবি অর্থগৌরবেরই কবি। চরিত্রসৃষ্টি, ওজোগুণসমন্বিত বীররসের উপযোগী ভাষা প্রভৃতির সৃষ্টির জন্য তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। কবিসুলভ বহুগুণের অধিকারী হইয়াও ভারবি শব্দ-

(১) একটি মাত্র বর্ণে গ্রথিত শ্লোক :—

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানা ননা ননু।
নু নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ॥

সজ্জায় সাহিত্যকে শ্বাস তোলাইয়া ছাড়িয়াছেন। ইহার জন্য তিনি যতটা দায়ী, তদপেক্ষা বেশী দায়ী তাঁহার যুগের চাহিদা। কাব্য-রীতির বহিরঙ্গসজ্জা যে কত বিকৃত হইতে পারে, ভারবি তাহার বেদনাদায়ক প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন। তাঁহার ভাষাগত দোষগুলি 'মাঘে' অধিকতর প্রকট হইয়াছে।

এই পাণ্ডিত্যের ঘনীভূতধারার অপর দৃষ্টান্ত ভট্টিকাব্য। কবি ব্যাকরণকে কাব্যের ছাঁচে ফেলিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। শুধু ব্যাকরণ কেন, দশম সর্গে কবি তাঁহার অলঙ্কার-জ্ঞানেরও সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানির যে কাব্যমূল্য নাই, তাহা নহে, তবে তাহার পরিমাণ এত স্বল্প যে সমুদ্রে গোষ্পদপ্রমাণ দুগ্ধদানের মত। এতক্ষণ আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম, কাব্যরীতিতে অলঙ্কারের প্রাধান্য; শব্দ-চাতুরী তাহার পাশে পা-রাখার মত জায়গা দাবি করিয়া আসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা ছিল, যে অলঙ্কারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু সে পথেও তাহার বাধা বড় কম ছিল না। শব্দালঙ্কার তাহার অগ্রগতিতে বাধা হানিয়াছে। তাই সে নিরুপায় হইয়া অপ্রচলিত শব্দ, অব্যুৎপন্ন শব্দ প্রভৃতি টুকিটাকি লইয়া ভাষার গৃহ-প্রাকারে অলক্ষ্যে সিঁধ কাটিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু ভারবি যে-দিন শব্দের ভোজ-বাজী দেখাইয়া শব্দকে দিয়া অলঙ্কারের উপর টেক্কা মারিয়া পাঠক-মনকে বিভ্রান্ত করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতেই শব্দ-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। আত্ম-শক্তির আবিষ্কারে সে সাহিত্যকে জয় করিতে চাহিল। তাহার যত বিদ্বেষ শব্দালঙ্কারের উপর। তাই সে রাতারাতি সাহিত্যজয়ের উদ্দীপনায় ব্যাকরণ ফাঁদিয়া বসিল। সাহিত্যের এলাকায় সেই ব্যাকরণ ভট্টিকাব্য। তবে ভট্টিকাব্য এত অমানুষ নয়, যে সে এতদিনকার বাসিন্দা অলঙ্কারকে দেশ ছাড়া করিয়া ছাড়িবে। তাই দশম সর্গটি অলঙ্কারের নামে উৎসর্গ করিল। অতএব ভট্টি পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শব্দ, শব্দপ্রতিভূ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার কাব্যরীতিতে আসিয়া সমান অংশ দাবি করিতেছে। কিন্তু রীতির যেখানে প্রাণ, সেই সমগ্র পুরুষীয় সত্তার প্রকাশ,—তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া—প্রাণের অসংখ্য অনুভূতির রূপকর্ম হইতে বিরত হইয়া সত্তার আনন্দঘন চেতনায় আবির্ভূত প্রাণ-চৈতন্যকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া অনুভব-সাক্ষিক প্রাণের নর্ম-বিলাসের প্রতি উদাসীন হইয়া ভারতীয় কবিগণ যে-দিন কাব্যরীতিতে দেহাত্ম-বাদিতায় পুরাপুরি বামপন্থী হইয়া উঠিলেন, ভারতীয় রীতির ইতিহাসে সে এক দুর্দিন। মহাকবি কালিদাস দৈব আশীর্ব্বাদের মত ভারতীয় সাহিত্যকুঞ্জে আবির্ভূত হইয়া রীতির যে অন্তর্মুখী পথ দেখাইয়াছিলেন, ভারতবাসী সে-পথে চলিল না। চলিলে দেখিতে পাইত, প্রাণ-

পারাবারের দুকূল ভরিয়া যে শ্যামকান্তি হিন্দোল ফেনিল-তরঙ্গ-ভঙ্গ তুলিয়া মানুষের মর্ম-লোকে নিত্যলীলায় তান ভরিয়া দিতেছে, সেই হিন্দোলে হিন্দোলে যে তান উঠিতেছে নামিতেছে, সেই তানের ভৌমাকর্ষণে সুরলোকের অপ্সরী-রমনীবৃন্দ বাস্তব জীবনের ছায়াতলে ফিরিয়া কাব্যের পুষ্প-ফসল আঁটি বাঁধিয়া মাথায় তুলিয়া মানুষের ঘরেই পৌঁছাইয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষ কালিদাসকে চিনিল না, হাল-অমরু প্রভৃতি শতক কবির বাস্তব জীবন সংবেদনার দৃষ্টিকোনটিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তাহারা চিনিল কাব্যের দেহাত্ম-বাদিতার দেহ-সর্বস্বতার পথ। রীতির এই পথে অলঙ্কারের মধ্যে শব্দালঙ্কারের ঘনঘটা, অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমকের মঞ্জুল মঞ্জীর-ধ্বনি, বিষয়বস্তুর মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশন অপেক্ষা ক্লান্তি-হীন দীর্ঘ বর্ণনার প্রতি ঝোঁক, ব্যাকরণ ও অভিধানের জ্ঞানপ্রসূত অপ্রচলিত শব্দ-ব্যবহারের প্রতি মোহ, পুরাবৃত্তের প্রতি অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া সংকেত জ্ঞাপন, কোমলবর্ণের দেহরক্ষি-হিসাবে রূঢ়বর্ণের বাহিনী লইয়া সদম্ভ পদবিক্ষেপের ঘটা প্রভৃতি উপকরণ দিয়া রীতির বহিরঙ্গে রাজকীয় নেপথ্য-বিধানের উৎসাহ যেন দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাব্য-রীতির এই দেহাত্ম-বাদিতার জন্য পরবর্তী কালে কাব্যের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

এ পর্যন্ত আমরা কাব্যরীতির যে পরিচয় পাইয়া আসিলাম, তাহাতে দেখা গেল, একমাত্র ছন্দ বাদে গদ্য-পদ্যের শিল্পরূপের একই আদর্শ। পৃথক্‌রূপে আমরা গদ্যের যে নমুনা গির্ণার প্রশস্তি, নাসিক শিলালিপি, হরিষেনের প্রশস্তি, আর্যশূরের জাতকমালায় ও দিব্যাবদানে পাইয়াছি, তাহাতে সমাস, অনুপ্রাস ও উপমার প্রতি একটি বিশেষ ঝোঁকও দেখিয়াছি। গদ্য রোমান্সের পূর্বে অশ্বঘোষের 'সূত্রালঙ্কার', 'পঞ্চতন্ত্র' ও গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র গদ্য-প্রকৃতির আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'সূত্রালঙ্কার' পাওয়া যায় নাই। 'পঞ্চতন্ত্রে'র কাশ্মীরী ও নেপালী রূপ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অনেক পরবর্তীকালের বলিয়া তাহার ভাষা-প্রকৃতিকে ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের সহিত গ্রহণ করিতে পারা যায় না। তাহা ছাড়া 'পঞ্চতন্ত্রে' রাজনীতি ও ব্যবহারনীতির যত পরিচয়ই থাকুক না কেন, তাহাকে পশুপক্ষি-গল্পের অতিরিক্ত কিছুই মনে করা হয় না। 'পঞ্চতন্ত্রে'র যে ভাষা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সমাস থাকিলেও তাহার পরিমাপ খুব সংযত। অপ্রচলিত শব্দ ও ব্যাকরণ-দুর্ঘট অতি অল্পই। এ সম্পর্কে অধ্যাপক কীথ বলিয়াছেন—"Indeed, rarely in Sanskrit literature is the Style more

admirably adapted to the subject-matter and the purpose of the work." 'পঞ্চতন্ত্রে'র ভাষাকে আমরা ক্লাসিক পূর্বযুগের বা ক্লাসিক সূচনা-যুগের ভাষা বলিয়াছি। এই ভাষার যে বিশেষত্ব আমাদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা হইল বস্তু-ধর্মিতা। এই ভাষার মাধ্যমে আমরা সুদূর অতীত ভারতের সামাজিক মানুষের সহিত রাজপুরুষের জীবন্ত ছবি দেখিতে পাই। গণ-জীবন-বোধ যদি ভারতীয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম ক্ষীণরূপে কোথাও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা পঞ্চতন্ত্রে। যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা গণ-মানুষের জীবনে ইতস্ততঃ ছড়াইয়াছিল, পঞ্চতন্ত্রকার তাহা বাস্তব লোক হইতে কুড়াইয়া আনিয়া পশুপক্ষীর ভূমিকায় পরিবেশন করিয়াছেন। গণ-বোধের দুরন্ত প্রেরণায় না হইলেও গণ-ব্যবহার-নীতি অনুসন্ধানের প্রেরণায় পঞ্চতন্ত্রকারকে বাস্তবমুখী হইতে হইয়াছিল। এই পঞ্চতন্ত্রের ভাষার যোগ্য উত্তরাধিকারী দশকুমার-চরিতকার দণ্ডীর ভাষা। পঞ্চতন্ত্রের ভাষাই দণ্ডীর মধ্যে চমকে-ঝলকে দেখা দিয়া পলকের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। গুণাঢ্যের ভাষা পৈশাচী প্রাকৃত হইলেও তাঁহার গল্পের মত গণ-দৃষ্টি-সমুদ্ভাসিত ভাষার রীতিরও হয়ত পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কিছু প্রভাব ছিল। সে ভাষা যখন পাওয়া যায় নাই, তখন পরবর্তী কালের কাশ্মীরী ও নেপালী রূপের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা ও রীতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা সমীচীন নয়। অতএব আমরা এখন দণ্ডীর দশকুমার-চরিতের গদ্যরূপ হইতে আমাদের কাব্য-রীতির আলোচনা সুরু করিব।

দণ্ডীর পূর্বে গদ্য-কাব্য বা গদ্য রোমান্সের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাণ খুব উচ্চাঙ্গ-গদ্য-কাব্যের রচয়িতা হিসাবে ভট্টারহরিচন্দ্রের নাম করিলেও হরিচন্দ্রের কাব্য আমরা পাই নাই। অধিকন্তু তাঁহার কাব্য যে মহাকাব্যের আওতায় উদ্ভিন্ন কথাকাব্যের সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাহাও মনে করিবার কোন হেতু নাই। যাহা হউক, দশকুমার-চরিতের আলোকে একথা বলা চলে যে লোক-কথার কাহিনীর উপর গদ্যকাব্যের কবি আপন প্রতিভা বলে মহাকাব্যের সৌন্দর্য ঢালিয়া যে নূতন ছাঁচের সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে গদ্যকাব্য বা গদ্য রোমান্স নামে পরিচিত। সেই হিসাবে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত' সংস্কৃত গদ্য কাব্যের আদিম রূপ না হইলেও রীতির দিক দিয়া আমাদের প্রথম প্রাপ্তি। দণ্ডীর দশকুমার চরিতের কাহিনী-পরিকল্পনায় গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকিলেও দশকুমার-চরিত যে মহাকাব্যের আওতায়

পরিপুষ্ট, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে 'দশকুমার-চরিতে' মহাকাব্য-প্রভাব-জনিত গদ্যকাব্যের কাহিনী-প্রকৃতি অনুপস্থিত।' সেকথা ঠিক নয়। দশকুমার-চরিতের বিষয়বস্তু বৃহত্তর সমাজ-মুখী হওয়ায় অনেকের মনে এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। আসল কথা, সুবন্ধু-বাণের রচনায় মহাকাব্যের প্রভাব যতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, দণ্ডীর রচনায় যে ততটা হয় নাই, তাহার কারণ কবির নীতি-বিগর্হিত বিশিষ্ট সমাজ-জীবন-চিত্রণের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর একমুখিতা। দণ্ডী যে সমাজ-জীবন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নীতিবাদী আদর্শ জগতের শুচিস্নাত জীবন নহে। আদর্শ-বাদের চ্যালেঞ্জ যে নীতি-হীনতা, ইহা সেই জগৎ ও জীবন। এ জগতে অবিবেকী দুষ্কৃতকারী মানুষ, প্রতারক সন্ন্যাসী ও পুরোহিত, লঘুচিত্ত অলসব্যক্তি, দুর্জয় প্রেমিক, চতুরা কুটনী, বিশ্বাস-ঘাতিনী স্ত্রী ও হৃদয়হীনা বারাঙ্গনা প্রভৃতির নিত্য আনাগোনা। এ জগতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাও রমণে দৌত্য করেন এবং জিনের উপদেশকেও প্রতারণা বলিয়া মনে করা হয়। এমন একটি জগতের ছবি আঁকিবার জন্য দণ্ডীর লেখনীকে রাজদরবারের বাহিরে যেখানে নানা দেশের ও নানা সমাজের আবর্জনা আসিয়া মিশিয়াছে, সেইখানেই ছুটাইতে হইয়াছে। তাই তাঁহার রীতিতে মহাকাব্যের রীতির ছায়া ঈষদ্‌লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, দণ্ডীর সহিত সুবন্ধু-বাণের কাহিনী-প্রকৃতির মিল নাই। দণ্ডীর কাহিনীলোক সুবন্ধু-বাণের কাহিনীলোক নহে। ইহা হইতে আমরা দুইটি কাহিনী-বৃত্তের সন্ধান পাই; একটি লোক-চরিত্রের অশ্রদ্ধেয় গ্রাম্য বৃত্ত; অপরটি বিশিষ্ট আদর্শে অনুস্যূত রাজকীয় পরিবারের অগ্রাম্য ও শুচিশুদ্ধ বৃত্ত। কাহিনীগত ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় এই দুইটি বৃত্ত অভিব্যক্তির ধারায় পরস্পর-সাপেক্ষও নয় এবং যুগমানসের দ্যোতনায় কার্য-কারণ-সূত্রেও অনুস্যূত নয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ উন্মেষ—পৃথক্‌ পৃথক্‌ পরিণতি। সেই পৃথক্‌ চিহ্নিত উন্মেষের একটি পরিণত রূপ যেমন 'দশকুমারচরিত', অন্যটির তেমন 'বাসবদত্তা' ও 'হর্ষচরিত-কাদম্বরী'। কাহিনী-বৃত্তের অভিব্যক্তিতে ইহাদের মধ্যকার কার্য-কারণ-সূত্র পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া রীতির ক্ষেত্রে অভিব্যক্তির সে-সূত্রটি খুব স্পষ্ট। রোমান্সের আঙ্গিকের যে আদর্শ 'দশকুমারচরিতে'র, সেই আদর্শই 'বাসবদত্তা-হর্ষচরিত-কাদম্বরী'র। উভয়েরই পূর্বসূত্র লোককথা এবং উভয়ের রূপাদর্শও মহাকাব্যের আঙ্গিক। দণ্ডী হইতে বাণ পর্যন্ত আঙ্গিকের একই ধারা। কিন্তু যে-সূত্রে আমরা একটানা 'দশকুমার-চরিত' হইতে 'বাসবদত্তা'র মধ্য দিয়া চোখ বুজিয়া কাদম্বরীতে যাইয়া

উঠিতে পারি, সে সূত্রটি হইল কাব্য-রীতির সূত্র।[১] তাহার আরম্ভ দণ্ডীতে, পরিণতি সুবন্ধু-বাণে। কাজেই বলিতে হয়, কেবল গল্পাংশের সূত্র ধরিয়াই লোককথা কথাকাব্যে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে নাই। গদ্য-কাব্য তাহার আপন স্বরূপটির সন্ধান পাইয়াছে গদ্য-রীতির মধ্যে। এই রীতির প্রথম উন্মেষ রুদ্রদামনের গির্নার শিলালিপি ও সমুদ্রগুপ্তের হরিষেন-প্রশস্তির মধ্যে। এই রীতিরই পরিণাম বাণের 'হর্ষচরিত-কাদম্বরী'। এই রীতিরই প্রথম প্রচেষ্টা প্রশস্তি-প্রেরণা-সঞ্জাত ঐতিহাসিককাব্য এবং পরে উহার আলম্বন হইয়া দাঁড়ায় লোক-কথা। আলঙ্কারিকগণের জীবনীবৃত্তমূলক 'আখ্যায়িকা' ও কল্পনাসর্বস্ব 'কথা'র মূলভেদের ইতিহাস হয়ত এইখানেই।

যাহা হউক, দণ্ডীতে যে গদ্যরীতির পরিচয় পাই, তাহা রুদ্রদামন ও হরিষেন-প্রশস্তির কাব্য-রীতিরই অনুবৃত্তি। এই রীতি প্রশস্তি-লোক ছাড়িয়া দণ্ডীর হাতে প্রত্যক্ষতঃ গদ্য-কাব্যের এলাকায় আসিয়া ঢুকিয়াছে। দণ্ডীর শিল্পকলায় যদি কিছুর প্রাধান্য থাকে, তবে তাহা কাহিনীর নয়,—বর্ণনার। দণ্ডীর গদ্য সরল, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। বৈদর্ভী রীতির কবি দণ্ডী। সংযম ও মাত্রাজ্ঞানের ফলে দণ্ডীর রীতিতে অতিবিস্তৃতির দোষ ঘটে নাই। দণ্ডীর রচনা সহজ না হইলেও তাহাতে জটিলতার ক্লান্তি নাই। তাঁহার রীতির মধ্যে একটা জীবনদ্যোতনা আছে এবং তাঁহার ভাষা সেই জীবনদ্যোতনার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাঁহার ভাষারও স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়াছে। পৃথকরূপে নির্বাচিত বিষয়বস্তুতে কাব্যরীতির পুরা দাবি মানিয়া লইলে দণ্ডীর ভাষা উপ-হাসাস্পদ হইত। অবশ্য কখনও কখনও আমরা দণ্ডীর লেখনী হইতে উজ্জ্বল বর্ণনাচিত্র পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—নিদ্রিতা অম্বালিকার ও নৃত্যশীলা কন্দুকবতীর বর্ণনা। এই সকল ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বর্ণনা কয়েকটি দীর্ঘ বাক্যের সীমিত গণ্ডীর বাহিরে যায় নাই। বর্ণনা বেশী দীর্ঘ হইলেও ছাপা কাগজের এক পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ হইলেও সপ্তম উচ্ছ্বাসে ওষ্ঠ্য বর্ণকে তাঁহার রচনার এলাকা হইতে নির্বাসিত করার ঝোঁক দেখা যায় এবং ক্রিয়াপদ প্রয়োগের অতিকৌশলপ্রদর্শনের মোহের মধ্যেও যেন একটা সংযম লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একথা সত্য নয় যে তাঁহার রচনায় আলঙ্কারিতা নাই। রচনার মধ্যে বৃহৎ-পরিধির সমাসের ঝোঁক দেখা যায় এবং ব্যাকরণের

(১) সুবন্ধু ও বাণের রীতি দণ্ডীর রীতিরই উন্নততর প্রকাশ ধরিয়া আমরা আলোচনার জন্য দণ্ডীকেই প্রারম্ভে নির্বাচন করিয়াছি, কবিগণের কালানুপাতিক ক্রমের দিক হইতে নহে।

উৎকট অভিসার তাঁহার রচনাকে যে কেবল মাঝে মাঝে অশুদ্ধির নিগড়ে বাঁধিয়াছে, তাহা নহে, স্থানে স্থানে তাঁহার ভাষাকে দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রূপক ও উপমা অলঙ্কার সুন্দর ও সুশ্রী। বাণ ও সুবন্ধুর গূঢ় পুরাতত্ত্ব, জটিল প্রকৃতির শ্লেষ, বাক্যরীতির অন্তর্গূঢ়তা ও আতিশয্য প্রভৃতির প্রতি প্রবণতা দণ্ডীতে অনুপস্থিত। রচনারীতিতে দণ্ডীর ছিল পাকা হাত। কোন এক প্রাচীন সমালোচক যে দণ্ডীর অভিনব পদ-বিন্যাস ও সুষম রীতিতে মুগ্ধ হইয়া কবির পদলালিত্যের প্রশস্তি গাহিয়াছেন, তাহা অহেতুক নয়। কবির হাতের অনুশীলিত উদাত্ত ও ভ্রম-প্রমাদশূন্য গদ্যরচনার ছাঁচটির মধ্যে শব্দার্থের ঐক্য ও সঙ্গতির যাদুটি যেন ধরা যায়। মোটের উপর দণ্ডীর নিকট হইতে আমরা সংস্কৃত গদ্যের যে ভাষা পাইয়াছি, তাহা সতেজ ও সুন্দর।[১] শিল্পবোধ ও সমাজ-বোধের দিক হইতে দণ্ডীর রচনাশ্রী অনন্যসুলভ উৎকর্ষে মণ্ডিত। তাঁহার ভাষা প্রচলিত কাব্যরীতি হইতে একটু সরিয়া থাকায় আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

দণ্ডীর পরেই সুবন্ধুর নাম করিতে হয়। দণ্ডীর রচনা ঋজু ও মসৃণ না হইলেও সুবন্ধুর রচনার তুলনায় ইহা অনেকখানি সরল ও সাবলীল। কোন সমালোচক সুবন্ধুর কাব্যের সহিত ভারতীয় মন্দিরের তুলনা দিয়াছেন। ভারতীয় মন্দির-শিল্পের বিশেষত্ব হইল মন্দিরের প্রস্তরের উপর কারুকার্যের এমনি বিস্ময়কর সৌন্দর্য-চাতুরী, যাহার মধ্যে মন্দিরের আসল নক্সাটি হারাইয়া যায়। সুবন্ধুর রচনায় ঐরূপ এক বহিরঙ্গ বিস্ময়কর সৌন্দর্য-চাতুরী। সুবন্ধু ছিলেন গৌড়ীরীতির কবি। তাই বাক্‌চাতুর্য প্রকাশের তিনি অবাধ সুযোগ পাইয়াছিলেন। গৌড়ীরীতির 'অক্ষর-ডম্বরতা'র মন্ত্রটিকে তিনি দ্ব্যর্থক বাক্যের মণিমঞ্জীরে ভরিয়া দিয়া যে যন্ত্র-সঙ্গীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কান পাতিয়া শুনিতে হয়। গৌড়ীরীতির উল্লেখযোগ্য গুণ হইল—দীর্ঘ সমস্ত পদের প্রয়োগ-প্রবণতা, গুণবাচক শব্দের পিণ্ডিত শব্দকূট, মসৃণ ও পেলব ধ্বনির পরিবর্তে রুক্ষ ও মুখর ধ্বনির আধিক্য, অনুপ্রাস ও অতিশয়োক্তি, ব্যুৎপত্তিগত শব্দ ও ধাতু-প্রয়োগের লীলাবৈচিত্র্য। ইহাদের সকলেরই সন্ধান মেলে সুবন্ধুর গদ্যরচনার সুঠাম প্রকৃতির মধ্যে। সুবন্ধুর রচনার মধ্যে তাঁহার কালে প্রতিষ্ঠিত সকল বিদ্যার অপটু প্রয়োগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যের টীকাকারগণের মধ্যে তাঁহার উল্লিখিত

(১) ভুবল্লভ। ভবদীয় মনোরথফলমিব সমৃদ্ধলাবণ্যং তারুণ্যং নূতমিত্রো ভবৎপুত্রোঽনুভবতি। সহচরসমেতস্ত নূনমেতস্য দিগ্বিজয়ারম্ভসময় এষঃ। তদস্য সকলক্লেশসহস্য রাজবাহনস্য দিগ্বিজয়প্রয়াণং ক্রিয়তাম্। —দ, চ, ২

পুরাবৃত্তের সূত্র লইয়া সংশয় ও বিভ্রান্তি দেখা যায়। জীবন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁহার সূত্রগুলিও স্পষ্ট নয়। বহু অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দের উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ, নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার এবং সর্বোপরি অনুপ্রাসের বাহুল্য তাঁহার রচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁহার রচনায় জীবনাবেগ মন্দীভূত। বর্ণনার প্রাচুর্য ও স্ফীতিই মুখ্য। কাহিনীর গণ্ডী অতি সংক্ষিপ্ত, কবি-কল্পনা বৈদগ্ধ্য-ভারাক্রান্ত এবং রীতির স্বচ্ছন্দচারিতা নিতান্তই মন্থর। সুবন্ধুর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য শ্লেষের আধিক্যে। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার রচনার প্রতিশব্দেই শ্লেষের ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হয়ত' যুগ-রুচিরই ফল। কথাকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে শ্লেষ, সে-কথা 'নিরন্তর-শ্লেষ-ঘন' পদাংশের মাধ্যমে বাণও বলিয়া গিয়াছেন। শ্লেষের অতিশয়িত মোহে পড়িয়া সুবন্ধুর গদ্যরীতি স্বৈরাচারে পরিণত হইয়াছে। শব্দ-ব্যবহারের চাতুরী দেখাইতে যাইয়া সুবন্ধুর শ্লেষ কেবল কষ্ট-কল্পিতই হয় নাই[১], ইহা তাঁহার রচনার ললাটে ভাষা-লাঞ্ছনার রক্ত-তিলক পরাইয়া ছাড়িয়াছে। তাঁহার শ্লেষ যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে থাকে,—সহজ সরল রূপ হইতে ইহা ক্রমে জটিলতর হইতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার শ্লেষগুলি কষ্টকল্পিত এবং মূল বিষয়ের ব্যভিচার। তবুও তাঁহার শ্লেষ যে একেবারে দুর্বোধ, তাহা বলা চলে না। তাঁহার শ্লেষগুলি যেন পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ড এবং উভয়বিধ ঔচিত্যের আধারবিশেষ। সুবন্ধুর দীর্ঘায়িত সমাস জোয়ারের টানে ফুলিয়া ফুলিয়া আসিলেও তাহার রাজকীয় মহিমা যেমন ক্ষুন্ন হয় নাই, তেমনি তাহাদের ধ্বনিতরঙ্গও ব্যাহত হয় নাই। তিনি যখন দীর্ঘ সমাসের মালা গাঁথিতে বসেন, তখন তাঁহার সমস্তপদগুলির মধ্যে আঘাত-প্রত্যাঘাত-জনিত প্রতিযোগিতায় এক অপূর্ব ধ্বনি বাজিতে থাকে, দেড় ফুট দীর্ঘভূমির উপর সমাস-রাজ-পুরুষের সদর্প ও সদম্ভ পদক্ষেপের অকুণ্ঠ মহিমা যেন ফাটিয়া পড়িতে চায়। তাই সমাপ্তির দিকে পাঠকের অব্যভিচারী মনোযোগ না থাকিলে—যোগ্যতা, আসত্তি ও আকাঙ্ক্ষার নিত্যধারা পাঠক-চিত্তে সজাগ না থাকিলে সুবন্ধুর সমাসের অর্থোপলব্ধি এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনি যেমন বাক্যকে টানিয়া লম্বা করিতে পারেন, তেমনি প্রয়োজন হইলে ছোট ছোট বাক্যও রচনা করিতে পারেন। তাঁহার কথোপকথনের

---

(১) যস্য চ নিশিতনারাচজর্জরিতমত্তমাতঙ্গকুম্ভস্থলবিগলিতনিস্তলমুক্তাফলনিকরদন্তুরিতপরিসরে পতৎপত্ররথে রক্তবারিসমুড্ডয়মানদ্বিরদপদকচ্ছপে বিলসদচ্ছুৎপলপুণ্ডরীকে বাহিনীশতসমাকুলে নৃত্যৎ-কবন্ধবিধুরে সুরসুন্দরীসমাগমোৎসুকভটাহঙ্কারভাষণরবভীষণে সাগর ইব সমরশিরসি ভিন্নপদাতিকারি-তুরগরুধিরার্দ্রজয়লক্ষ্মীপাদালক্তকরাগরঞ্জিত ইব খড়্গো ররাজ। —বা. দ. ২৯-৩১

ভাষায় এইরূপ বাক্যকণিকার অভাব নাই। তাঁহার শব্দ-শিল্পের আবহাওয়ায় ধ্বনিসাম্যও ক্লান্তিকর নয় এবং তাঁহার শব্দ-নির্বাচনও সর্বক্ষেত্রে যে স্বৈরাচারী, তাহাও নহে। তাঁহার রচনার ক্লান্তিকর যাহা, তাহা হইল বিরোধাভাস ও শ্লেষের গ্রন্থিহীন মালায় গাঁথা গূঢ়ার্থক শব্দ, বিশেষণ ও উপমার প্রাচুর্য এবং এই শ্রেণীর সাহিত্যিক-দক্ষতার মণি-মন্দির যে তাঁহার কাব্য, সেকথাও তিনি জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। সুবন্ধুর রচনায় অনুপ্রাসের আধিক্য[১] থাকিলেও তাহার ধ্বনি-গুণ অনস্বীকার্য। তিনি যখন সুদক্ষ মালাকরের মত অনুপ্রাসের মালা গাঁথিতে থাকেন, তখন বর্ণে বর্ণে যে দোলা লাগে, দোলায় দোলায় গীতালির যে উৎসব পড়িয়া যায়, তাহাতে পাঠকচিত্তে এক প্রকার ঘুমের নেশা জমিয়া ওঠে। তবুও তাঁহার অনুপ্রাস অর্থচৌর ধ্বনিজৌলুষমাত্র। সুবন্ধুর বর্ণনায় কোথাও প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণায় ঘনপিনদ্ধভাব, কোথাও বা দূরান্বয় উৎকট ভাবের সমাবেশে বর্ণনাটি দুর্বোধ। বর্ণনা কাব্যরীতির একটি অঙ্গ হইলেও সুবন্ধুর হাতে সেই বর্ণনা প্রাবৃট আকাশের ঘনকৃষ্ণ সর্বগ্রাসী মেঘপুঞ্জের ন্যায় তাঁহার কাহিনীকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। তাহার ফলে সুবন্ধুর বহুমুখী বিদ্যাবত্তা ও অলঙ্কার-শিল্পের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে। কন্দর্পকেতুর মুখে স্বপ্নে-দেখা বাসবদত্তার বর্ণনা ১২০ পঙ্‌ক্তির একটি বাক্যে বিধৃত। কথায় ও ভাবে সহচার বা Paralellism রক্ষা করা সুবন্ধুর রচনার অপর বৈশিষ্ট্য। যেখানেই তাঁহার কল্পনা পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিয়াছে, সেইখানেই সে তাহার আলঙ্কারিক মণি-মুক্তা-খচিত জড়োয়া ভারে মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহার কল্পনা কবি-ভাবনার স্বপ্ন-চারিণী না হইয়া শব্দ-শিল্পের প্রদর্শনীরূপে দেখা দিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, শব্দ-শিল্পের আভিজাত্য, বর্ণনার স্বপ্ন-মেদুরতা, বিশেষণ, উপমা, গূঢ়ার্থক শব্দের প্রাচুর্য ও পৌরাণিক বার্তার সূচীকর্ম—সুবন্ধুর রচনার দোষ ও গুণ। সুবন্ধুর রচনার এই শ্রেণীর অহংতার মূলে যে যুগের চাহিদা ছিল, একথা নিশ্চিত। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে এই রুচি-পরিণতির ইতিহাস মেলে ভারবি হইতে সুরু করিয়া মাঘের মধ্যে। দণ্ডী ও সুবন্ধুর পার্থক্য হইল,

---

(১) যশ্চ প্রবৃদ্ধগুল্মতয়া রোগীব দৃশ্যমানবহুধাতুবিকারঃ, সাধুরিব সানুগ্রহপ্রচারপ্রকটিতমহিমা মীমাংসান্যায় হব পিহিতদিগম্বরদর্শনঃ যশ্চ হরিবংশৈরিব পুষ্করাক্ষপ্রাদুর্ভাবরমণীয়ৈঃ রাশিভিরিব মীনমকরকুলীরমিথুনসঙ্গতৈঃ করণৈরিব শকুনিনাগভদ্রবালবকুলোপেতৈঃ দেবখাতৈরুপশোভিতাঙ্গঃ। যশ্চ ছন্দোবিচিতিরিব কুসুমবিচিত্রাভিঃ বংশপত্রপতিতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিঃ শিখরিণীভির্লতাভির্দর্শিতা-নেকবৃত্তবিলাসঃ। —ঐ, পৃষ্ঠা ৭১-৭৩

দণ্ডীর গদ্যভাষার স্বাভাবিক ধর্মের বলেই বিস্ময়, উৎসাহ ও রতি-ভাব রোমাঞ্চের কল্পলোক হইতে যেন স্বতঃই উৎসারিত হইতে থাকে; আর সুবন্ধুর কল্পনায় রতি বা বিস্ময় সমভাবেই তাঁহার ভাষার অর্থহীন শব্দ-ডম্বরের বালিয়াড়ির তলায় চাপা পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িতে থাকে।

আমরা এতক্ষণ কাব্যে অশ্বঘোষ হইতে ভট্টি পর্যন্ত এবং গদ্যকাব্যে দণ্ডী ও সুবন্ধুর কাব্যরীতি আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে এক কালিদাস বাদে আর সকলেই প্রায় কাব্য-রীতিকে কাব্যের বহিরঙ্গভাবে (objectively) দেখিয়া আসিয়াছেন। তাই বহিরঙ্গের সাধনায় তাঁহারা তাঁহাদের সকল প্রতিভা, সকল প্রযত্ন, সকল শিক্ষা ও অভ্যাস উজাড় করিয়া দিয়া কাব্য-রীতিকে অনৈসর্গিক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন যে অলঙ্কার, সে কথা বুঝিলেও বড় বাহির হইতে বুঝিয়াছিলেন। অলঙ্কারের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্যের মধ্যে যে কবি-ব্যাপার আছে, সেই কবি-ব্যাপার বক্রতা গুণে (aesthetic quality) কবির চিত্ত-ধাতুকে গলাইয়া ঝরাইয়া—ভাবের সহিত ভাষার, বাসনার সহিত শব্দের মৈত্রী ঘটাইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অযত্ন-নির্বর্ত্যতার সহিত যে অপরূপকাব্য উৎসারিত করিয়া তুলিতে পারে, সে কথা তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। আলঙ্কারিকদের মধ্যে বোধহয় এক[১] কুন্তক ছাড়া আর কেহ তেমন করিয়া সেকথা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। ইংরেজীতে style বলিতে কবির সমগ্র পুরুষীয় স্বভাবের যে অভিব্যক্তি বোঝায়, সংস্কৃত রীতিতে তাহা বোঝায় না। সংস্কৃত রীতি পূর্বে দেশ-বিশেষের রচনা-পদ্ধতি ছিল। পরে উহার মধ্যে কাব্য-মাধুর্যের উপকারক গুণগুলির সন্নিবেশের ফলে উহা কবি-সাধারণের রচনা-পদ্ধতি হইয়া ওঠে। অপরাপর রীতি থাকিলেও মোটের উপর বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতিই মুখ্য হইয়া ওঠে এবং কবিরাও সাধারণতঃ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। রীতি-ইতিহাসের আলোকেও দেখা যায় দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল, গৌড়ী রীতি তত কায়েমী হইতে লাগিল। অলঙ্কার-

---

(১) সম্প্রতি তত্র যে মার্গাঃ কবিপ্রস্থানহেতবঃ।
সুকুমারো বিচিত্রশ্চ মধ্যমশ্চোভয়াত্মকঃ॥
......এতচ্চ উভয়মপ্যযুক্তিযুক্তম্। যস্মাদ্দেশভেদনিবন্ধনত্বে
রীতিভেদানাং দেশানামানন্ত্যাদসংখ্যত্বং প্রসজ্যতে।......
কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ সমঞ্জসতাং গাহতে।
—ব, জী, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬

শাস্ত্রের বিচারে নয়, কাব্যে রীতি-অনুসন্ধানের ফলের বিচারে। কাব্যে অভিব্যক্ত অলঙ্কৃত কাব্য-রীতির যে ইতিহাস আমরা অনুসরণ করিয়া আসিলাম, ইতিহাসের সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই আমাদের সংস্কৃত কাব্যের রীতি-বিচারের মাপকাঠি। সেই মাপকাঠির সহিত কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব মিলাইয়া আমরা কাদম্বরীর ভাষা ও রীতির যে-আলোচনা কাদম্বরী-প্রসঙ্গে যথাস্থানে করির, এ আলোচনা তাহার পূর্ব-পীঠিকা।

কথা ও আখ্যায়িকা

সংস্কৃত গদ্যের দুই রূপ—আখ্যায়িকা ও কথা। আমাদের আলোচ্য 'কাদম্বরী' এই দুইটি কোটির কোন্‌টিতে পড়ে, তাহা বিচারের জন্য বাণ-পূর্ব কথা-আখ্যায়িকার আঙ্গিকের স্বরূপ-নির্ণয় ও তারতম্য লইয়া আলঙ্কারিকদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, তাহার আনুপূর্বিক পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন।

'কথা-আখ্যায়িকা' শব্দ দুইটি অলঙ্কার শাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থলাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত কেবল গদ্যগল্পকেই বুঝাইত, গল্পের আঙ্গিককে বুঝাইত না। বৈদিক-সাহিত্যের আখ্যায়িকার প্রসঙ্গ এড়াইয়া যাইয়াও বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত আখ্যায়িকার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় কাত্যায়নের বার্তিকে। পতঞ্জলি তিনটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন—(১) বাসবদত্তা, (২) সুমনোত্তরা, (৩) ভৈমরথী। কিন্তু কেবল উল্লেখ ছাড়া ইহাদের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। আবার গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির শিরোনামায় যেমন 'কথা'-শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্পের শিরোনামায় এবং 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'য় আখ্যায়িকা শব্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই 'কথা-আখ্যায়িকা' শব্দব্যবহারের মধ্যে কোন পারিভাষিক অর্থ নাই। কেবল নির্জলা সাধারণ গল্পের অর্থেই এই শব্দ-যুগ্মের ব্যবহার হইয়াছে। 'কথা' হইলেই যে তাহাকে কথা-কাব্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। পঞ্চতন্ত্রের কথাও কথা, বৃহৎকথাও কথা। ইহারা কিন্তু কথা-কাব্যের অন্তর্গত নয়। ইহাদের জাত আলাদা; ইহাদের আঙ্গিক ও বিষয়-বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। এক কথায়, গদ্য কথা-কাব্যের অন্য জাত—কাব্যের জাত। ইহাদের মূলে ছিল লোক-কথা। সেই লোক-কথা বা মুখে মুখে প্রচলিত বা অপরিণত রচনার জনপ্রিয় কাহিনী কাব্যের আওতায় কাব্য-সৌন্দর্যে অলঙ্কৃত হইয়া গদ্য-কাব্যের রাজ-দরবারে আসন লাভ করিয়াছে। কাব্যশিল্পের নিরিখে কথা-কাব্যের কবিরা ইহাকে রীতিমত শিল্পসম্মত একটা রূপ দিয়াছেন। অন্ততঃ দণ্ডীর দশকুমার-চরিত হইতে আরম্ভ করিয়া বাণভট্টের কাদম্বরী পর্যন্ত কাহিনীগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে এইরূপ একটা ধারণা সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। ইহার একটা প্রমাণ মেলে অলঙ্কার-শাস্ত্রে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যেখানে কাব্যের লক্ষণ বলা

হইয়াছে, সেখানে মহাকাব্যের অবান্তর রূপ বলিয়া কথা-আখ্যায়িকা নামক গদ্য-কাব্যেরও লক্ষণ বলা হইয়াছে, কিন্তু জনপ্রিয় বৃহৎকথা ও স্বনামধন্য তন্ত্রাখ্যায়িকা সেখানে স্থান পায় নাই। গদ্য-কাব্যের মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য নয় বলিয়াই তাহারা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া রহিল। অতএব এ কথা বলা যায় যে, গদ্য-কাব্য কাব্যেরই একটা রূপান্তর এবং আধুনিক মহাকাব্যের দ্বারা ইহা আমূল প্রভাবিত। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে এমন কোন কথা নাই যে কাব্য হইতে হইলেই তাহাকে ছন্দোবদ্ধ রূপ হইতে হইবে। গদ্য হউক, পদ্য হউক, তাহাতে কাব্যধর্ম থাকিলেই হইল—রসাস্বাদনের অনুকূল আবহাওয়া থাকিলেই হইল।

লোক-কথার বর্ণনাত্মক উপাদান লইয়া গদ্যকাব্যের প্রাথমিক আবির্ভাব। লোক-কথার প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার রঙে আপনাকে রাঙাইয়া তুলিয়া গল্প বলিবার বিশিষ্ট শিল্পের মধ্যে গদ্য-কাব্য আশ্রয় লইয়াছে। ভারতীয় গল্পকারের আবহমান কালের পুঁজি উজাড় করিয়া ইহা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পর মহাকাব্যের অনুকরণে ইহা ইহার আঙ্গিকই কেবল গড়িয়া তোলে নাই, গল্প বলিবার সুচারু ঢঙ্‌টিও গড়িয়া লইয়াছে। অভিজাত বিদগ্ধ রসিক মহলের জন্য রচিত বলিয়া ইহাও মহাকাব্যের উচ্চতর মঞ্চ হইতে কথা বলে। কড়াতারে ইহা ইহার স্বর-গ্রামকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভাষণের মায়াজাল বুনিয়াছে এবং অলঙ্কারের জৌলুষে ও বর্ণন-শিল্পে রীতিমত হাত পাকাইয়াছে। এককথায়, দেশের বুকে প্রবাহিত ইতিবৃত্তের সহিত কাব্য-শিল্পের আদর্শ ও কাঠামো মানাইয়া লইয়া গদ্য-কাব্যের আবির্ভাব। মহাকাব্যের রচনা-শৈলীর দীর্ঘ-সমাসনিষ্পন্ন পদ, শ্লেষ, অনুপ্রাস, প্রভৃতির নিয়ত শিঞ্জাধ্বনি, গূঢ় পুরাবৃত্তের ইঙ্গিত প্রভৃতি গদ্য-কাব্যে অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্ম-শিল্পে প্রকৃতির বর্ণনা গদ্য-কাব্যের অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য। তাহা ছাড়া নারী-পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক ভাবের আলিম্পন ইহার কাব্যধর্মের অপর বৈশিষ্ট্য। মহাকাব্য হইতেই ইহা পাইয়াছে নারী-পুরুষের প্রেমের বৈচিত্র্য ও আদর্শ।

কথা-কাব্যের পশ্চাতের ইতিহাসের মত আখ্যায়িকা-কাব্যেরও একটা অনাবিষ্কৃত প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষে ইতিহাস নাই, কিন্তু ইতিহাসের মতই আখ্যায়িকা আছে। সে আখ্যায়িকা কেবল নীতিবাদ বা শিক্ষা-প্রচারের গল্প নয়, আবার পুরাপুরি ইতিহাসও নয়। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা তথ্য-সত্যকে কল্পনার রঙে রাঙাইয়া আপনার বাসনানুরূপ রূপ দিবার চেষ্টার মধ্যে এক

শ্রেণীর কাব্য গড়িয়া ওঠে। ইহাদিগকে ঐতিহাসিক-কাব্য বলা হয়। ইহাতে তথ্যরসের চেয়ে কাব্যরসই বেশী। ইতিহাস এখানে গৌণ, কাব্যই মুখ্য। প্রশস্তি-কবিগণের প্রশস্তি-কাব্যের মধ্যে এই কাব্য-কল্প ঐতিহাসিক মেজাজের একট অনু-প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর কাব্যের আত্মপ্রকাশের পূর্বে তৎকালীন মানুষের মনে তাহার ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতা ও চেতনাকে গল্পের আড়ালে পরিবেশনের যে ইচ্ছা জাগিয়াছিল, তাহাতে আত্ম-জীবনীধরণের এক শ্রেণীর রচনার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল এবং একথা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে শিলালিপির প্রশস্তিগুলি এই ধরণের প্রচেষ্টার উদ্দীপনা জাগাইয়া ছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার ফল আমরা কিছু পাই নাই। তবে একথা সত্য যে সেইরূপ একটা প্রচেষ্টা গদ্য-গল্পের এলাকায় ঢুকিয়া কথা-আখ্যায়িকার মধ্যে একটা সীমারেখা নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টা হইতেই আমরা কথা-আখ্যায়িকা-বিরোধের একটা আভাস পাই আলঙ্কারিকদিগের বিতণ্ডার মধ্যে।

প্রাচীনতম আলঙ্কারিক ভামহই সর্বপ্রথম আখ্যায়িকা ও কথাকাব্যের পার্থক্য আলোচনা করেন।[১]

আখ্যায়িকা-কাব্য সম্পর্কে আচার্য ভামহের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে নিম্নোক্ত সূত্রগুলি পাওয়া যায় :—

(১) বিষয়-বস্তু হইবে লোকানুবর্তী ; (২) নায়ক নিজেই আখ্যানভাগের বক্তা হইবেন ; (৩) গল্পটি বলিতে হইবে মনোজ্ঞ গদ্যে ; (৪) গল্পে পরিচ্ছেদ-বিভাগ থাকিবে এবং পরিচ্ছেদগুলিকে পরিচ্ছেদ না বলিয়া 'উচ্ছ্বাস' বলিতে হইবে ; (৫) বক্ত্র ও অপর-বক্ত্র ছন্দের ভাবী ঘটনাসূচক কবিতা থাকিবে ;

---

(১) 'প্রকৃতানুকুলশ্রব্যশব্দার্থ-পদবৃত্তিনা।
গদ্যেন যুক্তোদাত্তার্থা সোচ্ছ্বাসাখ্যায়িকা মতা॥
বৃত্তমাখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্।
বক্ত্রং চাপরবক্ত্রঞ্চ কালে ভাব্যর্থশংসি চ॥
কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা।
কন্যাহরণ-সংগ্রাম-বিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা॥ —আ
ন বক্ত্রাপরবক্ত্রাভ্যাম্ যুক্তা নোচ্ছ্বাসবত্যপি।
সংস্কৃতং সংস্কৃতচেষ্টা কথা পভ্রংশভাক্ তথা॥
অন্যৈঃ স্বচরিতং তস্যাং নায়কেন তু নোচ্যতে।
স্বগুণাবিষ্কৃতিং কুর্যাদভিজাতঃ কথং জনঃ॥ —ক

(৬) কবি-কল্পনার সুযোগ থাকিবে ; (৭) কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ বা বিপ্রলম্ভ এবং নায়কের অভ্যুদয়—এইগুলি হইবে বিষয়বস্তু ; (৮) রচনার ভাষা হইবে—সংস্কৃত।

ভামহ-কৃত কথা-কাব্যের বিধিতে নিম্নোক্ত সূত্রগুলি পাওয়া যায় :—

(১) বক্ত্র বা অপর-বক্ত্রছন্দের শ্লোক থাকিবে না ; (২) উচ্ছ্বাস-ভাগ থাকিবে না—একটানা গল্প বলিতে হইবে ; (৩) নায়ক গল্পের বক্তা হইতে পারিবেন না, অন্য কাহাকেও হইতে হইবে ; (৪) কেবল সংস্কৃতে নয়, অপভ্রংশেও ইহা রচিত হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল, ভামহ যে কথা-আখ্যায়িকার ভেদক সূত্র রচনা করিলেন, ইহা কিসের নজিরে ? তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সমন্বকার কথা-আখ্যায়িকার নিরিখে এই সূত্রগুলি রচনা করিয়া থাকিবেন। আমরা প্রাচীনতর আখ্যায়িকার মধ্যে পাইয়াছি বাণভট্টের 'হর্ষ-চরিত' এবং কথা-কাব্যের মধ্যে সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণের 'কাদম্বরী'।

বাণ নিজেই 'হর্ষ-চরিত'কে আখ্যায়িকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু ভামহের আখ্যায়িকা-সূত্রের নজিরে হর্ষ-চরিতকে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে কাব্যখানির কয়েকটি লক্ষণের সহিত ভামহোক্ত আখ্যায়িকা-লক্ষণের কিছু কিছু মিল থাকিলেও 'আখ্যায়িকা' বলিতে ভামহ যাহা বুঝিতেন, 'হর্ষ-চরিত' তাহা নহে। ভামহ নিশ্চয়ই হর্ষ-চরিত ও কাদম্বরীর কথা জানিতেন। দণ্ডী যখন জানিতেন, তখন ভামহের না জানিবার কথা নয় ; কারণ ভামহ দণ্ডীর অগ্রজ হইলেও* সমসাময়িক। আসল কথা, ভামহ বাণের রচনাকে আমলই দেন নাই। কেন দেন নাই, ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। এক, তাঁহার সময়ে বা পূর্বে অখ্যাত যে আখ্যায়িকা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এবং যাহাদের কয়েকখানির উপর নির্ভর করিয়া তিনি আখ্যায়িকার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাণের রচনা তাহার ব্যতিরেক। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববর্তী বা তাঁহার আদর্শের অনুপাতী সমসাময়িক রচনাগুলির প্রতি গোঁড়ামি ছিল বলিয়া ভামহ বাণের রচনা মানিয়া লইতে পারেন নাই।

প্রথম কারণ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ভামহের আখ্যায়িকা-আদর্শের উপজীব্য কোন বিখ্যাত গ্রন্থ তাঁহার সময়ে বা পূর্বে রচিত হয় নাই ; হইলে কাব্য না থাকিলেও কবির নাম থাকিত। ভট্টারহরিচন্দ্রের কাব্য পাওয়া যায় নাই, কিন্তু নাম পাওয়া গিয়াছে। যশের অধিকারী এমন কোন গ্রন্থ রচিত হইলে সে-গ্রন্থ দণ্ডীরও জানিবার কথা। দণ্ডী 'বৃহৎ-কথা'র নাম করিয়াছেন, আর এরূপ

একখানি সম্পন্ন গ্রন্থের নাম করিলেন না, ইহা স্বাভাবিক নহে। বিশেষ করিয়া ভামহের সমালোচনায় দণ্ডী যখন আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচক পথ ধরিয়াছেন, তখন তিনি যে অমন অভিপ্রেত শিকার ছাড়িয়া দিবেন, তাহা মনে হয় না। মনে হয়, ভামহের পূর্বে ও তাঁহার সময়ে কথা ও আখ্যায়িকা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে কথা ও আখ্যায়িকা লইয়া উভয়ের মধ্যে একটা সীমারেখা টানিবারও চেষ্টা চলিতেছিল। সেই চেষ্টার নিরিখে ভামহ তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন মাত্র। যে গ্রন্থগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি কথা-আখ্যায়িকার তারতম্যের সীমারেখা টানিয়াছিলেন, সেগুলি নিশ্চয়ই অক্ষম কবির রচনা। তাই সেগুলি কালজয়ী হইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিবেশে ভামহের বিঘোষিত মতের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভামহের সে ইঙ্গিতটি মূল্যবান্। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্যে তিনি যে সংজ্ঞা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে আত্ম-জীবনী-কাব্য ও অভিজ্ঞতার তথ্যসমৃদ্ধ লোকানুবর্তী কাব্যকেই যেন তিনি আখ্যায়িকার আদর্শ বলিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। পাছে এই আত্ম-জীবনী ও অভিজ্ঞতার কাব্য ইতিহাস হইয়া পড়ে, সেই জন্য তিনি আখ্যায়িকার লেখককে "কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা" বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কবির অভিপ্রায় বলিতে অনেক কথাই মনে হইতে পারে; কোন কিছুর স্পষ্ট ধারণা হয় না। কাজেই ভামহের এই আদর্শ অনুমান করা গেলেও প্রমাণিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভামহের আখ্যায়িকা-সংজ্ঞার মধ্যে সত্য সত্যই যদি শ্রদ্ধেয় কিছু থাকে, তাহা হইল আত্মজীবনীমূলক কাব্যের খবরটুকু।

আখ্যায়িকা প্রসঙ্গে ভামহ বলিয়াছেন—"নায়ক আত্মকাহিনীর বক্তা হইবেন।" নায়ক আত্ম-কাহিনীর বক্তা হইলেই যে লাভ হইবে, তাহা মনে হয় না। লাভ-লোকসান নির্ভর করে কবির শিল্পোপন্যাসের উপর। আত্ম-কাহিনী নিজে বলিলে নিজের পর্যবেক্ষণজাত চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি খুলিয়া দেখানো যাইতে পারে, একথা সত্য, কিন্তু আত্ম-কাহিনীর বক্তামাত্রের যে সেই কবি-মানস থাকিবে, এরূপ কোন বাস্তব সত্য গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। সব কিছুই নির্ভর করে কবির উপর। কবির স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিভার সৌকর্যে যাহার মুখে কাহিনী বসাইলে কবির উদ্দেশ্য সার্থক হইবে, তাহার নির্ণয় করিবেন কবি স্বয়ং। তাহা লইয়া কোন বিধি-নিষেধ গড়া চলে না।

ইংরেজী নভেলে William Henry Hudson তিনটি method-এর উল্লেখ করিয়াছেন ;—(১) the direct or epic ; (২) the autobiographical ; (৩) the documentary. এই তিনটি method-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"In the first and most usual way, the novelist is an historian narrating from the outside ; in the second, he writes in the first person, identifying himself with one of his characters (generally though not always, the hero or heroine), and thus produces an imaginary autobiography ;·········in the third, the action is unfolded by means of letters."

তৃতীয় methodটি আমাদের প্রয়োজনের বাহিরে। প্রথম দুইটি methodএর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে Hudsonএর মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলিতেছেন—

···for while the direct method always gives the greatest scope and freedom of movement, a keener and more intimate interest may sometimes be attained by the use of either of the first personal or the documentary plan. Yet it will be observed that both these last-named methods involve difficulties of their own, and that on the whole it is best to avoid them save where the compensating gain is considerable. In adopting the autobiographic form, a novelist may frequently fail to bring all his material naturally within the compass of the supposed narrrator's knowledge and power ; and he may sometimes miss the true personal tone.

Hudson যে তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ Direct or epic method নিরাপদ। দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ autobiographical পদ্ধতিটির অনেক সুবিধা থাকিলেও তাহার ঝুঁকি বড় কম নয়। তাই শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিলেন—"It is best to avoid them." অতএব আখ্যায়িকার নায়ক-বক্তৃত্বের মহৎ লাভের কথায় Hudsonএর সহিত আমাদের মতৈক্য স্বীকার করি।[১]

---

(১) " 'রজনী'তে বঙ্কিম আখ্যানবস্তুর বর্ণনায় নূতন পথের পথিক হইয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখরে গ্রন্থকার নিজে আখ্যায়িকার বক্তা। 'ইন্দিরা'তে নায়িকা স্বয়ং বক্ত্রী। 'রজনী'তে আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মুখে বর্ণিত হইয়াছে।

ভামহের অপর বক্তব্য—পরিচ্ছেদ ভাগ। পরিচ্ছেদ ভাগের যৌক্তিকতা দেখাইয়া ডাঃ সুশীলকুমার দে বলিয়াছেন—

"The pauses in the Ākhyāikā, as already pointed out, were necessary because the hero, who is himself the narrator, should be allowed to recount his story in an easy manner."

পরিচ্ছেদভাগ সুবিধা কি অসুবিধা, তাহা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপর—(১) বিষয়-বণ্টনের সুচতুর শৈলী এবং (২) সহৃদয় পাঠকবর্গের চিত্তবৃত্তির ওঠানামার উপর। সামগ্রিকতার মধ্যে অংশীর সহিত অংশের সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধের সুসঙ্গত পরিপাটী বিন্যাসের ফলে ঔচিত্য ও মাত্রাগুণে সৌন্দর্যের যে জাগরণ ঘটে, একথাও সত্য। তবে এই বিষয়-বণ্টন বা ভাগ আঙ্গিক হইবে, কি মানসিক হইবে, —তাহা নির্ভর করে পাঠকবর্গের দোলায়মান চিত্তবৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া রস-বৈচিত্র্য-পরিবেশনের মাপ-কাঠির উপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় নাটকের অঙ্কবিভাগ এবং মহাকাব্যের সর্গ-বিভাগ। বৃহত্তর বিষয়বস্তুকে অংশ অংশ করিয়া ভাগ করিয়া পরিবেশন করায় কবির সুবিধা। কথাকাব্যকে আখ্যায়িকা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইবার জন্য অথবা কথা-আখ্যায়িকার বর্ণভেদ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবার জন্যই যদি বলা হয়, আখ্যায়িকায় পরিচ্ছেদভাগ থাকিবে, কথায় থাকিবে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহা কেবল সমজাতীয় জিনিসকে ভিন্ন বলিয়া সনাক্ত করিবার দুর্বল উপায়মাত্র। ইহার পশ্চাতে কোন তাত্ত্বিক অর্থ নাই। তাত্ত্বিক

প্রথম রীতিই সাধারণ রীতি এবং সকল দিক দিয়া দেখিলে প্রকৃষ্টতম রীতি বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয় রীতিতেও অনেক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। থ্যাকারে (Henry Esmond) ও ডিকেন্সের (David Copperfield) সর্বোত্তম সৃষ্টি ঐ রীতির। ইহার কতকগুলি অসুবিধাও আছে ; আখ্যায়িকার সকল ঘটনা কল্পিত বক্তার জ্ঞানগোচরে আনা সহজসাধ্য নহে ; তাহা ছাড়া এই রীতিতে বক্তা কেবল নিজ মনোভাবই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারেন, অন্য পাত্রের মনোভাব তেমন করিয়া দেখাইতে গেলে স্বাভাবিকতার হানি হয়। যেরূপ প্লটে এই দুই অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তথায় দ্বিতীয় রীতি বেশ মনোরম হয়। বঙ্কিম এক 'ইন্দিরা' ব্যতীত অন্যত্র এই রীতির অনুসরণ করেন নাই। তৃতীয় রীতিতে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের মধ্যে ভাব-প্রকাশের প্রণালীতে এবং অন্যান্য বিষয়েও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা কিছু কঠিন।* * * বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তৃতীয় রীতির গুণ এই যে, যে কথা যে পাত্রের মুখে শুনিতে ভাল লাগে সে কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। যদি প্রত্যেক পাত্র নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কথা বলিতে পারে তবে ইহা সত্য বটে। তৃতীয় রীতির বস্তুতঃ খুব সুন্দর হয়—যদি ঘটনা-সমূহের সঙ্ঘটনকালে এবং তাহাদের ভাবিফল জানিবার পূর্বে প্রধান পাত্রগণের মুখে তাহাদের তদানীন্তন মনোভাব যথাযথ প্রকাশ করা যায়।

—ব,

অর্থ যে নাই এবং ইহা যে কেবল স্বল্পায়ু প্রথামাত্র, তাহা আধুনিক যুগের উপন্যাস-সাহিত্যের পরিচ্ছেদভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে। অতএব আখ্যায়িকা-কাব্যে পরিচ্ছেদ-ভাগের কৌলীন্যের উপর ভামহের স্মার্তবিধি কেবল কথাকাব্য হইতে আখ্যায়িকা-কাব্যকে পৃথক করিবার জন্য, অন্য কোন প্রয়োজনে নয়। তাহার পর পরিচ্ছেদকে পরিচ্ছেদ না বলিয়া যদি কেবল 'উচ্ছ্বাস' বলা হয়, তাহাতে তাহার মূল্য যে বিশেষ বাড়ে, তাহা মনে হয় না। উচ্ছ্বাস সম্পর্কেও ডাঃ দে একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"The word Ucchvāsa (lit. breathing out) indicates a pause for breath ; and so it is a name for a chapter which constitutes the pause for the narrator, who cannot be supposed to tell the story "in one breath", but should recount it in an easy manner with necessary pauses."

'উচ্ছ্বাস'-পদের না হয় একটা ব্যাখ্যা দেওয়া গেল কিন্তু 'লম্ভ' (লভ্ ধাতু হইতে), 'উল্লাস', 'আশ্বাস'—প্রভৃতি পদের কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিলেও 'উচ্ছ্বাস' পদের এমন কি কৌলীন্য আছে যাহার ফলে আখ্যায়িকায় কেবল পরিচ্ছেদের নাম 'উচ্ছ্বাস' হইবে ? উহাদের যে-নামেই ডাকা যাউক না কেন, উহারা পরিচ্ছেদের অতিরিক্ত কোন অর্থ বোঝায় না।

তাহার পর বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের প্রসঙ্গ। বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের কবিতা থাকিলেই যে আখ্যায়িকার মূল্য বাড়িবে, এমন কোন কথা নাই। ঐ ছন্দের এমন কোন বিশেষত্বের চেহারা চোখে পড়ে না, যাহার নজিরে ভবিষ্যৎ ঘটনার সংকেত রসিকমনে সহজ হইবে।

তাহার পর আখ্যায়িকার ভাষা। আখ্যায়িকার ভাষা কেবল সংস্কৃত হইবে, ভামহের এই নির্দেশের অর্থ হইল আখ্যায়িকা-কাব্যকে তিনি উচ্চ গ্রামের অভিজাত সাহিত্য বলিয়া মনে করিতেন। আখ্যায়িকাকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। কাজেই আখ্যায়িকার প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাঁহার ন্যায় বিদগ্ধ আলঙ্কারিকের তাহা থাকা উচিত হয় নাই। যদি তাঁহার কালে দুই শ্রেণীর গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়েরই ভাবী জীবনের উদাত্ত সমৃদ্ধির দিকে চাহিয়া উভয় শ্রেণীর সাহিত্যের আদর্শ এবং আঙ্গিকের যথার্থ পার্থক্য অর্থাৎ আঙ্গিকের যে পার্থক্য বিষয়গত আদর্শের সহিত

অযত্ন-নির্বর্ত্য হইয়া দেখা দিবে, তাহারই মন্ত্রটি ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির ন্যায় ভামহের ঘোষণা করা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

ভামহ-নির্দিষ্ট আখ্যায়িকার সর্বশেষ লক্ষণটি হইল—"কন্যাহরণ-সংগ্রাম-বিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা"। এই লক্ষণটি সত্যই আলোচনার বিষয়। দণ্ডী ইহাকে আখ্যায়িকার বৈশেষিক গুণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই এবং ডাঃ সুশীলকুমার দে ইহারই নজিরে আখ্যায়িকা-কথা কাব্যকে মহাকাব্যের Challenge বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। "কন্যাহরণ-সংগ্রাম-বিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা" অংশের সহিত মহাকাব্যের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে কন্যাহরণের ব্যাপারটা বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ 'সংগ্রাম', 'বিপ্রলম্ভ', ও 'উদয়',—তিনি মহাকাব্যের আদর্শ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, পুরাপুরি মহাকাব্যের লক্ষণগুলি গ্রহণ করেন নাই। গ্রহণ করিলে কেবলমাত্র ছন্দোরূপ ছাড়া আখ্যায়িকা-কাব্যের সহিত মহাকাব্যের কোন পার্থক্য থাকিত না। অতএব এখানে প্রশ্ন ওঠে, আখ্যায়িকা-কাব্যের আদর্শ খাড়া করিবার জন্য তিনি মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিলেন কেন? এবং করিলেনই যদি, তবে সমগ্র আদর্শটি না লইয়া তাহা হইতে ছাঁটিয়া কাটিয়া মাত্র তিনটি অংশই বা গ্রহণ করিলেন কেন? প্রশ্নটির প্রথম অংশের উত্তর হইল— মহাকাব্য হইতে পৃথক জাতি হিসাবে গদ্য-কাব্যের কী আদর্শ হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন নাই। ভামহের কালে কাব্যের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকের আদর্শ স্থির করা একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। একমাত্র নাট্য-প্রতিষ্ঠিত রসবাদ ছাড়া কাব্যগত কোন আদর্শ তখনও দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। সবেমাত্র অলঙ্কারের মধ্যে কাব্যের আদর্শের তখন অনুসন্ধান চলিতেছিল। সেই সারস্বত অভিযানের অনুসন্ধিৎসু দলের পথিকৃৎ হিসাবে ভামহ আমাদের চির-নমস্য।

গদ্য-কাব্য তখন লোক-কথার স্বপ্নাতুর স্নেহ-কোমল কোল ছাড়িয়া সবে মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, চলাফেরা করিবার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সে তখনও শেখে নাই। তাহার আপন প্রাণের সদ্যো বিকাশের মধ্যে এক নূতন জীবন-ছন্দ বাজিয়া উঠিয়া দেহের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত কেবল দোলা-বিনিময়ের অসংযত ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সেই চলিতে চলিতে পড়া এবং পড়িতে পড়িতে চলার অধ্যবসায়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্যে আত্ম-সম্বৃত চলার জন্য সে তখন একটা অবলম্বন খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। হাত বাড়াইয়া সে অবলম্বন তাহাকে কেহই দিতে পারেন নাই। দিবার জন্য সর্বপ্রথম ভামহই হাত বাড়াইয়া ছিলেন। হাত বাড়াইলেও ভামহ ঠিক জানিতেন

না কীভাবে কেমন অবলম্বন তাহাকে দিতে হইবে। সবে মাত্র লোক-কথা সে ছাড়িয়া আসিয়াছে। সেখানে সে আর ফিরিবে না। কাব্যতত্ত্বের নূতন রাস্তার আবাদ তখন সবে সুরু হইয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটক আর মহাকাব্য ছাড়া আর কোন নির্ভরযোগ্য কাব্যশাখা তখন ছিল না। নাটকের প্রতি ভামহের দাক্ষিণ্য ছিল না, কারণ রস-চুক্তি তিনি মানিতে চাহেন নাই। হাতের মাথায় ছিল মহাকাব্য। তাই তিনি মহাকাব্যের আদর্শ হইতে তিনটি জিনিস বাছিয়া লইয়া গদ্যাত্মক আখ্যায়িকা-কাব্যকে আদর্শে গড়িবার জন্য দান করিলেন। কিন্তু ভামহ যে ঐ তিনটি উপাদানের মাধ্যমেই মহাকাব্যের স্বরূপ-লক্ষণের নিখিল সঞ্চয়কেই আখ্যায়িকার করপুটে ঢালিয়া দিলেন, একথা তখনকার মত চাপা রহিল।

প্রথম ধরা যাউক, কন্যাহরণের কথা। কন্যাহরণের ইতিবৃত্ত আছে যুগ-মহাকব্যে—রামায়ণ-মহাভারতে। শুধু প্রাচ্যে নয়, প্রতীচ্যের মহাকাব্যেও ইহার অপ্রাচুর্য নাই। কন্যাহরণের মূলে ভামহের মনের কথাটি হইল—বীররস। প্রতীচ্যের মহাকাব্যেরও মূলরস হইল বীররস। এই কন্যাহরণের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষের প্রয়োজন—এক পক্ষ নায়ক, অপরপক্ষ প্রতিনায়ক। প্রতিনায়ককে হত্যা করিয়া নায়ক যদি জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে নায়কের অভ্যুদয় অনিবার্য। বাকি রহিল—'বিপ্রলম্ভ'—শৃঙ্গারেরই রূপ-বিশেষ। শৃঙ্গারের দুই ভেদ—(১) সম্ভোগ ও (২) বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সাধারণতঃ চারিটি অংশ স্বীকৃত—(১) পূর্বরাগ (২) মান (৩) প্রবাস ও (৪) করুণ। কোনমতে আবার পাঁচটি অংশ; অতিরিক্তটি হইল—'অভিশাপ'।[১] বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ছাড়া সম্ভোগশৃঙ্গার পুষ্টিলাভ করে না। বিপ্রলম্ভ একা থাকিতে পারে না। পারিলে সংস্কৃত কাব্যে ট্রাজেডির সন্ধান মিলিত। অতএব 'বিপ্রলম্ভ' শব্দটির উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাভাবেই 'সম্ভোগ' আসিয়া উঠিল। আবার এই লক্ষণটিকে উপলক্ষণ বলিয়া মানিয়া লইলে 'উদয়'-শব্দের অর্থ নায়কের অভ্যুদয় ছাড়াও সূর্য-চন্দ্রাদির উদয় যেমন মনে করা যাইতে পারে, তেমন তাহাদের অস্ত-গমনের কথাও ইহার মধ্যে সঙ্কেতিত, এরূপ কল্পনায়ও বাধা নাই। এখন কথা হইল, নায়ক কোথায় থাকিবেন? নিশ্চয়ই তাঁহার নগরে বাস করিবার কথা। তিনি মাঝে মাঝে সমুদ্রদর্শনে যাইতে পারেন, মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিতে পারেন, বিভিন্ন ঋতুতে বনের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারেন। তিনি রাজা

(১) "অপরস্তু অভিলাষ-বিরহের্ষ্যা-প্রবাস-শাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।"—কা. প্র, ৫।

বলিয়া রাণীদের সহিত মাঝে মাঝে জলকেলি করিতে পারেন, রতি-উৎসবে মধু-পানেও মত্ত হইতে পারেন। আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর দেখা গেল যে অবিনাভাবে সেই মহাকাব্যের সামগ্রিক মডেলটি গড়াইয়া আসিল। তাহা হইলে বলিতে হইবে, কন্যাহরণের মধ্যে কন্যাহরণের স্থূলব্যাপারটি শুধু নাই। ইহার সহিত জড়াইয়া আছে সামগ্রিক শৃঙ্গার-ব্যাপার। কিন্তু এ কী অঘটন ঘটিল। রসকে যিনি মানিতে চাহেন না, তাঁহারই অজ্ঞাতে তাঁহারই অসতর্ক বাণীর ছদ্মবেশে রস আসিয়া হানা দিল। ঐ কন্যাহরণের মধ্যে ক্ষাত্রবীর্যের যে ছদ্মবেশী আদর্শ আছে, তাহার মধ্যেই বীররস রীতিমত কায়েমী হইয়া আছে। অতএব বলা যাইতে পারে যে অন্যান্য রস অপেক্ষা বীররসকেই তিনি বেশি পছন্দ করিতেন, যেমন করিতেন সম্ভোগশৃঙ্গার অপেক্ষা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারকে। যাহা হৌক, দেখা গেল মহাকাব্যের আদর্শকেই তিনি আখ্যায়িকার আদর্শ হিসাবে প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। মহাকাব্যের ইতিবৃত্তও কল্পনাসর্বস্ব নয়। ইতিহাস-উদ্ভূত অথবা সদাশ্রয় কথা অবলম্বন করিয়া মহাকাব্যের কাহিনী গড়িবার কথা। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সজাগ দেখিতে পাই ভামহের 'বৃত্তমাখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টেতম্"—উক্তির মধ্যে। এই উক্তি-কণিকার মধ্যেই আমরা ভামহের লোকানুবর্তী জীবনপন্থী আত্মজীবনীমূলক কাব্য-রচনার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। ভামহের পরবর্তীকালে হয়ত' মহাকাব্যোক্ত ইতিহাসও সদাশ্রয় কাহিনী এবং কেবলমাত্র কবির স্বকপোলকল্পনা—এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্যের অজুহাতে আখ্যায়িকাও যথাসাধ্য আপনাদের স্বজাতীয়ত্বের মধ্যেও ভিন্নজাতীয়ত্বের ম্যাকমহন সীমারেখা টানিয়া দিয়াছিল।

এখন ভামহের কথাসংজ্ঞার আলোচনায় আসা যাউক। বাণ নিজেই তাঁহার 'কাদম্বরী'কে এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তাকে' কথাকাব্য বলিয়াছেন। বাণের উল্লেখ হইতে মনে হয় 'বাসবদত্তা' 'কাদম্বরী'র পূর্বে রচিত। 'বাসবদত্তা'র বিষয়বস্তুটি মৌলিক। গ্রন্থখানিতে কোন উচ্ছ্বাস বা পরিচ্ছেদ ভাগ নাই, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত কোন কবিতাও নাই। কবিতা যাহা আছে, তাহার কয়েকটি আর্যা, শিখরিণী ও শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে রচিত এবং তিনটি রচিত স্রগ্ধরা ছন্দে। কাহিনীর কেন্দ্রে আছে রতি। ইহাতে ভামহোক্ত মুখ্যতঃ কন্যাহরণের ব্যাপার নাই, আছে নায়ক-অভ্যুদয়ের নিদর্শনস্বরূপ বিন্ধ্যপর্বতে বাসবদত্তকে লইয়া প্রস্থানের কথা,—কন্যালাভের কথা।

কাদম্বরী-কথাখানি আঙ্গিকের দিক হইতে 'বাসবদত্তা'রই অনুরূপ। সূচনায়

বংশস্থ বৃত্তে রচিত কয়েকটি কবিতায় ব্রহ্মা, শিব ও গুরু ভৎস্বর উদ্দেশে নমস্কার, উত্তম কাব্যের ফলশ্রুতি সম্পর্কে মন্তব্য ও কবি-বংশের বর্ণনা আছে। বক্তা নায়ক নন। বৈশম্পায়ন, মহাশ্বেতা ও ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি জাবালি—এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে কাহিনীর বক্তৃত্বের বণ্টন করা হইয়াছে এবং বণ্টনের মধ্যে কবির রসবোধ ও ঔচিত্যবোধ পুরামাত্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন মহর্ষি জাবালির মুখে গল্প শুনিয়া স্বীয় অতীত জীবনের সকল কাহিনী জানিলেও তাহার মুখে কেবল সেইটুকু ঘটনার বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে যাহাকে সংক্ষেপে কাহিনীর উপক্রমণিকা বলা যাইতে পারে। মূল ও আদ্যোপান্ত কাহিনীটি জাবালির মুখে বসান হইয়াছে। উদ্দেশ্য হইল ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলিয়া তাঁহার পক্ষে নিখিল ঘটনা জানিবার কথা এবং আত্ম-সম্পর্ক-শূন্য বলিয়া—তটস্থ জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহার বিবৃতিটি পক্ষপাতশূন্য তৃতীয় ব্যক্তির বিবৃতির ন্যায় যেমন সংকোচহীন ও স্বাধীন, তেমনি যথাযথ হইবার কথা। মহাশ্বেতার মুখে কেবল সেই কাহিনীটি বসান হইয়াছে যাহা তাহার স্বীয় জীবনের মর্মকথা। মানুষের দুইটি পরিচয়—একটি বাহ্য, অপরটি আভ্যন্তর। যেখানে অশ্রু, বেদনা ও হাহাকারভরা আত্মজীবনের মর্মশেষ একান্ত আপনার কাহিনীটি শুনাইবার প্রয়োজন হয়, সেখানে ভুক্তভোগীর মুখেই তাহা শুনিতে হয়; কারণ যাহা ঘটে, তাহাই কেবল ঘটনা নয়, যাহা চিত্তবৃত্তির রঞ্জনে রাঙা হইয়া আত্মার অপরিমেয়ত্ব ও শাশ্বত সাক্ষিত্বের কথা ঘোষণা করে, তাহাই প্রকৃত ঘটনা। মহাশ্বেতার মুখে কবি তাহার আত্মজীবনের কাহিনীটি বসাইয়া উক্ত অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন। কাদম্বরী-গল্পের কেন্দ্রে আছে রতি-ভাব। ইহার কাহিনীটিও কবি-কল্পিত, ঐতিহাসিক নহে। ইহাতে উচ্ছ্বাস-ভাগ নাই,—একটানা রচনা। ইহাতে কন্যাহরণের কথাও নাই, আছে কন্যালাভের কথা; সেও আবার একটি নয়, এক জোড়া।

উপরি উক্ত দুইখানি কথাকাব্যের কথা-আঙ্গিকের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাতে একথা বলা চলে যে ভামহোক্ত কথাকাব্যের সংজ্ঞার সহিত ইহাদের অনেকটা মিল আছে। "অনেকটা মিল আছে"—কথার তাৎপর্য এই নয় যে ভামহোক্ত কথাকাব্যের আদর্শে এই কাব্যদুইখানি রচিত; ইহার তাৎপর্য হইল, ভামহের চাহিদা মিটাইয়াও ইহারা ইহাদের আত্ম-বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গিয়াছে। একদিকে ভামহের আদর্শ, অপরদিকে কাব্যদুইখানির আত্ম-বৈশিষ্ট্য—এই যুগ্ম লক্ষণের নিরিখে বলা চলে, বাণের আখ্যায়িকা-কাব্যের ন্যায় সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণের 'কাদম্বরী' ভামহের কথা-সংজ্ঞার উপজীব্য নয়।

ভামহের কথা-কাব্যের সংজ্ঞাটি নেতিবাচক। তাঁহার বক্তব্য হইল, যে-গদ্য-কাব্য অনেকটা আখ্যায়িকার মতই দেখায় অথচ প্রকৃতপক্ষে আখ্যায়িকা নয়, তাহাই কথাকাব্য এবং আখ্যায়িকা-কাব্যে যাহা তাঁহার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে, সেগুলি পাছে কথাকাব্যে ঢুকিয়া পড়ে, এই দুর্ভাবনায় তিনি কথাকাব্যের সংজ্ঞায় বিধি অংশটুকু বাদ দিয়া কেবল নিষেধ অংশটিরই উল্লেখ করিয়াছেন। কথাকাব্য যে তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, ইহার আর একটি প্রমাণ হইল, তিনি কথাকাব্যের জন্য সংস্কৃতের সহিত অপভ্রংশ-ভাষারও দ্বার খুলিয়া দিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহার পর নায়ক গল্পের বক্তা হইতে পারিবেন না, অন্য কাহাকেও হইতে হইবে, ইহার বড় জোর এই অর্থ করা যাইতে পারে যে নায়ক-বক্তৃত্বের মধ্যে আত্মজীবনীমূলক কাব্যের যে সম্ভাবনা আছে, কথাকাব্যে সে সম্ভাবনা কদাচ থাকিবে না। 'স্বগুণাবিষ্কৃতি' যদি কথাকাব্যের বক্তার পক্ষে দোষাবহ হয়, তবে আখ্যায়িকা-কাব্যের বক্তারই বা দোষ হইবে না কেন? আখ্যায়িকার ভাগ্য ভাল যে "কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা"—বলিয়া কবিকল্পনারও কিছু সুযোগ দিয়া গিয়াছেন কিন্তু কথাকাব্যের বেলায় তিনি একেবারেই নির্বাক্।

ভামহের অনুজ অথচ সমকালবর্তী আলঙ্কারিক হইলেন দণ্ডী। ভামহ ও তাঁহার সমমতাবলম্বীদের কথা-আখ্যায়িকার ভেদ-নিরূপক সংজ্ঞার যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছিলেন, আচার্য দণ্ডী তাঁহাদের অন্যতম। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে ঐ মত সম্পূর্ণ নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

দণ্ডী প্রথম আপত্তি জানাইয়াছেন কথা-আখ্যায়িকার বক্তৃত্বভেদের। ভামহের মতে আখ্যায়িকায় বক্তা হইবেন নায়ক নিজে, কথায় নায়ক-ভিন্ন অন্য কেহ। কিন্তু দণ্ডী বাদিগণের উক্তির যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে ভামহের মুখের কথারও অতিরিক্ত কিছু কথা আছে। ভামহ কথাবক্তৃত্ব সম্পর্কে বলিয়াছেন—"অন্যৈঃ স্বচরিতং তস্যাং নায়কেন নোচ্যতে।" কিন্তু দণ্ডী বলিতেছেন—"নায়কেনেতরেণ বা"—নায়কও বক্তা হইতে পারেন, নায়ক ভিন্ন অন্য কেহও বক্তা হইতে পারেন। নায়ক কথাকাব্যে বক্তা হইবেন, একথা ভামহ যে বলেন নাই, তাহা দেখা যাইতেছে কিন্তু দণ্ডী বলিতেছেন, বাদিগণের এইরূপ মত যে আখ্যায়িকায় কেবল নায়ক বক্তা হইবেন কিন্তু কথায় যেমন নায়ক, তেমনি নায়ক ভিন্ন অন্য যে-কেহ বক্তা হইতে পারেন। এখন প্রশ্ন, এই অতিরিক্ত অংশটুকু কি দণ্ডীরই যোজনা, না দণ্ডী অন্য কোথাও হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? দণ্ডী ভামহের নাম করেন নাই।

অতএব তিনি যে কেবল ভামহের উক্তিরই প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, তাহা নয়; তিনি ভামহের সমকালীন অনেকটা একমতের উদ্গাতাদিগের মতেরও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাই ভামহের উক্তির সহিত অপরের উক্তি মিশিয়া উক্তিটি দাঁড়াইয়াছে—"নায়কেনেতরেণ বা"। উপস্থিত উক্তিটির আলোচনার পূর্বে একটি কথা বলিয়া রাখি। উক্ত উক্তিটির মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস হইল এই যে ভামহের সময়েও কথাকাব্যের বক্তৃত্ব লইয়া সকলে একমত ছিলেন না। যাঁহারা বাম-পন্থীছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, কথায় নায়ক কোনমতেই বক্তা হইতে পারিবেন না; যাঁহারা দক্ষিণ-পন্থী ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন, অত কড়াকড়ি ভাল নয়, কথাকে একটু স্বাধীনতা দিতে হইবে বৈ কি! কথায় অন্য লোক যেমন বক্তা হইতে পারিবেন, তেমনি নায়কও পারিবেন। নায়ক-বক্তৃত্বের এই সমগ্র পরিমণ্ডলটি আলঙ্কারিক দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস-সংবলিত নায়ক-বক্তৃত্বের অংশটি গ্রহণ করায় লাভ হইয়াছে এই যে দীর্ঘ-মেয়াদী বিবাদের যেন অনেকটা উপশম দেখা দিয়াছে।

যদি ভামহ বলেন, আখ্যায়িকা-কাব্যে নায়ক বক্তা, কথায় অন্য কেহ, অমনি দণ্ডী প্রশ্ন তোলেন, ইহার কারণ? ভামহ বলেন, আত্ম-জীবনীমূলক কাব্যের বিশেষত্ব হইল, নায়ক ও বক্তা অভিন্ন ব্যক্তি; কথাকাব্য উদারার্থসম্পন্ন আত্ম-জীবনীমূলক কাব্য নয় বলিয়া নায়ক ও বক্তা বিভিন্ন ব্যক্তি। ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডীর কিছু বলিবার নাই। দণ্ডী যদি কথা ও আখ্যায়িকা কাব্যকে একশ্রেণীর বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা; সে-তো জাতিত্ব লইয়া বিবাদ, বক্তৃত্ব লইয়া বিবাদ নয়। বক্তৃত্বের যুক্তিতে উপস্থিত ক্ষেত্রে ভামহকে হার মানাইবার কোন উপায় নাই দণ্ডীর। কিন্তু কথাকাব্যের সংজ্ঞায় যদি বলা হয় 'নায়কেনেতরেণ বা', তাহা হইলে ভামহের আখ্যায়িকা-কাব্যের বক্তৃত্বের আলোচনার পর দণ্ডী অনায়াসে বলিতে পারেন যে আখ্যায়িকায় ও কথায় উভয়ত্র যদি নায়ক-বক্তৃত্বের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে নায়ক-বক্তৃত্বের লক্ষণ লইয়া ভামহ কথা-আখ্যায়িকার মধ্যে যে ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, সে ভেদ টেকে না। অধিকন্তু কথাকাব্যের নায়ক-বক্তৃত্ব নিরাকরণের হেতুরূপে ভামহ যে 'স্বগুণাবিষ্কৃতি'র কথা তুলিয়াছেন, তাহাও নিরস্ত হইল। দণ্ডী বলেন, স্বগুণাবিষ্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই দোষের নয়। স্বগুণাবিষ্কৃতির মধ্যে যদি অসত্য-ভাষণের স্থান থাকে, তাহা হইলে তাহা দোষপদ-বাচ্য। সাহিত্যে—সে সাহিত্য আখ্যায়িকাই হউক, আর কথাই হউক, মিথ্যা-

ভাষণের কোন স্থান নাই ; থাকিলে স্বত্বোৎকর্ষের অভাব থাকায় সে-সাহিত্য কোনকালেই রসোত্তীর্ণ হইবে না।[১]

দণ্ডী এবার সোজা পথ ছাড়িয়া বিপরীত দিক হইতে আক্রমণ করিলেন ভামহকে। তুমি যে বলিলে আখ্যায়িকায় বক্তা হইবে নায়ক নিজে, কথায় নায়ক বা অন্য কেহ,—তোমার এ মতও টেকেনা। এমন আখ্যায়িকা আছে, যেখানে নায়ক বক্তা নন, বক্তা অন্য কেহ। তাহা হইলে আখ্যায়িকার নায়ক-বক্তৃত্ব লক্ষণও টিকিল না। আবার আখ্যায়িকায় নায়ক বক্তা, কথায়ও নায়ক বক্তা হইলে কথাও আখ্যায়িকা আপনা হইতেই অভেদ হইয়া ওঠে।

ভামহের বিরুদ্ধে দণ্ডীর দ্বিতীয় অভিযোগ বক্ত্রাপরবক্ত্র ছন্দ ও 'উচ্ছ্বাস' লইয়া। আখ্যায়িকায় কেবল বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দ থাকিবে,—ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন করি, বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দের এমন কি বিশেষত্ব আছে, যাহা না হইলে আখ্যায়িকা-কাব্যের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবে ? ছন্দ হিসাবে ইহাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য স্বীকার করি কিন্তু আখ্যায়িকা-কাব্যের কোন্ বৈশিষ্ট্য সম্পাদনের জন্য এই ছন্দের বিশেষত্ব ? অতএব বিশেষ দৌত্য এ ছন্দের নাই, ইহা মানিয়া লইতে হইবে। আবার কথাকাব্যে যখন আর্যা-ছন্দের সন্নিবেশ দেখা যায়, তখন আর্যার পিছন পিছন যদি বক্ত্র ও অপরবক্ত্র ছন্দ আসিয়া ওঠে, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে ? অতএব তুমি এই ছন্দ-দুইটির নজিরে কথা-আখ্যায়িকার ভেদ নিরূপণ করিতে পার নাই। তাহার পর তোমার মতে আর একটি ভেদক—'উচ্ছ্বাস'। আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদ-ভাগকে যদি 'উচ্ছ্বাস' বল, তাহা হইলে ইহার কী মূল্য বাড়িল ? তুমি যেমন আখ্যায়িকার পরিচ্ছেদকে উচ্ছ্বাস বলিয়া থাক, তেমনি কথার পরিচ্ছেদকেও 'লম্ভ', 'উল্লাস' প্রভৃতি বলা হয় ; অতএব পার্থক্য কোথায় ? পার্থক্য যা, তা কেবল নামেই। অতএব উহাও পার্থক্যের মানদণ্ড হইতে পারে না।

তৃতীয় অভিযোগ—"কন্যাহরণ-সংগ্রাম-বিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা" লইয়া। দণ্ডীর বক্তব্য, এগুলি যখন মহাকাব্যের লক্ষণ, তখন আখ্যায়িকা কাব্যের এগুলি বৈশেষিক গুণ হইতে পারে না। দণ্ডীর অপর আপত্তি—'কবেরভিপ্রায়কৃতৈঃ

(১) "সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজ্দুরি।" —ঐ

কথনৈঃ কৈশ্চিদঙ্কিতা' লইয়া। দণ্ডী বলেন, কবির অভিপ্রায় বা কবিভাবকৃত চিহ্ন যখন কবি-প্রতিভা-সঙ্গী, তখন এ সুযোগ কেবল আখ্যায়িকাকারের থাকিবে কেন, কথাকারেরও থাকিতে পারে। ভাষা-প্রসঙ্গে দণ্ডী বলেন, শুধু অপভ্রংশে কেন, সংস্কৃতের ন্যায় সকল ভাষায় কথা-কাব্য রচিত হইতে পারে। তাঁহার দৃষ্টান্ত পৈশাচী-ভাষায়-রচিত 'বৃহৎ কথা'র, কিন্তু 'বৃহৎ কথা' কথাকাব্যের কোঠায় পড়ে না।

এইভাবে আখ্যায়িকা-কথার পার্থক্যমূলক ভামহের লক্ষণগুলি নাকচ করিয়া দণ্ডী সিদ্ধান্ত করিলেন—"কথা-আখ্যায়িকার এক জাত, নামেই যা পার্থক্য।"

দেখা গেল দণ্ডীর আলোচনা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। তিনি কথা ও আখ্যায়িকার পার্থক্য অস্বীকার করিয়া যুক্তিবলে তাহাদের একজাতিত্ব প্রমাণ করিলেন বটে, কিন্তু সেই একজাতীয় গদ্য-কাব্যের কোন আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার, দণ্ডী বাণের নামটি পর্যন্ত করিলেন না; অথচ বাণকে তিনি চিনিতেন, জানিতেন, কাব্যাদর্শের রচনায় তিনি বাণের দ্বারা প্রভাবিতও হইয়াছিলেন।[১] বাণসম্পর্কে দণ্ডীর এইরূপ উদাসীন নীরবতা সত্যই বিস্ময়কর। ভামহ হইতে দণ্ডীর সময় পর্যন্ত কথা-আখ্যায়িকা লইয়া আলঙ্কারিকদের বিতণ্ডা এবং বাণের হর্ষচরিত-কাদম্বরী-সৃষ্টি—এই দুইটি জিনিস পাশাপাশি রাখিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, ভামহ হইতে দণ্ডীও বাণের সময় পর্যন্ত গদ্যসাহিত্যের আঙ্গিকের একটা নিত্যপরিবর্তন চলিতেছিল। একদিকে প্রাচীন আদর্শ যেমন ভাঙিতেছিল, তেমনি নূতন আদর্শও গড়িয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এই কারণেই বোধ হয় দণ্ডীর পরবর্তী ও রুদ্রটের পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক বামন ভামহ-দণ্ডী-বিতর্কের পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। এমনি একটা লক্ষ্যহীন অবস্থায় তখন গদ্য-সাহিত্যের দিন

---

(১) "তবে দণ্ডী যে বাণভট্টের পরবর্তী ইহা আধুনিক গবেষকগণ প্রায়ই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।—"অরত্নালোক-সংহার্যমবার্যং সূর্যরশ্মিভিঃ। দৃষ্টিরোধকরং যূনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥" [কাব্যা : ২, ১৯৭]—দণ্ডীর এই শ্লোকটি যে বাণভট্টের 'কাদম্বরী কথা'র অন্তর্গত শুকনাসোপদেশের "নিসর্গত এব অভানুভেদ্যমরত্নালোকচ্ছেদ্যম্ অপ্রদীপপ্রভাপনেয়ম্ অতিগহনং তমো যৌবনপ্রভবম্" এই অংশটুকুরই শ্লোকাকারে বিন্যাসমাত্র তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া—"অপিত্বনিয়মোদৃষ্ট স্তত্রাপ্যন্যৈরুদীরণাৎ" (কাব্যা : ১, ২৫) এই কারিকার ব্যাখ্যায় প্রাচীন টীকাকার তরুণ বাচস্পতি বলিয়াছেন—"তত্রাপি আখ্যায়িকায়ামপি অন্যৈঃ নায়কাদন্যৈঃ হর্ষচরিতাদৌ ভট্ট-বাণাদিভিরপি উদীরণস্য দৃষ্টত্বাৎ"। সুতরাং তরুণ বাচস্পতির মতেও বাণভট্টের হর্ষচরিত আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই দণ্ডী উদ্ধৃত কারিকাংশটি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব দণ্ডীর আবির্ভাবকাল যে খৃঃ ৭ম শতকের মধ্যবর্তী, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ।" অ, শা, ভূ পৃঃ ৮

কাটিতেছিল। কী করিয়া এই জড়তা কাটাইয়া গদ্য-সাহিত্য তখনকার মত চলিবার প্রেরণা লাভ করিল, তাহা আলোচনার পূর্বে কথা-আখ্যায়িকা সম্পর্কে আমরা অগ্নিপুরাণের অভিমতটি জানিয়া লইব। কেবল কথা-আখ্যায়িকা নয়, অগ্নিপুরাণে খণ্ডকথা, পরিকথা, ও কথালিকা লইয়া পাঁচশ্রেণীর গদ্য-কাব্যের উল্লেখ আছে।[১] অগ্নিপুরাণের নিজস্ব অবদান কিছু না থাকিলেও প্রাচীন ও নূতনকে খাপখাওয়াইয়া লইবার মত পরিবর্জন-পরিবর্ধন-শক্তির পরিচয় আছে।

অগ্নিপুরাণের মতে আখ্যায়িকার লক্ষণগুলি হইল :—

(১) গদ্যে কর্তৃবংশ বা কবিবংশ প্রশংসা ; (২) কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিপ্রলম্ভ ও অপরাপর প্রতিকূল ঘটনা ; (৩) উচ্ছ্বাসভাগ ; (৪) চূর্ণক ও বক্ত্র ও অপবক্ত্র ছন্দের অবতারণা ; (৫) বৃত্তি ও রীতির ব্যবহার।

কথাকাব্যের লক্ষণে—(১) পদ্যে কবি-বংশ প্রশংসা ; (২) মূল উপাখ্যানের অবতারণায় উপাখ্যানান্তর যোজনা ; (৩) পরিচ্ছেদ বা লম্ভবিভাগ ; (৪) প্রতি-গর্ভে চতুষ্পদী কবিতার প্রয়োগ।

তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে অগ্নিপুরাণে আখ্যায়িকায় নূতন সংযোজনা হইল—(১) কবিবংশ-প্রশংসার গদ্যরূপ ; (২) অপরাপর প্রতিকূল ঘটনা ; (৩) চূর্ণক ; (৪) বৃত্তি ও রীতির ব্যবহার।

---

(১) "পূর্বকালে ছিল 'কথা'। অমরকোষে কথা প্রবন্ধ-কল্পনা ; প্রবন্ধের কল্পনা ; মানসিক রচনা। তখনকার 'কথায়' নায়ক-নায়িকার নাম সত্য থাকত, হয়ত বৃত্তেরও কিছু সত্য থাকত। এই হেতু কেহ-কেহ 'কথা'র লক্ষণে বলতেন, কথা রচনায় অল্প সত্য, বহু অসত্য থাকে। কথার প্রসিদ্ধ উদাহরণ পদ্যে রামায়ণ, গদ্যে কাদম্বরী। 'কথা' ছোট হ'লে 'কথানক'। ক থা-ন-ক বাংলা অপভ্রংশে কা-হি-নী। 'কথা'য় কিছু সত্য থাকে, 'উপকথা'য় কিছুই থাকে না। 'কথা' বিস্তারিত হ'লে 'পরিকথা'। কথা, উপকথা, পরিকথা গদ্যে লেখা হত। এই লক্ষণ ছেড়ে দিলে রামায়ণকে পরিকথা বলতে পারা যায়। যাঁরা রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় বিষয় সত্য মনে করেন, তাঁরা রামের চরিতকে 'আখ্যায়িকা' বলতেন। দৃষ্ট বিষয় অবশ্য সত্য, দৃষ্টবিষয়-বর্ণন 'আখ্যায়িকা' বা 'আখ্যান'। পৌরাণিকদের বিবেচনায় দ্বৈপায়ন ব্যাস ভারত-'আখ্যান' লিখেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'আখ্যান'-মঞ্জরী লিখেছিলেন, তিনি কয়েকজনের চরিত বর্ণন করেছেন। বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণন 'উপাখ্যান'। নলচরিত বহুশ্রুত কিন্তু দৃষ্ট নয়। এই চরিতের কত সত্য, কত অসত্য, তাহা কেহ জানিত না। মহাভারতে অসংখ্য 'উপাখ্যান' আছে, রামোপাখ্যানও আছে। সে সব উপকথা নয়, কথা নয়, উপাখ্যান। উপাখ্যানের মধ্যে 'কথা' থাকতে পারে। যেমন, "দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকায়" ভোজরাজ কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত সিংহাসন-প্রাপ্তি, এক উপাখ্যান ; এবং এক এক পুত্তলিকা কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য-বর্ণন, এক এক 'কথা'।" —গ

কথায় নূতন সংযোজনা হইল—(১) উপাখ্যানান্তর যোজনা (২) পরিচ্ছেদ বা লম্ভ-বিভাগ (৩) প্রতিগর্ভে চতুষ্পদী ব্যবহার। এগুলি ছাড়া বাকিগুলি সবই প্রাচীন। কর্তৃবংশের প্রশংসার কথা ভামহের লক্ষণে নাই। অগ্নিপুরাণ ইহা হর্ষচরিতের ব্যবহার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আখ্যায়িকায় কর্তৃবংশ প্রশংসার গদ্যরূপ ও কথায় পদ্যরূপের নজির হইল—হর্ষচরিত ও কাদম্বরী। আখ্যায়িকার বিষয়বস্তুতে অপরাপর বিপত্তির যোজনা পুরাণকারের লৌকিক ঋষিত্বের পরিচয়।[২] চূর্ণক, বৃত্তি ও রীতির ব্যবহার কেবল ভাষাগত। ইহাও বাণের সাহিত্যের নজিরে। অবশ্য ভামহও "শ্রব্য শব্দার্থ-পদবৃত্তি"র কথা বলিয়াছেন। কথাংশে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হইল—মূলকথার সহিত কথান্তর-যোজনা। ইহাও একেবারে নূতন নয়, 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'র গল্পবলার পদ্ধতি হইতে গৃহীত। কাছের নজির হইলেন স্বয়ং বাণ। যাহা হউক, দণ্ডীর সমালোচনার পর দেখা যাইতেছে যে, বক্তৃত্বের প্রশ্নই যে চাপা পড়িয়াছে, তাহা নহে, কবিভাবকৃতচিহ্ন-ও অগ্নিপুরাণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আরও মজার ব্যাপার হইল, আলঙ্কারিক বামন ভামহ-দণ্ডী বিতণ্ডা যে এড়াইয়া গেলেন, ইহার কারণ হইল—এ সম্পর্কে তাঁহার বলিবার মত নূতন কথা কিছু ছিল না। বামনের অভাব অগ্নিপুরাণ পূর্ণ করিলেন। বামনের পশ্চাদপসরণে কথা-আখ্যায়িকার সংজ্ঞা লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পক্ষে আর আলঙ্কারিকদের মুখ চাহিয়া থাকা সম্ভব হইল না। তাঁহারা একে একে বাণের শরণাপন্ন হইলেন এবং এই শরণ্য-প্রবৃত্তি আরম্ভ হইল অগ্নিপুরাণের যুগ হইতে। ইহার পর আসিলেন আলঙ্কারিক রুদ্রট। রুদ্রটের আখ্যায়িকা লক্ষণের সার কথা হইল—

(১) পদ্যে দেবতা ও গুরুর উদ্দেশে নমস্কার, প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন কবিগণের প্রশংসা, নৃপতি-বিশেষের প্রতি ভক্তি বা অন্য কোন কারণে আখ্যায়িকা রচনার অনুপ্রেরণার কথা। (২) গদ্যে কবিবংশের বর্ণনা; (৩) কথাকাব্যের পদ্ধতিতে কাহিনী রচনা; (৪) উচ্ছ্বাসভাগ; (৫) প্রথম পরিচ্ছেদ ভিন্ন প্রতি পরিচ্ছেদের আদিতে আর্যাছন্দের যুগ্মক ব্যবহার; (৬) গদ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত কবিতায় বক্ত্র, অপরবক্ত্র বা যে-কোন ছন্দের প্রবেশাধিকার।

কথা লক্ষণের বক্তব্যে—(১) পদ্যে দেবতার ও গুরুর উদ্দেশে নমস্কার, কবিবংশ বর্ণনা, কাব্য রচনার প্রেরণা (২) সংস্কৃতে হইলে কথারূপ হইবে গদ্যমূল, ভাষান্তরে

(২) লৌকিকানাং হি সাধূনামর্থং বাগনুবর্ততে।
ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি। উ, চ।

পদ্যে ; ভাষায় অনুপ্রাস-ব্যবহার এবং উৎপাদ্যকাব্য সুলভ পুর-বর্ণনা প্রভৃতির রূপায়ণ ; (৩) কাহিনীর অবতারণায় কথান্তরের বিনিয়োগ ; (৪) কন্যা লাভ।

রুদ্রটের সংজ্ঞায় কথা-আখ্যায়িকার ভেদ-নিরূপক কিছুই পাওয়া গেল না। বরং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' ও বাণের 'কাদম্বরী' যেন কথা-সাহিত্যের কল্পনায় তাহাকে একটু উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন মতের কন্যাহরণ যে কেবল কন্যা-লাভে পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে, কন্যা-লাভের সূত্র ধরিয়া শৃঙ্গার-রস তাহার বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বাহিনী লইয়া নবীন উদ্যমে ও নূতন উৎসাহে রোমান্টিক উপন্যাসের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। কন্যা লাভ করিয়া কথা-কাহিনী প্রেমের নিখিল পরিমণ্ডলের মধ্যে পড়িয়া এক অপূর্ব প্রেম উপন্যাসে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কথা ও আখ্যায়িকার ভিন্ন জাতীয় আদর্শের কথা বলিতে না পারিলেও অগ্রজ দণ্ডীর একজাতীয়ত্বের সূত্র ধরিয়া উভয়ের আদর্শ সে রস, একথা ঘোষণা করিবার সুযোগ তাঁহার ছিল কিন্তু অবহেলিত গদ্য-কাব্যের সম্পর্কে এত বড় আদর্শের কথা ঘোষণা করিবার মত সৎসাহস ও বুকের পাটা তাঁহার ছিল না। তাই উত্তর-সূরিদের উপর সে ঘোষণার ভার দিয়া তিনি কথাকে কেবল—"বিন্যস্তসকলশৃঙ্গারা" বলিয়া বিদায় লইয়াছেন।

কথা-আখ্যায়িকার মৌলিক বিবাদ হইল বক্তৃত্বকেন্দ্রিক। আমরা দেখিলাম, দণ্ডীর সমালোচনার পর সে-বিবাদ চিরতরে চাপা পড়িয়া গেল। অগ্নিপুরাণের মত রুদ্রট-ও সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া, আখ্যায়িকা-কাব্যে আত্ম-জীবনী-মূলক রচনার যে 'দোহদ'টি ভামহের আখ্যায়িকা-সংজ্ঞার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, রুদ্রট সে-পথে অগ্রসর হইয়া তাহার কোন উন্মেষ সাধনও করিলেন না। না করিবার ফলে কথা-আখ্যায়িকার মধ্যে কেবল কথারসই আভাসিত হইয়া উঠিল। অগ্নিপুরাণের তুলনায় রুদ্রটের সংজ্ঞার নূতনত্ব হইল বাণের 'হর্ষ-চরিত' ও 'কাদম্বরী'র আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণজাত পদার্থের সূত্রাকারে উপন্যাস। বাণের উক্ত গ্রন্থ-দুইখানির বৈশিষ্ট্যগুলির সাধারণীকৃত বা সামান্য ধর্মের উপর রুদ্রটের কথা-আখ্যায়িকার সংজ্ঞা-রচনা। নমি সাধু-ও তাঁহার টীকায় এইরূপ অভিমত দিয়া গিয়াছেন। রুদ্রটের এই সংজ্ঞা পরবর্তী কালে যে কথা-সাহিত্যের নির্দেশক হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা শ্বেতাম্বর জৈন ধনপালের 'তিলক-মঞ্জরী', 'তরঙ্গবতী', 'ত্রৈলোক্য-সুন্দরী', 'উদয়-সুন্দরী-কথা' প্রভৃতির পরিচয়ে জানিতে পারি।

আনন্দবর্ধন সংঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে কথা-আখ্যায়িকা সম্পর্কে

সাময়িকভাবে দুই-একটি মন্তব্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে কথা-আখ্যায়িকার রীতিগত কোন পার্থক্য নাই। কথা প্রসঙ্গে গাঢ়বন্ধের প্রাচুর্যের কথা বলিলেও তিনি রস-ঔচিত্যের উপরই জোর দিয়াছেন বেশি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রুদ্রট তাঁহার কন্যালাভজাত রস-প্রসঙ্গের বক্তব্যে আনন্দ-বর্ধনের সমর্থন পাইলেন। শুধু সমর্থন নয়, রুদ্রট যাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না, আনন্দবর্ধন তাহারই প্রামাণ্য ঘোষণা করিলেন। অভিনব গুপ্তকে কিন্তু এই কথা-আখ্যায়িকার আলোচনায় প্রাচীন-পন্থী বলিয়া মনে হয়। রসের সম্পর্কে তিনি যেমন মন্তব্যও করেন নাই, তেমনি আপত্তিও তোলেন নাই। হয়ত তাঁহার এইরূপ অভিমত ছিল যে রস-ঔচিত্যের কথা যখন আনন্দবর্ধন বলিয়াই দিয়াছেন, তখন তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ কি? হেমচন্দ্রের মধ্যে দণ্ডী, রুদ্রট ও অভিনব গুপ্ত—এই তিন মতেরই কিছু কিছু সংযোজন দেখা যায়। তিনি যত কথাই বলুন না কেন, বক্তৃত্ব ও ভাষার ব্যাপারে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরীর'। বিশ্বনাথ কথাকাব্যের উল্লেখ করেন নাই, করিয়াছেন গদ্য ও পদ্য কাব্যের। তাঁহার গদ্য কাব্যের দৃষ্টান্ত হইল—'কাদম্বরী'। সর্বকনিষ্ঠ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ রুদ্রটের কথার সংক্ষিপ্তরূপকে ভাষান্তরে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি রুদ্রটের মনোভাব বুঝিয়া এবং আনন্দ-বর্ধনের জোর পাইয়া 'সরসং বস্তু'র উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কথা-আখ্যায়িকা উভয়েরই বিষয়বস্তু হইল—রস-শৃঙ্গার রস। তিনি কথার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 'কাদম্বরী' ও আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—'হর্ষ-চরিত'। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক মতের আপোষ করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার 'ক্বচিৎ ক্বচিৎ' শব্দন্যাস এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

কথা-আখ্যায়িকা সম্পর্কে অমরকোষের প্রামাণ্যও আলোচনীয়। অমর সিংহ বলিয়াছেন—'আখ্যায়িকা উপলব্ধার্থা' এবং 'প্রবন্ধ-কল্পনা'—কথা। শব্দকল্পদ্রুম বলেন, 'আখ্যায়িকা হইল উপলব্ধার্থকথা। ইতিহাস বা উপন্যাস নামে ইহা খ্যাত। কথা হইল প্রবন্ধ-কল্পনা।' ভারতের মতে কথা হইল কাল্পনিক রচনা। ইহাতে বহু অসত্য এবং অল্পসত্য থাকে। কোষকার ও ভরতের মতে আমরা যেন প্রাচীন ও নূতনমতের সমন্বয়ের একটি স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। ইহাতে একদিকে যেমন ভামহের মনের গোপন কথাটি আছে, তেমনি আছে পরবর্তীকালের আলঙ্কারিকগণের শৃঙ্গার-সর্বস্বতার পরিবর্তে কল্পনা-বিলাসের সুযোগ। এ আপোষ মন্দ নয়; ইহা স্বীকার করিয়া লইবার মত।

ভামহ হইতে বিশ্বনাথ পর্যন্ত আলঙ্কারিকগণের আলোচনার পর মনে হইতেছে যে ভামহের সময়ে আমরা কথা-আখ্যায়িকার আদর্শ লইয়া যতটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম, ততটা না হইলেও পারিতাম। আলোচনার উপসংহারে আসিয়া মনে হইতেছে কথা-আখ্যায়িকার বিরোধের উপশম ঘটিয়াছে এবং উহাদের শ্রেণী-বৈষম্যের অপসারণে শৃঙ্গার রসের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহা হউক, আলঙ্কারিক আলোচনার পট-পরিবর্তনে দেখিলাম—হর্ষচরিত-কাদম্বরীর জয়-জয়কার, বাণের মস্তকে দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি, বাণের ললাটে কালজয়ী কবি-আলঙ্কারিকগণের চন্দন-চর্চার প্রতিযোগিতা। ধন্য বাণ! ধন্য কবি বাণভট্ট! আগে কবি-প্রজাপতির কাব্যসৃষ্টি, পরে ব্যাকরণ-অলঙ্কার-ছন্দো-বিচিতি; আগে সৃষ্টি, পরে সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভেদ, আগে প্রেম, পরে প্রেমতত্ত্ব। ইহাই জগতের রীতি। এই রীতিই কথা-আখ্যায়িকার ভীড় ঠেলিয়া মহাকালের দরবার হইতে কালাধীশের দক্ষিণহস্ত হইতে পারিজাতের মালা লইয়া গিয়াছে—বিজয়ীর পুরস্কার পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

দণ্ডী হর্ষ-চরিত-কাদম্বরীর নাম গোপন করিয়া গিয়াছেন। রুদ্রট তাহাদের নাম তো করিয়াছেনই অধিকন্তু তাহাদের গুহায়িত তত্ত্বের উপরিকার নানাবর্ণের নির্মোক-অবগুণ্ঠনখানিকে খুলিয়া ফেলিয়া শরীর ও আত্মার রহস্যময় সংযোজনটিকে—প্রয়োগবিজ্ঞানকে—গুহায়িত তত্ত্বটিকে সাধারণীকৃত করিয়া সামান্যধর্মে উন্নীত করিয়া তাহাকে ভাবীযুগের কথা-আখ্যায়িকার পতাকারূপে ভারতের কবি-সাহিত্যিকের মর্মমূলে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দিব্যচক্ষুতে বসন্ত-বাতাসে হিল্লোলিত সেই চীনাংশুক-কেতুর বর্ণালীর শোভা দেখিয়া ধন্য হইতেছি। তবু বলিব, কাদম্বরীর কথারূপের শেষকথা বলা হয় নাই। হয়তো আমরাও বলিতে পারিব না। জীবনকে অনুভব করা যায়, বর্ণনা করা যায় না। কাদম্বরী ভারতীয় প্রেমিক-যুগলের হাসিকান্নাভরা আশানৈরাশ্যদীর্ণ বিরহ মিলনখচিত জীবন্ত জীবন—জীবনের মেঘদূত—জীবনের পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ।

আমাদের পক্ষে অতীতযুগের কথাকাব্যের সংজ্ঞানিরূপণের প্রশ্নই উঠে না। সংজ্ঞা দিতে হইলে আধুনিক রমন্যাসের[১] সংজ্ঞাই দিতে হয়। তাহাও অপ্রাসঙ্গিক। তাহাতে দোষ হইবে অব্যাপ্তি। কাদম্বরী রুদ্রটের কথাসংজ্ঞার ভিত্তিভূমি বলিয়া

(১) (ক) "বীর বা অদ্ভুত রস থাকলে ইংরেজী romance, রোমান্স" —গ।

(খ) "সকল দেশেই নরনারীর চিত্তে কতকগুলি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সার্বজনীন মানুষী প্রবৃত্তির খেলার উপরে রোমান্স গড়িয়া উঠে।" —ব (বি)

কাদম্বরীর যে বিবেচ্য বিষয়গুলি রুদ্রটের চক্ষুকেও ফাঁকি দিয়াছে, আমরা সেই বিষয়গুলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের বিবেচ্য-বিষয়গুলির দুইভাগ—(১) বহিরঙ্গ ও (২) অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ভাগে পড়ে—(১) কথাকাব্যের স্বরূপ (২) বক্তৃত্ব (৩) কথান্তরের পদ্ধতি (৪) গদ্যের স্বরূপ (৫) সংঘটনা (অলঙ্কার, রীতি ও গুণ) (৬) পুরাবৃত্তের অবতারণা (৭) শিল্পকর্ম। অন্তরঙ্গভাগে পড়ে—(১) অভিশাপ (২) পুনর্জন্ম (৩) ইন্দ্রজাল (৪) স্বপ্ন (৫) ভাবনা বা কল্পনা (৬) শৃঙ্গার-রস। এগুলিকে মাহেশ্বর সূত্রের ন্যায় এখানে উল্লেখ করিলাম মাত্র। কাদম্বরী প্রসঙ্গে ইহাদের আলোচনা করিব।

গল্পের প্রকৃতি-বিচার

সংস্কৃত সাহিত্যের গল্পের প্রকৃতি-বিচার বর্তমান প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। আমরা কেবল গল্প-প্রকৃতির রেখাপাত করিয়া যাইব। কাদম্বরী উপন্যাসের আঙ্গিক হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করায় আমরা 'কাদম্বরী'র পূর্বকালীন সাহিত্যের সীমান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিব। কাব্য ও নাটকের গল্প সম্পর্কে আমাদের আলোচনা হইবে প্রাসঙ্গিক। আমাদের লক্ষ্য গদ্য-সাহিত্য।

গল্পের উৎপত্তি কবে কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন; তবে এইটুকু মাত্র বলা যায়, মনুষ্য মনে মননশীলতা ও কল্পনাশক্তির যে দিন রাখীবন্ধন হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই গল্পের সূত্রপাত। প্রথমে গল্প চলিত মুখে মুখে। তাহার পর লিপি আবিষ্কৃত হইবার অনেকদিন পরে গল্প সাহিত্যিক রূপ লাভ করে। গল্পের প্রথম উন্মেষ পদ্যে। গদ্য আবিষ্কৃত হইবার পর গল্প স্বারাজ্য পায় এবং গদ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ আঙ্গিক লাভ করে।

কেবল ভারতের নয়, বিশ্বের আদিম সাহিত্য বেদ। এই বেদের মধ্যে গল্পের নীহারিকা দেখা যায়। প্রাকৃতিক শক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে ও তিরোভাবে আর্য ঋষিগণের মননশীলতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতিজাত আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় হইতে প্রাচীন মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহা হইতে জাগে মননশীলতা। এই মননশীলতা লাভ করিবার পর মানুষের মনে নূতন চেতনার রঙ লাগে। এই নূতন রঙের ঢেউয়ে জাগে কল্পনার নীলাঞ্জন। এই মননশীলতা ও কল্পনার বলে প্রাকৃতিক শক্তি দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়। জাগে দেবতার সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা। ফুল ফোটে কিংবদন্তীর। তাই বলিতেছিলাম, ঋষিগণের বিস্ময়-ব্যাকুল বিহ্বল নয়নে যে-সকল দেবতা জাগিতেছিলেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য স্বীয় স্বীয় কাহিনী ঘনাইয়া তুলিতেছিলেন। এইরূপ কাহিনীর কল্পনা যে ভারতবর্ষের ঋষিদের মনে জাগিয়াছিল, তাহা নয়, বহু যুগ ধরিয়া বহুকালের পান্থনিবাসে বিশ্রাম করিয়া মানবজাতির মনে এইরূপ গল্প গড়িয়া উঠিতেছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর চেতনা হইতে এইরূপ কল্পনার কচি কচি ডানা ওঠে এবং ভারতবর্ষের জলে-হাওয়ায় সেই বহুকাল-প্রসৃত মেদুর কল্পনা ভাষা পায় আর্য-ঋষিদের বিস্ময়-ব্যাকুল নীললোচনে। দেবতাদের সম্পর্কে এই গল্প অবসর-বিনোদনের রূপ পাইয়া বিশ্রাম

শেষের সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া যায় নাই। ইহারা আর্য ঋষিগণের আন্তরিক বিশ্বাসের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম, মন্ত্রপ্রধান, বর্ণনা-প্রধান ঋগ্বেদের মধ্যেও কাহিনীর নীহারিকা লক্ষ্য করা যায়। তবুও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সংবাদ-সূক্তে কিছু কিছু গল্পের আভাস আছে। পুরূরবা-উর্বশী, যম-যমী, সরমা-পণি প্রভৃতির সংলাপের মধ্যে লোক জীবনের দক্ষিণা হাওয়ায় কেমন করিয়া যেন গল্পের বাসন্তী বীজ উড়িয়া ধর্মাশ্রয়, শুচিশুদ্ধ, আধ্যাত্মিক সাহিত্যের যজ্ঞ-বেদীতে আসিয়া ঠিকরিয়া পাড়িয়াছিল। বৈদিক ধর্মোৎসবের সহিত ইহাদের যে রকমের যোগই থাকুক না কেন, ইহারা যে দেবারাধনায় বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈয়ারী নয়, তাহা বোঝা যায়। বরং মনে হয়, বৈদিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির পশ্চাৎভূমিতে মানব-মনের সুখ-দুঃখ-মিলন-বিরহের অনুভূতিমাখা প্রেম-জীবনের অযত্নপালিত পুষ্পবনে যে মৌসুমী চাষ চলিতেছিল, ইহারা সেই চাষের উড়িয়া-আসা দুই-একটি ফুল। আর্যেরা গণজীবনের অলস গন্ধমাখা এই ফুলগুলি দিয়া দেবতার পূজা করিয়াছিলেন। সে-পূজায় শুদ্ধচিত্ত ঋষিদেরই কেবল পূজা হয় নাই, যাহারা ঋষিত্বের আড়ালে বিস্মৃতির কালো-যবনিকায় পড়িয়া কেবল ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও মরুৎ বমন করিয়া মৃত্যুর নিকষ-কালো পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে পূজায় তাহাদেরও পূজা হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের মানবীয় সংবেদনার যাহা কিছু মণি-মাণিক্য, তাহা ঐ উপেক্ষিত গণ-জীবনের অন্ধকারের ঝাঁপিতে।

বেদের পর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'। এই ব্রাহ্মণে দুই-চারিটি গল্প আছে। তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুনঃশেফের কাহিনী, মনুর পুত্র নাভানেদিষ্টের কাহিনী। ইহাদের মধ্যে শুনঃশেফের কাহিনী বিশেষ মূল্যবান্। আকারে ছোট হইলে-ও ইহা আমাদের সাহিত্যের[১] প্রথমতম উপন্যাস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রূপক গল্পেরও অভাব নাই। মন ও বাকের বিবাদের কাহিনীটি সেই শ্রেণীর রূপকাশ্রয়ী একটি গল্প।

শতপথ ব্রাহ্মণ আবার গল্পের খনি।[২] শতপথ ব্রাহ্মণে পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনীটি আরও বিস্তৃত ও পরিপাটী। ইহাতে আরও আছে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনী। মহাবন্যার কাহিনীটিও শতপথ ব্রাহ্মণে বিধৃত। ব্রাহ্মণের তিন ভাগ—বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ্। বিধি হইল—নিয়ম; অর্থবাদ হইল ব্যাখ্যা—অর্থের

(১) বা, সা, ই ২য় খণ্ড; ২৭৬

(২) H. S. L. (M), p. 217

ব্যাখ্যা। এই অর্থবাদের আশ্রয়ে অনেক ইতিহাস, আখ্যান ও পুরাণের আবিষ্কার ঘটিয়াছে।

উপনিষদে অনেক গল্প আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী, ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ও সনৎ সুজাতের, মুণ্ডকোপনিষদে যক্ষের, যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর, শ্বেতকেতু-আরুণির, কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার, এইরূপ অনেক গল্প আছে। ইহা ছাড়া 'নিরুক্ত' ও 'বৃহদ্দেবতা'য় ও গল্পের ঝুলি। বেদের গল্পগুলি নানা রকমের। কোথাও বিশ্বের উৎপত্তির গল্প কোথাও সৃষ্টিতত্ত্বের গল্প, কোথাও রূপকাশ্রয়ী গল্প। এই গল্পগুলিকে দুইভাগে ফেলা হয়—(১) আখ্যান ও (২) পুরাণ। আখ্যান হইল—দেবতা ও মনুষ্য বিষয়ক গল্প; এগুলিবাদে আর সব গল্পকেই পুরাণ বলা হয়। উপনিষদের প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কোনো-না-কোনো তত্ত্ব প্রকাশ করা[১]।

পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণই গল্পের খনি। ব্রাহ্মণের গল্পগুলি ভারতীয় গণজীবনের গল্পের কিছু কিছু রক্ষিত রূপ। বৈদিক ঋষিরা যে গল্প বানাইয়াছিলেন, সেই গল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য গণজীবনের কিছু কিছু গল্পের ডাক পড়িয়াছিল ব্রাহ্মণের অর্থবাদের আসরে। তাহাতে লোক-জীবনের গল্পের খণির আর কতটুকুই বা ব্যয় হইয়াছে। যাহা বাকি রহিল, তাহার প্রবাহের দুইটি ধারা; একটি চলিল যুগমহাকাব্য বা রামায়ণ মহাভারতের মুখে, অপরটি বৌদ্ধগাথার অববাহিকা বাহিয়া।

গল্পের দিকে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতের মূল্য বেশী। রামায়ণের কোন ঘটনার বা চরিত্রের উল্লেখ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না; কেবল সূর্যবংশের রাজা ইক্ষ্বাকুর নামটি[২] আছে। মহাভারতের চরিত্রের কিছু কিছু উল্লেখ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। মহাভারতের জনমেজয়, পরীক্ষিৎ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শুধু পরীক্ষিত কেন "ইমে পারীক্ষিতাবঃ" বলিয়া পরীক্ষিৎ-বংশের বহুলোকের একস্থান হইতে অন্যত্র যাইয়া বসবাস করিবারও পরিচয় আছে। তাহার পর লোক-জীবনের আদিমস্তরের দুইটি উল্লেখযোগ্য উপাদান বীরধর্ম ও প্রেম। বীর-ধর্মের পশ্চাতে আছে আর্যজাতির যুদ্ধ-অভিযান ও জিগীষা; নূতন নূতন রাজ্য-বিস্তারের দুর্নিবার মোহ; আর প্রেম! নর-নারীর পারস্পরিক মিলনের আকাঙ্ক্ষা হইতে প্রেমের অভিব্যক্তি। অতএব বীরধর্ম ও প্রেম—এই দুইটি উপাদান লইয়া

(১) গ, উ,

(২) H. S. L. (K) p.93

লোকজীবনের গল্পের সূত্রপাত। রামায়ণ ও মহাভারতে তাই মুখ্যতঃ প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী। কাহিনীর পরিণামে বৈরাগ্য।[১] লোক-জীবনের প্রেম ও বীরত্ব-মাখা গল্পের উপর যখন বৈদিক নৈতিক জীবনের দেবতা, মন্ত্র, যজ্ঞ ও ইন্দ্রজালের আলো আসিয়া ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল, তখন বীরত্ব ও প্রেমের সহিত নানা অনুভূতির গল্প প্রজাপতির রঙীন বিচিত্র পাখা মেলিতে লাগিল; গল্পের প্লাবন দেখা দিল। এই প্লাবনের সামান্য ঢেউয়ের ফেনা লাগিয়াছে রামায়ণের গায়; কিন্তু মহাভারতের মাথায় সেই কালো প্লাবনের শ্বেত ফেনরাশির রাজমুকুট। সংস্কৃত এপিক কবিতার দুই ভাগ—ইতিহাস, বর্ণনা ও পুরাণ লইয়া একভাগ। এগুলির গায়ে প্রাচীনত্বের শীলমোহর, অপর ভাগ কাব্য। মহাভারত প্রথম ভাগের, রামায়ণ দ্বিতীয় ভাগের।[২] মহাভারত দেবতা, রাজা ও ঋষিদের সম্পর্কে অনেক গল্প বলিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্বে সরস্বতী নদীতীরস্থ কাম্যক-বনে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকে কেন্দ্র করিয়া মহাভারতকার অনেক গল্প বলিবার সুযোগ পাইয়াছেন। যেমন পাণ্ডবগণের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অজ্ঞাত বাসের কাহিনী, তেমনি সেই দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার মত আরও অনেক পুরানো কাহিনী। শান্তি ও বিরাটপর্ব খুব কম যায় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত বেদ হইতে রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত গল্পের ধারাটির অনুসরণ করিতেছিলাম মাত্র, এখন ইহাদের প্রকৃতি-পরিচয় সারিয়া লইয়া মহাকাব্যের অর্থাৎ epic of art এর গল্পের ধারায় অবতরণ করিব।

বেদের গল্পগুলি কোথায়ও বীরত্বের কথা, কোথায়ও প্রেমের কথা, কোথায়ও

---

(১) "ছয়টি কাণ্ডে সে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে একটি মাত্র উত্তরকাণ্ডে তাহাকে অসংকোচে চূর্ণ করিয়া ফেলা কি সহজ ব্যাপার। আমরা লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত এই দেখিয়া আসিলাম যে, অধর্মাচারী নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণই সীতার পরমশত্রু। অসাধারণ শৌর্যে ও বিপুল আয়োজনে সেই ভয়ংকর রাবণের হাত হইতে সীতা যখন পরিত্রাণ পাইলেন তখন আমাদের সমস্ত চিন্তাদূর হইল, আমরা আনন্দের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এমন সময় মুহূর্তের মধ্যে কবি দেখাইয়া দিলেন সীতার চরম শত্রু অধার্মিক বাবণ নহে, সে শত্রু ধর্মনিষ্ঠ রাম; নির্বাসনে তাঁহার তেমন সংকট ঘটে নাই যেমন তাঁহার রাজাধিরাজ স্বামীর গৃহে। যে সোনার তরণী দীর্ঘকাল যুঝিয়া ঝড়ের হাত হইতে উদ্ধার পাইল ঘাটের পাষাণে ঠেকিবা মাত্র এক মুহূর্তে তাহা দুইখানা হইয়া গেল। গল্পের উপর যাহার কিছুমাত্র মমতা আছে সে কি এমন আকস্মিক উপদ্রব সহ্য করিতে পারে? যে বৈরাগ্য প্রভাবে আমরা গল্পের নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধা সহ্য করিয়াছি, সেই বৈরাগ্যই গল্পটির অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে আমাদের ধৈর্যরক্ষা করিয়া থাকে। মহাভারতেও তাই।"—প্রা, সা,

(২) H. S. L. (k) p. 281.

নীতিকথা, কোথায়ও রূপক, কোথায়ও বা ব্যঙ্গ-রচনা। এগুলি গল্পের জন্য গল্প নয়; বীরত্ব, নীতি, প্রেম বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য এই গল্পগুলি। অবশ্য সমগ্র পৃথিবীর আদিম গল্পগুলি নীতিমূলক বা শিক্ষাত্মক। বৈদিক সাহিত্যের গল্পগুলির মধ্যে যেমন একদিকে বীরত্বের অনুপ্রেরণা, তেমনি অন্যদিকে নীতির প্রভাব। নীতির প্রভাবের অনেক কারণ ছিল। একদিকে বরুণ ও ঋতবাদের প্রভাব, অন্যদিকে জন্মান্তর-গ্রথিত কর্মবাদের মধ্য দিয়া নৈতিক জীবন-আচরণের প্রতি আকুতি। তাহার পর উপনিষদের যুগে মনন-শীলতার উৎকর্ষ-সাধনে তত্ত্বভূয়িষ্ঠ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রভাবে মানুষের মনে যে গল্পের আকাঙ্ক্ষা জাগিল, তাহা অবসর-বিনোদনের জন্য নয়, আত্ম-জিজ্ঞাসার উৎকণ্ঠায়। মাতাল যেমন মদের নেশায় গ্লাসের পর গ্লাস ঢালিতে থাকিয়া বলিয়া ওঠে, আরও ঢালো, আরও ঢালো, তেমনি সেদিন ব্রহ্ম-মাতাল তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গল্প-বলিয়েদের বলিয়াছিলেন, গল্প বল—আত্মা কে? ব্রহ্ম কে? এই যে রূপে-রসে-ভরা জগৎ দেখিতেছি, এ জগৎ কে সৃষ্টি করিল? কোথায় সে? কেমন সে? কিভাবে পাওয়া যায় তাঁকে?

তাই যে গল্প আমরা চাই, সে গল্পের চাহিদা তখন ছিলনা। যাহা ছিল, তাহারই ছটায় উষাসূক্তে গল্পের নবাঙ্কুর, সংবাদসূক্তের গল্প, নীলাকাশকে কেন্দ্র করিয়া গন্ধর্ব-কিন্নরের অস্ফুট গল্পের কাকলি। বৈদিক সাহিত্যে গল্পের যেটুকু আভাস আছে, তাহা ধর্মাদর্শের আভাস, নৈতিক জীবনের আভাস। তখন যে ভারতবর্ষে খাঁটি সন্তান গড়িবার ধূম পড়িয়াছে। বর্ণাশ্রমের লৌহ পরিকল্পনায় ধর্মিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মনুষ্য উৎপাদনের কোলাহল উঠিয়াছে। সেই জন্যইতো জাতিভেদের কড়াকড়ি। এ প্রভাব ব্যর্থ হয় নাই। তাই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেখা যায় চরিত্র সৃষ্টির জন্য গল্প। সেই গল্পের চাষে রামের মত সত্যাদর্শী, লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃ-বৎসল, ভরতের মত ভ্রাতৃপ্রেমিক, সীতার মত[১] সর্বংসহা ও প্রেমিকার যেমন সন্ধান পাইলাম, তেমনি পাইলাম ধর্মাচরণায় যুধিষ্ঠিরকে, বীরত্বে অর্জুনকে, সত্য-প্রতিজ্ঞ ভীষ্মকে, পুরুষকারের সাধক কর্ণকে, ভক্তিপাবন বিদুরকে এবং পুরুষের বুদ্ধি দোষে লাঞ্ছিতা সতী দ্রৌপদীকে। পাইলাম আদর্শ রমণী সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে।

(১) "On the other hand, the stronger-minded Draupadi is not the typical woman of the higher orders of this age, nor is Sāvitrī who is merely the embodiment of the ideal, but the help-less Sitā who suffered for no fault of her own."

S. E. L.

দ্রৌপদী[১] লাঞ্ছিতা নারীর প্রতীক, সাবিত্রী ও দময়ন্তী—আদর্শ নারীত্বের মানসী সৃষ্টি।

বৈদিকযুগের আশ্রমের নৈষ্ঠিক দীক্ষার দিন হইতে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্যন্ত কেবল মানুষ গড়িবার যুগ। এই যুগের গল্প তাই মানুষ গড়িবার গল্প। তাহা হইলে রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত যেমন লোক-জীবনের নানা অনুভূতির নানা রঙ্, তেমনি বৈদিক সাহিত্যের মানুষ গড়িবার নীতি—, এই দু'য়ের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটিয়াছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পে।

রামায়ণ-মহাভারত একদিকে যেমন কাব্য, অন্যদিকে তেমনি ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ। ইহাদের গল্পগুলিকে লোকে গল্প হিসাবে পড়িত না, পড়িত ঐতিহাসিক সত্যরূপে। তাই, ভারতীয় জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের সার্বভৌম প্রভাব। পরবর্তী কালের সাহিত্যে দেখা যায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তন। অনুবর্তন হইলেও ঠিক যথাযথ অনুবর্তন নয়। এই সকল কাহিনীর সহিত কল্পনা মিশাইয়া যুগ-চাহিদার অনুপাতে ও আঙ্গিকের প্রয়োজনে পরবর্তী কবিগণ পুরাতন কাহিনীরই নূতন রূপ মেলিয়া ধরিয়াছেন।

অশ্বঘোষের কাব্যে গল্প জমিল বুদ্ধকে লইয়া। তখন তো ভারতবর্ষের ভোগের দিন। ঐহিক জীবনের বর্ণিতাও গন্ধমাল্যের প্রতি মানুষের জমাট নেশা। স্বর্গও তাহারা চায় কেবল উন্নততর ভোগের জন্য। সেখানকার অপ্সরারা মানুষী সুন্দরী অপেক্ষা সুভোগ্যা। বকুলের মালা ছাড়িয়া পারিজাতের মালায় তাহাদের লোভ। পারিজাত আর পারিজাত থাকিতে পারে নাই, বকুলের গন্ধ তাহার মুখে লাগিয়াছে। দেবযানী কচের প্রেমে পড়িয়াছে; স্বর্গের আলোয় পড়িয়াছে মর্ত্যের ছায়া। এই লোভকে ঠ্যাঙাইয়া মানুষের চেতনাকে অধ্যাত্মমুখী করিবার জন্য অশ্বঘোষকে একটি প্রকাণ্ড চরিত্র খাড়া করিতে হইয়াছিল। সে-চরিত্র ব্যক্তিত্বপূর্ণ বুদ্ধের চরিত্র। কিন্তু জনরুচিকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া সুন্দরকে স্বর্গের অপ্সরা দেখাইয়া আনিতে হইয়াছিল। অতএব অশ্বঘোষের গল্পে ধর্মাদর্শের

---

(১) "......হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্ত কণ্ঠরব
প্রাসাদ পাষাণ ভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্র পিশাচেরা—ধর্ম জানে,
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব।" —রবীন্দ্রনাথ, গান্ধারীর আবেদন।

গায়ে গণ-জীবনের বাসনার রক্তিম আভা পড়িয়াছে। এখন হইতে গল্প কেবল নীতিবাদ বা ধর্মাদর্শের স্বপ্নমেদুর কল্পনা নয়, লোক-জীবনের তৃষিত চিত্তের রঙ্‌খেলারও হোলী উৎসব।

ভাসের গল্পে লোক-জীবনের তৃষ্ণার্ত কামনার সহিত যেমন রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব, তেমনি প্রভাব লৌকিক কিংবদন্তীর। তাই তাঁহার গল্পের বিষয়বস্তু ভাগ করিলে দেখা যায় ;—রামায়ণ অবলম্বনে—প্রতিমা ও অভিষেক নাটক, মহাভারত অবলম্বনে—মধ্যম-ব্যায়োগ, দূত-বাক্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ, পঞ্চরাত্র ; হরিবংশ অবলম্বনে—বালচরিত ; কল্পনা ও লোক-কথার অবলম্বনে—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, অবিমারক ও চারুদত্ত। এই সকল গল্পের হৃদ্‌স্পন্দনে পৌরাণিক ও লোকজীবনের বাসনার শৈল্পিক সূক্ষ্ম কম্পিত রেখা। কেবল নীতিবাদ নয়, কেবল ধর্মাদর্শ নয়, লোক-জীবনের রঙীন চাওয়ায় পুষ্পের বুকে রেণু-মাখা প্রজাপতির মত কাব্যশিল্পের বুকে ঐ গল্পগুলি।

কালিদাসের নূতন চেতনায় গল্পগুলি আরও রঙীন, আরও জীবন্ত ; যেন জীবনের ব্রজবুলি। নীতি, সত্য ও সৌন্দর্য জীবন-চেতনায় ভরিয়া দিল এক অপরূপ মেদুর আকুতি। জীবন বাঁচিয়া উঠিল নূতন ছন্দের নূপুরে। সুরলোক, ছায়ালোক, স্বপ্নলোক আসিয়া গল্প-সুন্দরীর পায়ে পরাইয়া দিল নূতন জীবন ব্যঞ্জনার সোনার মঞ্জীর। রুমু ঝুমু রবে জীবন-সঙ্গীত বাজিল। তাহাতে তাল দিতে থাকিল চেতন প্রকৃতি। মানুষের কামনায় স্বর্গ-মর্ত্য একাকার হইয়া উঠিল। মাধুর্য-সুষমায় ভরা জীবনের রস শিল্পের পেয়ালায় পান করিতে লাগিলেন বিক্রমাদিত্যের কালের রসিকেরা।

কুমার-সম্ভবের গল্পে দেব-দেবীর প্রেমলীলা। এ প্রেম স্বর্গীয়, মর্ত্যে সম্ভব নয়। মেঘদূতে যক্ষের প্রেম। যক্ষ দেবতাও নয়, মানুষও নয়, মাঝামাঝি স্তরের। রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত সেই প্রেমের আঁকাবাঁকা পথ। এ প্রেমলিপির 'রাণার' মেঘ। অলকা রামগিরির দিকে চাহিয়া আছে ; বিরহিণী যক্ষকান্তার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে রামগিরি-আশ্রমের পল্লবগুলি ; চোখের ঝরা জলে মর্তের বুকে জাগে স্থলকমল। 'বিক্রমোর্বশীয়'তে অপ্সরার প্রেম মানুষের প্রেমের শিকারে নামিয়াছে। মেঘের বুকে চলে 'খেল-গমনে'র লীলা। কুমার-সম্ভবের স্বর্গীয় প্রেম মেঘদূতের গবাক্ষ দিয়া মর্ত্যের দিকে চাহিয়াছিল মাত্র, মর্ত্যে নামে নাই। উর্বশীর প্রেম মর্ত্যে নামিয়াছে। কিন্তু মর্ত্যের মাটিতে চিরদিন টিকিবে কিনা বলা যায় না। শকুন্তলায় মর্ত্য স্বর্গে পরিণত হইল। মালবিকায় খাঁটি মর্ত্যপ্রেম। মালবিকায়

কবির গল্প মর্ত্যধর্মী। ইতিহাসের পটভূমিতে এ প্রেমের পত্তন। কিন্তু কালিদাসের গল্পপ্রতিভার পতাকা ওড়ে শকুন্তলায়। শকুন্তলায় দেবতা নাই, আছেন দেবকল্প ঋষি, আছেন মহাতপা মুনি। গল্পের নায়িকা অপ্সরী নন, অপ্সরা-কন্যা। কর্তব্য-চ্যুতির অনুতাপের উপর অভিশাপের রোমান্টিকতা। আশেপাশে ঘোরে অপ্সরারা; মাঝে মাঝে নাটকীয় কাজের মোট বহিয়া দেয়। আছে ইন্দ্রজাল; আছে বৈদিক ও পৌরাণিক মানসের স্বপ্নালু চেতনা; দেখা যায়, ধরা যায় না। বৈদিক হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পাঠক-মানসে যে সৌন্দর্য গুমরাইতেছিল, তুলির একটানে মহাকবি শকুন্তলায় তাহার ছবি আঁকিয়াছেন। নীতি, স্বপ্ন, জীবন ও সৌন্দর্যের এক মেদুর ঘনিমা। কালিদাসের শকুন্তলা ভারতীয় গল্পমানসের প্রতিনিধি। রামায়ণ-মহাভারতকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও ভাসকে কিংবদন্তীর গল্প কুড়াইতে হইয়াছে বৃহৎ-কথার দ্বারস্থ হইয়া। মেঘদূতের[১] একটি শ্লোকে কালিদাস 'বৃহৎ-কথা'র অভিজ্ঞান রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চেতনায় যে কিংবদন্তী, তাহা বৃহৎ-কথার কৃপায় নয়, তাহা সমগ্র বৈদিক কিংবদন্তীর বহতা ধারা। রঘুবংশের গল্পে তিনি দুইটি ধারা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; রামায়ণ ও পুরাণ-প্রথিত রাজগণের কথা লইয়া তিনি যেমন গল্পের মালা গাঁথিয়াছেন, তেমনি সূর্য-বংশের প্রখ্যাত নৃপতিগণের ব্যক্তিত্বের তলায় পড়িয়া যে-সকল রাজা হারাইয়া গিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কিংবদন্তীর শরণ লইয়াছিলেন, কালিদাসের তুলিকায় তাঁহারাও জীবনের মান পাইলেন রঘুবংশে।

কালিদাসের পর শূদ্রকের নাম করিতে হয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' গণজীবনের সংবাদপত্র। মৃচ্ছকটিকে গণজীবনের যে আলো-ঝলমল ধারা, সে ধারা গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র গল্পের ধারা। গুণাঢ্যের গল্পে বৈদিক কিংবদন্তীর উপাদান থাকিলেও তাহা লোকজীবনের নিজস্ব-ধারা। লোকজীবনের ট্রেডমার্ক লইয়া সে-ধারা গল্পের আসরে নামিয়াছে। বৈদিক কিংবদন্তীর সহিত ইহা জাতিতে পৃথক। বৈদিক কিংবদন্তীতে নীতি ও ধর্মাদর্শ বড়; লৌকিক কিংবদন্তীতে অর্থাৎ গুণাঢ্যের গল্পের ঝাঁপিতে প্রেম বড়, নীতি বা ধর্ম গৌণ। বৈদিক ধর্মাদর্শের লৌকিক কাব্যের সংস্করণে রামায়ণ-মহাভারতের প্রামাণ্য। লোকরঞ্জক প্রজাপালক রাজার পৃষ্ঠ-পোষকতায় লৌকিক কাব্যের পুষ্টি। তাই জনকল্যাণেই কাব্যের কল্যাণ। সেই কল্যাণের মানদণ্ড ধর্মগোপ্তা রাজার হাতে। কাজেই দাম্পত্য প্রেম ছাড়া অন্য কোন প্রেম মহাকাব্যে ও নাটকে অচল। লৌকিক কিংবদন্তীর প্রেম লাইসেন্স-

(১) মে, দূ, পূর্বমেঘ—৩১।

পাওয়া। মহাকাব্যে ও নাটকে রাজাদের অভিযানিক ব্যাপার কাল-পরম্পরা। লৌকিক কিংবদন্তীতে অভিযানের সূক্ষ্ম মাত্রা। বাস্তব অভিযানের মত ইহা ঘটনা-বহুল নয়। ইহাকে প্রেমের অভিযান বলাই সঙ্গত। রাজগণের বীর্যবত্তা পরোক্ষ অনুমানের বিষয়। জীবনের স্বচ্ছল, পিচ্ছিল স্বাধীনতায় জীবনভোগের ফেনিলতা।

লৌকিক কিংবদন্তীর সন্ধান মেলে গুণাঢ্যের বৃহৎ-কথায়। সেই কিংবদন্তীর গল্পগুলি রাজ-পরিপুষ্ট মার্জিত ধ্রুপদী সাহিত্যের নীতিবাদের উপরেও কম প্রভাব ফেলে নাই। ভাসের 'চারুদত্ত' ও 'মৃচ্ছকটিক' পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে কী মনে হয়? মনে হয় না কি, ইহাতে ধ্রুপদী সাহিত্যের যান্ত্রিকতা নাই; যাহা আছে তাহা লোকজীবনের উজ্জ্বল, উচ্ছল পরিপূর্ণতা। চারুদত্ত, মৃচ্ছকটিক লৌকিক কিংবদন্তীর বাহন, হঠাৎ ঢুকিয়া পড়ে নাটকে। কিন্তু এধারা রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পায় নাই বলিয়া ইহা চকিতেই আলো ফেলিয়া চকিতেই হারাইয়া গিয়াছে। মৃচ্চকটিকে রাজা ও রাজকন্যার প্রেম নয়, ব্রাহ্মণের সহিত গণিকার প্রেম। সেই প্রেমের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়াছে লম্পট, চোর, ভিক্ষু, ষড়যন্ত্রকারী, পুলিস, বিচার-বিভাগ প্রভৃতি। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় গণিকার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহে কোন বাধা ঘটে নাই। মৃচ্ছকটিকের গল্প গণজীবনের বাস্তব চেতনায় নামিয়াছে।

গদ্য-গল্পের রেখা টানিতে হয় বেদ হইতে। কিন্তু বেদের আসরে নামিব না, নামিব বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তরালে যে লোক-জীবন, সেই জীবনের নীহারিকার মধ্যে। সে-জীবন অনাদরে উপেক্ষায় হারাইয়া গেলেও ভারতের আকাশে-বাতাসে, জ্যোছনার স্বপ্নে, পাখীর গানে লতায়-পল্লবে-পুষ্পে পৃথিবীর তৃণে-মাটিতে এখনও লাগিয়া আছে সেই হারাণো জীবনের দীর্ঘ নিশ্বাস, গ্রাম্য হাসির একটুকরো জ্যোছনা, গ্রাম্যকান্নার একফোটা তপ্ত অশ্রু, গ্রাম্য আশা-আকাঙ্ক্ষার একফালি শাদা মেঘ। মানুষ ভুলিয়া গেলেও পৃথিবী ধরিয়া রাখে মানব-জীবনের ছোট ছোট হাসিকান্না। এইসব টুকরো হাসি, টুকরো কান্নাকে ভাষা দিলেন না কোন মহাকবি। তাই গ্রাম্য কবির মুখের ছড়ায়, কাঁচা কথকতায় তাহারা মুখে মুখে ঘুরিত। যত ঘুরিত, তত রঙ মাখিত; যত রঙ মাখিত, তত চিক চিক করিত। যাহারা দিলনা জীবন-প্রকাশের সোজা পথ, তাহাদের অনাদরে উপেক্ষায় কি জীবন-প্রবাহ রুদ্ধ হইতে পারে? না পাইল তারা ভাগীরথীর ধারা, খালবিলটা অন্ততঃ তাহাদের জন্য জোটে। এমনি খালে-বিলে কাজে-কাজে গানে-গানে যে-জীবন ছড়া কাটিত, কথকতা করিত, গল্প বলিত, সেই-জীবনের বিকশিত পুষ্পের উড়ন্ত রেণুগুলির খানিকটা যিনি সংগ্রহ

করিয়াছিলেন, তিনি গুণাঢ্য। গুণাঢ্য ভারতীয় জীবনের বাস্তবতায় ও স্বপ্নে মথিত লোক-কথার প্রগল্ভ কাহিনীর ঝাপিটি খুলিয়া দিয়াছিলেন 'বৃহৎ-কথার' রচনায়। বৈদিক যুগের স্বপ্ন-বিধুর চৈত্র-রজনী হইতে তাঁহার কালের কল্পনা মেদুর শ্রাবণ-রজনী পর্যন্ত ভারতীয় লোকায়ত নর-নারীর চিত্তবৃত্তিতে বাসনা লোকের যে অনাস্বাদিত স্বাদটি জীবন-সংগ্রামের অবসর-বিনোদনের আত্মস্থ মুহূর্তে উঁকি মারিত, গুণাঢ্য তাঁহার কথার ঝাপিতে তাহারই কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সে-সংগ্রহের ললাটে যেমন ভারতীয় জীবনের নাম হারা মধু-যামিনীর আনন্দতিলক অঙ্কিত ছিল, তেমনি তাহার কণ্ঠে ছিল যুগ-যুগান্তের কাকলি, অধরে ছিল বিশ্ব-বিরহিনীর আতপ্ত শ্বাশ্বত অশ্রু, হৃদয়ে ছিল জীবন-বনভূমির ক্লান্তিহীন মর্মর-গান। তাই এককালে ভারতবর্ষ ব্যাস-বাল্মীকির সহিত গুণাঢ্যেরও নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিত।

দুইটি সূত্রে আমরা গুণাঢ্য ও তাঁহার বৃহৎ-কথার সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় পাই। সূত্র দুইটির একটি হইল কাশ্মীরে, অপরটি নেপালে। কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর' এবং নেপালে বুধস্বামীর "বৃহৎ-কথা শ্লোক-সংগ্রহ"—এই তিন খানি গ্রন্থই 'বৃহৎ-কথা' সম্পর্কে ধারনা করিয়া লইবার মতো একমাত্র আশ্রয়স্থল। দুইটি দেশের প্রাপ্ত রূপের তুলন-মূলক আলোচনা হইতে বোঝা যায়, যে কোন গ্রন্থই মূল বৃহৎ-কথার আক্ষরিক অনুবাদ বা সার-বস্তুর বিশ্বাস্ত পুনর্বিন্যাস নয়। এইটুকু মাত্র বলা চলিতে পারে যে, মূলে গল্প ও কথারস পরিবেশনের যে নীতিটি ছিল, তাহারই নিরিখে হয়তো পরবর্তী কালে গল্পগুলির সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্দ্ধিত হারের গল্পগুলির চাপে মূল সূত্রটি আচ্ছন্ন হইলেও যাহাদের জন্য গল্পলেখা, তাহাদের চাহিদাটা নিশ্চয়ই চাপা পড়ে নাই। ঐ চাহিদার মধ্যে লোক-জীবনের প্রতিবিম্ব আঁকা হইয়া আছে। মূল কাহিনীর নায়ক নর-বাহনদত্ত কোন্ শ্রেণীর মানুষ? তাঁহার অভিযানের স্বরূপটাই বা কী? নরবাহনদত্ত রাজপুত্র হইলেও গল্পটি রাজসভা বা রাজকীয় অভিযানের নয়। এমন কি বীরত্বের আদর্শেও ইহা রচিত নয়। বীরত্বের আদর্শে রচিত হইলে এ কাহিনী লোককথার কাহিনী না হইয়া মহাকাব্যের কাহিনী হইতে পারিত। ইহা মধ্যম শ্রেণীর সমাজ জীবনের একখানি মুখর চিত্র। রূপকথার কাল্পনিক রাজ্যের রোমান্টিক অভিযানের অপূর্ব বিস্ময়ে চিত্রখানি রসান্বিত। ইহাতে কেবল কল্পনার ইন্দ্রধনু নাই, বাস্তবের মর্মসত্যও আছে। তাই রোমান্টিক ও বাস্তব জীবনের বহুচিত্র-রঞ্জিত এই কাহিনী বিচিত্র আবেদনে পরিপূর্ণ। Keith ইহাকে মধ্যম

শ্রেণীর গণ-জীবনের মহাকাব্য বলিয়াছেন। মূলে মূর্খ, সয়তান ও দুশ্চরিত্রা রমনীর বহু সংখ্যক গল্প না থাকিলেও বর্তমানে গল্পের আসরে জাঁকিয়া বসিয়া তাহারা এই সত্যটিরই মুখোস খুলিয়া ধরিয়াছে যে, মানব-জীবন সম্পর্কে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা ছিল বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ। চরিত্র-চিত্রণেও গুণাঢ্যের হাত বড় কম পাকা ছিল না। বহুবিবাহদক্ষ নরবাহনদত্ত তাঁহার পিতার ন্যায় লঘুচিত্ত হইলেও তাঁহার পরিণীতা বধূগণের মধ্যে মদন-মঞ্জুকার জোড়া মেলে কেবল মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ও চারুদত্তের নায়িকার মধ্যে। গোমুখের চরিত্রটি জীবন্ত ও প্রাণবান্; উদয়ন-মন্ত্রী যৌগন্ধরায়নেরই যেন আধুনিক রূপ। অতএব বলা চলে যে, রোমান্টিক অভিযানের সরল কাহিনীর মধ্যে কিংবদন্তী, ইন্দ্রজাল ও রূপকথার সহিত বাস্তব জীবনের মমতা মিশাইয়া, ছায়াপথের সহিত বন-পথের মৈত্রীবন্ধনে গল্পের মালা গাঁথিবার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল গুণাঢ্যের। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার, অনুভব করিবার ও প্রকাশ করিবার মুন্সীয়ানা গুণাঢ্যের ছিল বলিয়া ভারতবর্ষ তাঁহাকে কেবল নামের মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছে।

আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকার যে ভেদনিরূপন করিয়াছেন, বৃহৎকথা সম্পর্কে তাহা খাটে না। পঞ্চতন্ত্রের পশুপক্ষি-গল্পগুলির নামকরণে 'কথা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আবার মূল পঞ্চতন্ত্রের একখানি প্রাচীনতম রূপ তন্ত্রাখ্যায়িকার নামকরণের মধ্যে আখ্যায়িকা শব্দের ব্যবহার আছে। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহাতে মনে হয়, আলঙ্কারিকদের নজরে পড়িবার পূর্বে গল্প বলিতে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'—এই উভয় শব্দই শিথিল-ভাবেই ব্যবহৃত হইত, পরবর্তী আলঙ্কারিকগণের পারিভাষিক অর্থে ইহাদের ব্যবহার হইত না। আচার্য দণ্ডী 'অদ্ভুতার্থাবৃহৎকথা'কে কেন যে কথা বলিয়াছেন, তাহা ভাবিলেই বোঝা যায়। 'বৃহৎকথা'কে কথা বলিয়া ঘোষণা করিবার কালে তিনি একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন অদ্ভুতার্থ শব্দের মধ্যে।[১] এই অদ্ভুতার্থ বা বিস্ময়ভাবের সৃজন 'বৃহৎকথা'র চরম

(১) (ক) "The marvellous, howevor, is a cause of pleasure, as is shown by the fact that we all tell a story with additions, in the belief that we are doing our hearers a pleasure." P.

(খ) "অথাদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ দিব্যজন-দর্শনেপ্সিত-মনোরথাবাপ্ত্যুপবনদেব-কুলাদিগমন-সভা বিমানমায়েন্দ্রজাল-সম্ভাবনাদিভি-র্বিভাবৈরুৎপদ্যতে।" না, শা, ৬

(গ) রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥ ইতি॥ সা, দ, ৩

প্রকাশ। বিস্ময় ভাবটির ইশারার মধ্যে তিনি 'বৃহৎ-কথা'র মর্মলোকের এই ব্যঞ্জনাটুকুই হয়তো রাখিয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত গদ্যরোমান্স লেখকেরা সকলেই স্বীয় স্বীয় কাব্যরচনায় বিস্ময়-ভাব-প্রধান 'লোককথা'রই দ্বারস্থ হইয়াছেন। এক কথায়, তাঁহারা লোক-কথার যাবতীয় সম্পদ্ আত্মসাৎ করিয়া কথাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাই কথাকাব্যের সহিত লোককথার আঙ্গিকের পার্থক্য থাকিলেও কথাকাব্য 'লোক-কথা'র নাড়ীর যোগ হারায় নাই।

বৃহৎকথার আঙ্গিকে দেখা যায়, গল্পের মধ্যে গল্পবলার ঢঙ্। বৃহৎ কথার নায়ক নর বাহন-দত্ত নিজে বক্তা হইয়া ২৬টি বিবাহের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন।

বৃহৎকথার গল্প বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কাহিনী রতিভাবের বাহন হইলেও ইহার চমৎকারিত্ব বিস্ময়-ভাবে। লোক-কথার দুইটি নিরিখ বীরত্ব ও প্রেম। বীরত্ব যাহা আছে, তাহা যে পরোক্ষ, একথা পূর্বে বলিয়াছি। প্রেম ইহাতে নারী-শিকারের পদবীতে নামিয়াছে। অর্থাৎ মানব-মনের সূক্ষ্মভাবের পরিবেশন ইহাতে নাই। ইহাতে যাহা আছে, তাহা আদিম প্রবৃত্তির ভাসমান অবস্থা। বিস্ময়ের দোলায়-দোলায় প্রবৃত্তি যেন রঙের পিচকারি খেলে। মানব-সমাজের সহজ ও স্বাভাবিক ধারণা, কিংবদন্তী, স্বপ্ন, ইন্দ্রজালে বিশ্বাস এবং জীবন-বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রকাশ এই লোক-কথা। ইহা রূপকথা-লোকের রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের রোমান্টিক পরিবেশে টইটুম্বুর। অভিশাপ, পুনর্জন্ম, দেহান্তর, রূপান্তর প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ব্যোম-গমনী বিদ্যা, তিরস্করিণী বিদ্যা, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় ইহা সিদ্ধহস্ত। আধুনিক রূপকথার সহিত ইহার পার্থক্য হইল, আধুনিক রূপকথা শিশুদের জন্য, লোককথা প্রাচীন বয়স্কদের জন্য। জীবন-বিস্ময়ে যাহারা বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাসীদের জন্য এই রচনা। পঞ্চতন্ত্রের সহিত ইহার পার্থক্য, পঞ্চতন্ত্রের চরিত্র পশুপক্ষী,—লোক-কথার মানুষ। পঞ্চতন্ত্রের শ্রোতা বিদ্যার্থী শিশু, লোক-কথার শ্রোতা জীবন-বৈচিত্র্যের নব নব অভিযানের রসলিপ্সু স্বপ্নমানস আদিম ভারতবাসী।

পঞ্চতন্ত্র পশুপক্ষীর গল্প। পশুপক্ষী লইয়া গল্প, পঞ্চতন্ত্রকারের মৌলিক কল্পনা নয়। বেদে, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে পশুপক্ষীর গল্প পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ভেক-সূক্তে, ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের উপাখ্যানে, ছান্দোগ্য উপনিষদের সারমেয়-কাহিনীতে পশুপক্ষী ও ইতর প্রাণী লইয়া গল্প বলা হইয়াছে। কিন্তু সে গল্পগুলি হয় রূপক, না হয় ব্যঙ্গ রচনা। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির ন্যায় এগুলি সাহিত্যিক নয়। বৈদিক আখ্যানে গল্পগুলি গৌণ। বৈদিক সত্যের আবরণ হিসাবে বা বিদ্রূপাত্মক কৌশল

হিসাবে গল্পগুলি বলা হইয়াছে। সাহিত্যের গল্প ও-গুলি নয়। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি পুরাপুরি সাহিত্যিক। বৈদিক আখ্যানেও ইতর প্রাণী আসিয়াছে ঋষির ভূমাদৃষ্টি হইতে। ভারতীয় ঋষি পশুপক্ষী, মানুষ ও প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, বিশ্ব-ব্যাপী মহাপ্রাণের অভিব্যক্তিরূপে, সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে ওগুলিকে দেখিয়াছেন। তাই বৃহত্তর জীবনের শরিক হিসাবে পশুপক্ষী বৈদিক আখ্যানে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু লৌকিক সাহিত্যে পশুপক্ষীর গল্প হইল—ব্যষ্টি বা একদেশী সৃষ্টি। পশুপক্ষীর জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি নিত্য ভূমিকা আছে। পশুপক্ষী লইয়া গল্প বলিবার ধারাবাহিক খাতে[১] পঞ্চতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটিলেও পঞ্চতন্ত্রের পশুপক্ষী একটি বিশেষ তাগিদে আসিয়া পড়িয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকার শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া রাজকুমারগণকে অর্থনীতি ও ব্যবহারনীতি শিখাইবার জন্য গল্প বলিয়াছেন। পশুপক্ষীর গল্প শুনিতে শিশুরা যে বিশেষ কৌতুক বোধ করে, পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকারের তা অজানা নয়। অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের জটিল সমস্যাগুলিকে এবং মানুষী চেতনার নিকষ-পাথরে কসিয়া-দেখা সামাজিক রীতিনীতির আদর্শের বাস্তব রূপগুলিকে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলে টানিয়া আনিয়া, পশুপক্ষী ও ইতর প্রাণীর বিশিষ্ট জগতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া গ্রন্থকার গল্প রচনা করিয়াছেন। এক কথায়, সুখদুঃখ-সমাকীর্ণ ধর্মাধর্ম-বিজড়িত মানুষের সীমাহীন বিচিত্র জগৎকে সঙ্কুচিত করিয়া কবি পশুপক্ষী ও ইতর প্রাণীর প্রাচীর-ঘেরা আঙিনায় তাহাকে বন্দী করিয়া শিশু মনের পরিচিত পরিমণ্ডলের উপর কল্পনার বর্ণচ্ছটা মাখাইয়া, তবে গল্পের মালা গাঁথিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রের পশুপক্ষিগুলি মানুষী চেতনার প্রতিভূ। তাহারা বেদপাঠ ও ধর্মাচরণ করিয়া থাকে; দেবতা, ঋষি ও বীরগণ সম্পর্কে বিচারমূলক তর্ক তোলে এবং নীতিশাস্ত্রের জটিল রহস্য সম্পর্কে স্বীয় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের পশু প্রকৃতি চাপা থাকে না। কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে পশু-প্রকৃতির আপন স্বরূপ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, পঞ্চতন্ত্র গল্পের পশুপক্ষী ও বৈদিক আখ্যানের পশুপক্ষী এক ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়।

কাশ্মীরের সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর' ও ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী'র মধ্যে

(১) জাতকের গল্পের ন্যায় 'অবদান', 'দিব্যাবদান' ও 'মহাবস্তু'র গল্পগুলি কর্মফল ও বুদ্ধভক্তির আখ্যায়িকা। এইগুলিতে পশুপক্ষী ও নীতিজ্ঞান আশ্রয় লইয়াছে। মহাভারতেও কিছু কিছু পশুপক্ষিঘটিত ও নীতিজ্ঞাপক গদ্যগল্প আছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'অজাকৃপানীয়' 'কাকতালীয়' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখের মাধ্যমে পশুপক্ষিগল্পেরও ইসারা পাওয়া যায়।

গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র সহিত পঞ্চতন্ত্রও আছে। আবার দেখা যায়, লোক-কথার কিছু কিছু উপাদান যেমন পঞ্চতন্ত্রে আছে, তেমন পঞ্চতন্ত্রের উপাদানও লোক-কথায় অনুপস্থিত নাই। অতএব অনুমান করা চলে, পঞ্চতন্ত্রের আদিম রূপ ছিল সাহিত্যিক। অর্থনীতি ও ব্যবহারনীতির সহিত ইহার সম্পর্ক ছিল না। Keith ও ডাঃ এস্, কে, দে—উভয়েই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। উভয়ের মতে পঞ্চতন্ত্রের আদিম রূপ ছিল লোক-কথার অন্তর্বর্তী। চিরন্তনী লোক-কথার গল্প বলার যে ঢঙ্ ছিল, তাহা ছিল পুরাপুরি সাহিত্যিক। পঞ্চম শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্রের কথা লোকে জানিত; পঞ্চম শতাব্দীতে গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা'র কথা লোকে জানিত; আবার পঞ্চম শতাব্দীতে জাতকের গল্পগুলি পালি 'সুত্তপিঠকে'র রূপ লাভ করিয়াছিল। ইহা হইতে অনায়াসে অনুমান করা চলে, পঞ্চতন্ত্রের আদিম সাহিত্যিক রূপের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। এদিকে ব্রাহ্মণ-উপনিষদের গল্প, ওদিকে অধুনালুপ্ত সংস্কৃত লৌকিক ধারার সাহিত্য ও তাহার প্রচলিত মৌখিক রূপ; এদিকে প্রাকৃত সাহিত্যের কলরব, ওদিকে বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের ঐকতান—এই সকল জীবন-প্রাচুর্যের মধ্যে থাকিয়া পঞ্চতন্ত্রের আদিম রূপটির যে সাহিত্য-নিষ্ণাত একটি দিব্য মূর্তি ছিল, তাহা স্বীকার না করিবার কোনো কারণ নাই। সেদিন এই পঞ্চতন্ত্রের পশ্চাতে ছিল—ভারতীয় লোক-কথার মন্দগামিনী জীবনানুভূতির রোমান্টিকতা, বহুবর্ণ-বিচ্ছুরিত জীবন-বৈচিত্র্যের ইন্দ্রধনু, বৈদিকযুগ হইতে প্রবাহিত ইন্দ্রজাল, রহস্যকুটিল স্বপ্ন এবং মৃদু ও মসৃণ ধরণের অভিযান।

পঞ্চতন্ত্রের আধুনিক রূপ নিছক কালহরণের ও আনন্দ-পরিবেশনের পথ ছাড়িয়া নীতিবাদপ্রচারের মাধ্যম হইয়া উঠিয়াছে;—পরস্পর-সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি একটি মাত্র কাঠামোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিধৃত হইয়া পারস্পরিক সাক্ষ্যে এক অনবদ্য নীতিকথা গড়িয়া তুলিয়াছে। এইভাবে লোক-কথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাহিত্যের এক বিশেষ জাতিরূপে ধরা দিয়া ইহা ব্রাহ্মণগণের কুশাগ্রবুদ্ধি ও কলানৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহিয়া আনিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণের এই নৈপুণ্য পুরোহিত-শ্রেণীর সুবিধাবাদের কাজে লাগান হয় নাই। রাজসভার তাগিদে অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের নিরিখে অর্থনীতি ও ব্যবহার-নীতিতে সুকুমারমতি রাজপুত্রগণকে পারদর্শী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আনন্দ-পরিবেশনের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট রচনার আবির্ভাব। ইহাতে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ; আদর্শ প্রচারের প্রচেষ্টা হয় নাই, অন্য দিকে তেমনি কলা-বিদ্যার নামে শাঠ্য-শিক্ষণের দুষ্টবুদ্ধিও ভূতের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে নাই। নীতি-শাস্ত্রের আলোছায়ায় শিশুজগতের রমণীয় জীবন্ত পরিবেশের ইহা এক অনবদ্য

চিত্র। হার্টেল সাহেব বলিয়াছেন যে রাজনীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই পঞ্চতন্ত্রের আধুনিক রূপ উদ্ভাবিত। ইহা মিথ্যা নহে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে গ্রন্থখানি মুখ্যতঃ গল্পের বই। ইহাতে গল্পের বক্তা ও অর্থনীতির শিক্ষক একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন। গল্পশিল্পে গ্রন্থকার যেমন নিপুণ, অভিজ্ঞতার জগতেও তেমনি তিনি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ মানুষ। গ্রন্থরচনা করিতে বসিয়া গ্রন্থকার কৌতুক ও বিদ্রূপ, শ্লেষ ও হাসির হিল্লোল বহাইয়া দিয়া শিক্ষকের স্বভাব-সিদ্ধ কড়া মেজাজকে এমন স্নিগ্ধ, এমন আর্দ্র, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন, যাহার মূল্য না দিয়া পারা যায় না।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি নানা উৎস হইতে আসিয়াছে। বৌদ্ধগল্পগুলি তাহাদের অন্যতম। প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধদের মধ্যেও নীতিকথা ও নীতিগল্প প্রচলিত ছিল। এগুলি ভগবান বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এবং যে-চরিত্রটি বুদ্ধের পূর্বজন্মের সহিত অভিন্ন, সেই চরিত্রকে পবিত্র মনে করা হইত। এই গল্পগুলি জাতক নামে পরিচিত। এমন প্রমাণ আছে যে খৃঃ পূঃ ৩৮০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে জাতকের অস্তিত্ব ছিল। দুইখানি শব্দকোষে ভারতীয় গল্পের অনুবাদ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতর শব্দকোষখানি খ্রীষ্টীয় ৬৬৮ অব্দে সম্পূর্ণ হয়। উহাতে ভারতীয় গল্পগুলির উৎস হিসাবে অন্ততঃ ২০২ খানি বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ আছে। লোক-কথার উৎস, অধুনা-অজ্ঞাত উৎস, বৌদ্ধ উৎস এইরূপ উৎস নানা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সেগুলি ছাটিয়া কাটিয়া গ্রন্থকার প্রয়োজনানুরূপ রূপ দান করিয়াছেন।

পঞ্চতন্ত্রকারের কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায় গল্পগুলির আস্বাদনের মধ্যে, সামগ্রিক ফলের উপর। গ্রন্থকারের সম্মুখে ছিল দুইটি জগৎ; একটি ভালোমন্দ-সুখে-দুঃখে-গড়া আলো আঁধারি বিস্তৃত মানুষী জগৎ; অপরটি ছিল প্রকৃতির আঁচলে-বাঁধা পশুপক্ষিপ্রাণিকুলের জগৎ। এই দুই জগতের মাঝখানে ছিল দাগ-না-ধরা শাদা মনের কিশোরবৃন্দ। চোখে তাহাদের না-জানা জগতের অকূল বিস্ময়-বারিধি; মনে তাহাদের নিদ্রিত স্বপ্ন। এই কিশোর ছাত্রদের রাজনীতি, ধর্মনীতি, ব্যবহার-নীতি শিখাইতে হইবে। কাব্য নয়, সঙ্গীত নয়, চিত্র নয়, নৃত্য নয়, প্রতিমূর্তি নয়, নীরস শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইবে এবং সে শাস্ত্র প্রকৃতির সহিত মানুষের জীবন-দ্বন্দ্বের অন্বয়-ব্যতিরেকের অভিজ্ঞতায় ভাবী পূর্ণাঙ্গ মানুষের আদর্শ দিয়া তৈয়ারী।

প্রগতিশীল মানব-সমাজের কূলে কূলে যে জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, স্রোতে ও অবস্রোতে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, জীবনের ষড় ঋতুতে যাহার ছয়

রূপ, যাহাকে চিনিলেও চেনা যায় না, জানিলেও জানা যায় না, যাহা জীবনের বাতুল, রহস্যের রহস্য, পঞ্চতন্ত্রের গ্রন্থকারের সম্মুখে সেই জীবন-সমুদ্র। সেই বিচিত্র দুর্ধর্ষ পোষ-না-মানা জগৎকে ধরিয়া আনিয়া কিশোর-মনের সোনার খাঁচায় পুরিতে হইবে; যে-খাঁচার স্বর্ণ-শলাকাগুলি স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী, যাহার মাপা ফাঁকগুলি দিয়া অজানা বৃহত্তর জগতের ছায়া-মলিন পায়ে-চলা বনপথগুলি দেখা যায়। এ বড় সোজা কাজ নয়। এর জন্য গ্রন্থকারকে যেমন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া চাই,—যেমন সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞ হওয়া চাই, তেমনি মানুষের পূর্ণাঙ্গ মূর্তিকল্পনায় ধ্যানী হওয়াও চাই। আবার এই কল্পিত পূর্ণাঙ্গ মানুষকে শুধু ধ্যানে পাইলে চলিবে না। শিল্পীর মতো রঙের তুলি হাতে লইয়া স্বপ্নলব্ধ পূর্ণাঙ্গ মানুষের বাস্তব জীবন্ত মূর্তি রচনা করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, পঞ্চতন্ত্রকারের মধ্যে একাদিক্রমে পণ্ডিত, সমাজতাত্ত্বিক, ধ্যানী ও শিল্পী—এই কয়জন মানুষ পাশাপাশি বাস করিতেছে। আধুনিক টেকনিকের আলোচনায় আমরা ইংরেজীতে যাহাকে বলি Creation, বাংলায় যার চল্‌তি নাম সৃষ্টি, এই Creation, এই সৃষ্টি, এই শিল্পশক্তি পঞ্চতন্ত্র-গ্রন্থকারের ছিল। অবাস্তব বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের দুর্নাম চিরকালই আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শিল্পীরা ছিলেন আদর্শবাদী। বস্তু লইয়া তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। বস্তুর আদর্শ মূর্তি লইয়া তাঁহারা শিল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে যাহাকে রস বলে, সেই রস-সৃষ্টির জন্যই তাঁহাদের এই Abstraction এর পথে নামিতে হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে কেবল বস্তুকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করিবার জন্য যতটুকু abstraction এর প্রয়োজন, পঞ্চতন্ত্রকার তাহার অধিক অগ্রসর হন নাই। গ্রন্থকার মর্ত্যগন্ধশূন্য সাহিত্য রচনা করেন নাই, যাহা পরবর্তী কালের কবি-নাট্যকার-গল্পকার-উপন্যাসকারেরা করিয়াছিলেন। মানুষের সমাজই ছিল তাঁহার রচনার একমাত্র উপজীব্য। মনুষ্য-সমাজের খনি হইতে গ্রন্থকার অনেক রত্ন আহরণ করিয়াছেন। উত্তম হইতে অধম, সৎ হইতে অসৎ, রাজা হইতে সন্ন্যাসী, ত্যাগী হইতে ভোগী, উদাসীন হইতে আসক্ত, সত্যধর্মী হইতে শঠ, পরোপকারক হইতে পরস্বাপহারক—সকল শ্রেণীর মনুষের ইতিবৃত্ত পঞ্চতন্ত্রে আছে।

এই ইতিবৃত্ত—মনুষ্য-চরিত্রের এই শক্তি ও দুর্বলতার দিকে গ্রন্থকার যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাকাইয়াছেন, এমনিভাবে বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোন কবি তাকান নাই। মনুষ্য-চরিত্রের এই ধর্মাধর্মগুলি পশুজগতে পরিবেশিত হইলেও গ্রন্থকারের শিল্পগুণে তাহারা জীবন্ত হইয়াই আছে। গ্রন্থকার বাস্তবমুখী

হইলেও তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, যাহা কিছু জানিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় শিল্পে উপন্যস্ত করেন নাই। তাঁহাকে যে আদর্শ পুরুষ তৈয়ারী করিতে হইবে। তাই তাহার জন্য বাস্তবের সহিত আদর্শ,—লোক-ব্যবহারের সহিত কল্পনা থাকা চাই। খাঁটি আদর্শের কোন রূপ-কল্পনা তিনি করেন নাই, কেবল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, পঞ্চতন্ত্রকারের সম্মুখে যদি কোন বিশিষ্ট বস্তু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা মানুষের জীবন। জীবন-দর্শন যদি সাহিত্যের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে গ্রন্থকার ছিলেন জীবন-দার্শনিক, জীবন-রসিক। পঞ্চতন্ত্র সে-হিসাবে জীবনের আলেখ্য-গৃহ। এই শিল্পজ্ঞান পঞ্চতন্ত্রকার যদি কোন ধ্রুপদী কাব্য রচনায় নিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে realistic কাব্য নাই বলিয়া আমরা যে দুঃখ করিয়া থাকি, সে দুঃখ করিতে হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যের এক নূতন রূপ উদ্ঘাটন করিতে পারিত।

এতক্ষণ ইঁহার গুণের আলোচনা করিয়াছি। এখন ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলিব। শিক্ষণ-শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহার যে প্রথম অপরাধ আমাদের চোখে পড়ে, তাহা হইল—প্রকৃতি-জগতের সহিত কিশোর ছাত্রগণের অপরিচয়। প্রকৃতিকে বাদ দিয়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। প্রকৃতি হইতে মানুষ পৃথক হইলেও প্রকৃতি মানুষের জীবনের এক বৃহত্তর অংশ। মাতার সহিত সন্তানের যে সম্পর্ক, প্রকৃতির সহিত মানুষের সেই সম্পর্ক। প্রকৃতির আলো-ছায়ায়, প্রকৃতির গানে-গর্জনে, ষড়ঋতুর রূপ বৈচিত্র্যে মানুষের মনে আদিম চিত্ত-বৃত্তগুলি জাগিয়া ওঠে। যে-সকল চিত্তবৃত্তির কূল নাই, অথচ গহনতা আছে, যাহা ভাসিয়া ওঠে, অথচ দাঁড়ায় না; যাহার গতি একটানা, বাঁক ফিরিবার জন্য যাহার মাথাব্যথা নাই; যাহা রহস্য হইতেও রহস্যতর, গহীন হইতেও গহীনতর, যাহা বাক্য-মনের অতীত, যাহা অনির্বচনীয়, সেই সকল চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক উন্মেষ ঘটে মুক্ত প্রকৃতির আলিঙ্গনে। চিত্তের বিশেষ লক্ষণীয় ধর্ম হইল—সংকোচ ও বিস্তার, দীপ্তি ও দ্রুতি। বিস্তার ধর্ম হইতে যে ভাবের উদয় হয়, অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাহাকে বলা হয় বিস্ময়-ভাব। এই বিস্ময়-ভাব হইতে অদ্ভুত রসের জাগরণ। এই অদ্ভুত রসের আশ্রয়েই অন্যান্য মুখ্য রসের যথার্থ স্ফূরণ। কিশোর মনের কচিকাচা পেলব পাত্রে তাই এই অদ্ভুত রস ঢালিতে হয়। একে কিশোর মন বিশ্ব-বৈচিত্র্যের দ্বারে নবাগত আগন্তুক। নিখিল বিশ্বই তাহার অজানা। অজানা বলিয়া পদে পদে তাহার বিস্ময়, পদে পদে তাহার কৌতূহল, পদে পদে তাহার জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসু মনের নিখিল জিজ্ঞাসাকে জাগাইয়া

তুলিবার জন্য প্রকৃতির ঘন পল্লবের ছায়ায়-ঢাকা, বনকুসুমের গন্ধে-মাতা, ফুল-ফুটানিয়া গানে-ভরা অরণ্যের বক্ষলগ্ন হৃদ্‌স্পন্দনের কাছে কিশোরকে কান-পাতা শিখাইতে হয়। বসন্তের হাওয়ায়-ভাগা শ্যামল পাতার কচি অঙ্গে আচম্বিত শিহরণ, পুষ্পে পুষ্পে যৌবনের প্রগল্‌ভতা, লতায় লতায় লুব্ধতার আকুলতা, বৃক্ষে বৃক্ষে গোপন সংবাদের কানাকানি, পাখির মেলা, প্রজাপতির হাট, কোকিল ও ভ্রমরের কালোয়াতি-মজলিস, প্রভাতের বর্ণচ্ছটা, মধ্যাহ্নের বৈরাগ্য, সন্ধ্যার রাঙিমা, রাত্রির তৃপ্তি, বর্ষা-মেঘের 'অন্যথাবৃত্তি', শরতের শুভ্র শেফালিকার হাসি—এই নিখিল রূপলোকের রঙীন অবগুণ্ঠনতলে বিশ্বহৃদয়ের হৃদ্‌স্পন্দন নিত্য ধ্বনিত হইতেছে। তাহার সহিত নবাগত কিশোরের প্রথম পরিচয় আবশ্যক। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির মুক্ত জীবনের মধ্যে কিশোর জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পঞ্চতন্ত্রকার প্রকৃতির অস্পষ্ট রেখার মধ্যে পশুপক্ষী ও ইতর জীবকে টানিয়া আনিয়া গল্পের ফাঁদ পাতিয়াছেন। তাহাতে পশুপক্ষী ও ইতর প্রাণীগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। পঞ্চতন্ত্রকার যে ইহা করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ হইতে পারে যে তিনি মানুষের কথাই মুখ্যতঃ বলিতে চাহিয়াছেন এবং সেই কারণেই তাহার সৃষ্ট পশুপক্ষী ও ইতর প্রাণিগুলি মানুষের চেতনা মাখিয়া মনুষ্য সমাজের আচার-ব্যবহারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পশুপক্ষীর ছদ্মবেশে তিনি যে-মানুষের বিচিত্র মূর্তি আঁকিয়াছেন, তাহারাও সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। মানুষের জীবনের এক বৃহত্তম অংশ প্রকৃতি। পঞ্চতন্ত্রে প্রকৃতির অনাদর। অথচ সংস্কৃত কাব্য-নাটকে প্রকৃতি না হইলে এক দণ্ডও চলে নাই। এরূপ হওয়ার একমাত্র কারণ হয়তো জাতকগুলির প্রভাব। জাতকগুলির বাস্তবমুখিতার অনুকরণে ও লোক-কথা হইতে বিচ্ছিন্ন সাহিত্যের বিশেষ জাতির সৃষ্টির মোহে পঞ্চতন্ত্রকার হয়তো এই নূতন পথ ধরিয়াছেন। জাতক গল্পগুলি যে তাহার আদর্শ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ, ওগুলিও বাস্তবমুখী নীতিগল্প।

চোখে পড়িবার মতো দ্বিতীয় ত্রুটি হইল—পশুজগতের মধ্যে মানুষের স্বতন্ত্র স্থান নাই। ইহার কারণ, মানুষকে তিনি আগেই পশু-বিগ্রহের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইখানেই তাহার হাত-পা বাঁধা পড়িয়াছে। কিশোর মনের উপকরণের জন্য পশু তাঁহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, একথা সত্য, এবং এই কারণেই তিনি মানুষী ব্যবহারগুলিকে পশুর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষী ব্যবহারের যে নীতিগুলি তিনি শিশু-শিক্ষণের উদ্দেশ্যে পশুজগতে

আনিয়া ফেলিয়াছেন, সেগুলি সবই যে শিশুমনের অনুপাতে সহজ ও সরল, তাহাও নহে। তাহাদের মধ্যে অনেক জটিল সমস্যাও আছে। সেই সমস্যাগুলি পশুপক্ষীর খাপছাড়া জীবনে জটিলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। অমরশক্তির জড়বুদ্ধি পুত্রগণের নিকট এই জটিল সমস্যাগুলির অবতারণা করিয়া তিনি যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তাই বলিতেছিলাম, সমস্যা যখন সমস্যাই থাকিয়া গেল, তখন পশুর মাধ্যম টানিয়া আনিবার কী প্রয়োজন ছিল? সরাসরি মানুষের সমাজকে অঙ্কিত করিয়া জীবনের পূর্ণতার জন্য তিনি ঐ মানুষগুলিকে প্রয়োজন মত পশু-পক্ষি-পতঙ্গ-পূর্ণ প্রকৃতির মুক্ত দরবারে আনিয়া ফেলিতে পারিতেন।

তৃতীয় ত্রুটি, কাহিনীর গৌণতা ও নীতি কবিতার প্রাচুর্য। পঞ্চতন্ত্র তাহার উপযুক্ত ভাষা পাইয়াছিল, গল্প বলিবার উপযুক্ত ঢঙ পাইয়াছিল ; কিন্তু পদে পদে নৈতিক কবিতারাশির হোঁচোট খাইয়া গল্পগুলি আশানুরূপ দ্রুত গতিতে চলিতে পারে নাই। সেই কারণে গল্পগুলি নৈতিক গল্প হইয়া আছে।

উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও বলিব, নিখিল সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র বাস্তবপন্থী হইয়া নূতন মেঠো পথের সন্ধান পাইয়াছিল। সেই পথকে গড়িয়া পিটাইয়া মনুষ্য-চলাচলের পথ করিতে পারিলে সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যই একটা বাড়তি স্থায়ী পথ থাকিত। পঞ্চতন্ত্রের পর নিখিল সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র 'দশকুমারচরিত' রচয়িতা দণ্ডীর মধ্যে এই মানস-ভঙ্গীটি দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃত ভারতের তাহা ধাতে কুলাইল না।

আধুনিক ইংরেজনবিশ ও পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা 'দশকুমারচরিতে' দণ্ডীর বস্তুধর্মিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁহাদের এই প্রশংসার কারণ, 'দশকুমারচরিতে' তাঁহারা এমনি একটি সমাজ-জীবনের ছবি দেখিয়াছেন যাহা মানব-জীবনের অন্ধকারের দিক, নীতিহীনতা, লাম্পট্য, চৌর্য ও প্রবৃত্তি উচ্ছ্বাসের কদর্য দিক। মানুষ নীতিভ্রংশের চরম সোপানে নামিলে, কাম ও অর্থকে ধর্মের চাইতে অনেক বড় করিয়া দেখিলে মানব-জীবনের যে পঙ্কিলতা থিতাইয়া ওঠে, এ জীবনে সেই পর্য্যুষিত কদর্যতা। পৃথিবীর যেখানে যত কদর্যতা এতকাল ধরিয়া লোকলোচনের আড়ালে থাকিয়া জমিতেছিল, জমিয়া পঁচিতেছিল, পঁচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল, দণ্ডীর লেখনীর টানে তাহারা একত্র সংহত হইয়াছে দশকুমারচরিতে। ইহাই কি বাস্তবতা? বাস্তবতা কি মনুষ্য জীবনের কেবল নোঙ্‌রা দিক? মনুষ্যদেহের পেট হইতে পা পর্যন্ত—এই অংশটাই কি মনুষ্য-জীবনের একমাত্র প্রেরণা? মস্তিষ্ক হইতে

হৃদয় পর্যন্ত—এই অংশটা কি অবাস্তবতার উপাধি? বাস্তবতারও সর্বভূমীন দিক আছে। এই পঙ্কিল দুর্গন্ধি জীবনে সেই সর্বভূমীনতার প্রসার কোথায়? যেগুণে ugly ও beautiful হইয়া ওঠে, ইহাতে সে-গুণ কোথায়?[১] এই চিত্রই যদি বাস্তবতার মাপকাঠি হয়, এই চিত্রে যে জীবনের ফটো উঠিয়াছে তাহাই যদি ভারতীয় জীবনের একমাত্র বাস্তবতা হয়, তাহা হইলে ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষাদীক্ষা, মননশীলতা ও সৌন্দর্যবোধকে রূপকথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। বাস্তবোধ ও-জীবনে নাই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, সামাজিক অস্তিত্ব বোধে, রাষ্ট্রিক চেতনায় ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ব্যাপার লইয়া যে আনন্দ ও দুঃখ, যে আশা ও নৈরাশ্য, যে সার্থকতা ও ব্যর্থতা, যে জয় ও ভয়, যে শ্রেয়ঃপ্রেয় আমাদের ব্যক্তি-জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে নিত্যই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটাইতেছে, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র অনুভূতির প্রকাশ হইল বাস্তবতা। সে বাস্তবতা 'দশকুমারচরিতে' নাই। বাস্তব হইতে হইলে সত্য হইতে হয়; সত্য হইতে হইলে সুন্দর হইতে হয়। 'দশকুমারচরিতে'র ঘটনায় সে সত্যানুভূতি সে সৌন্দর্যানুভূতি নাই। যাহা আছে, তাহা কেবল প্রবৃত্তি-আলিপনার রঙীন কল্পনা। সেই কল্পনার সহিত বাস্তব দুষ্টবুদ্ধির যোগ। বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষ মনুষ্যত্বের শেষ কথা নয়। বুদ্ধিবৃত্তির সহিত চিত্তবৃত্তির সমানুপাতিক যোগ সাধনেই মনুষ্যত্ব। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য বা কাঠিন্যের সহিত চিত্তের দ্রবীভাব মিলাইয়া তবে মনুষ্যত্বের ফসল ফলাইতে হয়। দণ্ডী তাহা পারেন নাই। তবে এইটুকু স্বীকার করিতে হয়, লোকবৃত্তের দিকে চাহনিটি তাঁর বাস্তব। বিষয়-নির্বাচনের ভ্রান্তিতে তাহার সে চাহনি ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতীয় মার্জিত জীবনযাত্রার প্রতি তাঁহার যেন এক রুক্ষ বিদ্বেষ। ধর্ম-প্রধান, নীতি-প্রধান, সৌন্দর্য-প্রধান ভারতীয় জীবন-যাত্রাকে তচনচ করিয়া ফেলিবার যেন একটি রূঢ় সংকল্প প্রকাশ পায় তাঁহার কাহিনীতে। আধুনিক যুগে ডাকাইতের কাহিনী, পকেটমারের কাহিনী, জুয়াড়ির কাহিনী, ধড়িবাজ, ভণ্ড সাধুর কাহিনী, রূপোপজীবিকার কাহিনী,

(১) (ক) According to Plotinus, ugly is the opposite of beautiful. Just as beauty is that property in things, which the soul recognises as akin to her own essence, so ugly is that which she feels to be alien and antipathic to herself. Just as beautiful is that which participates in the spiritual form, so ugly is that which is characterised by the comparative absence of such form." W. Æ; Vol. II,

(খ) 'Ugliness alone cannot produce the ridiculous. For ugliness is imperfection, and in order to create a sense of the ridiculous, a contrast is required of perfections with imperfections.' P.C.

নারী-সম্ভোগের কাহিনী একত্র গাঁথিয়া যাদুবিদ্যার বিস্ময় রসে জারিত করিয়া পরিবেশন করিলে যাহা হইত, দণ্ডীর কাহিনী তাহারই রূপবিশেষ। ডাকাইত, পকেটমার, জুয়াড়ি, চোর, ধড়িবাজ, ভণ্ড সাধু, বেশ্যা বাস্তব বলিয়াই কি যে-সাহিত্যে ইহাদের সমাবেশ আছে এবং আর কাহারও নাই, সে-সাহিত্যকে কি বাস্তব বলিতে হইবে? বাস্তবতা ধর্মবিশেষ; সাহিত্যের সকল দাবি বজায় রাখিয়া যদি সেই ধর্মটি জাতিবিশেষের সামগ্রিকতায় একটি জীবন্ত পরিমণ্ডল রচনা করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সাহিত্যকে আমরা বাস্তব সাহিত্য বলিয়া মানিতে পারি।[১] আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারিনা যে, মনুষ্যলোকে একমাত্র উঁই, ইঁন্দুর, আরশোলা ও শুঁয়াপোকার বাস।

এখন কথা হইল দণ্ডীর কি তাহা হইলে জীবনদর্শন বলিয়া কিছু ছিল না? ছিল তো বটেই। তবে আশ্চর্য ব্যাপার হইল, তিনি পঁচা জিনিস বাছিয়া বাছিয়া দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।[২] বৈদিক যুগ হইতে সমাজ-জীবনের যে অংশে খুন রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তি, অবৈধ প্রেম প্রভৃতি অন্ধকারে পথ কাটিয়া চলিতেছিল, তিনি সেই অংশের উপাদানগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইয়াছেন। তাহার পর অথর্ব বেদের লৌকিক অংশের স্বল্পাবিষ্কৃত সুড়ঙ্গ পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একেবারে তাঁহার যুগে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির নেপথ্যভূমির সেই মসীমাখা ইতিবৃত্ত দিয়া তিনি তাঁহার গল্পের মালা গাঁথিয়াছেন। গাঁথুন তাহাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতি-জীবনের এমনি ব্যঙ্গ চিত্র তিনি আঁকিলেন কেন? ইহার কি কারণ থাকিতে পারে? ইহার মধ্যে কি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের লাঞ্ছনার প্রতিশোধের কোন ইঙ্গিত আছে? সতের সহিত অসতের, আলোর সহিত অন্ধকারের মিলনে যেমন জীবন, তেমনি সাহিত্য। তাঁহার অঙ্কিত মানুষের উদার-ধর্মের, মনুষ্যত্ববিকলনের কোন পরিচয় নাই। পরোপকারের যে কৈফিয়ৎ তিনি মাঝে মাঝে দিয়াছেন, তাহা কৈফিয়ৎ, পরোপকার নয়; পরোপকারের জন্য পরোপকার নয়; আত্মস্বার্থের জন্য পরোপকার। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বিষে তিনি জর্জরিত। দেবতাদের চরিত্র দোষ তিনি নোট করিয়া রাখিয়াছেন; পিতামহ ব্রহ্মার তিলোত্তমার প্রতি অভিলাষ,

(১) "Realism must be kept within the sphere of art by the presence of the ideal element". I. S. L.

(২) "We hear in the hymns of the Rgveda of incest, seduction, conjugal unfaithfulness, the procuring of abortion, as also of deception, theft and robbery." H. I. L. Vol I, p. I, page 58

ভবানীপতির সহস্র সহস্র মুনিভার্যা-সংদূষণ, পদ্মনাভ বিষ্ণুর ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরবিহার, নিজের দুহিতার উপরেও প্রজাপতির প্রণয়-প্রবৃত্তি, ইন্দ্রের অহল্যা-জারতা, চন্দ্রের গুরুতল্পগমন, সূর্যের বড়বালম্বন, উতথ্যের ভার্যার প্রতি বৃহস্পতির অভিসার, অনিলের বানরী-সমাগম। ঋষিরাও বাদ পড়েন নাই; পরাশরের দাশকন্যাদূষণ, পরাশর-পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের ভ্রাতৃবধূ সম্ভোগ, অত্রিমুনির মৃগী-সমাগম।

দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীকে বিকৃত করিয়া আঁকিবার যেন তাঁহার দৃঢ় সংকল্প। তাঁহার ঋষি তপস্যা ছাড়িয়া কামবেগে বেশ্যার পশ্চাদ্ধাবন করে, তাঁহার ব্রাহ্মণ বেশ্যাদাস, বেশ্যান্ন-ভোজী; তাঁহার ভিক্ষুণী প্রণয়-দূতী। ভক্তের সাধনায় বরদান করিতে বা স্বপ্নাদেশে বা দৈববাণীতে ক্বচিৎ আবির্ভূত তাঁহার দেবতা যেন বৈদিক ও পৌরাণিক সাধনার ব্যঙ্গ-মূর্তি। শুধু দেবতা কেন, বৈদিক কিংবদন্তীর ইন্দ্রজাল, দৈব-বাণী, স্বপ্ন, রূপান্তর ও দেহান্তর প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্র তাঁহার সাহিত্য। যেমন প্রাচীন কৃষ্টির ব্যঙ্গ, তেমনি বাস্তব জীবনেরও ব্যঙ্গ। বাস্তবজীবনে অর্থের জন্য যে প্রাণান্তিক অধ্যবসায়, প্রেমের জন্য যে বেদনা, নীতির জন্য যে নিষ্ঠা, তাহাও ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছে শাঠ্যমন্ত্রে। কেবল ধাপ্পাবাজি, ধড়িবাজি, কূটবুদ্ধি, বুদ্ধির প্যাঁচ ও হাতের প্যাঁচ থাকিলে সুখ, সম্পদ, প্রেম কিছুই অনায়ত্ত নয়। শ্রমহীন, তপস্যাহীন, কর্মহীন, অলস মেজাজের কেবল অনায়াসলব্ধ অর্থভোগ, সম্পদ-ভোগ ও নারী-ভোগ। কথা-সাহিত্যের মূলে লোক-সাহিত্যের দুইটি প্রবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি - বীরত্ব ও প্রেম; chivalry and love লোক-সাহিত্যে বীরত্ব পরোক্ষ। দশকুমার-চরিতে বীরত্বও তাই। তবে পার্থক্যের মধ্যে, ইহাতে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধী শাঠ্য, ছলনা, অন্যায়, প্রতারণা, মন্ত্র-তন্ত্রের ভেল্কি। এ বীরত্ব যাদুবিদ্যার, ম্যাজিকের। শৌর্য, শক্তি, রণদক্ষতা, কৃচ্ছ্রসাধনা ইহাতে দরকার হয় না। দাম্পত্য প্রেম এখানে কোণঠাসা। পরকীয়া, কন্যা ও রূপোপজীবিনীর প্রেম এখানে প্রবৃত্তির আগুনে জ্বলিতেছে। পরকীয়া ও কন্যা-প্রেমের যেন কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা। কন্যান্তঃপুর এই প্রেম-রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কন্যান্তঃপুরে গোপন প্রেমের লালসার অগ্নিতে পাড়িয়া শুদ্ধান্তচারিনী কন্যা অন্তঃসত্ত্বা; গোপনে নবজাতকের বিসর্জন; পরগৃহের অন্তঃপুরেই পরস্ত্রী সম্ভোগ; নারীর ছদ্মবেশে পুরুষের কন্যা-সম্ভোগ; নারীর উপর পুরুষের নয়, পুরুষের উপর নারীর বলাৎকার! আবার রাজান্তঃপুরের বাহিরে নগরের চত্বরে চত্বরে জুয়াড়ির দল; জুয়া-খেলায় গ্রাম্য অশ্লীল ভাষার ফোয়ারা। অন্ধকার

রাজপথে সিঁদকাঠি ও অস্ত্রহাতে চোরের পরিক্রমা। চুরিটা এত সহজ, যেন একটা তুড়ির ব্যাপার। ধনোপার্জনের ইহা অলস মন্ত্র, একমাত্র পথ। তাহার পর শুঁড়ির দোকান। বেশ্যাপল্লী। বেশ্যালয়ের চিত্র ; বেশ্যার পানোন্মত্ততা। আর কত বলিব ? মনুষ্য জীবনের কাম-প্রবৃত্তিগুলি যেন দশকুমার-চরিত-লোকের উপর দিয়া কুৎসিৎ কদর্যতার ও অশ্লীলতার বাণ ডাকিয়া ছুটিয়াছে। তাহার নোঙরা ঢেউয়ের কৃমিকীট পৃথিবীর সভ্য-সমাজের গায়ে জড়াইতেছে। এমনি পঁচা দুর্গন্ধ তার, যে একালে বসিয়াও নাক সিটকাইতে হয়।

যাঁহারা এ চিত্রকে বাস্তব জগতের প্রতিনিধি বলিয়াছেন, তাঁহারা কি ইহাকে satire বলিতে চান ? Satire এর কোন্ লক্ষণ ইহাতে ? Satire এর উদ্দেশ্য[১] জীবনের ক্ষতগুলিকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। ইংরেজীতে যাহাকে satire বলে, তাহা হইল বিদ্রূপ ও শ্লেষের সমবায়। ইহার একদিকে থাকা চাই wit ও humour, অন্যদিকে থাকিবে বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ, কৌতুক ইত্যাদি। নির্বেদ লইয়া সংসারের উদ্ভটতা ও উৎকটতা দেখাইতে হয়। নিজের মাতিয়া উঠিবার অবসর নাই ইহাতে। ইহাতে হাসাইতে হয়। সে হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফুটাইতে হয়, হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে শোকের সকরুণ রোদনধ্বনি বাজাইতে হয়। Satarist হইতে হইলে দেশপ্রেমিক হইতে হয়। 'দশকুমার-চরিত'—এই সকল লক্ষণের বিপরীত। ইহা নৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে অভিযান ; শাশ্বত সুন্দর জীবনের মূলে আঘাত করিবার সংকল্প। কামসূত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র—জীবন গড়িবার শাস্ত্র। দণ্ডীর হস্তে ঐ তিনখানি গ্রন্থের মানবকল্যাণ-চিহ্ন বিকৃত। যদি কোন বিদেশী পাঠক কেবলমাত্র 'দশকুমারচরিত' পাঠ করেন, তাহা হইলে ভারত সম্পর্কে কুৎসিত ধারণা গড়িতে তিনি বাধ্য হইবেন। ভারতীয় জীবনের মানবিকতার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ইহা পাকা ফোঁড়ার মত টন্‌টন্ করিতেছে। এই সাহিত্য পাঠ করিয়া ভারতীয় সামগ্রিক জীবনের কোন ধারণা করা যায় না।

এত দোষ থাকা সত্ত্বেও বলিব, শক্তিমান্ কবি দণ্ডী। ভারতীয় জীবনকে তিনি যতই বিকৃত করিয়া দেখান না কেন, চাঁদের কলঙ্ক ছানিয়া তুলুন না কেন, তাঁহার কবিশক্তির জয়গান করিতে হয়। আদর্শ আর্টিষ্ট কবি দণ্ডী। যে ভাবে যে উপায়েই তিনি তাঁহার কাব্যের উপাদান গ্রহণ করুন না, সেগুলিকে শিল্পে

(১) "Use of ridicule, irony, sarcasm etc in speech or writing for the ostensible purpose of exposing and discouraging vice or folly."—O.D.

পরিবেশন করিবার তাঁহার অদ্ভুত শক্তি। এই শক্তিই রিয়ালিজমের শক্তি।[১] বিকৃতির উপাদান লইয়া তিনি যে কাব্য ঘনাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঔচিত্যের অভাব নাই। কথা-সাহিত্যের মূলে যে অদ্ভুত রস, সেই অদ্ভুত রস তাঁহার সাহিত্যে কেবল যে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে, বিস্ময়ভাবের ইন্দ্রজালে সকল ঘটনা যেন পাঠকের চিত্ত ধরিয়া টান দেয়। পাঠক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে গল্প পড়িতে থাকেন। সার্থক গল্প-বলিয়ে দণ্ডী। শ্রোতার মনে আকাঙ্ক্ষা ঘনাইয়া তুলিবার মন্ত্রটি তাহার জানা। তাই তাঁহার গল্প নির্ঝরিণীর মত কলকলধ্বনিতে ছুটিতে থাকে, বাধা পায় না কোথাও, হুঁচোট খায় না কোথাও। কেবল তরতরানি, ঝরঝরানি। বৈদিক কিংবদন্তীর ইন্দ্রজাল, অভিশাপ, দৈববাণী, জন্মান্তর, রূপান্তর প্রভৃতি দিয়া গড়া ভারতীয় সাহিত্যের চিরন্তন পাঠক-মানস ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ধারা ঠিকই বজায় আছে। তিনি গঙ্গাজলের পাত্রে অমেধ্য আসব ঢালিতে পারেন, কিন্তু পাত্রটি উভয়তঃ সমান। পাঠক-মনের যেখানে বিশ্বাস, বিশ্বাসের চিরন্তনতা, সেখানে তিনি হাত দেন নাই। তাঁহার গল্প পূর্ণাঙ্গ কোন গল্প নয়। আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত গল্পের যে বৃত্তটি[২] গল্পের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, সে বৃত্ত তাঁহার গল্পে নাই। প্রত্যেকটি গল্প এক এক কুমারেব অভি-যানের বিবৃতি। কাজেই সুবন্ধু-বাণের কাহিনী-বৃত্তের সহিত সম্পর্কশূন্য দশকুমার-চরিতের গল্পগুলি। ইহাকে রিপোর্ট বলা চলে, বিবৃতি বলা চলে, কিন্তু গল্প বলা চলে না। তবুও গল্পগুলি বলার মধ্যে বাস্তব জীবনের দিকে একটা ঝোঁক আছে। দণ্ডীতে যে জীবন-চিত্র আছে, সে-চিত্র যতই বিবসনার চিত্র হউক না কেন, তাহাতে বাস্তব জীবনের সংবাদ দেবার একটা তাগিদ আছে। সে-সংবাদ সংস্কৃত সাহিত্যের আর কোথায়ও নাই। বাস্তবের দৃষ্টি তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু বিষয়বস্তুর নির্বা-চনের গোলকধাঁধায় পড়িয়া বাস্তব-বোধ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। বাস্তবধর্মকে যদি আরও একটু উন্নততর চেতনার সাহায্যে তুলিয়া লইতে পারিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যেও বাস্তবধর্মী সাহিত্যের একটা পথ খুলিতে পারিত। কাজেই error of Judgement এর ফলে দণ্ডীর হাতে বাস্তব চিত্রের tragedy ঘটিয়াছে। দণ্ডীর মত একজন শক্তিমান্ রোমান্টিক কবিকে আমাদের

(১) "কিন্তু বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্ নয়, রিয়ালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে।"—সা,স্ব.

(২) "Now a whole is that which has beginning, middle and end. A beginning is that which is not itself necessarily after any thing else, and which has naturally something else after it; an end is that which is naturally after something itself, either as its necessary or usual consequent and with nothing else after it; and a middle, that which is by nature after one thing and has also another after it". P.

পাইয়াও হারাইতে হইল। দশকুমার-চরিতের গল্পের কাঠামোয় তাই চিরাচরিত ধর্ম, নীতি, কল্যাণ ও সৌন্দর্যের ব্যভিচার।[১]

উদয়ন-কিংবদন্তীর বাসবদত্তাকে লইয়া অনেকেই গল্প ফাঁদিয়াছেন। কিন্তু সুবন্ধুর বাসবদত্তার কাহিনীর সহিত সে-কাহিনীর মিল নাই। আবার পতঞ্জলি যে বাসবদত্তার উল্লেখ করিয়াছেন, সে-কাহিনী না জানায় সুবন্ধুর কাহিনীকে আপাততঃ মৌলিক কাহিনী বলিতে হয়। তবুও মনে হয়, সুবন্ধুর বাসবদত্তার মূলে হয়তো কোন মৌখিক কিংবদন্তী থাকিবে।

যাহা হোক, বাসবদত্তার কাহিনীর মধ্যে কাহিনীর কোন বিশেষত্ব নাই। নায়ক-নায়িকা পরস্পর পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া প্রেমে পড়িলেন। পোষা শুক পাখীর সহায়তায় নায়ক-নায়িকার মিলন হইল। এখানেও কন্যান্তঃপুরে নায়ক-নায়িকার মিলন। নায়িকাকে লইয়া নায়কের পলায়ন। তাহার পর বিচ্ছেদ; নায়িকার কিরাত-হস্তে পতন; ঋষির অভিশাপে বাসবদত্তার পাষাণে পরিণতি। নায়কের স্পর্শে আবার মানবীদেহে প্রত্যাবর্ত্তন। তাহার পর মিলন। এখানে গল্পের আঙ্গিক হিসাবে স্বপ্নদর্শন, শুকপাখীর মুখে সংবাদ-পরিবেশন, ঐন্দ্রজালিক অশ্ব, অভিশাপ, রূপান্তর ও দৈববাণী প্রভৃতি। কথাসাহিত্যের Chivalry এর অভিযান কেবল স্বপ্নদৃষ্ট প্রেমিকার অন্বেষণে। প্রেমের অস্তিত্ব কেবল বর্ণনায়। তবে প্রেম এখানে রোমান্টিক। নানা দুর্যোগের মধ্যে পড়িয়াও প্রেমিকার মন কেন্দ্রচ্যুত হয় নাই। বাণের কথাকাব্যে প্রেমের স্তরগুলির যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আছে, ইহাতে তাহা নাই। তাই বলিতে হয়, বাসবদত্তার প্রেমকাহিনী কাদম্বরী-উপন্যাসের প্রেম-কাহিনীর যেন অস্ফুট পটভূমি।

তাই বলিতেছিলাম, সংস্কৃত সাহিত্যের গদ্য যত পথই পরিভ্রমণ করুক না কেন, উহার চিত্তে আছে অন্যথাবৃত্তি।[২] পার্থিব বাসনার রঙে রঙে রঙ্ খেলার যে পিচকারি পড়িতে থাকে, তাহাতে সারা আকাশ আবীর-গোলায় রাঙা হইয়া ওঠে। জীবনের রাগ আকাশের রক্ত-রাগে মিলাইয়া যায়। সেই রাঙা আকাশে জাগে ত্রিমূর্তি;—সত্য, শিব ও সুন্দরের মূর্তি।

---

(১) "All art to be truly great, must be moralised—must be in harmony with those principles of conduct, that tone of feeling, which it is the self-preservative instinct of civilised humanity to strengthen.' I. S. L.

(২) "অন্যথাবৃত্তি হল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মস্ত জিনিষ, এই অন্যথাবৃত্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়াপত্তন হল, অন্যথাবৃত্তি কবির চিত্ত মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা।"—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাণের জীবন-চরিত

কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কবি বাণভট্টের[১] আবির্ভাব। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ৬০৬ হইতে ৬৪৮ পর্যন্ত। অতএব খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাণ জীবিত ছিলেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কবির আত্মচরিতের কিছু পরিচয় মেলে তাঁহার রচিত হর্ষচরিতে ও কাদম্বরীতে। তাঁহার নিবাস ছিল কান্যকুব্জের শোণ-নদের পশ্চিম-তীরে প্রীতিকূটনামক গ্রামে। তিনি ছিলেন বাৎসায়ন গোত্রের ব্রাহ্মণ। হর্ষচরিতে তিনি যে বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে কুবেরের পুত্র অচ্যুত, ঈশান, হর ও পাশুপত; পাশুপতের পুত্র অর্থপতি; অর্থপতির ১১টি সন্তান। চিত্রভানু উহাদের অন্যতম। চিত্রভানুর পুত্র বাণ। বাণের মাতার নাম রাজ্যদেবী। বাণের শৈশবে রাজ্যদেবী পরলোক গমন করেন। মাতৃহীন বালকের পরিচর্যা ও পরিপালনের ভার পড়ে পিতা চিত্রভানুর উপর। চিত্রভানু মাতার ন্যায় বালককে পালন করেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাণের উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই সময়কার পিতৃস্নেহের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়াছে কবি-রচিত কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন-চরিত্রের আত্মকথায়। পিতৃ-বিয়োগের পর বাণ যৌবনসুলভ পদস্খলনে ও সাহচর্যদোষে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ওঠেন। তাঁহার সমবয়সী অনেক বন্ধু ছিলেন—ভাষা-কবি, বর্ণনা-কবি, প্রাকৃত-কবি, প্রশস্তি-কবি, ব্রহ্মচারিণী, সর্প-বৈদ্য, তাম্বুলবাহী, বৈদ্য, উপাধ্যায় (Reader), স্বর্ণকার, পর্যবেক্ষক, লিপিকর, চিত্রকর, নক্সাকার, ঢাকী, গায়ক, কন্যকা, বংশীবাদক, সঙ্গীত-শিক্ষক, অঙ্গ-সংবাহনকারী, নর্তক, অক্ষক্রীড়ক, জুয়াড়ি, নট, নর্তকী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, কথক, শৈবসাধু, ঐন্দ্রজালিক, ধন-অন্বেষক, ধাতুপরীক্ষক, কুম্ভকার, বাজীকর, ব্রাহ্মণ সাধু প্রভৃতি। এই শ্রেণীর বন্ধুবান্ধবের সাহচর্য যে তাঁহার পরিণত বয়সে কলাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও জীবন-অভিজ্ঞতার প্রেরণা যোগাইয়াছিল, তাহা রসিকমাত্রই অনুমান করিতে পারিবেন। যাহাহউক, ইহাদের সঙ্গে লইয়া তিনি দেশ-ভ্রমণে বহির্গত

(১) (ক) সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে নবা॥

(খ) বাণীপাণিপরামৃষ্টবীণানিক্কণ-হারিণীম্।
ভাবয়ন্তি কথং বান্যে ভট্টবাণস্য ভারতীম্॥ (গঙ্গাদেবী)

হন। বিদেশে রাজসভা, পণ্ডিতগোষ্ঠী, চতুর-সংঘ প্রভৃতির সহিত মিশিবার অভিজ্ঞতা হইতে পরিণত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া এবং জীবনদর্শন ও জীবন-অভিজ্ঞতায় ঋষিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও ক্রান্ত দৃষ্টি লইয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। দীর্ঘ দিনের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করায় আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। তিনি গৃহে ফিরিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অজিরাবতীতে মণিতারা শহরের নিকট এক শিবিরে হর্ষবর্ধন বাণকে ডাকাইয়া আনাইয়া তিরস্কার করেন। পরে সভাসদ্ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র-বিচারে বৈদগ্ধ্য দেখিয়া হর্ষবর্ধন তাঁহাকে রাজসভার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। সেই সভায় আরও দুইজন কবি ছিলেন—সূর্যশতকের কবি "ময়ূরভট্ট" এবং "মাতঙ্গদিবাকর"। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ও হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ছিলেন। তিনি যে বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সপ্তম শতকের ভারতবর্ষের কিছু তথ্য জানিতে পারি। হর্ষচরিতেও আমরা বাণের সমসাময়িক ভারতবর্ষের কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান পাই। বাণের ব্যক্তি-জীবনের দুইটি সূত্রের সন্ধান মেলে তাঁহার দুইখানি কাব্যে ;—একটি কাদম্বরীতে, অপরটি হর্ষচরিতে। কাদম্বরীতে পক্ষী বৈশম্পায়নের আত্মবিবৃতিতে উপন্যস্ত পিতৃস্নেহের অভিজ্ঞতায় ; হর্ষচরিতের ভূমিকায় উপনিবদ্ধ বংশবল্লী-বিবৃতি-মুখে সরস্বতীর অবতরণ-ভূমি শোণনদের সামগ্রিক বর্ণনার মধ্যে অনুস্যূত ক্ষীণ রেখায় আঁকা কবির স্বদেশ-প্রেমে। শোণনদ ও তাহার তীরভূমির বর্ণনার মধ্যে কবি-কল্পনার অভিজাত অলঙ্কার থাকিলেও তাহার প্রাণকেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত আপন গ্রামের নদের স্মৃতিটি কবির মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিছুদিন পরে ঘরে ফিরিয়া আত্মীয়বর্গ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া হর্ষবর্ধনসম্বন্ধে গল্প বলিতে আরম্ভ করেন। তাহারই ফলশ্রুতি হর্ষচরিত। গল্পটি তিনি আট উচ্ছ্বাস পর্যন্ত বলিতে পারিয়াছিলেন, শেষ করিতে পারেন নাই। হর্ষচরিতের মত কাদম্বরী-কথাসাহিত্যও বাণের অসমাপ্ত গ্রন্থ। কেহ কেহ মনে করিতেন যে 'চণ্ডীশতক', 'পার্বতী-পরিণয়' ও 'রত্নাবলী'—বুঝি বাণের রচনা। প্রথম দুইখানি পঞ্চদশ শতকের বামনভট্ট বাণের রচনা। রত্নাবলীও বাণের নয়। Winternitz-এর ধারণা বাণের স্বীয় গ্রন্থাগার ছিল এবং সেই গ্রন্থাগারে কবির নিজস্ব একজন অধ্যাপক (Reader) ও ছিলেন।[১]

(১) It is reported of the poet Bāṇa (about 620 after Christ) that he kept his own reader, so he must have possessed a considerable private Library.

H. I. L. vol. I, Pt.. I, p34

প্রাচীন কবিগণের জীবন-চরিত নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে কবি-মানসের যে পদচিহ্ন আছে, তাহা হইতে অন্ততঃ আমরা কবিগণের জগৎ ও জীবনসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি ; ধারণা করিতে পারি জগৎ ও জীবনকে তাঁহারা কী চক্ষে দেখিতেন—জগৎ ও জীবন তাঁহাদের চেতনায় ঘা দিয়া অন্তরতম সত্তার কেমন অনুভূতি টানিয়া বাহির করিত। সমাজ-জীবনের যে বাস্তবতার অগ্রগণ্য দাবি আধুনিক যুগের সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতেছে, সে দাবির তাঁহারা ধার ধারিতেন না ;—না জীবনে, না শিল্পে। জীবনে তাঁহারা ছিলেন জন্মান্তরবাদী। অখণ্ড জীবনধারার নিরবচ্ছিন্ন গতির একটি বিশিষ্ট ভূমিকাকে তাঁহারা চরম সত্য বলিয়া মনে না করায় জীবনের নিত্যকর্মপদ্ধতির—অশনপানের বেদনা-কণ্টকিত প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার তথাকথিত বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। শিল্পের জগতে বস্তু-জগৎ হইতে বাণ-প্রস্থের কৌশলে অপোহবৃত্তির (abstraction) ফলে আপন প্রতিভায় যে মনোময় জগৎ, সামগ্রিকতায় পরিপূর্ণ যে সুন্দরের জগৎ, কল্পনায় ও সৌন্দর্যে অনুবিদ্ধ যে অলৌকিক জগৎ, যে আস্বাদ-সর্বস্ব রসের জগৎ তাঁহারা গ্রথিত করিয়া রসিক জনের হাতে উপহার দিতেন, তাহাতে বাস্তবের ছায়া পড়িলেও কায়াটি তাহার কবি-ভাবনার জ্যোতির্ময় আনন্দঘন প্রকাশ-স্বরূপের। তাই তাহাদের রূপবর্ণনায় বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ মানবের পেশিবহুল দেহের যথাযথ ফটোগ্রাফ পাইনা, আমরা যাহা পাই, তাহা মানবমূর্তির সৌন্দর্যে-ফোটা রসেভরা এক চিরন্তন আদর্শের মন্ময় চিন্ময় ছবি। যে আদর্শ অচরিতার্থ বাসনার ঈপ্সিততমের সৌন্দর্য-সংবলিত দ্যোতনায় লীলাময়, প্রাণময়, জীবনময়, এ ছবি সেই আদর্শেরই ছবি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম উপন্যাসের অন্তর্গত ললিতগিরির গুহাগাত্রে ভাস্কর্য-শিল্পের চরম প্রকাশের মধ্যে বিধৃত পুরুষ ও নারীমূর্তি-সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুর ললিতকলা-সাধনার চরম রহস্যটি মুদ্রিত হইয়া আছে। "আর এই প্রস্তর মূর্তিসকল কে ক্ষোদিয়াছিল,—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণ-ভূষিত বিকম্পিত-চেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গ-সুন্দর-গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলন স্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেম-গর্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যেক্ষামা চকিতহরিনী-প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ"—

এই সকল স্ত্রীমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?" আরও বলি, পটে

অখিল রসামৃতমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখি, তাহা কোন্ মানবের প্রতিনিধি? সে মূর্তি অন্নময়ী নয়, মন্ময়ী—রসময়ী। তাই বলিতেছিলাম, নিরেট বাস্তবতা বলিতে যাহা বোঝায়, তাহার প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছিল চিরকালের। বাস্তবতাবোধ যে তাঁহাদের ছিলনা, তাহা নহে। যে-বাস্তবতা মানুষের প্রয়োজনে যুগে যুগে পরিবর্তনশীল, সে-বাস্তবতার প্রতি যদি তাঁহাদের ঝোঁক না থাকিয়া থাকে, তবে তাঁহারা যে বিশেষ একটা অপরাধ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বাস্তবতা কোথায়? তিনি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে ব্রিটিশ জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস আচার-বিচারের যোগ ছিল কোথায়? তাঁহার ভাবের রাগিনীটি নির্জনবাসী একলা কবির চিত্তবাঁশিতে বাজিয়াছিল—ইংরেজের স্বদেশী হাটে ওজনদরে যাহা বিক্রি হয় এমনতরো বস্তুপিণ্ড তাহার মধ্যে কী আছে জানিতে চাই।[১]" কবির এই মন্তব্য কীটস শেলির পক্ষেও প্রযোজ্য। কালজয়ী কবিদের নিকট মানবহৃদয়-নিষণ্ণ চিরন্তন স্থায়ী ভাবগুলি হইল বস্তু। সেই ভাবগুলি কবির চেতনায় সহযোগী ও অনুযোগী ভাবগুলির সংঘাতে মথিত হইয়া যদি সমূহালম্বনাত্মক জ্ঞানের তাপে গলিয়া ঝরিয়া নিতান্ত মানসগোচর, নিতান্ত মানস-প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে, সকলের হইয়াও যদি কেবল নিজের হইয়া ওঠে, তাহা হইলে সৃষ্টির জগতে, রসের জগতে তাহা হইল চিরন্তন বাস্তব। মানব-অনুভূতির উচ্চগ্রামে চেতনাবিদ্ধ যে বাস্তব, তাহাই সাহিত্যের বাস্তব। তাই কবিগুরু বলিয়াছেন—"ইংরেজীতে রীয়ল, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা।"[২]

"যেখান হইতে যেমন করিয়াই হউক, জীবনের আঘাতে জীবন জাগিয়া ওঠে, মানবজীবনতত্ত্বে ইহা একটি চিরকালের বাস্তব ব্যাপার।"[৩] এই আত্মোপলব্ধির বাস্তবতা, এই মানস-প্রত্যক্ষের বাস্তবতা, এই জীবনজাগানিয়া বাস্তবতা সংস্কৃত কবিগণের মানস-সহচরী ছিল। আসল কথা, আধুনিক জীবনরসিকদের সহিত প্রাচীন জীবনরসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হইল জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের স্বাতন্ত্র্যে। যুগে যুগে মানুষের যে রুচির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার মূলে আছে নূতন যুগের

(১) সা. প.

(২) সা. প.

(৩) সা. প.

জীবন-ধর্মের নূতন প্রেরণা। তাই অতুল গুপ্ত তাঁহার 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বলিয়াছেন—"মানবমনের যেগুলি চিরন্তন 'স্থায়ীভাব', সকল যুগের কাব্যের তারাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যেসব 'সঞ্চারী' কাব্যের রসকে গাঢ় করে, মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তাদের নব নব সৃষ্টি করে চলেছে।" তাই বলিতেছিলাম, নূতন যুগের নূতন বাণী যুগ-সাহিত্যে সঞ্চারী বা ব্যভিচারীভাবের ভূমিকায় উপস্থিত হয়, স্থায়ীভাব মানব-সত্যের বাণী বলিয়া চিরন্তন। তাহা হইলে কথাটি দাঁড়াইল এই, কবি-মানসের সংবেদনা যদি ঐক্যের বৃন্তটির উপর পাপড়ি-পরাগ-বর্ণ-গন্ধের সামঞ্জস্য মেলিয়া ধরিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সুষমা ফুটাইয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে সেই সুষমা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া তাহার নিজস্ব চিত্তবৃত্তির যে জাগরণ ঘটায়, সেই জাগৃতির প্রত্যক্ষ-গোচরতার মধ্যে—চিত্তের রসস্বরূপ প্রকাশের মধ্যে যে আস্বাদন—যে অনুব্যবসায় (aesthetic experience) ঘটে, তাহাই সাহিত্যের বাস্তব। এইরূপ বাস্তব-রচনার শক্তি বাণের ছিল। ছিল বলিয়া তিনি জন্ম-জন্মান্তরব্যাপিনী জীবন-ধারাকে, জন্ম-মৃত্যুর গ্রন্থিবিলুপ্ত দীর্ঘায়িত জীবন-ধারাকে—জন্মান্তরবাদকে কাঠামো (structure) করিয়া গল্প বলিতে পারিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে গল্পের ভিত্তিভূমি একটিমাত্র জীবনবৃত্ত। বাণের গল্পের ভিত্তিভূমি একই প্রাণদ্যোতনার একাধিক জন্মান্তরীণ জীবনবৃত্ত। জন্মান্তরকে ভিত্তি করিয়া যে গল্পের প্লট রচনা চলে, এ কেবল সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে বাণের প্রতিভায় দেখা যায়। ইহার পূর্বে আর কেহ এ দায়িত্বের ঝুঁকি গ্রহণ করেন নাই। কালিদাস একটু ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার "জননান্তরসৌহৃদানি" হয়ত বাণকে প্লট রচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছে। একই দুষ্যন্ত—তাঁহার দুইটি জীবন অভিশাপের মৃত্যুতে গাঁথা। অভিশাপকে মৃত্যু ধরিলে অভিশাপের পূর্ববর্তী জীবন অর্থাৎ তপোবন-বিবর্ধিত শকুন্তলার সহিত দুষ্যন্তের হৃদয়-যোগের জীবন হইল একটি জীবন এবং অভিশাপের পরবর্তী জীবন, যে-জীবনে পরস্ত্রী মনে করিয়া আপন সহধর্মিণীকে তিনি ত্যাগ করিলেন ;—ইহা হইল দ্বিতীয় জীবন। পাশাপাশি এই দুইটি জীবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিচ্ছেদক অভিশাপ। অভিশাপের ফলে দুষ্যন্তের পূর্বস্মৃতি ব্যাহত। মৃত্যুস্নান সারিয়া আমরাও যখন নবজীবনের তীরে আসিয়া উঠি, তখনও আমাদের পূর্বস্মৃতি থাকে না। অভিশাপ-মৃত্যু-আহত দুষ্যন্ত পূর্ব-জীবনের কথা মনে করিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু মৃত্যুর তলদেশ দিয়া পূর্ব-জীবনের ভাবস্রোত ফল্গুর মত বহিয়া চলিতেছে। তাই জননান্তরসৌহৃদের এ ভাব 'অবোধপূর্ব'। তাহা হইলে একই দুষ্যন্তের জীবনে যদি মৃত্যুর অভিশাপ-মুদ্রায় ভাবের একটানা স্রোতে ছেদ না

পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বাণের জন্মান্তর দিয়া রচিত কাহিনীতে জীবন-ভাবের ছেদ পড়িয়াছে, তাহাই বা বলি কী করিয়া? এই হৃদয়ভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারা যেমন কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন-চরিত্রে স্ফুট হইয়া আছে, চন্দ্রাপীড় বা পুণ্ডরীক-চরিত্রে তেমন হয় নাই। এখন কথা হইল, কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' পড়িয়া অভিশাপ-ছিন্ন দুষ্যন্তের জীবন-কাহিনীর রস-উপভোগে যে বাধা হয় না, তাহার কারণ ঐ দুইটি জীবনের সমন্বয় হইয়াছে গোটা দুষ্যন্তের মধ্যে। দুইটি জীবন লইয়াই গোটা দুষ্যন্তের জীবন। একটি জীবন অপরটির পরিপূরক অথবা দুষ্যন্তবৃত্তের পূর্ণ অভিব্যক্তি ভাববদ্ধ দুইটি জীবনে। প্রথম জীবনের ফুল, দ্বিতীয় জীবনের ফলে পরিণত হইয়াছে। তাই দুইটি জীবন লইয়া একটি গোটা জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আর্টের জন্য চাই একটা গোটা জীবন। জীবন অনন্ত হইলেও আর্টের জন্য তাহাকে সান্ত করিতে হইবে। দুষ্যন্তের মধ্যে এই সান্তরূপ প্রত্যক্ষ। এ্যারিস্টটলও আর্টের জন্য আদি-মধ্য-অন্ত-বিশিষ্ট বৃত্তের কথাই বলিয়াছেন। বৃত্তরচনায় বাণ যে কালিদাসের নিপুণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, তাহার কারণ বাণের অতি সাহস। কালিদাসের অভিশাপ মৃত্যু নহে, তবে মৃত্যুর মত ছেদক এবং অভিশাপ-উদ্ভিন্ন দুইটি জীবন-ধারা একটি বিশিষ্ট জীবন-ধারার সুসমঞ্জস সংহতরূপ। বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্পর্কে উহা একক। অঙ্কন-রেখার সুনিপুণ টানে উহা পূরিপূর্ণ ও জীবন্ত। একটি ফুলের বৃন্তকে কেন্দ্র করিয়া যে পাপড়িগুলি জাগে, তাহাদের মাপ সমান না হইতে পারে, স্তরেরও বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের মূল কেন্দ্রটি হইল ঐ বৃন্তটি। ঐ বৃন্তটিই ফুলের জীবন-কেন্দ্র। জীবন যেমন ব্যাপক ও স্বচ্ছন্দ, ফুলটিও তাই। অংশের সহিত পূর্ণের, পারিপার্শ্বিকতার সহিত মূলের জীবন-যোগের ঐক্য আছে বলিয়া ফুলটি সুন্দর; অংশীর মধ্যে অংশের পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া ফুলটি সুন্দর। কালিদাসের রচিত বৃত্তে এই ঐক্য, এই সংহতি, এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়া বৃত্তটি সুন্দর। বাণের অঙ্কিত বৃত্তগুলির মধ্যে এই পূর্ণতার অভাব আছে। বাণের অঙ্কিত বৃত্তে ঐক্য-সংহত একের পূর্ণ প্রকাশ নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। কালিদাসের যেখানে সুবিধা ছিল, বাণের সেখানে অসুবিধা। দুর্বাসার অভিশাপ মৃত্যু নহে। পাঠক জানেন উহা একটি আবরণ, একটু পরেই সরিয়া যাইবে। অভিশাপ সম্পর্কে পাঠকের মনের চেতনা—উহা যেমন বন্ধন, তেমনি মুক্তি। অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ হইতে মুক্তিরও ব্যবস্থা আছে। তাই ঐ ক্ষণিক আবরণের অসুবিধাটি তেমন অসুবিধা নয়। তাহার পর নাটকীয় প্রয়োজনায় ঐ অসুবিধার বোধটি কাটিয়া বিস্ময়-বোধে

পাঠকের মন ভরিয়া ওঠে। কিন্তু বাণের জীবন-বৃত্তের ঘটনায় অভিশাপের সঙ্গে আছে মৃত্যু। অভিশাপের সম্পর্কে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা থাকিতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পৌর্বাপর্য সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না। উহা লইয়া দার্শনিক তত্ত্ব দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে কিন্তু পাঠক সেই দার্শনিকতাকে হেয়ালি মনে করিতে পারেন। তাই পাঠকের মনে রস-উপভোগে বাধা হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়া জীবনের অমৃতধারা নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে, পাঠকের এই মানসিকতা সৃষ্টি করিতে না পারিলে পাঠক-চিত্ত সাড়া দিতে পারে না। এই মানসিকতা সৃষ্টি কবির কাজ নয়—জীবন-কবির কাজ—যুগমানসের কাজ। যুগ-মানস যদি এই বিশিষ্ট অনুভূতিতে গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে কবি ইহার পটভূমিকায় রস সৃষ্টি করিতে পারেন। বর্তমান যুগের যুগমানস এই জন্মান্তর-অনুভূতিতে পুষ্ট নয়। বাণের সময়কার যুগমানস যদি এই বিশিষ্ট অনুভূতিতে গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সে-যুগের পাঠকের রস না পাইবার কথা নয়। এখন বিচার করিয়া দেখা যাক বাণের সময়কার পাঠক-সমাজের যুগমানসটি ইহার অনুকূলে ছিল, না প্রতিকূলে ছিল?

এ আলোচনায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বে এই কথাটাই খুব জোর গলায় ঘোষণা করিতে চাই যে বাণ যে পটভূমির উপর তাঁহার 'কাদম্বরী'কে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষকালের বিশেষ পটভূমি নয়। ইহা হিন্দুমনের সনাতন পটভূমি। আর্য বৈদিক যুগ হইতে প্রবাহিত জীবনধারার সহিত ইহার নাড়ীর যোগ আছে। শুধু জন্মান্তরবাদ নয়, বৈদিকযুগের মানুষের যে সকল ভাবধারা মহাকাব্য ও পুরাণযুগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাঁহার কালে আসিয়া ঠেকিয়াছিল, নব নব রূপ-পরিবর্তনের মধ্যে যাহার মূলটি বার বার নূতন নূতন চেতনায় ভাসিয়া নিখিল ভারতীয় মানসকে মথিত ও অভিভূত করিয়া জীবনে প্রোথিত করিয়া কালের সহিত সমানতালে পা ফেলিয়া তাঁহার কালে আসিয়া ঠেকিয়াছিল, বাণ সেই পটভূমির সমগ্রতাকে তাহার চিরন্তন সত্তাকে সেই সত্তার অঙ্গে অঙ্গে জড়িত বাসনাকে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবন-ধর্ম ও জীবনবোধকে একটি মাত্র কেন্দ্রে সংহত করিয়া গল্পের পটভূমি রচনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার গল্পের উপাদানে আসিয়া ধরা দিয়াছে প্রাক্-বৈদিকযুগের জীবন-বিশ্বাস, বৈদিকযুগের ধর্মচেতনা ও কিংবদন্তী, মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগের সংস্কার, নীতিবাদ ও কিংবদন্তী। শুধু তাহাই নয়, লোক-কথার কিংবদন্তীও সেই ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া জীবন-মন্থনের অমৃত ফেনাইয়া তুলিয়াছে। এক কথায় বলিতে চাই, প্রকাণ্ড

হিন্দুজাতি, প্রকাণ্ড তাহার জীবন-জিজ্ঞাসা। সেই জীবন-জিজ্ঞাসার ফলিতরূপের মহোৎসব সৃষ্টি করিয়াছেন বাণ তাঁহার কাদম্বরীতে। সমস্ত হিন্দু জাতির বাসনা-লোকের যদি কেহ একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখিতে চাহেন, অখণ্ড হিন্দু মনের নিখিল সংস্কারকে যদি কেহ একটিমাত্র কেন্দ্রে সংহত দেখিতে চাহেন, সর্বব্যাপক যুগান্তরবাহী পরিপূর্ণ হিন্দুমনকে যদি একটিমাত্র যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে কাদম্বরী পড়িতে হইবে। কাদম্বরী সেই হিন্দু মনের গীতি-কবিতা, হিন্দু-জীবনের মহাকাব্য, হিন্দু-বাসনার অজন্তার চিত্র, হিন্দুর মানস ধ্যানের জীবন-সঙ্গীত।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির মধ্যে মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ভাবী জীবন সম্পর্কে ঋগ্বেদের ঋষিরা কী ভাবিতেন, তাহার সম্বন্ধে সর্বাধিক পরিচয় পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সর্বশেষ মণ্ডলটির অন্ত্যেষ্টি সূক্তে। ঋষিদের ধারণা ছিল, মৃত ব্যক্তির আত্মার ধ্বংস হয় না। দেহ হইতে আত্মার পৃথক্‌ভাব কেবল মৃত্যুর মধ্যেই ঘটে না, জীবিত মানুষের অচেতন অবস্থার মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। ঋগ্বেদে বা পরবর্তী বেদগুলিতে জন্মান্তরবাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের জাগরণের পর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করে। অবশ্য ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আত্মার জলে বা ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষে সংক্রমণের কথা পাওয়া যায়। উক্ত সূক্তে বিধৃত ধারণার মধ্যে হয়তো পরবর্তী কালের জন্মান্তরবাদের উৎস থাকিতে পারে। দশম মণ্ডলের পাঁচটি সূক্তে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ আছে। চারিটি সূক্তে ভবিষ্যৎ জীবনের সহিত সম্পৃক্ত দেবগণের আবাহনই মুখ্যবিষয়। শেষ সূক্তটি হইল খাঁটি অন্ত্যেষ্টি সূক্ত। এই সূক্তটির রীতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ লৌকিক ধরনের। সেকালের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার প্রথাগুলির পরিচয়ও এই সূক্তে আছে। মৃতের অগ্নি-সংস্কারের বিধির সহিত জড়িত ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা। অগ্নিকে মনে করা হইত দেবলোকে ও পিতৃলোকে শবদেহের বাহন। অগ্নিসংস্কারের কালে ছাগ বলি হইত। এইরূপ ধারণা ছিল যে ঐ ছাগ মৃতব্যক্তির পিতৃলোকে আগমণের কথা আগেই জানাইয়া দিবে। অথর্ববেদেও এইরূপ অনেক কথা আছে। ভাবী জীবনে ব্যবহারের জন্য মৃতদেহের সহিত অলঙ্কার ও বস্ত্রদান করা হইত। এই প্রথা কেবল বৈদিক যুগের নয়, এপ্রথা আরও প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ আছে। বীর স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে তাহার পত্নীকে শোয়াইয়া দেওয়া হইত। ভাবটি ছিল এই, উভয়ে পরলোকে একত্র যাইয়া

উঠিবে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলিতে জন্মান্তরবাদ অনেকখানি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিকালেই জন্মান্তরবাদ পুরাপুরি সপ্রতিষ্ঠ। তাই বুদ্ধদেব বিনাপ্রশ্নেই ইহাকে মানিয়া লইয়াছিলেন। এই জন্মান্তর বাদের প্রাচীন রূপটির সন্ধান মেলে শতপথ ব্রাহ্মণে। ঐ গ্রন্থেই জন্মমৃত্যুর নিত্য ঘটমানতার সহিত কর্মসম্বন্ধ জড়িত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী ও বিহিত যজ্ঞের সম্পাদক, তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন অমরতা লাভের জন্য এবং যাঁহারা ইহার বিপরীত, তাঁহারাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই গ্রন্থে পৌনঃপুনিক জন্ম-মৃত্যুর যে প্রসঙ্গ তোলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পারত্রিক। এই মতবাদ ইহলোকের সম্পর্কে আসিয়া উপনিষদে জন্মান্তরবাদের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বৃহদারণ্যকের জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের মধ্যে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মৃত্যু, জন্মান্তর ও মুক্তির কথা আছে।

আর্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"যাজ্ঞবল্ক্য, যখন মানুষের মৃত্যুর পর তাহার বাক্‌শক্তি অগ্নিতে, শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ুতে, দৃষ্টিশক্তি সূর্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণশক্তি দিঙ্‌মণ্ডলে, দেহ মাটিতে, আত্মা ব্যোমে, রোমরাজি গুল্মে, কেশদাম বৃক্ষে এবং রক্ত ও বীর্য জলে মিশিয়া যায়, তখন মানুষটি কোথায় থাকে ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"হে প্রিয় ! আমার হাত ধর। আর্তভাগ ! আমরা দুইজনেই কেবল এ বিষয় জানিব। দশজনের মধ্যে এ আলোচনা হইতে পারেনা।" দুইজনেই বাহির হইয়া গেলেন ; দুই জনেই আলোচনা করিলেন। তাঁহারা কর্মের কথাই বলিলেন। সৎকর্মের মধ্য দিয়া মানুষ সৎ হয় এবং অসৎ কর্মের মধ্য দিয়া মানুষ অসৎ হয়। এই উপনিষদে আত্মার পরিক্রমার সহিত জন্মান্তরের কথা আরও বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে :

ম্রিয়মান ব্যক্তির হৃদ্‌বিন্দু দীপ্ত হইয়া উঠিলে সেই দীপ্ত আলোকের পথে চক্ষু, ব্রহ্মরন্ধ্র অথবা অঙ্গান্তরের মধ্য দিয়া আত্মা পরিক্রমণ করেন। আত্মার অনুসরণ করে প্রাণ, প্রাণের পশ্চাতে চলে ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়গণের পশ্চাতে চলে চৈতন্য কিন্তু বিজ্ঞানাত্মা আত্মা বিজ্ঞানময়ই থাকেন। জ্ঞান, কর্ম, প্রাক্তন সংস্কার তাঁহার থাকে। লুকা যেমন একটি তৃণের শেষ ভাগে উপনীত হইয়া অন্য তৃণখণ্ডে উঠিবার জন্য নূতন তৃণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইরূপ মানুষও দেহ ও অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া অন্য দেহে সংক্রমণের উদ্দেশ্যে নূতন শরীরের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। যেমন সূচি-শিল্পিনী তাহার সূচিকর্মের সামান্য অংশ খুলিয়া ফেলিয়া সেইখানে নূতন ও সুন্দরতর নক্সা গড়িয়া তোলে, সেইরূপ আত্মাও দেহ ও অবিদ্যা হইতে মুক্ত

হইয়া নিজের জন্য ভিন্ন প্রকারের সম্পূর্ণ নূতন ও সুন্দরতর দেহ ধারণ করেন। জীবিতকালে তিনি যেমন কর্ম করেন, যেরূপে জীবন যাপন করেন, নূতন বিগ্রহে তিনি তেমনটি হইয়া ওঠেন ; জীবনে যিনি সৎ কাজ করেন, তিনি সৎ হইয়া, যিনি অসৎ কাজ করেন, তিনি অসৎ হইয়াই জন্মান। সৎকার্যের মধ্যদিয়া সৎ, অসৎ কার্যের মধ্য দিয়া তিনি অসৎ হইয়া ওঠেন। ইচ্ছাবৃত্তি অনুসারে মানুষ তাহার রূপ গড়িয়া তোলে, ইচ্ছাবৃত্তি অনুসারেই তাহার সংকল্প জাগে, সংকল্প অনুসারে কার্য করে এবং কার্যের অনুপাতে সে তাহার অদৃষ্ট গড়িয়া তোলে। এই উপনিষদেই সর্বপ্রথম কর্মবাদের কথা শোনা যায়। বৃহদারণ্যক বলেন, মানুষের কর্ম অনুসারে তাহার জন্ম হইয়া থাকে। মানুষের দেহ যখন মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, অবশিষ্ট থাকে কেবল কর্ম। এই কর্মই নির্ধারিত করিয়া দেয়, মানুষ ভাল কী মন্দ। মনে হয়, ইহাই বৌদ্ধধর্মের জন্মান্তর-বাদের বীজ। বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও জন্মান্তরের কারণরূপে কর্মকে স্বীকার করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদেই জন্মান্তরবাদের বেশী আলোচনা হইয়াছে। জ্ঞান ও বিশ্বাসের আধার আরণ্যক ঋষিরা মৃত্যুর পর দেবযানে গমন করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যে-সকল সংসারী সৎকর্ম ও যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তাঁহারা পিতৃযানে গমন করিয়া চন্দ্রলোকে উপস্থিত হন এবং কর্মফলের নিষ্কৃতি পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। তাহার পর মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিয়া উদ্ভিদ্‌যোনি প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে মনুষ্য-সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের একটিকে আশ্রয় করেন। এখানে আমরা কর্মের দুইটি ধারার সাক্ষাৎ পাই—একটি পরলোকে, অপরটি জন্মান্তরের মধ্য দিয়া ইহলোকে। প্রথমটি হইল, ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদের বহতা ধারা। দ্বিতীয়টিতে—দেখা যায় অসৎ ব্যক্তির চণ্ডাল, কুক্কুর অথবা শূকর-যোনিতে জন্মগ্রহণ। শ্বেতকেতুর পিতা ব্রাহ্মণ গৌতম প্রবহণ-রাজের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য গমন করেন। প্রবহণ গৌতমকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জড়িত ছিল জন্মান্তরবাদ। প্রবহণের মুখেই প্রচ্ছন্ন মতবাদ হিসাবে জন্মান্তরবাদের কথা সর্বপ্রথম শোনা যায়। এই জন্মান্তরবাদ ব্রাহ্মণগণের অজ্ঞাত। ইহা ক্ষত্রিয়ের দান।[১] কৌষিতকি উপনিষদ আবার কিছু ভিন্ন মত পোষণ করেন। মৃত ব্যক্তি

---

(১) 'In the Upanisads, however, we are repeatedly told that kings or warriors are in possession of the highest knowledge, and that Brahmans go to them for instruction.' H. I. L. P. 201

মাত্রই চন্দ্রলোকে গমন করেন। তথা হইতে কেহ বা পিতৃযানে যাইয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হন, কেহ বা মর্ত্যলোকে ফিরিয়া স্বীয় কর্ম ও জ্ঞানানুসারে মনুষ্য হইতে পতঙ্গ পর্যন্ত যে-কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাঠক উপনিষদে নচিকেতের উপাখ্যানে যমের নিকট নচিকেতের প্রশ্ন ছিল—মৃত্যুর পর মানুষ থাকে, কি থাকে না। যম বলিয়াছিলেন—জন্ম ও মৃত্যু জীবন-প্রবাহের দুইটি দিক্ মাত্র। ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নতা অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত বিশ্বাত্মার অভিন্নতা যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জানিতে পারেন, তিনিই কেবল মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। মহাকাব্যে জন্মান্তরবাদ সাধারণ্যে স্বীকৃত দেখা যায়। সেখানে প্রাণিগণ ক্রমানুসারে ব্রহ্মা হইতে মনুষ্য ও পশু জন্মের মধ্য দিয়া সর্বনিম্ন পতঙ্গ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। ইহা হয়তো এপিক বা মহাকাব্য-সুলভ কল্পনারই ফল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিষ্ণুকে পশুরূপে অবতার গ্রহণ করিতে এবং ঋষি-সন্ন্যাসী-দিগকে স্বর্গ-মর্ত্যে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়; নররূপী রাজগণও স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন। জন্মান্তরবাদের ঐতিহাসিক আলোচনা করা হইল কিন্তু আর্যগণের বিশ্বাসে ইহার পরিণামের কথা না বলিলে মন সাড়া দিতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ নিত্যকাল ধরিয়া চলিলে মানব মনের বিশ্রান্তি কোথায়? মানুষ কি এই জন্ম-মৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন ধারা বাহিয়া নিত্যকাল ছুটিবে? ইহার কি শেষ নাই? যতদিন না মানব মনে জ্ঞান ও ধ্যানের ফলে বোধি জাগ্রত হইয়া সকল সংসার-বন্ধন ছিন্ন না করে,[১] বন্ধন-মুক্তির ফলে যতক্ষণ না জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য ঘটে,[২] ততক্ষণ আত্মার এই দেহান্তর ভ্রমণের বিশ্রাম নাই। বোধিলাভের ফলে মানুষের যে অবস্থা ঘটে তাহার নাম জীবন্মুক্তি।—তাহা হইল সৎ, চিৎ ও আনন্দের অভীপ্সিত অবস্থা। অতএব দেখা যাইতেছে, বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এপিক যুগের মধ্য দিয়া পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত জন্মান্তরবাদ দিনের পর দিন উদ্ভিন্ন হইয়া নানা সংশয়ের ও সন্দেহের অতীতে উঠিয়া মহাসত্য-রূপে হিন্দুর চিরন্তন বিশ্বাসরূপে ভারতীয় মানসে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এই

---

(১) যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠোপনিষৎ, ৩।১৪
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

(২) যোঽন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ৫।২৪

জন্মান্তরবাদের পরিণত রূপের মধ্যে আমরা ঘনপিনদ্ধ থিয়োরীরূপে স্বীকৃত জন্মান্তরবাদকেই কেবল পাই না, তাহার সঙ্গে পাই জন্মান্তরবাদে আজন্ম নিত্য-বিশ্বাসী যুগে-যুগে বহিয়া-আসা হিন্দুর—ভারতবাসীর পৌর্বাপর্য-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অখণ্ড মানস চেতনা। বাণ ইহাকে লইয়াই তাঁহার গল্পের বনিয়াদ তৈয়ারী করিয়াছেন—প্লট রচনা করিয়াছেন। অতএব বাণকে যথার্থ শিল্পী বলিতে হইবে। ভারতবাসীর এই জীবন-দর্শন, জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের এমনি ভূমা দর্শন যাহার থাকে, তিনিই তো যথার্থ ভারতীয় শিল্পী। আমরা এই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি বা না করি, যাহাদের জন্য তিনি গল্প রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং ভারতীয় মানসে কালজয়ী বলিয়া এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে যাহা রচিত, তাহারও কালজয়ী হইবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহা যে অন্যতম, একথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাদম্বরী উপন্যাসে জন্মান্তরবাদের উপর রচিত চরিত্র চন্দ্রাপীড়, বৈশম্পায়ন, কপিঞ্জল ও পত্রলেখা। ইহাদের মধ্যে জন্মান্তরের 'অবোধপূর্ব' ভাবটির স্পষ্ট অনুসৃতি আছে পুণ্ডরীক-চরিত্রে। পুণ্ডরীক-চরিত্রে কাম-স্বরূপের উৎকট আতিশয্য না থাকিলে কামকে আত্মবিলোপী প্রেমে পর্যবসিত করিতে পারিলে চরিত্রটি অনবদ্য হইত। বাণভট্ট যে তাহা পারেন নাই, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। চন্দ্রাপীড়ের চরিত্রে চন্দ্রাবতারের কোন 'অবোধপূর্ব' ভাব নাই, চন্দ্রাপীড়-অবতারের পর শূদ্রক-অবতারেও তাহা নাই। যাহা সামান্য আছে, তাহা কেবল নাটকীয় প্রয়োজনার জন্য। শুকপাখীর মুখে শুনিয়া তাঁহার জন্মান্তরের কাদম্বরীর মুখ মনে পড়িয়া গেল এবং পূর্বস্মৃতির জাগরণের ফলে তিনি মিলনের জন্য উন্মুখ হইয়া শূদ্রক-দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় চন্দ্রাপীড়ের দেহে ফিরিয়া আসিলেন। স্মৃতির এই জাগরণ যতটা বৈদ্যুতিক ও নাটকীয়, ততটা 'অবোধপূর্ব' অন্তরাত্মার আঘাতজনিত নয়। কপিঞ্জল-চরিত্রে বন্ধুপ্রীতি বলবান্ কিন্তু অশ্বাবতারে চন্দ্রাপীড়কে মহাশ্বেতার আশ্রমের দিকে বহিয়া আনিলেও সে-বন্ধুপ্রীতি যতটা পরোক্ষে কাজ করিয়াছে, ততটা প্রত্যক্ষে নয়। এই চরিত্রে 'অবোধপূর্ব' বন্ধুপ্রীতির যে একেবারে অনুসরণ নাই তাহা বলা চলে না, তবে অশ্বাবতারে সে-বন্ধুপ্রীতিটার তত সজ্ঞান প্রকাশ নাই। অন্তত: পুণ্ডরীকের মত সেই motive force, নাট্যায়নে যাহাকে 'বিন্দু' [১] বলে,

---

(১) "ইত্যেবং প্রধানানুসন্ধানচেতনব্যাপারঃ কারণানুগ্রাহী স্বয়ং চ পরমকারণস্বভাবস্তৈলবিন্দুবৎ সর্বব্যাপকত্বাদপি বিন্দুঃ বীজং চ মুখসন্ধেরেব প্রভৃত্যাত্মানমুন্মেষয়তি।" A. bh. Vol III, 14

কপিঞ্জলে তাহার উৎকর্ষ নাই। পত্রলেখার চরিত্রে সেবার মধ্যে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সখীভাব থাকিলেও রোহিণী-জীবনের সহিত তাহার যোগ নিতান্ত কাল্পনিক। কিংবদন্তীর সূক্ষ্মরেখায় এ কল্পনা দাঁড়াইয়া। একই মতবাদের উপর অনেকগুলি চরিত্র দাঁড় করাইতে যাইয়া বাণ যে বেশ একটু গোলে পড়িয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

জন্মান্তরবাদের সহিত আনুষঙ্গিকভাবে আসিয়া পড়ে কর্মফলের প্রশ্ন। কাদম্বরীতে দেখিতে পাই প্লটরচনা বা ঘটনাবিন্যাসের কাজে বিশেষ করিয়া বৈশম্পায়ন-চরিত্রের অনুবন্ধে এই কর্মফলের কালজয়ী চেতনাকে কবি কাজে খাটাইয়াছেন। শিল্প-উপন্যাসের মধ্যে কর্মফলের যোগ্যতা কতটুকু, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। জন্মান্তরবাদের সহিত কর্মফলের প্রাসঙ্গিক আলোচনা হইয়াছে কিন্তু আলোচনার দিঙ্‌ নির্ণয় হয় নাই। জন্মান্তরবাদের মত কর্মফলের চেতনা যেমন প্রাচীন, তেমনি ঐতিহ্যময়।

জন্মান্তরবাদের সহিত কর্মবাদ জড়িত থাকিলেও ভারতীয় চিন্তায় কর্মবাদের একটি প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদীয় ধর্মের প্রথম স্তরে দেবতা, দ্বিতীয় স্তরে হোম, তৃতীয় স্তরে ঋতের স্থান। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া আর্যগণ ঋতেও বিশ্বাসী ছিলেন। কালক্রমে এই ঋতের ধারণাগুলি দুইটি বিশিষ্টখাতে প্রবাহিত হইল— একটি যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে, অপরটি দার্শনিক চিন্তায়। ঋত বলিতে বোঝায় প্রকৃতিতে অনুস্যূত নিয়ম-পরিক্রমা। ঋতের ফলেই দিনের অব্যবহিত পরে রাত্রি আসে, ঋতুগুলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়, নদী প্রবাহিত হয়। ঋত হইল গতি, প্রকৃতি ও সৃষ্টির নিয়ম। ঋতের শাসনে জগৎ শাসিত। দেবগণও এই ঋতকে মানিতে বাধ্য। ঋতকে না মানাই পাপ। এই ঋতকে বা প্রকৃতির অন্তরস্থিত নিয়মানুবর্তিতাকে ভারতের প্রথম যুগের দার্শনিকেরা ধরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া প্রাকৃতিক রূপের নানা অবস্থাকে বিশ্ব-নিয়মের মধ্যে অনুস্যূত একটি মাত্র ঐশী ইচ্ছাবৃত্তির মধ্যে সমন্বিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই ঋতের সহিত জড়াইয়া উঠিলেন স্বর্গীয় বা আকাশ-দেবতা বরুণ। ঋগ্বেদের বহু দেবতার মধ্যে ইনি খুব মনোজ্ঞ। ইনি রাজা, ইনি বিশ্বরাজ্যের সম্রাট্। ইনি সর্বশক্তিমান্ ও বিশিষ্ট নীতিবিদ্। ইনি সর্ব্বগ, সর্বজ্ঞ ও জন্ম-মৃত্যুর নিয়ামক। সকল দেবতা ও মানুষ ইঁহার নিয়মাধীন। ইনি নৈতিক নিয়মের প্রভু। সকল দেবতাকে ইনি একীভূত করিয়া তোলেন।

আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি বৈদিক মানুষ দেবযান ও পিতৃযানে বিশ্বাসী

ছিলেন। এই বিশ্বাসের পাশে ছিল ঋতের বিশ্বাস। উপনিষদ পাশাপাশি এই দুইটি বিশ্বাসকে বৈপ্লবিক চিন্তার মধ্যে টানিয়া আনিয়া অনার্য প্রভাব হইতে আগত কর্ম ও জন্মান্তর মতবাদের সহিত গ্রথিত করিয়া তুলিয়া ইহার এক পরিণত রূপদান করিলেন। উপনিষদের চারিটি বক্তব্যের[১] মধ্যে দুইটি হইল—কর্মবাদ ও জন্মান্তর-বাদ। ঔপনিষদিক চিন্তা-ও অ-ব্রাহ্মণ সমাজে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা হয়। যাহাহৌক, ঋত পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। সেই ঋতের মধ্যে সকল দ্রব্যের যথাযথ স্থান ও ক্রিয়া বিধৃত হইয়া আছে। কর্মবাদ ঋতের সেই বিধিকে নূতন ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া অমোঘ কর্ম ও তাহার পুরস্কারের ব্যাখ্যা দিয়াছে এবং মানুষের উপরেই তাহার সুখ-দুঃখের দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছে। উপনিষদে মানুষই তাহার সুখ-দুঃখের বিধাতা। আত্মকর্মফলের অধীন হইলেও সে কর্মের হাতে অসহায় যন্ত্র নয়। ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি তাহার আয়ত্ত বলিয়া মানুষ কর্ম অপেক্ষাও শক্তিমান্। উপনিষদ কর্মের অনুপাতে পৃথিবীতে জন্মান্তর গ্রহণের তত্ত্বটি বাঁধিয়া দিলেন। এই ধারণা যুগ যুগ ধরিয়া দানা বাঁধিতেছিল এবং কর্মবাদের অনুবন্ধে ঔপনিষদিক চিন্তার কাঠামোর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মধ্য দিয়া জন্মান্তরবাদের সহিত গ্রথিত কর্মবাদ ভারতীয় মানসে নিত্যকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অতএব ভারতীয় জীবন-অভিব্যক্তির সহিত যে সকল চিন্তা ভারতীয় মানসকে ক্রম-পরিণতিতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, কালের ব্যবধানে যাহার ক্ষয় না হইয়া পুষ্টিই ঘটিয়াছে, যাহা ভারতীয় গণমনের জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নের সহিত গ্রথিত, যাহার উত্তাপ শ্বাস-প্রশ্বাসে, গতি রক্তপ্রবাহে. বাণভট্ট এইরূপ এক শাশ্বত জীবনবোধকে তাঁহার গল্পের কাঠামোর মধ্য দিয়া ভারতীয় পাঠকের চিন্তাভূমিতে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। শুধু জন্মান্তর ও কর্মবাদ নয়, ভারতীয় কিংবদন্তীতে যুগে যুগে যাহা ভারতীয় মনকে স্পর্শ করিয়াছে, বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছে, আশা দিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা দিয়াছে, ব্যর্থতার বেদনা মুছিয়া দিয়াছে, পরাজয়ের গ্লানিকে নূতন অমৃত আস্বাদে ভরিয়া তুলিয়াছে, হাসাইয়াছে, কাঁদাইয়াছে, ভালবাসিয়াছে ভাল-বাসাইয়াছে, সেই কিংবদন্তীগত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, রূপান্তর, দেহান্তরগমন, অভিশাপ, দৈববাণী, মিলন, বিরহ, সুদূরের পিপাসা, প্রেমের অভিসার প্রভৃতি একত্র সংহত করিয়া একদিকে যেমন গল্পের মালা বাঁধিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে এই সকল

(১) "The substance of the teachings of the Upanishads, thus, is represented in the four concepts of Atman, Brahman, Karma and rebirth." A.I. p. 171.

ভাবরসে পুষ্ট, উল্লসিত, রোমাঞ্চিত পাঠকমনকে স্পর্শ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিভার কেবল 'পরিকল্পিত স্বত্বযোগ' নহে, পাঠকচিত্তের সহিত তাঁহার মানসী সৃষ্টির তাদাত্ম্যের গ্রন্থিবন্ধন। একদিকে যেমন তিনি সৃষ্টির সেতুবন্ধ করিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি পাঠক মনকেও সমান্তরালভাবে বাসনালোকে পুঞ্জীভূত তথ্য-গুলির নবনির্বাচনের মাধ্যমে স্পর্শ করিয়াছেন।

আধুনিক কালে আধুনিক কবি বাস্তব জগৎ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আপন বাসনা অনুযায়ী নির্বাচন করিয়া আপন বাসনায় জারিত করিয়া প্রতিভা ও কল্পনা বলে নূতন এক অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করিয়া পাঠকের চিত্তে illusion of reality বনাইয়া তোলেন, প্রতিভার যাদুমন্ত্রে বাস্তবকে টান দিতে যাইয়া বিশেষ কালের বিশেষ সমাজের বিশেষ বাস্তব-সংস্কারপূর্ণ পাঠকচিত্তকে টান দিয়া থাকেন। তাহার ফলে কবি-হৃদয়গত অনুভূতির সহিত পাঠক-হৃদয়গত অনুভূতির corres-pondence বা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদ[১] চলিতে থাকে এবং কবিপ্রতিভার নৈপুণ্যে কল্পনার বিশদীকরণে ঐক্যের ঘনবিন্যাসে পাঠকচিত্তে অনুব্যবসায়ের (aesthetic experience) ক্রমিক ধারা বহিতে বহিতে যখন চমৎকারের ভূমিকায় যাইয়া ওঠে, তখনই তাহার মনে রস সৃষ্টি হয়। এই রস জন্যও নয়, জনকও নয়। সহৃদয়ের বাসনা-লোকের পূর্ণাভিব্যক্তির এক চরম রূপ—অনুব্যবসায়-জনিত চিত্তের এ এক

---

(১) (ক) "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়-সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ" অভিনবগুপ্ত ; ধ্ব, আ লোচন।

(খ) "Every art causes those to whom the artist's feeling is translated to unite in soul with the artist and also with all who receive the same impression."

Tolstoy.

(গ) "There is not only the working of the imaginative reason in the poet's mind but there is the working of the imaginative reason in the mind of the hearer or reader. In this latter operation our own mind co-operates with the mind of the poet, and it is this co-operation which makes Poetry gives us the intimate sense of the reality of things of which Matthew Arnold speaks." p.c.

(ঘ) ক্রীড়াপ্রস্তাবব্যাজোপদেশকাঃ বিগতরাগদ্বেষা মধ্যস্থবৃত্তয়ঃ নির্মলহৃদয়মুকুরে সতি তন্ময়ীভবনযোগ্যতোপেতা আহিতরসাস্বাদাঃ সামাজিকাঃ। না, ভা,

(ঙ) * 'সহৃদয়' সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসকের পারিভাষিক শব্দ। সংসারে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও ও বিখ্যাত কাব্যকর্তাদের শ্রেষ্ঠ রচনার সহিত পরিচিতির জন্য কাব্যে ও নাট্যে পরিবেশিত বস্তুতে তন্ময় হইবার যোগ্যতা যাহার আছে সেই সহৃদয়। সহৃদয় কাব্য-নাট্য-বর্ণিত বিষয় ও চরিত্রের সহিত অনায়াসে নিজের একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ইহার ফলে কাব্য-নাট্য-বর্ণিত আস্বাদ লাভ তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে।—র, স, পৃ, ৯৯

অভিনব আস্বাদ। এই রসের সাক্ষাৎ গ্রন্থে ঘটেনা, ঘটে সহৃদয় পাঠকের অনুব্যবসায়-রঞ্জিত আপন চিত্তে। তাই ইহাকে বলা হয় সহৃদয়-হৃদয়-সাক্ষাৎকার। আধুনিক কালের পাঠক-মনের বাস্তব সংস্কার যেমন আধুনিক কবির লক্ষ্য, প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণের লক্ষ্য ছিল, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা নয়, চিত্তের চিরস্থায়ী বৃত্তিগুলির সমীকরণের দ্বারা ভাববিশেষের মুখ্যকরণের বাস্তবতা। হিন্দুর চিত্তলোকে অনন্তকাল ধরিয়া যাহা ঘটিয়াছে, যে-ঘটনার রক্তরাগচ্ছটা ইন্দ্রধনুর ন্যায় তাহার চিত্তাকাশকে যুগ যুগ ধরিয়া রঞ্জিত করিয়া আসিয়াছে, যাহা তাহাকে ভাষা দিয়াছে, আশা দিয়াছে, জাগরণে ও স্বপ্নে প্রেরণা যোগাইয়াছে, সেই চিত্তলোকে নিরূঢ় তথ্যগুলির নির্বাচন, জারণ, সমীকরণ, সাধারণীকরণ, কল্পনায় বিশদীকরণ, ঐক্যে নিপীড়ন করিয়া সুষমা ঘনাইয়া তুলিয়া বাণভট্ট সহৃদয় পাঠকের হৃদয়-সাক্ষাৎকার ঘটাইয়াছেন। আপন মনের অনুভূতির পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দিয়া তিনি পাঠকচিত্তের অভিনব জাগৃতিকে স্পর্শ করিয়াছেন। তাই তাঁহার সৃষ্ট কাব্য-জগতের সহিত পাঠকের সুসমঞ্জস চিত্তজগতের হৃদয়-সংবাদ দুলিয়া উঠিয়া উভয় উভয়কে আহত করিয়া মথিত করিয়া আকর্ষণে ও বিকর্ষণে পরস্পর পরস্পরকে প্লাবিত করিয়া—তরঙ্গে তরঙ্গে হানাহানি করিয়া রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের এক নৈর্ব্যক্তিক জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানবদেহকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন অন্নময় দেহের সকল সংবাদ পাওয়া যায়, পাওয়া যায়না কেবল প্রাণের—আত্মার তথ্যটুকু, তেমনি বাণের কাদম্বরীর কাব্য-শরীরটিকে বিশ্লেষণ করিলে হিন্দুচেতনার সর্বায়বের সংবাদ পাওয়া যায়; শরীর-নিষণ্ণ আত্মার ন্যায় কাব্যদেহে-গুহায়িত রসের সংবাদের পরিমাপক যন্ত্র কবিসৃষ্টির নৈপুণ্যের সহিত গ্রথিত পাঠকচিত্তের হৃদয়-সংবাদ। বাণের শৈল্পিক প্রতিভায় হৃদয়-সংবাদের সার্থক প্রতিফলন হইয়াছে কিনা তাহাও বিচার্য বিষয়।

কবির কাব্যসৃষ্টির মূলে আছে বাসনা। সেই বাসনা সৃষ্টিমুখী হইলে তাহাতে জাগে স্পন্দন। সে স্পন্দন গতিশীল—ক্রিয়াত্মক—Dynamic। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য কবি তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ্ডারে, পরোক্ষজ্ঞানের মণি-পেটিকায়, স্মৃতিতে, চেতনায়, অবচেতনায়, যেখানে যাহা পা'ন, তাহা দুই হাতে লুটিয়া লইতে চাহেন। বহির্বিশ্বের উপাদান লইয়া তিনি তখন তাঁহার মানস প্রতিমা গড়িতে থাকেন কিন্তু মজা হইল এই, বহির্বিশ্ব হইতে কুড়াইয়া-আনা নিখিল উপাদান কবির অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া যেমনটি ছিল, তেমনটি আর থাকে না। তাঁহারা বেশ পরিবর্তন করে। যে নবীন বেশে তাঁহারা

সাজিয়া ওঠে, তাহা হইল কবির সমগ্র মনোভাবের স্ফুরণের দ্বারা অধিবাসিত আন্তরিক ভাব-বেশ। কবির মনে এই ভাবের সৃষ্টি হয় বহির্জগতের সহিত সংঘাতে। ঢিল ছুড়িলে পুকুরের জল লাফাইয়া ওঠে, ঢিল ডুবিয়া যায়। বহির্বিশ্ব তেমনি কবির চিত্তলোকে ডুব দিয়া এক তরঙ্গ তুলিয়া ধরে। সে তরঙ্গের নূতন রূপ, নূতন মূর্তি, একেবারে ideal বা emotional form। ইহার ফলে কবি-চিত্তে এক পরিস্পন্দন জাগিয়া ওঠে। পরিস্পন্দনের ফলে কবি এমন সব শব্দ আহরণ করেন যাহার সহিত তাঁহার ভাবময় বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। কবি-চিত্তে তলাইয়া যাওয়া বিষয়বস্তু নূতন ভাবসত্তায় ছন্দিত হইতে হইতে শব্দের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। সেই শব্দে গ্রথিত হইয়া ওঠে জ্যোতির্ময় কাব্যালোক। ভূমিষ্ঠ হইয়াও নূতনের প্রতি তাহার টান কমে না। যে-সৌন্দর্যের প্রেরণায় তাহার আবির্ভাব হইল, তাহারই দ্যোতনায় সে অর্থকে অতিক্রম করিয়া ওঠে; জাগে অর্থের মধ্যে নূতন জাতীয় একটি স্ফুরণ; জাগে একটি আস্বাদ—একটি হ্লাদরস। এই আস্বাদ, এই হ্লাদরস শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও শব্দ জাতীয় নয়; ইহা যেন একটি বিজাতীয় আবির্ভাব। দেহযন্ত্রগুলির ক্রিয়া-সামান্য হইতে প্রাণের আবির্ভাবের মত এই আবির্ভাব। কাব্য সৃষ্টির মূলে হইল—"অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রতিভা।" এই প্রতিভার ফলে কবির চৈতন্য-ব্যাপারের মধ্যে জাগে এক চমৎকারিতা—বিস্ময়ঘন অপূর্বতা। ইহাকে 'হ্লাদ' বলে। এই হ্লাদ হইল Subjective aesthetic quality। ইহার সহিত যুক্ত হয় লাবণ্য। বহিরঙ্গসন্নিবেশজাত সৌন্দর্যকে বলে লাবণ্য। এই দুইয়ের মিলনেই শব্দার্থ-সাহিত্য কাব্য।[১]

কবির অপূর্ব বস্তু-নির্মিতির মূলে আছে প্রতিভা বা আচার্য মম্মটোক্ত শক্তি। প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণ হইল—নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। ইহাই সাহিত্যে কবিগত কল্পনাশক্তি। আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে 'ভাবনা' বলা হয়। এই ভাবনা লইয়া আমাদের দেশে যা-কিছু গবেষণা হইয়াছে, তাহার সবটুকুই সহৃদয়গত। এক কুন্তকই কেবল কবিগত ভাবনার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। রস-শাস্ত্রে ভাব ও ভাবনা সমার্থক।[২] ভাব বা ভাবনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইয়াছে সহৃদয়গত রস-আস্বাদনের প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক

(১) ব, জী।

(২) দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্য বস্তুনঃ।
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনাশব্দভাগসৌ॥ ভ, র।

কল্পনার পদ্ধতি আর আমাদের রসপ্রকাশের পদ্ধতি অনেকটা এক। সাহিত্যিক কল্পনার একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ—"যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে, সে-শক্তি হচ্ছে কল্পনা-শক্তি; এই কল্পনার শক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে।"[১] কল্পনা হইল নন্দনতত্ত্বগত একটি মানসিক বৃত্তি। কবিগত হইয়া ইহা হয় সৃজনী এবং সহৃদয়গত হইয়া হয় গ্রহনী।[২] এই বৃত্তির মধ্যে যেমন আছে সমন্বয় ধর্ম, তেমনি আছে ঐন্দ্রজালিক শক্তি। ঐন্দ্রজালিক বলিবার কারণ যোগস্থ যোগীর হৃদয়-নিষণ্ণ অনুব্যবসায় যেমন রহস্যময়, ইহাও সেইরূপ। রহস্যময় বলিয়া অবর্ণনীয়। কেবল তাহার প্রকাশ হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি হইল—[৩] (১) বিরোধী গুণগুলির সমন্বয় (২) পুরাতন ও পরিচিত দ্রব্যগুলির সহিত নূতনের ও সজীবতার জ্ঞান (৩) অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধের সহিত অসাধারণ ভাবপ্রবণতা (৪) সদাজাগ্রৎ বিচারবুদ্ধি (৫) উচ্চগ্রামের উৎসাহ ও অনুভবশক্তির সহিত স্থির আত্মসংযম (৬) গীতিমাধুর্যের জ্ঞানের সহিত বহুকে একে পরিণতির সাম্যবিধিগত চেতনা (৭) চিন্তাপর্যায়কে একটিমাত্র মুখ্য চিন্তা বা অনুভবের দ্বারা মার্জনা। এইগুলি হইল সাহিত্যিক কল্পনার ধর্ম।

কবিতার যথার্থ জীবনীশক্তি ও চরম উৎকর্ষের মূলে কল্পনার ক্রিয়াকারিত্ব। তর্ক ওঠে,—বাস্তব জীবনের একই বা একশ্রেণীর ঘটনা কবি-কর্তৃক বিন্যাসের ফলে কেন আমাদের অধিক পরিমাণে অভিভূত করে? যে-সকল দ্রব্য বা ঘটনা স্বভাবতঃই

(১) সা, প

(২) বা, সা, ই

(৩) That synthetic and magical power, to which we have exclusively appropriated the name of imagination··· · reveals itself in the balance of reconciliation of apposite or discordant qualities······the sense of novelty and freshness, with old and familiar objects; a more than usual state of emotion, with more than usual order, judgement ever awake and steady self-possession with enthusiasm and feeling profound or vehement. The sense of musical delight .... with the power of reducing multitude into unity of effect and modifying a series of thoughts by some one predominant thought of feeling. There are the gifts of imagination.

I.A. Richards ; Principles of Literary Criticism.

অপ্রীতিকর, তাহাদের বর্ণনা কবির উপন্যাসগুণে কেনই বা আমাদের হৃদয়গ্রাহী হয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, মানুষী ক্রিয়ার অপক্ক উপাদান চিত্তবৃত্তির দ্বারা বাসিত হইয়া যেমন ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি স্বাধীন ক্রিয়া বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এমন কি, দৃশ্য ও স্পর্শকাতর দ্রব্যগুলি যখন পুনর্বিন্যাসের জন্য নির্বাচিত হয়, তখন তাহারা শিল্পীর মনের মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতির অবলম্বনে বিবর্তিত হইতে থাকে। তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্য দিয়া মনকে স্পর্শ করিলে যেভাবে আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক মাত্রায় কবিকর্তৃক উপন্যস্ত দ্রব্যগুলি আমাদের মনে ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠে। এক কথায়, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির কাছে আবেদন আনেনা, আনে কল্পনার কাছে। কল্পনার কাছে এমনি আবেদনশালিত্বই সকল প্রকার কবিকৃতির বিশেষত্ব। চিত্র হউক, ভাস্কর্য হউক, লিখিত বা কথিত শব্দ হউক—ইহারা ইন্দ্রিয়গ্রামের পথ ধরিয়া মনে আসিয়া ওঠে কিন্তু এই সকল পুনর্বিন্যাসের মধ্যে এমন কিছু থাকে, যাহা মৌলিকের উদ্বৃত্ত; এই উদ্বৃত্ত অংশই ঐ গুলিকে ইন্দ্রিয়গ্রামের পথে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অথবা তাহারাই অংশতঃ কল্পনার ফলশ্রুতি এবং সেই কারণে তাহারা মৌলিক অপেক্ষা অনেক তীব্রভাবে কল্পনাকে উত্তেজিত করে। এই উদ্বৃত্ত অংশ তাহাদের বিশিষ্ট চরিত্র ও শিল্পমূল্য দান করে বলিয়া একথা মানিতে হয় যে তাহাই শিল্পীর কল্পনা-শক্তিকে রূপায়িত করে। যেহেতু এই রূপায়ণের ফলে যে-মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণপ্রসূত ইন্দ্রিয়-চিত্রগুলি গ্রহণ করে, সেই মনেরই কল্পনাশক্তির কাছে ইহা এক সতেজ আবেদন তুলিয়া ধরে। জ্ঞানবৃত্তির ক্রিয়াকারিত্বে যেমন, তেমনি সাহিত্যে ও অপরাপর ললিত কলায় ইন্দ্রিয়জ ক্রিয়া অপেক্ষা অধিক কিছু থাকে। চিত্রী বা কবি যাহা কিছু চক্ষুরিন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতির যোগাযোগে গ্রহণ করেন, শিল্পে উপন্যস্ত করেন তদপেক্ষা অনেক কিছু বেশী। এই উদ্বৃত্ত অংশটি হইল মানুষের মনের বিশিষ্ট ক্রিয়ার ফল এবং এই ক্রিয়াটিকে বোধ-সৌকর্যের জন্য মনের সাধারণ ক্রিয়া হইতে পৃথক করিয়া **faculty of imagination** বা কল্পনাবৃত্তি বলা হয়। প্রশ্ন ওঠে—এই উদ্বৃত্ত শক্তি যদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার ফল না হয়, তাহা হইলে মনের মধ্যে ইহা কোথা হইতে আসে? উত্তরে বলা যায়, ইহা আত্মার শক্তি, আত্মাকে নানাবৃত্তি ও শক্তির জন্য নানাভাগে ভাগ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আত্মা অবিভাজ্য ও একক। স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও কল্পনা—একই আত্মার শক্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ এবং আনন্দ গ্রহণে

অধিকতর শক্তিশালী। এই ইন্দ্রিয়টিই কল্পনাকে আইডিয়া বা ধারণার দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। কল্পনার আনন্দ হইল সেই জাতীয় আনন্দ, যাহা দৃশ্য হইতে উৎপন্ন হয়—হয় প্রত্যক্ষ দর্শনে, না হয়, চিত্র, ভাস্কর্য, বর্ণনা প্রভৃতির দ্বারা আমাদের মনের ভিতরকার আইডিয়াগুলি বা ধৃতি-চিত্রগুলির স্মরণে। আমাদের কল্পনায় এমন একটিও চিত্র ভাসিয়া উঠিতে পারেনা যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মনের ভিতর প্রবেশাধিকার পায় নাই।

যে ইমেজগুলি আমরা একসময় গ্রহণ করিয়াছি, সেগুলিকে ধারণ করিবার, পরিবর্তন করিবার এবং সংযুক্ত করিবার শক্তি আমাদের আছে এবং তাহার দ্বারা কল্পনার অভিরুচি অনুসারে আমরা চিত্রের ও স্বপ্নের বিচিত্রতা সম্পাদন করি। এই কল্পনা শক্তির বলেই মানুষ কারাগারে বসিয়া এমন সব মধুরতর ও সুন্দরতর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মানস ভোগ করিয়া থাকে, যাহাদের জোড়া বাস্তব প্রকৃতির কোথাও মেলেনা। অতএব কল্পনার আনন্দ হইল সেই আনন্দ যাহা মূলতঃ দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ। এই আনন্দকে দুই শ্রেণীতে ফেলা হয়—মুখ্য ও গৌণ : মুখ্য হইল সেই আনন্দ যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষজাত আনন্দ এবং গৌণ হইল সেই আনন্দ যাহা দৃশ্যবস্তুর আইডিয়া হইতে আবির্ভূত। এই আনন্দ উপভোগের কালে বস্তুগুলি চ'খের সামনে উপস্থিত থাকে না কিন্তু স্মৃতিতে এদের ডাক পড়ে অথবা যে স্বপ্ন অনুপস্থিত বা কাল্পনিক, সেই সকল উপাদেয় স্বপ্নকে গড়িয়া তুলিবার কাজে উপাদানীভূত হইয়া ওঠে ইহারা। কিন্তু এই আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের মত স্থূলও নয়, এবং বুদ্ধিজাত আনন্দের মত অতিসূক্ষ্মও নয়। ইহার উপযোগিতা নূতন সৃষ্টির উপায়নে। গুরুত্বপূর্ণ মানসিক কার্যের জন্য চিন্তাশক্তিকে যেভাবে পীড়িত করিয়া তোলা হয়, ইহার জন্য তাহার যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি প্রয়োজন হয় না মনকে অনবধানে ও শৈথিল্যে তলাইয়া দিবার—যে অবস্থাটি আমাদের ইন্দ্রিয়জ আনন্দের নিত্য সহচর ; কিন্তু বৃত্তিগুলির মৃদু অনুশীলনের মত ইহা কোনরূপ শক্তি বা কষ্টকল্পতা না ঘটাইয়া আধ-জাগরূক আধ-তন্দ্রালু মানসিক পরিস্থিতিতে আনন্দ-বৃত্তিকে জাগাইয়া তোলে। মুখ্য আনন্দ বাহ্য দৃশ্য হইতে উৎপন্ন কিন্তু এই বাহ্য দৃশ্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা কল্পনার কাছে আবেদন তুলে ধরে ?

সেই অন্বিষ্টগুলি হইল—যা কিছু মহান্, অসাধারণ, বা অদ্ভুত ও সুন্দর। দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন সুখ একই দ্রব্যে নিষণ্ণ অপরাপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত গুণনিচয়ের উপস্থিতিতে বহুগুণিত হইয়া ওঠে। যদি দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপভোগ্য গন্ধ আসিয়া জোটে, তাহা হইলে তাহা কল্পনার আনন্দকে উচ্চ কোটিতে লইয়া যায় এবং প্রকৃতি-চিত্রের বর্ণালীকে অধিকতর উপাদেয় রূপে উপস্থিত করে। কারণ, একাধিক ইন্দ্রিয়ের আইডিয়া পরস্পরকে পুষ্টি দান করে এবং সমবেত হইয়া আনন্দের মাত্রাকে দেয় চড়াইয়া কিন্তু যখন তাহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, সে আনন্দ পূর্ববর্তী আনন্দের তুলনায় অনেক ক্ষীণ।

তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই যে গৌণ আনন্দ কোন প্রাকৃতিক বস্তুর দর্শনে উৎপন্ন হয় না ; উৎপন্ন হয় মনের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অথবা শিল্পমূর্তিদর্শনে দৃষ্টবস্তুর স্মৃতির মন্থনে। এই পুনরাবির্ভাব দুই শ্রেণীর : প্রথম শ্রেণীতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত যে উপস্থিতি, সে উপস্থিতি নিছক বাস্তবতার। কল্পনার মূল অধিষ্ঠান এই ইন্দ্রিয়ের উপর। দ্বিতীয় শ্রেণীতে চক্ষুরিন্দ্রিয়গোচর কোন বাস্তব পদার্থ নাই। কল্পনাজ গৌণ আনন্দ মানসিক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন।

সাহিত্যের মূলে শব্দ ও অর্থ। শব্দজাত আইডিয়ার মধ্যেও এই কল্পনার আনন্দ। সাহিত্যে আবির্ভূত কল্পনাশক্তির দুই ধারা—কবিগত ও পাঠকগত বা শ্রোতৃগত। কবিগত কল্পনা কবিমানসে ক্রিয়াশীল ; পাঠকগত বা শ্রোতৃগত কল্পনা পাঠক বা শ্রোতার মনে রমনশীল।

সাহিত্যের অনুবন্ধে কল্পনার যে আবেদন, তাহা হইতে জাগে পাঠকমানসে ক্রিয়া। কবি-মানসের কল্পনা হইতে জাগে মুখ্য আনন্দ, পাঠকমানসের আনন্দ হইল গৌণ আনন্দ। কবির মনে কল্পনা জাগে বাহ্য বস্তুর সম্পর্কে। এই বাহ্য উত্তেজনাই শিল্প-কর্মরূপে আবির্ভূত হয়। এই মুখ্য আনন্দের সহিত যুক্ত হয় গৌণ আনন্দ। একদিকে শিল্প-উপন্যাস, অপর দিকে পাঠক মনে দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ—এই উভয়ের তুলনা হইতে জাগে গৌণ আনন্দ। মৌল বস্তুর উপন্যাসের সাহিত্যিক মাধ্যম হইল একমাত্র শব্দ। এই উপন্যাস বর্ণনাত্মক। ইহা হইতে যে আনন্দ উৎসারিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ গৌণ। অতএব সাহিত্যের আনন্দ কল্পনার গৌণ আনন্দ।

প্রথম ধারায় কল্পনার ক্রিয়া চলে কবি-মানসে। এর জন্য কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন প্রকৃতির ভূয়োদর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার। এই ভূয়োদর্শনের ফলে কবির চিন্তাশক্তির ও কল্পনার বিস্তৃতি ঘটে এবং কবির নানামুখী সৃষ্টির উপর ইহাদের প্রভাব পড়ে, অবশ্য কবির যদি ইহাদের সদ্ব্যবহারের উপায় জানা থাকে। মানুষের মন চায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক পরিপূর্ণ রূপ। প্রকৃতিতে সে তাহা

পায় না বলিয়া তাহার আদর্শায়িত উচ্চতর সৌন্দর্যক্ষুধা তৃপ্ত হয় না। কারণ কল্পনায় মানুষ যে মহান, অদ্ভুত ও সুন্দরের সাক্ষাৎ পায়, চোখ তাহার সন্ধান পায় না; বরং যাহা সে দেখে, তাহার মধ্যে অপূর্ণতার ত্রুটি দেখিয়া সে সজাগ হইয়া ওঠে। তাই কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় বাস্তব সত্যের দিক হইতে প্রকৃতিকে ছাঁটিয়া কাটিয়া তাহাতে মহত্তর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরোপ করিয়া কল্পনাকে তাহার আপন স্বভাবে রাঙাইয়া তোলা।

ঋতুপর্যায়ের ক্রম ধরিয়াই যে বর্ণনা করিতে হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা কবির নাই। তিনি তাঁহার বর্ণনায় বসন্ত ও শরতের সকল সৌন্দর্যকে ডাক দিতে পারেন এবং তাঁহার প্রকৃতি-চিত্রকে অধিকতর উপাদেয় করিয়া তুলিবার জন্য সমস্ত বৎসরের সৃষ্টির সাহায্য লইতে পারেন। তাঁহার গোলাপ, উডবাইন ও মালতী একসঙ্গে ফুল ফোটায় এবং একই সময়ে তাঁহার কেয়ারিগুলি পদ্ম, পারিজাত ও বেগুনী ফুলে পূর্ণ হইয়া ওঠে। তাঁহার মাটিতে এক জাতীয় গাছই জন্মে না; ওক বা মার্টল গাছও জন্মে এবং যে-কোন গাছ জন্মাইবার যোগ্যতা সে রাখে। থোলো থোলো কমলালেবু সেখানে ফলিতে পারে; প্রতিটি লতাবেষ্টনীতে সুগন্ধি নির্যাস সুলভ হইয়া ওঠে এবং যদি শিল্পের খাতিরে এলাচবনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে "যো হুকুম" বলিয়া সেখানে এলাচের ঝাড় জাগিয়া ওঠে। যদি ইহাতেও তাঁহার কল্পিত দৃশ্যের অভাব পূরণ না হয়, তাহা হইলে তিনি গন্ধে ও বর্ণে সমৃদ্ধ ও ভাস্বর এমন সব নূতন জাতীয় ফুল ফুটাইতে পারেন যাহা প্রকৃতির কাননে দুর্লভ। এক কথায়, প্রকৃতিকে নিজের হাতে নূতন করিয়া আপন খুশির সৌন্দর্যে সাজাইয়া তোলার অধিকার তাহার আছে। কেবল এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি যেন আতিশয্যের মোহে পড়িয়া উৎকটভাবে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত না করেন বা অসম্ভবের রাজ্যের দ্বার খুলিয়া না দেন।

কল্পনার দ্বিতীয় ধারায় কবির বাণীর দ্বারা উত্তেজিত পাঠক বা শ্রোতার মনে কল্পনার লীলাবিস্তার। সুনির্বাচিত শব্দমালার এমন জোরালো শক্তি আছে যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তব বস্তুগুলি অপেক্ষা কবির শাব্দ চিত্রে অধিকতর জীবনাধান ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে। পাঠক সেই শব্দবৃত্তির সাহায্যে তাহার কল্পনায় কবিকর্তৃক অঙ্কিত চিত্রকে বর্ণভূয়িষ্ঠ ও অধিকতর সজীবরূপে দেখেন। এইরূপ স্থলে কবি নিসর্গেরই অনুসরণ করেন বটে কিন্তু সেই নিসর্গের উপর এমনি রঙ্ চড়াইয়া দেন, সেই সৌন্দর্যের দ্যোতনায় এমনি তাপ ভরিয়া দেন, এমনি জীবনাবেগে তাহা স্পন্দিত করিয়া তোলেন যে তাহা হইতে যে ইমেজগুলি ভাসিয়া ওঠে, তাহাদের

তুলনায় চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইমেজগুলি যেমন দুর্বল, তেমনি অস্পষ্ট। কেন এমন হয়? ইহারই কারণ বোধ হয় এই যে আমরা যখন কোন বস্তুকে দেখি, তখন আমাদের বাসনায় যেটুকু দোলা দেয়, আমরা সেইটুকুকেই চোখে ভরিয়া রাখি কিন্তু কবি যখন তাহাকে বর্ণনার মধ্যে উপন্যস্ত করেন, তখন তিনি তাহার ইচ্ছামত সেই দৃশ্যের একটি মুক্ত স্বাধীন রূপ আমাদের সামনে আনিয়া হাজির করেন এবং তাহাতে এমন সব অংশ যোজনা করেন যেগুলি হয় আমরা দর্শন-কালে লক্ষ্য করি নাই, না হয়, আমাদের প্রথম দর্শনে সেগুলি চোখের আড়ালে ছিল। যখন আমরা কোন জিনিস দেখি, তখন তাহার আইডিয়াতে থাকে দুইটি বা তিনটি সরল আইডিয়া কিন্তু কবি যখন ইহাকে উপন্যস্ত করেন, তিনি তখন ইহাতে অধিকতর জটিল আইডিয়ার উপন্যাস করিতে পারেন অথবা ইহার মধ্যে এমন সব আইডিয়া তুলিয়া ধরিতে পারেন যাহা কল্পনাকে গতিদান করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কল্পনার প্রভাব বিস্তারে যে কবির যতখানি প্রতিভা, তাহার সৃষ্টি ততখানি সার্থক। এই প্রতিভা যাহার উচ্চকোটিতে, তাহারই সৃষ্টি কালজয়ী হইয়া ওঠে। উপাদানের বাহার যতই থাকুক না কেন, কল্পনাকে ঘনাইয়া তুলিবার প্রজ্ঞা যাঁহার নাই, তাঁহার যত্ন নিষ্ফল। এই কল্পনার মধ্যেই আছে সৃষ্টির রহস্য। কল্পনার গুণে এই সৃষ্টি হইয়া ওঠে সদ্ধর্মী এবং পাঠক মানসে ইহা এমন সব বস্তু ঘনাইয়া তোলে বাস্তবে যাহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া সংক্ষেপে বলা যায়, জীবন-অভিজ্ঞতা হইতে নানা সুরের নানা ছন্দের নানা বর্ণের উপাদান সংগ্রহ করিয়া কবি যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আপন প্রতিভায় সেগুলিকে একটি ঐক্যের কেন্দ্রে সন্নদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যকার বিরোধী ভাবগুলির সমন্বয় সাধন করিয়া সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের মধ্যে একটি নির্বিশেষ বিশেষকে অনুভূতি ও সৌন্দর্যের আবেগে ব্যক্ত করিয়া তোলেন, হৃদয় আবেগের সহিত ঔচিত্যবোধের, রূপের সহিত ভাবের, ছন্দের সহিত সুরের মিলন ঘটাইয়া যখন একটি অখণ্ড পূর্ণ সৌন্দর্য ঘনাইয়া তোলেন, যখন সেই সৌন্দর্যে আহত হইয়া কবিচিত্ত সহৃদয়চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া অনুভূতির উচ্চতাপে হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া তোলে, তখনই আমরা কল্পনার লীলাটি প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তাই বলিতেছিলাম কল্পনাই রস, রসই কল্পনা। বৃন্তটিকে কেন্দ্র করিয়া সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে রূপে ও গন্ধে পাপড়ি ও পরাগে স্তবকের বিচিত্র বন্ধনে অনির্বচনীয়তায় মথিত হইয়া ফুলটি যখন বলিয়া ওঠে—'অয়মহমস্মি' তখনই আমরা

তাহার মধ্যে বিশ্বশিল্পীর কল্পনার চমৎকারিতা অনুভব করিয়া থাকি। বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও আপন সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনায় সে যখন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে—আমাদের হৃদয়ে ফুল হইয়া দেখা দেয়, তখনই আমরা ফুলের সেই রসরূপটার সাক্ষাৎ পাই।

কল্পনার যে সর্তগুলির কথা আলোচনা করিলাম, কবিমনে তাহার সহিত যুক্ত থাকে রোমান্টিকতা ও রোমান্স।[১] "মানুষের চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয় তিন রূপে—ঐতিহাসিক, রোমান্টিক ও বৈজ্ঞানিক। ঐতিহাসিক বিবেচনা হয় কালানুক্রমিক বিবর্তন ধরিয়া। রোমান্টিক কল্পনা চলে কালানুক্রম ও বাস্তব কার্যকারণ-পরম্পরাকে যেন পাশ কাটাইয়া, আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটে বাস্তব কার্যকারণ-পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া। ঐতিহাসিক বিবেচনা ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর। কেননা কালানুক্রমিকতার সঙ্গে কার্য-কারণ-পরম্পরার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রোমান্টিকতা হইতেছে কোন এক অনির্দেশ্য ইষ্ট আদর্শকে ইমোশনের মধ্য দিয়া পাইবার প্রচেষ্টা। এই ঈপ্সা চিত্তের সৃজনী অথবা গ্রহণী বৃত্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ইংরেজী করিয়া বলিতে গেলে বলিব, Romanticism is the emotional approach to some indefinably desirable ideal induced in the creative or receptive mind. কবি যখন কাব্যরচনা করেন অথবা ঔপন্যাসিক যখন উপন্যাস রচনা করেন, তখন তাঁহার চিত্তের সৃজনী বৃত্তি কাজ করিতেছে। আর পাঠক যখন সেই কাব্য বা উপন্যাস পড়িয়া রস পাইতেছেন, তখন তাঁহার চিত্তের গ্রহণী বৃত্তি জাগ্রত রহিয়াছে।[২] গ্রহণী বৃত্তিও অংশত সৃজনী বৃত্তি, তবে তাহা নূতন পথ কাটিয়া চলে না, কাটা পথে নূতন করিয়া চলে।" "রোমান্স জীবনের সহজ প্রবাহ অপেক্ষা তাহার অসাধারণ উচ্ছ্বাস বা গৌরবময় মুহূর্তগুলির উপরেই অধিক নির্ভর করে। অন্তরের বীরোচিত বিকাশগুলি, মনের উঁচু সুরে বাঁধা ঝঙ্কারগুলি, জীবনের বর্ণবহুল শোভাযাত্রা-সমারোহ—ইহাই মুখ্যতঃ রোমান্সের বিষয়বস্তু। সেই জন্য সূর্যালোক-দীপ্ত অতি পরিচিত বর্তমান অপেক্ষা কুহেলিকাচ্ছন্ন, অপরিচিত অতীতের দিকেই ইহার স্বাভাবিক প্রবণতা। অতীতের বিচিত্র বেশভূষা ও আচার ব্যবহার, অতীতের আকাশ-বাতাসে লঘু মেঘখণ্ডের মত যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ও কবিত্বময়

---

(১) বা, সা, ই।

(২) * সা চ দ্বিধা—কারয়িত্রী ভাবয়িত্রী চ। তত্র কবেরুপকুর্বাণা কারয়িত্রী। যা শব্দগ্রামমর্থজাতমলংকারতন্ত্রং কবেরধিহৃদয়ং অবভাসয়তি সা কারয়িত্রী। ভাবুকস্য চ উপকুর্বাণা ভাবয়িত্রী। অনয়া ফলিতঃ কবের্ব্যাপারতরুঃ। অন্যথা সোঽবকেশী স্যাৎ। - কা. মী.

কল্পনা ভাসিয়া বেড়ায়, রোমান্সলেখক সেইগুলিকেই ফুটাইয়া তুলিতে যত্ন করেন।" ১

কল্পনার কোন থিয়োরি আমাদের শাস্ত্রে যে নাই, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। থিয়োরী হিসাবে রোমান্স-চেতনাও সেকালের কাব্যতত্ত্ববিদের অজানা ছিল। তবুও সাহিত্য-দর্পণে বিধৃত একটি শ্লোকের মধ্যে রোমান্স-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

> যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
> স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
> সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
> রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

অতীতের রেবাতীরে বেতসকুঞ্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য নায়িকার মনোবৃত্তির মধ্যে রোমান্সের মূলতত্ত্বটি—সেই receeding back to its original home বিধৃত হইয়া আছে। কাদম্বরীর সকল উপাদানের মিলন-মহোৎসব পাঠকমনকে সেই অতিপ্রাকৃতে-ভরা স্বপ্নমেদুর পিছনে-ফেলিয়া-আসা জীবনরোমাঞ্চের সুরে বাঁধা চন্দ্রালোকিত রজনীর ছায়াভরা অস্পষ্টতার কাহিনীলোকে লইয়া যাইতে চাহে। এইখানে বসিয়া পাঠক তাহার শৈশবের স্বপ্ন দেখে। মানুষ বৃদ্ধ হইলেও যে তাহার শিশুত্ব একেবারে ঘুচিয়া যায়না, কাদম্বরী-উপন্যাসের ইন্দ্রজালের সম্মোহন-মুহূর্তের মধ্যে এই কথাটি যেন চির-জাগরূক হইয়া আছে। বাণের সৃষ্টিশীল মনে এই রোমান্সের ধর্মটি মুখ্য হইয়া আছে বলিয়া কেবল অতীতের ভাবময় জীবনদ্যোতনা দিয়াই তিনি তাঁহার গল্পরচনা করেন নাই, জীবন-ধ্যানের সুরে সুরে ছাওয়া জীবনরসের উদ্দীপনবিভাব প্রকৃতিকে আনিয়া হাজির করিয়াছেন। তাই গল্পের মায়ালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরা কখনও বা পম্পাসরোবরের তীরে কখনও বা অচ্ছোদ সরোবরের পুষ্পিত অরণ্যের মাধবীলতার ছায়ায় বসিয়া নবীন যৌবনের স্বপ্ন দেখি ; কখনও চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বিজয়িনী বাহিনীর সঙ্গে থাকিয়া কান্তার-পর্বত অতিক্রম করিয়া চলি। আমাদের পা-চলা পথে কখনও বা নবীন বয়সের নূতন সূর্য আসিয়া আকাশে-অন্তরীক্ষে জলস্থলেঅরণ্যেপর্বতে রূপরহস্যের ইন্দ্রজাল মেলিয়া ধরে, কখনও বা মধ্যাহ্ন তপনের উষ্ণ তাপ বিজন অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় বসাইয়া আমাদের ক্লান্তি বিনোদন করে। অরণ্যানী যখন চেলাঞ্চলব্যজনে আমাদের শ্রান্তি মুছিয়া লইতে থাকেন, তখন সেই অঞ্চল-বিধূনিত বাতাসে বাজিয়া

(১) ব, সা, উ।

ওঠে পাখীর গান, নির্ঝরিণীর কলতান, ঝরাপাতার মুখর মর্ম্মরধ্বনি, বনদেবীর গোপন হৃদয়ের লজ্জিত, রক্তাক্ত পূর্বরাগটি। পথে পথে প্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ—কখনও সন্ধ্যা, কখনও চন্দ্রোদয়, কখনও বর্ষা, কখনও শরৎ, কখনও বসন্ত। প্রকৃতির স্বভাবসুন্দর পত্রপুটে মানবমনের নিতান্ত শিশু চেতনার বাণীগুলি সুন্দরের পায়ে কীভাবে অঞ্জলি দিতে হয়, বাণ তাহা ভাল করিয়াই জানিতেন।

বাণের চিত্র-রচনার motif এর মধ্যে কেবল উদ্দীপন-বিভাবের জাগরণের মন্ত্রটি নাই, তাহাতে জুড়িয়া আছে, মানবসভ্যতার আদিমকালের ছায়ায় ভরা বিস্ময়রসের রোমাঞ্চটি। তাই তাহা হাল্কা না হইয়া গম্ভীর হইয়াছে, বাসনার নিবিড়তায় তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অরণ্যের কম্পিত ছায়ার সহিত পাখির গান, পাখির গানের সহিত নির্ঝরিণীর কলতান, নির্ঝরিণীর কলতানের সহিত পম্পা ও অচ্ছোদ সরোবরের মঞ্জুল তরঙ্গধ্বনি মিশিয়া মানব-মনের আদিম স্বপ্নকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে। আর্য সনাতন জীবনের ব্যাপ্তিতে-ছাওয়া বাণের বর্ণনার ব্যাপ্তি। নিখিল জীবনকে—অখণ্ড জীবনবোধকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে-মাপের পাত্রটি দরকার, বর্ণনাগুলি সেই মাপের। স্বপ্নের পর স্বপ্নের ঢেউয়ের মত বর্ণনার পর বর্ণনার ঢেউ আসিয়া পড়ে। তাহাতে যে গীতিধ্বনি বাজিয়া ওঠে, তাহা রোমান্সের মর্মমঞ্জরী।

চিত্রের মধ্যে রোমান্সের মন্ত্রটি ধরিতে গিয়াও তিনি তাঁহার পর্যবেক্ষণ শক্তিকে অন্ধ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, রঙের কারবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। লাল রঙটি যখন তিনি আঁকিতে বসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহার চিত্রপটের উপর বিশ্বের বিচিত্র লালকে আনিয়া হাজির করিয়া যেমন রক্তিমাকে প্রত্যক্ষকল্প করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি নানা লালের সমবায়ে তিনি লালের এক অপূর্ব প্যাটার্ণ তুলিয়াছেন। "এমন সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কিন্তু কাদম্বরীকারের লাল রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষালোহিত, কোন লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান। ···
রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ। যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্র-পটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে অর্থাৎ কোন জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।"[১]

---

(১) কা, চি,

বাণের কল্পনাশক্তি বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহার দুইটি দিকের সন্ধান পাই—একটি জীবনের, অপরটি শিল্পের। জীবনের মধ্যে পড়ে জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, রূপান্তর, দেহান্তরগমন, অভিশাপ, দৈববাণী, মিলন, বিরহ, সুদূরের পিপাসা, প্রেমের অভিসার প্রভৃতি; শিল্পের মধ্যে পড়ে রূপবর্ণনা, প্রকৃতি-বর্ণনা, জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের বর্ণনা, কথার ঢঙ, আখ্যায়িকার বৃত্তবন্ধন, পঞ্চসন্ধিসমন্বয়, চরিত্র চিত্রণ, অলঙ্কার, গুণ, রীতি, ধ্বনি ও রস। এগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, তাহা বলি না। একটি মাত্র জীবনোচ্ছ্বাসের টানে ইহারা পরস্পর মথিত হইয়া উঠিয়াছে! একটিমাত্র প্রাণের আবেগকে মূর্ত করিবার বাসনায় ইহারা আসিয়া জুটিয়াছে। জীবনকে কখনও বা তথ্যে, কখনও বা কল্পনায়, কখনও বা ভাবে, কখনও বা সুরে ভরিয়া, যখন যেখানে যেটুকুর প্রয়োজন, সেইটুকুকে গ্রহণ করিয়া বিরোধকে উল্লঙ্ঘন করিয়া সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সতর্ক সুনিপুণ হস্তে তিনি জীবনের এক রসময় আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। তাই তাঁহার চিত্রিত আলেখ্য সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার ন্যায় আমাদিগকে ভাবের অমরাবতীতে রসের অলকানন্দায় লইয়া উপস্থিত করে। আমরা একটি বিশেষ স্থানে বসিয়া ভারতবাসীর চিত্তধর্মের একটি রসরূপ আস্বাদন করি—আস্বাদন করি বৈচিত্র্যের সংহতিতে—সঙ্গতিতে—আকীর্ণ ব্যঞ্জিত একটি অখণ্ড চিত্তবৃত্তির হ্লাদরস। জীবনকে একটি বিশেষ কেন্দ্রে নিপীড়িত করিয়া যে দ্রাক্ষারস ঝরিয়া পড়ে, আমরা তৃষিতচিত্তে তাহা পান করি। তাই বলিতেছিলাম, জীবনে ও শিল্পে সংহত ও মথিত হইয়া যে ভারতীয় অখণ্ড আস্বাদ্যমান চিত্তবৃত্তি বাণের অনুভূতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল,—তাহাই সহৃদয় পাঠকের চিত্তবৃত্তিতে সঞ্চারিত করিয়া—তিনি তাহার সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া গিয়াছেন। জীবন দিয়া জীবন জাগানো, অনুভূতি দিয়া অনুভূতি জাগানো—শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাজ। শিল্পের সাহায্যে চিত্তবৃত্তির ঘন-পিনদ্ধ যে ভাবটি তিনি জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহা ভারতীয় জীবন-অনুভূতিতে যেমন বাস্তব, তেমনি চিরন্তন; যেমন অখণ্ড, তেমনি স্বপ্রকাশ, যেমন চিন্ময়, তেমনি আনন্দঘন।

বাণের সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদের আর একটি মাধ্যম হইল—পুরাণ-জ্ঞান। পুরাণে যে কেবল বাণই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সময়কার পাঠক-জনসাধারণের মধ্যে তখন পুরাণপাঠ ও আলোচনা এত অধিক হইত যে সাহিত্যে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিন্যাস করিতে না পারিলে পাঠক-রুচিকে আকর্ষণ করা যাইত না। তাহা ছাড়া কাব্য ও নাটক অপেক্ষা গদ্যের পরিসর বেশী বলিয়া এবং

ঘটনা-বিন্যাস অপেক্ষা দীর্ঘ বর্ণনার প্রতি কবিও পাঠকের সমান আকর্ষণ থাকায় ছন্দোবদ্ধ কাব্য অপেক্ষা গদ্যে জীবনের প্রতিটি মেজাজ খুলিয়া ধরিবার সুযোগ থাকায় গদ্যের কাঠামোর মধ্যে পুরাণের ভিড় জমিয়াছে বেশী। গদ্যকারেরা তাহাদের সাহিত্যে বাস্তব মানুষ অপেক্ষা কিংবদন্তীর আলোছায়ায় অস্পষ্ট মানুষকে আঁকিয়াছেন বেশী করিয়া। কারণ শ্রোতার মনকে আলো-আঁধারি স্বপ্নে ভরিয়া রাখিতে হইলে কিংবদন্তীর ছায়ামধুর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট চরিত্র অঙ্কণ করার প্রয়োজন। তাই দেখা যায় হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধনের চরিত্রে কায়ারূপ অপেক্ষা ছায়ারূপ অধিক ঘন। কেবল সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে নয়, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের ভাস্কর্যে পুরাণের নক্সা ঘন-পিনদ্ধ। বাণ ও সুবন্ধুর সাহিত্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত কবিদ্বয় যে কেবল তাঁহাদের কাব্য-সৌন্দর্যের উৎকর্ষের জন্য মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহারা 'হরিবংশে'র সহিতও পরিচিত ছিলেন। বাণের সময়ে ভগবদ্গীতা মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাণের জবানিতে জানা যায় যে তাঁহার কালে উজ্জয়িনীর মহাকাল-মন্দিরে মহাভারতের পাঠ প্রচলিত ছিল।[১] সেই সময়ে এইরূপ পাঠের যে দেশব্যাপী প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ মেলে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত কম্বোজের একখানি শিলালিপিতে। উহাতে বলা হইয়াছে যে রামায়ণ, মহাভারত ও নাম-না-জানা পুরাণের অনুলিপি সেখানকার মন্দিরে দান করা হইয়াছিল এবং ঐগুলির নিত্য পাঠের ব্যবস্থাও দাতার ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হর্ষচরিতের সূচনায় দধিচের সহিত সরস্বতীর বিবাহের কল্পনাটি বাণের নিজস্ব নয়। কবি উহা বায়ুপুরাণের ৬৫ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে বাণের নিজস্ব হইল সরস্বতীর সহিত দধিচের বিবাহের কারণ বর্ণনা এবং বাণের গোত্রগুরু বৎসের সহিত সারস্বতেয়দিগের সম্পর্কের একটি ব্যাখ্যা। এই সারস্বতেয়ের কাহিনী মহাভারতের শল্যপর্বে ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে একরূপেই পাওয়া যায়। শান্তিপর্বের কাহিনীটি ভিন্ন প্রকারের। হর্ষচরিতে নিম্নলিখিত পৌরাণিক চরিত্রগুলির উল্লেখ আছে—পুরূরবা, নহুষ, যযাতি, সুদ্যুম্ন, সোমক, মান্ধাতৃ, পুরুকুৎস, কুবলয়াশ্ব, পৃথু, নৃগ. সুদাম, নল, সম্বরণ, দশরথ, কার্তবীর্য, মরুত্ত, শান্তনু, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি। কাদম্বরীতে অসুররাজ বাণ, নরসিংহমূর্তি, পৃথু, মধুকৈটভ, নারায়ণের মোহিনী মূর্তি, অগস্ত্য, দৃঢ়দস্যু, ইধ্মবাহ, অগ্নির অভিশাপ, প্রমদ্বারা, পরীক্ষিত, রতি, পৃথা, উত্তরা দুঃশলা,

(১) উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরের উল্লেখ দশকুমার চরিতেও আছে।

প্রভৃতি। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের তুলনায় রামায়ণীয় চরিত্রের উল্লেখ খুব সামান্য। কাদম্বরীতে মহাভারত পাঠের উল্লেখ দুইটি স্থানে পাওয়া যায়—মহাকালের মন্দিরে ও গন্ধর্ব-নগরের মন্দার-প্রাসাদে। কিন্তু পৌরাণিক তথ্য কাদম্বরী কাব্যের নাড়ীতে নাড়ীতে জড়িত।

প্রসঙ্গক্রমে বাণের ধর্মবোধ আলোচনার বিষয়। বাণের ধর্ম-বোধ শ্রীহর্ষের ধর্ম-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীহর্ষের সভায় চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে আমরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগের অর্থাৎ ৬৩০ হইতে ৬৪০ অব্দ পর্যন্ত সময়ের ভারতবর্ষের বর্ণনা পাই। শ্রীহর্ষকে ভারতীয় ইতিহাসে হিন্দু-যুগের আকবর বলা চলে। তাঁহার ধর্ম-সমন্বয়ী চেতনার প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের বিরোধের বিশ্রান্তি ঘটে। রাজপণ্ডিত ও সভাকবি বাণের ধর্মবোধ যে হর্ষের দ্বারা প্রভাবিত, তাহা কাদম্বরী উপন্যাসের বিভিন্ন ধর্ম-পরিচিতির ইতস্ততঃ পরিবেশিত উপাদানের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাদম্বরীর নমস্কার শ্লোকে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের সমন্বয়ী পরমপুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার করিয়াছেন। তাহার পর তিনি মহাদেব ও নরসিংহমূর্তি নারায়ণের উদ্দেশে জয়শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার কালে বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক পূজা প্রচলিত ছিল। তিনি সকল পূজা-পদ্ধতির সহিত সকল দেবতাকে সমান সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে তাই পশুপতি, বুদ্ধ, জিন, কার্তিকেয় প্রভৃতি নানা দেবতার উল্লেখ আছে। মন্ত্রসিদ্ধ দ্রবিড়ঋষিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বৌদ্ধগণের মঠ যেমন তাঁহার লেখনীর টানে জীবন্ত, তেমনি ভাস্বর ও দীপ্ত হিন্দুর দেবায়তন।

বাণের রচনায় পৌরাণিক ঐশ্বর্যের ঘনঘটা থাকিলেও তাহার মধ্য হইতে সম-সাময়িক কালের চিত্র বাছিয়া লইতে কষ্ট হয় না। উজ্জয়িনী ও তারাপীড়ের ঐশ্বর্য বর্ণনায় তিনি হর্ষের ঐশ্বর্য, রাজসভা ও সার্বভৌমত্বের দ্বারা প্রভাবিত। যেমন রাজসভার বর্ণনায়, তেমনি গ্রাম্য-জীবন ও লৌকিক আচার-আচরণ বর্ণনায় তিনি তাঁহার কালের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রকৃতির কবি বাণভট্ট

'কাদম্বরী-চিত্রে' রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—"সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কণে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা"। এই চিত্রশালা হইতে সমস্ত চিত্রগুলি বাহির করিয়া বিশ্লেষণ করার অবসর আমাদের হাতে নাই। তাই আমরা কয়েকখানি চিত্র বাছাই করিয়া বিশ্লেষণ করিতেছি। চিত্রের সংখ্যা স্বল্প হইলেও ইঁহাদের মধ্যে কবি-প্রতিভার যে স্বাক্ষর মেলে তাহা হইতে তাঁহার প্রকৃতি-চিত্রণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। বর্ণনাগুণ সংস্কৃত উপন্যাসের কেন, সংস্কৃত কাব্য-শাস্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই গুণ সকল কবিই কিছুনা কিছু দেখাইয়াছেন কিন্তু বাণের মত পারদর্শিতার পরিচয় কেহ দিতে পারে নাই। তাঁহার কবি-অনুভূতির যেমন নিবিড়তা, বর্ণনার তেমনি রাজ-ঐশ্বর্য। জীবনে যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, তাহার সমগ্রতাকে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তাই তাঁহার সৃষ্টিতে অনুভূতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচিত্র রূপের প্যাটার্ণ। প্রকৃতি তাঁহার নিকট জড় নয়। তাহার একটি সাবলীল জীবনছন্দ আছে। সেই জীবন-ছন্দকে তিনি তাঁহার অন্তরাত্মায় অনুভব করিয়াছেন। তাই কোন কোন স্থানে দেখা যায়, তিনি নিজেকে আড়াল করিয়া বর্ণে ও চিত্রে, সুরে ও ছন্দে, শব্দে ও সংগীতে, নৃত্যে ও গানে, স্পন্দনে ও আবেগে প্রকৃতির চেতনাময়ী সত্তার উদ্বোধন করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার আপন মনের মাধুরীর অভাব হইলেও এমন একটি মনের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন যাহা দিয়া প্রকৃতির প্রাণযাত্রাকে চিত্রের মধ্যে রঙে ও রেখায় তরঙ্গিত করিয়া তোলা যায়। তাঁহার অঙ্কিত ছবির মধ্যে একটা জীবন-স্পন্দন—একটা স্বয়ংক্রিয় বেগবত্তার সন্ধান মেলে। সেই বেগের আবেগে মুখোমুখি দুইখানা ছবি অন্তর্নিহিত স্পন্দনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অনেকগুলি ছবি ফুটাইয়া তোলে। সে ছবিগুলি কেবল ছবি নয়; নব নব অনুভূতির ইন্দ্রধনুচ্ছটা; অনুভূতির 'পর অনুভূতির তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে তাহারা অসীমে হারাইয়া যায়, সেই হারাণো অনুভূতির শেষ মূর্চ্ছনা পাঠকের চিত্তে রহিয়া রহিয়া বাজিতে থাকে। এই চিত্রের রহস্য কবি-মনের রোমান্টিকতায়। এই রোমান্টিকতায় কোথায়ও জাগে নিখুঁত বাস্তবের ছবি, কোথাও ভাবের ছবি, কোথায়ও হৃদয়-সংবেদনার অদৃশ্য

ট্র্যাজেডির সুরের ছবি, কোথায়ও নির্লিপ্ত অনুভূতির ছবি। প্রকৃতিকে যখনই বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই তাহাতে মানুষীচেতনা সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাই বাণ-রচিত প্রকৃতি আমাদের প্রিয়জন—আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের সমাজের পরিচিত অভিজ্ঞান, আমাদের আচরিত ধর্মের—ক্রিয়াকলাপের অনুভব-ঘন আত্মিক সংস্করণ। তাঁহার প্রকৃতি কেবল উদ্দীপন বিভাব নয়, ব্যঞ্জনাময়। কেবল উদ্দীপন বিভাব লইয়া যে রস সৃষ্টি হইতে পারে, বাণ তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার চিত্র-শিল্পে। ভাব-চিত্র অঙ্কণে তাঁহার অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য। কোন ভাব সর্বহারা নির্জন নয়। একটি বিশিষ্ট ভাব বেগের আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে কখন যে আর একটি অপ্রত্যাশিত ভাবে যাইয়া ওঠে, তাহা ধরা যায় না। এই রীতিটি তাঁহার বিষমভাবের ব্যঞ্জনায় বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে। একটি বিশেষ ভাব যতই উগ্র হউক না কেন, পার্শ্ববর্তী ভাবের চাঁদের আলো পড়িয়া তাহার উগ্রতা ঝরিয়া যায়, দেখা দেয় কোমলে-কঠোরে ভয়ঙ্করে-সুন্দরে এক অপূর্বতা। সকল ভাবেরও ভাবান্তরের প্রকাশলীলায় বিস্ময়-ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া বাণের চিত্র-শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নাটকে অদ্ভুত রস ছাড়া যেমন কোন রস জমিতে পারে না, এও যেন তাই। তাঁর ছবিতে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে থাকে। বাণ উপন্যাস-লেখক। নাটক-রচনা না করিলেও তিনি নাট্যকার। তাঁহার উপন্যাসের বহুস্থানে নাট্যধর্মের অভিজ্ঞান ছড়াইয়া আছে। ইহার ফলে তাঁহার প্রতিভায় স্ফুরিত হইতে থাকে—ব্যাপার, ক্রিয়াকারিত্ব। এই ক্রিয়াকারিত্ব বা activity যেমন নাটকে আছে, তেমনি কাব্যেও আছে। বাণের প্রতিভায় এই ক্রিয়া-কারিত্ব তাঁহার ছবিতে dynamic force. যে রূপ স্থির, যে পাষাণ, যে কথা কয় না, সে জীবনহীন, সে মৃত। যে বলে—"হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে"—সেই জীবিত; সেই জীবন-তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে অসীমে হারাইয়া যায়; হারাইয়া যাইয়া আমাদের চিত্তে চিরদিনের মত লাগিয়া থাকে। তাই ছবি দেখিয়া আমাদের আশা আর মেটে না; এ যেন—"জল ঢেলে ফুটাপাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।" সকল শক্তির বড় শক্তি ব্যঞ্জনাশক্তি। এই ব্যঞ্জনা-শক্তি বাণের মধ্যে প্রচুর। তাঁহার শিল্পে এই ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব আছে বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি আমাদের প্রিয়। ছবি দেখিতে দেখিতে আমরা ছবি দেখি না, দেখি আমাদের বাসনালোক—দেখি আমাদের অনুভূতির আকিম্পন—কম্পনে কম্পনে তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার বিচিত্র রঙের স্ফূর্তি—জটিল চিত্তবৃত্তির প্রত্যেকটি অণুর—প্রত্যেকটি পরমাণুর জীবন্ত বর্ণালি।

বাণের চিত্র-রচনায় যে ত্রুটি নাই, এমন বলি না। ভাবের তোড়ে মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্রের বুনানি এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। এ ত্রুটি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনিও বলিয়াছেন—"চিত্রগুলিও যে ঘন-সংলগ্ন ধারাবাহিক তাহা নহে।" কিন্তু রসিক পাঠক যদি সেই ঝোড়ো এলোচুলগুলি সরাইয়া একটি বিশেষ ঐক্যের মধ্যে সেগুলির বেণীবন্ধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনবগুণ্ঠিত চিত্র-সৌন্দর্যের লাবণ্যভরা সুন্দর মুখখানি দেখিবার সুযোগ পাইবেন।

সন্ধ্যা বর্ণনা

বাণের সন্ধ্যাবর্ণনারূপ প্যাটার্ণের শিল্পসৌন্দর্যের মধ্যে আছে—গতির আঘাতে আঘাতে উদ্ভিন্ন রূপের বিকাশ। চিত্র নির্নিমেষ নক্ষত্রের ন্যায় কোথাও চিরস্থির নহে। নির্দিষ্ট অঙ্কণ-রেখার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের জীবনছন্দ লক্ষ্য করা যায়। কোথাও মনকে স্থির হইতে দেয় না। পুরীর সমুদ্রোপকূলে দাঁড়াইয়া যদি কেহ সূর্যাস্তের চিত্র দেখিয়া থাকেন, সূর্যাস্তের আকুল সৌন্দর্যের মধ্যে যদি প্রেক্ষক বিশ্ব-শিল্পীর শিল্পশৈলীটি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বাণের সন্ধ্যাবর্ণনার মাধুর্যটি উপভোগ করা সম্ভব হইবে। বাণের চিত্রের মধ্যে আছে বেগের স্পন্দন—গতির আলোড়ন। সেই স্পন্দনে স্পন্দনে নিখিল চিত্রের আত্মায় এক প্রাণের শিহরণ জাগিয়া ওঠে। সেই শিহরণে শিহরণে যেন নির্নিমেষ সৌন্দর্যের 'কমলে-কামিনী'-র আবির্ভাব। চিত্র শুধু রূপ নয়, ঘটনার সহিত রূপের গ্রন্থি-বন্ধন। সেই ঘটনা মানবজীবনের স্থায়ী ভাবের জঙ্গম মূর্তি। কোন চিত্রই একক নহে। যেন কোন জীবন-রসিক ঐন্দ্রজালিক চিত্রের পর চিত্র দেখাইয়া মানব-জীবনের আদিম ভাবগুলির সঙ্গত বিন্যাসে অনুভূতির কাব্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন। সে কাব্যে কথা নাই, ভাব আছে; শব্দ নাই, রূপ আছে। রূপের আখরে অরূপকে প্রকাশ করিবার যে রীতি, এই মনোময় চিন্ময় রসময় কাব্য সেই রীতিতে বিন্যস্ত।

বাণের সন্ধ্যাবর্ণনার গোপন মন্ত্রটি উৎসারিত আকাশ ও সমুদ্র হইতে। একদিকে আকাশ, অপরদিকে সমুদ্র। এই আকাশ ও সাগরের আলিঙ্গন-উত্থিত স্পন্দন হইতে যে রূপলহরী জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আপন অবতরণের পাদপীঠ রূপে বাছিয়া লইয়াছে শান্তরসাস্পদ তপোবন। তাই সূর্যাস্তই হউক, সন্ধ্যা হউক, চন্দ্রোদয় হউক,—উহাদের অবতরণের কেন্দ্রভূমি সংসার-সম্পর্কহীন শান্তরসাস্পদ তপোবন।

বাণের সন্ধ্যা-চিত্রের বিষয়বস্তুকে চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) অস্তায়মান সূর্যের বর্ণনা (২) সন্ধ্যারাগের বর্ণনা (৩) সন্ধ্যার বর্ণনা (৪) চন্দ্রোদয় বর্ণনা।

অস্তায়মান সূর্যের রঙ্, কোথাও রক্তচন্দনের মত লাল, কোথাও কপোতচরণের মত পাটলবর্ণ, কোথাও ক্ষীরোদ-সাগর-শায়ী নারায়ণের নাভি-কমলের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ। অস্তায়মান সূর্যের এই যে লালিমা, ইহা একই লালরঙের বৈচিত্র্যমাত্র

নহে, গতির আবেগে একই লালিমার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। সূর্য দুর্নিবার গতিতে অস্তে চলিয়াছেন। সেই গতির আঘাতে সূর্যের রাঙিমার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই কোথাও সে রক্তচন্দনের মত। আবর্তনের তরঙ্গে চলিতে চলিতে যেখানে তাহার রঙে শ্বেত ও রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে সে কপোত-চরণের ন্যায় পাটলবর্ণ। আবার অবতরণের মুখে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য যখন সমুদ্রের কাছাকাছি এমন স্থানে যাইয়া পড়িয়াছে যে নীল সমুদ্রজলে তাহার প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষগোচর, সমুদ্রের নীলিমা-বিধৌত রক্তিমা তখন ঈষৎ লাল। তাই ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নাভিকমলের সহিত তাহার তুলনা।

ইহার পর সূর্যের তাপের প্রসঙ্গ। সূর্য যত অস্তমুখে, ততই তাহার তাপের হ্রাস ঘটিতেছে। শুধু তাপ নয়, আকৃতিরও বিলোপ ঘটিতেছে; তাই ক্রমশঃ তাহার ক্ষুদ্রাকৃতি। তাহার পর সূর্যের রক্তরশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে তপোবন-বৃক্ষে ও পাহাড়ের গায়ে। তপোবনবৃক্ষের শাখালগ্ন রক্তরশ্মিপুঞ্জ দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি ঋষিদের বাকল ঝুলিতেছে। অতএব উল্লিখিত অংশে বাণের পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও রূপানুভূতি তারিফ করিবার মত। এ পর্যন্ত যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা চিত্র-বিশ্লেষণের একটি দিক্ মাত্র। ইহা সৌন্দর্য নহে, সৌন্দর্যের বিষয়গত বিচার। শব্দ ছাড়িয়া বাক্য ছাড়িয়া অলঙ্কার, গুণ, ধ্বনি ও রস ছাড়িয়া সে সৌন্দর্য কোথায় পাইব? ইহাদের সহিত জড়াইয়া আছে আবার পাঠকের মানস-ভূমিতে অনুস্যূত ও পরিবর্দ্ধিত পৌরাণিক সংস্কার:

"স্নানোত্থিতেন মুনিজনেনার্ঘবিধিমুপপাদয়তা যঃ ক্ষিতিতলে দত্তঃ তমম্বরতলগতঃ সাক্ষাদিব রক্তচন্দনাঙ্গরাগং রবিরুদবহৎ।"—

"মুনিগণ স্নান করিয়া উঠিয়া সূর্যার্ঘ দান করিবার সময়ে ভূতলে যে রক্তচন্দন দিয়াছিলেন, আকাশস্থিত সূর্য যেন সাক্ষাৎ সেই রক্তচন্দনের অঙ্গরাগ শরীরে ধারণ করিতে লাগিলেন।" আবার—

"আলোহিতাংশুজালং জলশয়নমধ্যগতস্য মধুরিপোর্বিগলন্মধুধারমিব নাভি-নলিনং প্রতিমাগতমপরার্ণবে সূর্যমণ্ডলমলক্ষ্যত।"—

পূর্বকালে ক্ষীরোদসাগরমধ্যে নারায়ণ শয়ন করিলে তাঁহার নাভি হইতে মধুধারাক্ষরণকারী রক্তবর্ণ যে পদ্ম উঠিয়াছিল, জলমধ্যে পতিত তাহার প্রতি-বিম্বের ন্যায়, পশ্চিম সমুদ্রে ঈষৎ রক্তবর্ণ কিরণজালসমন্বিত সূর্যমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল।

ভাষায় ও ভাবে, অলঙ্কারে ও পুরাণে, রীতিতে ও ধ্বনিতে, প্রকৃতিতে ও মানব-

জীবনে জীবন-নির্ঝরের যে নিরবচ্ছিন্ন কলতান উঠিতেছে, তাহারই রসরূপ ঐ চিত্র। ঐ চিত্র একটা বিশেষ মেজাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা। ঐক্য, সামঞ্জস্য ও অপোহধর্মের সমবায়ে উহার দ্যোতনা। তাই বাণের প্রকৃতি-বর্ণনাকে বলিতে ইচ্ছা করে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের একখানি শিশিরস্নাত মালিকা।

দ্বিতীয়তঃ সন্ধ্যারাগের বর্ণনা। একদিকে সাগরবক্ষে সূর্যের অস্তগমন, অপরদিকে সাগরবক্ষ হইতেই সন্ধ্যারাগের উদয়—এই দুয়ের মধ্যে কালের কোন ছেদ নাই। অস্তায়মান রক্তরাগ সূর্য পশ্চিম সমুদ্রের নীল জল রাঙা করিয়া ডুব দিলেন, একথা না বলিয়া কবি বলিলেন, নীলজলধিবক্ষে রাঙা সূর্যের যে প্রতিবিম্ব দেখিতেছ, উহা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নাভিকমলের ন্যায় ঈষৎ রক্তবর্ণ। বক্তব্যকে আড়াল করিয়া বিষয়বোধের জন্য পাঠকমনকে কল্পনার অবাধ সুযোগ দিয়া বাণ যে কেবল ব্যঞ্জনাশক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নহে, পাঠকমনকে কল্পনার স্পর্শে জাগাইয়া তুলিয়া তাহার চিত্তের গ্রহণী ও সৃজনী—এই উভয় শক্তিকে নাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তার উদ্বোধ পাঠকমনে সহজ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছাড়া এরীতি আয়ত্ত করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাঙা সূর্য তো নীল জল রাঙা করিয়া ডুবিলেন। সেই লালিমা নীলাব্ধির তরঙ্গে তরঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া স্ফীত ও তরঙ্গিত হইয়া চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সমস্ত সন্ধ্যাকাশ রাঙাইয়া তুলিল—। এই কথাটি বলিবারই বা কী সুঠাম ভঙ্গী। "অস্তমুপগতে চ ভগবতি সহস্রদীধিতাবপরার্ণবতটাৎ উল্লসন্তী বিদ্রুমলতেব পাটলা সন্ধ্যা সমদৃশ্যত।" —"ভগবান্ সূর্য অস্তমিত হইলে দেখা গেল, পশ্চিম সমুদ্রের তীর হইতে প্রবাললতার ন্যায় সন্ধ্যারাগ উঠিতেছে।" এখানেও সন্ধ্যারাগের বর্ণটি ফিকে লাল—শ্বেত ও রক্তের মিশ্রণে উৎপন্ন। 'বিদ্রুমলতা'—প্রবাললতা। সমুদ্রক্রোড়ে প্রবালের স্থান। সমুদ্রের নীল জলের সহিত রক্ত প্রবালের association of idea আছে। কিন্তু কবি-কল্পনা সেই প্রবাল-রক্তিমাকে নীল জলের উপর ফেনাইয়া তুলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচাইয়া তুলিয়া তির্যক্‌ভাবে বিন্যস্ত করিয়া লতার ন্যায় লীলায়িত, সঞ্চারিত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া সাগরকূলের ঊর্দ্ধাকাশে ফুটাইয়া তুলিল। তাই বলিতেছিলাম রক্তরাগ সূর্যের নিমজ্জন ও সন্ধ্যারাগের উন্মজ্জন—ইহার মধ্যে কালেরও যেমন ছেদ নাই, রক্তরাগেরও তেমনি ছেদ নাই। রাঙা সূর্য সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়া যেন নীলজলে রাঙা ঢেউ তুলিয়া ধরিল। তাহাতে সমস্ত আকাশ-ভুবন—"বাসো বসানা তরুণার্করাগম্"। সেই রাঙা আলোর ঝলক আসিয়া পড়িল আশ্রমের মুখে—যেখানে মুনিগণ ধ্যান-নিমীলিত চক্ষু, যেখানে আশ্রমের

একপ্রান্তে হোমধেনুর দোহনধ্বনি ছন্দে ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছে, যেখানে বেদির উপর মুনিগণ হরিদ্বর্ণ কুশ-আস্তরণ মেলিয়া চলিয়াছেন এবং ঋষিকন্যারা দিক্‌পাল-গণের পূজার জন্য পক্ক অন্ন রক্ষণে ব্যস্ত। ধ্যানানন্দে বিস্ফারিত-হৃদয় মুনিগণ চক্ষু মেলিয়া সন্ধ্যার যে মূর্তি দেখিলেন, তাহাকে কবি কেমন চিরপরিচিতের অন্তরঙ্গ প্রকাশের মধ্যে ধরিয়া তপোবনে হাজির করিলেন—"কাপি বিহৃত্য দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা মুদিতৈস্তপোধনৈ রদৃশ্যত।"—ধ্যানানন্দচিত্তে মুনিগণ দেখিতে লাগিলেন যেন কোন নূতন তৃণময়-ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া রক্তচক্ষু স্বর্ণবর্ণ হোমধেনু দিবসাবসানে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। দিনের বেলায় কোথায় ছিল এই রক্তচক্ষু সন্ধ্যার তারাগুলি? কোথায় ছিল এই পাটলবর্ণের হোমধেনু! তপোবনধেনু সন্ধ্যার সহিত আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। কী চমৎকার idea. কী চমৎকার association. বাণের সন্ধ্যাবর্ণনার এই বাণীটি মহাকালের ললাটের অনপনেয় চন্দন-তিলক। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথকেও ইহা প্রভাবিত করিয়াছে।

বর্ণনার তৃতীয় ভাগে পড়ে সন্ধ্যার অবতরণ। সন্ধ্যারাগ সারা আকাশে তারকাকুলের মুখে আসিয়া পড়ায় তারকাগুলিও রক্তবর্ণ। সন্ধ্যার বর্ণও পিঙ্গল, তাই সে কপিলা; ধেনুশব্দের পর্যায়-শব্দ কিরণ; তাই হোমধেনুর সজীব কল্পনা। এই সন্ধ্যার যে মন্মথ রূপ, যে চিত্তহারী সৌন্দর্য, তাহা চোখ দিয়া উপলব্ধির বিষয় নহে, ধ্যানের দ্বারা তাহার উপলব্ধি করিতে হয়। তাই প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িল বিরহিনীর—ব্রতচারিণীর মূর্তি! নিখিল প্রকৃতির এখন বিরহিনীর মূর্তি! এ বিরহ কেবল মিলনের অভাব নয়, কামকে প্রেমে উন্নীত করিবার ইহা এক কৌশল বিশেষ! এ কৌশলের নাম তপস্যা। যে জ্যোতিঃ দ্যুলোক ও ভূলোক ছাড়িয়া অন্ধকারের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে অন্তরে উপলব্ধির জন্য—আপন আত্মায় দর্শনের জন্য নিখিল প্রকৃতির প্রতীক পদ্মিনীর প্রেমতপস্যা। প্রেমের ঋণ তপস্যায় শোধিতে না পারিলে প্রেম পূর্ণ হয় না। তাই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের আলম্বন বিভাব পদ্মিনীর প্রেমতপস্যা! পদ্মিনী সূর্যের শোকে অধীরা। সূর্যের সহিত পুনর্মিলনের আশায় সে বিরহ-ব্রত ধারণ করিল—তপস্বিনীর বেশে সাজিয়া উঠিল! তাহার পরিধানে শুচি শ্বেতবস্ত্র, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, হস্তে জপের মালা, সন্নিকটে কমণ্ডলু। হংস তাহার শ্বেতবস্ত্র, মৃণাল যজ্ঞোপবীত, ভ্রমরপঙ্‌ক্তি জপের মালা এবং পদ্মের কলিকা কমণ্ডলু।

"অচিরপ্রোষিতে চ সবিতরি শোক-বিধুরা কমলমুকুলকমণ্ডলুধারিনী হংস-সিত-

দুকুল-পরিধানা মৃণালধবল-যজ্ঞোপবীতিনী মধুকরমণ্ডলাক্ষবলয়ম্ উদ্বহন্তী কমলিনী দিনপতিসমাগমব্রতমিবাচরৎ।" বলিতে কি, ইহা তপস্বিনী মহাশ্বেতার সন্ন্যাস-মূর্তিরই অলক্ষ্য সাক্ষ্য।

আকাশের রূপ আর কবিকে ভুলিতে দেয় না। তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই নক্ষত্রের বর্ণনা! দেখিতে দেখিতে আকাশখানা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্রে ভরিয়া উঠিল কী করিয়া? এই যে খণ্ড খণ্ড আলোরূপ দেখিতেছি, ইহাদের সহিত কি সবিতৃমণ্ডলের কোন সম্পর্ক আছে? কবি বলিতেছেন, আছে। সূর্য যখন বেগে সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপ দিলেন, তখন সেই বেগোত্থ যে উচ্ছল জলবিন্দু দেখিয়াছিলে, উহারা প্রকৃতপক্ষে জলবিন্দু নয়, উহারা নিমজ্জমান সূর্যেরই উচ্ছল উৎক্ষিপ্ত আলোকবিন্দু! আকাশ-বিধৃত সেই আলোক-বিন্দুনিচয়ের স্থির শান্ত রূপ ঐ নক্ষত্রের মালা! পাঠক! কবি-কল্পনার মধ্যে অনুস্যূত বেগের আবেগ লক্ষ্য করুন! লক্ষ্য করুন চিত্রের dynamic force. কবিচক্ষু এখানেও নিমীলিত নহে। এ কি হইল? তারার ভীড়ে যে আকাশ ছাইয়া গেল! কবি বলিতেছেন —সিদ্ধকন্যারা সন্ধ্যাকালীন পূজায় নক্ষত্রের যে অঞ্জলি দিয়াছিল, তাহাতেই আলোকখণ্ডপুঞ্জের আকুলতামাখা নীরন্ধ্র আকাশের আলোঝলমল রূপের বাহার!

আর নয়! এইবার অন্ধকারকে নামাইয়া আনো। অন্ধকার লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করিও না। খুব হাল্কা সূক্ষ্মরেখায় অন্ধকারকে আঁকিয়া দাও। এক আলো থাকিতে থাকিতে যেন আর এক আলোকের তীরে যাইয়া উঠিতে পারি। মুছিয়া ফেল আকাশের গায়ের সন্ধ্যার সমস্ত রক্তিমা। মুনিগণ ইষ্টদেবতার নমস্কারে অঞ্জলিপূর্ণ যে জলরাশি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই সন্ধ্যার রক্তিমা আকাশ হইতে—মুছিয়া গেল। নামিল অন্ধকার। আকাশে উঠিল চাঁদ।

চতুর্থতঃ উপমা ও শ্লেষের পারিপাট্যে চন্দ্রোদয় বর্ণনা সুরু হইল। নক্ষত্র-খচিত এই যে আকাশ, সূর্যের-আলোকস্ফুলিঙ্গে-অনুবিদ্ধ এই যে আকাশ, সিদ্ধকন্যাগণের অঞ্জলি-উৎক্ষিপ্ত নক্ষত্র-শিউলির অঞ্জলি-আকীর্ণ এই যে আলোঝলমল আকাশ, এই আকাশের সহিত যদি তপোবনের যোগ না থাকিল, তবে বৃথাই ইহার রূপ! বৃথাই ইহার সৌন্দর্য। যে-সৌন্দর্যের পূর্বরাগ-রক্তিমা তপস্যার জ্যোতিতে প্রশান্ত হইয়া ওঠে নাই, তাহা সৌন্দর্যই নহে। যেখানে কামনার জ্বালা নাই, অথচ ত্যাগের প্রশান্তি আছে, যাহা নিখিল ইন্দ্রিয়ের ললাটে শান্ত

শীতল করস্পর্শ বুলাইয়া দেয়, তাহাই অনুভূতিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীতলোকে লইয়া যায়—আনন্দ-নদীর জলে চিত্তের প্রাতঃস্নান ঘনাইয়া তোলে। তাই কবি-কল্পনায় অন্তরীক্ষের সৌন্দর্যলোকে আশ্রমের ছায়া ফুটিয়া উঠিল—একেবারে বশিষ্ঠের আশ্রম। এ আশ্রমের অধিবাসী সপ্তর্ষি। এ আশ্রমে ব্রহ্মচারী ঋষি-বৃন্দের ধর্মপ্রহরণ আষাঢ় দণ্ডের অভাব নাই; ঋষিজনের লঘু আহারের নিমিত্ত ফলমূলও দুর্লভ নয় এবং ইহার একান্তস্থিত মৃগগণের চক্ষুগুলিই বা কী মনোহর। চন্দ্র সস্ত্রীক তপস্যায় রত। তাহার তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধন নাই, আছে বন্ধুজন-বিয়োগ-বিধুর বৈরাগ্য। তাই তাহার পরণে ধৌত ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় শ্বেতশুভ্র বল্কল। সেই শুভ্র বল্কলের শ্বেতচ্ছটায় আকাশ রূপালি আলোকে ভরিয়া উঠিল। চন্দ্রের বন্ধু-বিয়োগের বৈরাগ্য কী কেবল বর্ণনার সুষমার জন্য? ইহার মধ্যে কি চন্দ্রাপীড়ের ভাবী বন্ধু-বিয়োগজনিত বেদনার আগমনী নাই? কপিঞ্জলের সখ্য-সংবেদনার পূর্বগামিনী ছায়া নাই? বাণের কল্পনায় কিছুই অবান্তর নয়। তাহার পর জ্যোৎস্নার কথা। জ্যোৎস্নার প্রথম প্রকাশ আকাশে। তাহার পর গঙ্গাবতারের মতই জ্যোৎস্নাধারার ভূতলে অবতরণ। কিন্তু মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রের ক্রোড়স্থ ঐ মৃগরূপটি কি বৃথাই যাইবে? কবি-কল্পনা নড়িয়া উঠিল। চন্দ্র আর চন্দ্র থাকিতে পারিল না, একেবারে জ্যোৎস্নার সরোবরে রূপান্তরিত হইল। মৃগটি ঐ জ্যোৎস্না পান করিতে আসিয়া অমৃতের মহাপঙ্কে নিমগ্ন হইল; আর নড়িতে পারিল না।

"হিমকর-সরসি বিকচ-পুণ্ডরীকসিতে চন্দ্রিকাজলপানলোভাদবতীর্ণো নিশ্চল-মূর্তিরমৃতপঙ্কলগ্ন ইবাদৃশ্যত হরিণঃ।"

চন্দ্রের কিরণ শ্বেতবর্ণ সিন্ধুবার কুসুমের মত শ্বেত, হংসের ন্যায় শ্বেত। ধারাক্রমে এই কিরণগুলি আসিয়া পড়িতেছে কুমুদপূর্ণ সরোবরে। Law of association অনুসারে হংসের সহিত জড়াইয়া আসিল বর্ষাকাল ও সমুদ্রসম্পৃক্ত কবি-সংস্কার (Poetic Convention)—বর্ষার অভিজ্ঞান মেঘ। কালোমেঘ কালো অন্ধকারের মত। অন্ধকারের অপসারণে চাঁদের কিরণ ভাঙিয়া পড়িল সরোবরে। উদয়কালে চন্দ্রবিম্বে রক্তিমার ছটা লাগিয়াছিল; এখন সে ছটা মুছিয়াগিয়াছে। তাই চন্দ্রবিম্বটি এখন শ্বেতহস্তী ঐরাবতের কুম্ভের ন্যায়। এবার চন্দ্র আকাশের অনেক উপরে। পৃথিবী চাঁদের কিরণে ঝলমল করিতেছে। এই বর্ণনার সমাপিকা রেখায় আবার সেই আশ্রমের আসক্তি জাগিয়া উঠিল। শিশিরের জলে স্নান সারিয়া কুমুদফুলের গন্ধ মাখিয়া—শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল।

তাহার স্পর্শে হরিণগণের নয়নে নিদ্রার আবেশ ভরিয়া উঠিল ; নিশ্চল হইল নয়নের তারা ; মন্থনরত মুখগুলি ক্রমে ক্রমে মন্থর হইয়া আসিল। জীব-জগতের দুঃখহারিনী চেতনহারা নিদ্রা রূপকথার সুষমা লইয়া নামিল পাঠকের নয়ন-পাতায়। ঘুম-পাড়ানিয়া সঙ্গীতের ধূসর লাবণ্য-রেখায় বাণভট্ট সন্ধ্যাচিত্রের মণ্ডলটি শেষ করিলেন।

প্রভাত বর্ণনা

সন্ধ্যাবর্ণনার রক্তিম আলেখ্যে যে ভাব-স্পন্দন, যে গতিবেগ, প্রাণময় সৌন্দর্যের যে মুহুর্মুহুঃ শিহরণ দেখিলাম, প্রভাত-বর্ণনায় তাহা অনুপস্থিত। জীব-ধাত্রীর নিদ্রার ক্রোড়ে সুপ্তিমগ্ন বিশ্ব-শিশুটিকে জাগাইবার কত না কৌশল। জাগরণ যেন নিদ্রাশেষের জড়িমাভরা আঁকাবাঁকা পথ বহিয়া অতি ধীরে নিতান্ত সন্তর্পণে চেতনার কূলে নামিতেছে। পাদক্ষেপে কোন ত্বরা নাই, মৃদুল গতির ললিত বিলাস মাত্র। সুগন্ধ প্রভাত-বায়ুর মৃদু হিল্লোলে গাছের পাতায় যতটা স্পন্দন আঁকিয়া যায়, তাহার অধিক স্পন্দন এ ছবির প্রথম তুলিকায় ধরা পড়ে নাই। মৃদু জাগরণের মধ্য দিয়া কম্পিত লীলাটি মৃগয়া-কোলাহলের পরম পরিণামের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। জাগরণের কলিগুলি ফুটিতে ফুটিতে কখন যে একটি সন্নদ্ধ পুষ্পস্তবকে ঘনীভূত হইয়া উঠিল, তাহা টের পাওয়া যায় না। সৌন্দর্য-মৃগটি কখন যে মন ভুলাইয়া কলমুখর জীবন-তরঙ্গিণীর কূলে নিয়া ফেলিয়াছে, সেদিকে পাঠকের লক্ষ্য থাকে না। এ চিত্রের মৌলিক ধর্ম প্রশান্তি। স্বভাববর্ণনার এতটুকু আতিশয্য ইহাতে নাই। ইহা প্রকৃতির একখানা বাস্তব চিত্র। কল্পনা যেটুকু আছে, তাহা কেবল বাস্তবের প্রকাশের জন্য। বস্তুধর্ম মুখ্য, কল্পনা গৌণ। নিখিল প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি না থাকিলে, প্রকৃতি-প্রেম না থাকিলে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এমনি সহৃদয় প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কণ করা সম্ভব নয়।

প্রভাত-বর্ণনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিলে উহার দশটি ভাগ চোখে পড়ে। প্রভাত-বর্ণনার চিত্রখানি সুরু হইয়াছে অস্তায়মান চন্দ্রের রক্তিম আভায়। আকাশ-গঙ্গার পদ্মবনে বিহারশীল বৃদ্ধ হংসটি ধীরে ধীরে পশ্চিম সাগরের কূলে নামিতেছে —"একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনে চ কমলিনী-মধুরক্ত-পক্ষ-সম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনী-পুলিনাদপর-জলনিধি-তটমবতরতি চন্দ্রমসি"—একদা প্রভাত-কালে গগনতল ও চন্দ্রমণ্ডল সন্ধ্যারাগরক্ত হইয়া উঠিলে পদ্মমধুরঞ্জিত পক্ষশালী বৃদ্ধ কলহংসের ন্যায় চন্দ্র আকাশ-গঙ্গার পুলিন হইতে পশ্চিম সমুদ্রের তীরে অবতরণ করিতেছিলেন।—প্রভাত-সন্ধ্যার রক্তিমা একদিকে যেমন গগন রাঙাইয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সেই আবীররাঙা আলোর ছটায় চাঁদও রক্তবর্ণ। চাঁদকে কল্পনা করা হইয়াছে বৃদ্ধহংস। মৃদু পদক্ষেপে গমনশীল বলিয়া বৃদ্ধত্বের কল্পনা। হংসটি কমলবনে বিহার করায় তাহার পক্ষ দুইটি পদ্মের রক্তমধুতে

রাঙা। ছবিখানি চমকপ্রদ। চমকের আচম্বিত আঘাতে সৌন্দর্য যেন চোখের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। চোখের শিরা-উপশিরা সৌন্দর্য-তৃষায় যেন আত্মহারা হইয়া নাচিতে থাকে।

ইহার পর দিকগুলির বর্ণনা। সঙ্কীর্ণ রেখায় স্পষ্ট অস্পষ্টতা। আলোকের মৃদুকম্পনে কুহেলীর বক্ষোবাস যেন স্রস্ত হইয়া পড়িতেছে—"পরিণত-রঙ্কু-রোম-পাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশাচক্রবালে"—বৃদ্ধ রঙ্কু মৃগের লোমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ দিঙ্মণ্ডল বিস্তৃত হইতে লাগিল।—বয়ঃপ্রাপ্ত রঙ্কুমৃগের রোমের পাণ্ডুরতার অর্থাৎ পীত ও শুভ্রের সংমিশ্রণজাত ধূসর বর্ণের ন্যায় দিক্‌গুলি পাণ্ডুরতামাখা। ধ্বনিময় অপরিচিত রঙ্কু-শব্দটি পাণ্ডুরতার দ্যোতনায় অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে। অন্ধকারে ইহারা ছিল অবলুপ্ত, পাণ্ডুর রূপের মধ্যে ইহারা যেন ভাসিয়া উঠিতেছে। তাই দিক্‌চক্রবালের বিশালতা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

ইহার পর আরম্ভ হইল তারাগুলির অদৃশ্যভাবের বর্ণনা।—"পদ্মরাগশলাকা-সম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমানে গগন-কুট্টিম-কুসুম প্রকরে তারাগণে"—

সূর্যের আলোকে তারাগুলি ডুবিয়া যাইতেছে। সূর্যের আলোক সদ্যোনিহত হস্তীর তাজা রক্তে রাঙা সিংহ-কেসরের ন্যায় অর্থাৎ পীত ও লোহিতবর্ণের মিশ্রণ-জাত রক্তবর্ণ। আবার সূর্যের কিরণের রঙ পাটলবর্ণ; আলতা আগুনে ফুটাইলে যেমন তার রঙে শ্বেত-রক্তের মিশ্রণ ঘটে, তেমনি পাটলবর্ণের সূর্যকিরণগুলি। আবার সূর্যের কিরণগুলি যেন সম্মার্জনী। সেই সম্মার্জনীর শলাকাগুলি পদ্মরাগমণি-নির্মিত। সূর্যের রক্তকিরণ নীল আকাশে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার রঙ, পদ্মরাগ-মণির ন্যায় নীল ও রক্তের মিশ্রণজাত। আকাশখানি কুট্টিমের ন্যায়। তারাগুলি জমাট ফুলগুলির ন্যায়। প্রত্যূষের কাজ সম্মার্জনীর সাহায্যে কুট্টিম পরিষ্করণ। পশ্চিম সমুদ্রের তীরে শুক্তির আবরণভঙ্গে মুক্তাগুলি জ্বলিতে থাকায় মনে হয়,—সম্মার্জনীর আঘাতে তারাগুলি বুঝি এখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

ইহার পর ভাসিয়া উঠিল অরণ্যের ছবি। বৃক্ষগণ পল্লব-অঞ্জলি শিশিরস্নাত পুষ্পে ভরিয়া সূর্যের উদ্দেশ্যে অর্ঘ নিবেদন করিতেছে। পুষ্পার্ঘের ন্যায় গগন-কুট্টিমের তারাগুলির সহিত সূর্যার্ঘের সহজ কল্পনা।

ইহার পরই সুরু হইল সূর্যকরস্পর্শে জাগ্রৎ জীবকুলের জীবন-স্পন্দন। ময়ূর জাগিতেছে, সিংহীরা হাই তুলিতেছে, হস্তিনীগণ শুণ্ড দিয়া হস্তীদের জাগাইতেছে।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিহোত্র যাগ আরব্ধ হইয়া গিয়াছে। যজ্ঞাগ্নির ধূম পাকাইয়া উঠিয়া তপোবনস্থ উচ্চবৃক্ষের শাখাগুলিতে লাগিয়া আছে। মনে

হইতেছে, কপোতগুলি ডালে বসিয়া আছে। বৃক্ষগুলির অট্টালিকা-কল্পনায় পারাবতের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল এবং অগ্নির সহিত যোগ রাখিয়া ধূমগুলির ধর্ম-পতাকায় পর্যবসান—সার্থক সহচারী কল্পনা। ধূমের রঙের বর্ণনায় রাসভরোমের তুলনা। ধূমের লীলাই বা কত! উৎপত্তিকালে ইহার বর্ণ রাসভরোমের ন্যায়, শাখালগ্ন অবস্থায় বর্ণে ও স্বরূপে ইহা পারাবত। বাণের বর্ণ-বর্ণনায় রঙগুলি কেবল বস্তুহীন রঙ নয়। পরিচিত জীবের জীবনপীঠে দাঁড়াইয়া বর্ণগুলি কেমন সজীব ও প্রাণময়।

প্রভাতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। এ বায়ু কেবল গন্ধবহ নয়, শৃঙ্গার-চেতনায় অনুলিপ্ত ইহার সর্বাঙ্গ। রতিখিন্ন শবর-কান্তার শ্রান্তি-বিনোদন এই বায়ু। শিশির-স্নানের ঈষৎ শৈত্য, কমলবনের শিহরণভরা সৌগন্ধ্য, পল্লবলতার পেলব স্পর্শ, কমলবনের হৃদয়-ভরা মাধুর্য, ভ্রমরের গন্ধ-বিলাস—জড়িমাকুল ধীর পদসঞ্চার—এতগুণে গুণান্বিত বায়ুর একটিমাত্র কাজ হইল—শবর-রমণীগণের রতিখেদের অপনোদন—মাধুর্যের ললিত উপাচারে শ্রান্ত নারীদেহের পরিচর্যা। একদিকে কামিনীর খিন্ন দেহলতা, অপরদিকে পরিচর্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৃদু সৌন্দর্যের সযত্ন সতর্ক আহরণ। শবররমণীর খেদ অপনয়নের ব্যাপারটি সাহিত্য নয়, একটি বিশেষ সংবাদ। এই সংবাদটিকে সাহিত্যে পরিণত করিতে কবি যে কেবল প্রভাত-প্রকৃতির বাছাইকরা সৌন্দর্যগুলিকে রূপের স্বয়ং সম্পূর্ণ ডালিতে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা নহে ; সেই বাছাই সৌন্দর্যের পরিপাটী ঐক্যানুভূতির মধ্যে নন্দিত জীবন-চাঞ্চল্য ভরিয়া দিয়া কবি এক অনির্বচনীয় জীবন-স্পন্দনের মালা গাঁথিয়া তুলিয়াছেন। সে মালা কণ্ঠে পরিবার বস্তু নহে, হৃদয়ে ধরিবার। বায়ুর কোন বর্ণ নাই কিন্তু বন-মহিষের রোমন্থন-ফেনোচ্ছ্বাসে তাহার স্বচ্ছ অঙ্গটি দেখা যায়।

জীব-জগতের জীবন-ব্যাপারের মৃদুলীলার আখরে আঁকা ভ্রমরের ও হরিণ-কুলের ছবি। ছবি-দুইখানি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পূর্ণাবয়ব। এগুলিকে কেবল স্বভাব-বর্ণনার পায়ে অঞ্জলি দিয়া নিঃশেষ করা যায় না। ইহাদের অঙ্কন-শিল্পের মাধুর্যে ভরিয়া আছে সদ্যোজাগ্রৎ তন্দ্রালু নয়নের জড়িমা। রাত্রির নেশা একেবারে কাটে নাই, অথচ ভোরের বাতাসের স্পর্শে জাগরণের কলি যেন রহিয়া রহিয়া ফুটতেছে। ভ্রমরগুঞ্জন ঘুম-ভাঙানিয়া সঙ্গীত। পদ্ম জাগাইবার কৌশলে খচিত ভ্রমর-গানের লীলাটি। কমল-বনে মঙ্গল-পাঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ভ্রমর : মদসিক্ত করি-কপোলে সে যন্ত্রসঙ্গীত-পরিবেশক। সর্বাপেক্ষা মধুর যখন সে

রাত্রি-ফোটা সাপলা ফুলের বুকের মধ্যে বন্দী হইয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া চলিয়াছে। এমনি মধুমাতাল সে যে এদিকে কখন যে বাহির্দ্বারে আগল পড়িয়াছে, সে খেয়ালও তাহার নাই। কেবল স্বভাব-বর্ণনা নয়, স্বভাব-বর্ণনার অন্তরে যে জীবন-রস ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি ঊর্মির কম্পন পর্যন্ত বিধৃত হইয়া আছে ভ্রমরের ছবিখানির মধ্যে। হরিণের চিত্রখানি নিদ্রার আবেশে এবং জাগরণের মৃদুঝঙ্কারে মথিত। ভোরের বাতাসে নিদ্রার জড়িমা যাইয়াও যাইতেছে না। সেই জড়িমা নেত্রপক্ষে সংসক্ত। উত্তপ্ত লাক্ষারসে যেন আঁটিয়া গিয়াছে চক্ষুর প্রত্যেকটি রোম। ঘুমের আবেশ কাটিতেছে না অথচ জাগরণের অপটু চেষ্টা যেন তাহাদের নয়ন-তারায় রহিয়া রহিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে, তাই তাহাদের নয়নতারা বঙ্কিম রেখায় স্পন্দিত। আবার ক্ষার-মৃত্তিকায় শয়ন করায় তাহাদের বক্ষঃস্থলের রোমগুলি ধূসর—ধূম্রবর্ণ। এই বর্ণের সহিত কি কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতী অরণ্যের সঙ্গতি নাই? না-কাটা ঘুমের নেশা-বর্ণনায় ইহার তাৎপর্য।

ইহার পূর্বেই হরিণের নয়ন-তারায় বিলীয়মান নিদ্রার শেষ মূর্চ্ছনা দেখিয়া আসিয়াছি। সূর্য যে পা চালাইয়া চলিয়াছেন, এ সংবাদের সংকেত সৃষ্টির জন্য জীব-জাগরণের লীলাময় ভূমিকা। অরণ্যচারী প্রাণিগণের ইতস্ততঃ বিচরণ, পম্পাসরোবরের কলহংসগণের বর্ধমান কোলাহল, হস্তিগণের কর্ণের মনোহর ধ্বনি ও শিখিকুলের নৃত্য জীবজগতে জাগরণের স্পষ্টতা আনিয়া দিয়াছে।

হস্তীর চিন্তায় চকিতে আসিয়া পড়িল তাহার কর্ণাবলম্বী মঞ্জিষ্ঠারাগরক্ত অধোমুখ চামরের কথা। ঐতো সূর্য-কিরণের প্রতিচ্ছবি। সূর্য তাহার রাঙা আলো ছড়াইয়া দিয়াছে প্রথম পর্বতশৃঙ্গে, তাহার পর পম্পা-সরোবরের প্রান্তবর্তী বৃক্ষসমূহে, পরে নিখিল অরণ্যে। পর্বতে, অরণ্যে গাছে গাছে ডালে ডালে পাতায় পাতায় রাঙা সূর্যের রঙীন আলোর রক্তাক্ত নৃত্য সুগ্রীবের উপমায় জীবন্ত। বানরের অঙ্গকান্তির আলোহিতত্ব ও প্লুতি এবং সূর্যের মঞ্জিষ্ঠারাগরক্ত কিরণমালা ও ধাবমান উদয়ন—যেন এক নিক্তিতে মাপা। সুগ্রীবের সহিত তারার কল্পনায় নক্ষত্রের অবলুপ্তির সংবাদ-স্বভাব বিগলিত হইয়া রসময় কাব্য-স্বভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পুরাণের সংস্কার আসিয়া প্রকৃতির রহস্যের মায়ালোকে এমনি একটা বলিষ্ঠ নাড়া দিল, যেন সূর্য-রশ্মির সংক্রমণের লীলাটি পাঠকের নিকট চাক্ষুষ হইয়া উঠিল। ইহাকেই বলে **mental visualisation** বা মানস-প্রত্যক্ষ। ইহার পরই অতিসংক্ষেপে সূর্যের প্রথম যামার্দ্ধ অতিক্রমণের কথা।

নিখিল অরণ্য ছাড়িয়া কেবলমাত্র শাল্মলীবৃক্ষের প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে

বাণের শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পের জন্য চাই আবদ্ধপরিসর একটি বৃত্ত। নিখিল অরণ্যের কেন্দ্রস্থিত এই শাল্মলীবৃক্ষের শাখাস্থ নীড় হইতে প্রকৃতপক্ষে বৈশম্পায়নের জীবন-কাহিনীর সূত্রপাত। নানা ভাব-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বাণ পাঠকমনকে ঘুরাইয়া আনিয়া শাল্মলী-শাখায় ঝুলাইয়া দিলেন। এখানে বর্ণনার আতিশয্য নাই। সংক্ষিপ্ত শব্দ-রেখায় অঙ্কিত বৃক্ষটি। শুকপক্ষিগণ আহারের সন্ধানে দিগ্‌দিগন্তরে চলিয়া গিয়াছে। যাহাদের এখনও ডানা ওঠে নাই বা উড়িবার ক্ষমতা হয় নাই, এমন শুকশাবকগণ নীরবে আপননীড়ে অবস্থান করিতেছে। অন্তহীন বন এখন শব্দহীন। শিল্পরসের দিক হইতে এই নৈঃশব্দের বড় প্রয়োজন এখানে। নৈঃশব্দের বুকে মৃগয়ার কোলাহলকে ধ্বনিয়া তুলিতে পারিলে কোলাহলের ভীষণতা উপলব্ধি করান সম্ভব। অপেক্ষমান মথিত কোলাহলের ঘোর ঘনঘটার প্রস্তুতি-পর্বে যে গহীন[১] নীরবতার প্রয়োজন, সেই নীরবতাকে নিতান্ত সংযমের সহিত শাল্মলী বৃক্ষটি লালন করিতেছে। তাহার পরই আচম্বিতে উঠিল মৃগয়ার কোলাহল। নিখিল অরণ্য তাহাতে আলোড়িত হইল। ইহা যেন অরণ্য-প্রাণীর আক্রন্দন; আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া হঠাৎ—জাগা ভয়-বিহ্বলতা। প্রাণিগণের ছোটাছুটি, পক্ষিগণের ভয়ত্রস্ত নিরবকাশ পক্ষপাত ধ্বনি, হস্তিশাবকগণের বিকৃত বৃংহিত, ভ্রমরকুলের ভীত ভীত গুণ্‌ গুণানির অসম্বৃত প্রলাপ, ধাবমান বরাহগণের ঘর্ঘর শব্দ, গিরিগহ্বরে সুপ্তোত্থিত সিংহগণের ভীষণ গর্জন—একত্র সংহত ও ব্যথিত হইয়া যেন প্রলয়-কালীন জলদ নির্ঘোষ ঘনাইয়া তুলিল। গঙ্গাবতারের জলস্রোতের ন্যায় সেই কোলাহলের শব্দস্রোতে অরণ্য বৃক্ষগুলি যেন থর থর কাঁপিতে লাগিল। জীবনের মূর্ত প্রকাশ জীবন-সম্ভোগের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নাই, আছে প্রাণ-রক্ষার ব্যাকুলতায় জৈবকোষগুলির অস্বাভাবিক নিপীড়নের মধ্যে। বাণ যে জীবন-সুরের রেওয়াজ তুলিয়াছিলেন উষার আগমনীর সহিত, সেই রেওয়াজ ধীরে ধীরে নানা বিচিত্র উপায়ে ঘটনার আঘাতে বর্ণনার নিপীড়নে আহত হইয়া জীবজগতের অন্তর্লোকের প্রাণ-সিন্ধুর উতরোল টানিয়া বাহির করিয়া সত্তার বিহ্বল রূপের একখানি অকৃত্রিম ছবি আঁকিয়া দিলেন। প্রভাত-বর্ণনার মূল প্রেরণা জীবন-কোলাহলে। কী চিত্রে, কী স্বভাব-বর্ণনায় কী কল্পনায় বাণের বর্ণনাটি একখানি নিখুঁত বাস্তব চিত্র।

---

(১) "তুমি হও গহীন গাঙ্‌ আমি ডুব্যা মরি"—মহুয়া।

পম্পা-সরোবরের বর্ণনা

প্রকৃতিকে জলের ধারে দাঁড় করাইতে না পারিলে কবি-মনে সুখ নাই। জলের মধ্যেই যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মুক্তি; তাই কবি-মানসে বুঝি অরণ্যের পাশেই সরোবর। অরণ্য ও সরোবর—উভয় উভয়ের পরিপূরক। অরণ্যের মর্মে নির্জনতার সহিত শ্যামলিমা মিশিয়া যে দুর্ভেদ্য রহস্যের সৃষ্টি করে, সেই রহস্যের ভাষা সরোবর-তরঙ্গের আখরে পড়িতে পারিলে বুঝি সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা আস্বাদ্যমান হইয়া ওঠে।

বাণের তুলিকায় আঁকা প্রভাত ও সন্ধ্যার যে ছবি দেখিয়াছি, তাহাতে অন্তরীক্ষ লোকের রক্তাক্ত স্বপ্ন গলিয়া ঝরিয়া যত নীচে নামিয়াছে, ততই বর্ণে বর্ণে উল্লসিত মর্ত্যভূমির আধা-আলো আধা-অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন বিচিত্র ছবি দেখিয়াছি। মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের রঙীন আলো পড়িয়া মৃন্ময়ী পৃথিবীকে হিরণ্ময়ী করিয়া তুলিয়াছে, মাটিকে ইন্দ্রধনুর আবেশে রাঙাইয়া চকিতে তাহার বুকে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। তাহাতে স্বর্গ ও মর্ত্য, দ্যুলোক ও ভূলোক একাকার হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরীক্ষ-লোকে যে রাঙিমা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা নিবাত আকাশের রক্ত মেঘপুঞ্জের ন্যায় স্থির নহে। তাহাতে আছে গতির স্পন্দন। সেই স্পন্দনে স্পন্দনে যে শিহরণ জাগে, শিহরণে শিহরণে যে প্রাণরস উছলিয়া ওঠে, তাহাতে অন্তরীক্ষের রঙের পারাবার দুলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে মাটীর পৃথিবীর উপর পড়িয়া মৃন্ময়ীকে শত শত চিন্ময়ী রূপে জীবিত করিয়া তোলে; আমরা চকিতের মধ্যে কোটি কোটি কমলে-কামিনীর দিব্য মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়রসে সাঁতার কাটিতে থাকি। তখন নয়ন-ভোলান পৃথিবীর রূপে আমাদের হৃদয় ভরিয়া ওঠে; আমরা পৃথিবীর প্রেমে প্রেমময় হইয়া উঠি; পৃথিবীকে ভালবাসি। প্রভাত-সন্ধ্যার বা প্রদোষ-সন্ধ্যার উদয়রাগে যে রক্তিমা ভাসিয়া উঠে, তাহার দর্শনে আমাদের বুকের রক্তে স্পন্দন জাগে, জাগে শিহরণ। সেই শিহরণের কম্পমান অনুভূতির মধ্যে রূপের জগৎকে ধরিতে পারি বলিয়া পৃথিবী আমাদের কাছে এত সুন্দরী, এত রূপময়ী, এত বিলাসিনী।

প্রভাত ও সন্ধ্যার ছবিতে আমরা অন্তরীক্ষরূপের ধাবমান মূর্তি দেখিয়াছি; দেখিয়াছি রক্তের সহিত শ্বেতের, পীতের সহিত রক্তবর্ণের উন্মজ্জন! বেগের আঘাতে আঘাতে রূপের কমল মুহুর্মুহুঃ যে নূতন রঙের পাঁপড়ি মেলিয়াছে,

বারি তুলিয়া ধরে। আর দেখা যায় উদবাসী ঋষিদের। আরণ্যপুষ্পে তাঁহারা ইষ্টদেবতার অর্ঘরচনা করিতেছেন। পম্পার বুকে নামে গন্ধচোর বায়ু। সেই গন্ধের অসম্বৃত চঞ্চল অঞ্চল ক্ষণে ক্ষণে পাঠকের চোখে-মুখে আসিয়া পড়ে।

তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরের এই ছবিখানি প্রাণহীন ছবি নয়; ইহা জীবনের চঞ্চল প্রেরণায় ধুসর। রঙে ও রেখায়, শব্দে ও সঙ্গীতে ইহার প্রকাশ। সরোবরের প্রান্তিক রেখা যেমন সুস্পষ্ট ও বিরলহস্তের স্পর্শে প্রোজ্জ্বল, তেমনি অরণ্য-রহস্যের কাজলভরা সজল মায়ায় ইহার সৌন্দর্যের কেশপাশের বেণীবন্ধ। অন্ধকার-কৃষ্ণ সেই বেণীর লীলায়িত ছন্দে-বাঁধা বর্ণপ্রচুর সুগন্ধি বনফুলের আকুতি। সেই আকুতিতে ছায়া নামে শিখিলাস্যের ভাঙা ভাঙা চাঁদের। পম্পাসরোবরের উন্মুক্ত তরল বুকে শ্বেত, রক্ত, নীলের উচ্ছ্বাস। রঙ-উৎসবে বর্ণালির শোভায় রঙের উপর রঙ ঢালিবার জন্য অক্রুরবির লোহিত ছটার ডাক পড়ে নাই। ইহার যাহা কিছু সবই নৈসর্গিক। প্রকৃতিকে শিল্পের ডালায় ভরিয়া উপহার দিতে হইলে রূপের বৈচিত্র্য-বিন্যাসে যেটুকু সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিবোধের প্রয়োজন, চিত্রশিল্পী বাণের তাহার সম্মতি নাই। চিত্রে উপাদান বিন্যাসের এমন পটুতা যে শিল্পশৈলীর ঐক্যের মধ্যে সংহত হইয়া ইহারা নিখিল প্রকৃতিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ চিত্র আলম্বনীভূত বিভাবের উদ্দীপন মাত্র নহে; ইহা আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ। প্রকৃতির যে একটি সজীব আত্মা আছে, সেই আত্মার প্রকাশের বীজমন্ত্রটি শিল্পীর তুলিকাগ্রে বিন্যস্ত। আধুনিক কালের প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে অনুস্যূত কবির আপন মনের মাধুরীটি ইহাতে নাই বটে, কিন্তু এ চিত্রে কবির বিশেষ মনের পরিচয় আছে—যে মনের একমাত্র কাজ বিশ্বপ্রকৃতির পরিপাটী জীবন-ছন্দকে—বুকের আনন্দকে রঙে ও রেখায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। তাই এ সৃষ্টির কবিমনের শিল্পটি আপন মনের মাধুরীকে গুণীভূত করিয়া আপন মন দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির মনকে উদ্বুদ্ধ করে। বাণ তাহাতে আপ্তকাম।

বিন্ধ্যাটবী-বর্ণনা

এতক্ষণ আমরা রঙ্ ও রেখার, শব্দ ও সঙ্গীতের, স্পন্দন ও নৃত্যের অতিপিনদ্ধ আলিঙ্গনভরা যে ছবিগুলি দেখিয়া আসিলাম, বিন্ধ্যাটবীর ছবি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বিন্ধ্যাটবীতে কল্পনার ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা। রঙ্, রেখা, শব্দ, সঙ্গীত, স্পন্দন ও নৃত্য এখানে কল্পনা-সবিতৃমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত বর্ণালির রশ্মি-পুঞ্জ। সহস্ররশ্মির আকাশ-সঞ্চারিনী গতির লীলায় যেমন রূপের নিত্য নূতন তরঙ্গ, কল্পনার জঙ্গম মধুর নৃত্যভঙ্গিতে তেমনি এখানে ভাবের লীলা, রসের সম্মোহন। বাণভট্টের কল্পনায় সপ্তরাগের মিশ্রণ, তাই তাঁহার ছবিতে কোন ভাব স্থূল নহে। তাঁহার অঙ্কিত প্রত্যেকটি ভাব মাটির পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকতাশূন্য। একটি ভাবের রূপলহরী উঠিতে না উঠিতে ভাবান্তরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। তাই কোন ভাবকেই বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখা যায় না। তিনি যখন রতিভাবের আলিপনা আঁকিতে থাকেন, তখন সেই রতিভাবটি যে কখন উৎসাহ বা বিস্ময় বা ভয়ানক বা অপর কোন ভাবে মিলাইয়া যায়, তাহা ধরা যায় না। শুধু রতি নয়, সকলভাবেরই ঐ একই পরিণাম। তাই তাঁহার অঙ্কিত চিত্রে বর্ণনীয় বস্তু ভাবান্তরের আঘাতে ফিকে হইতে হইতে এক অপ্রাকৃত রূপলোকে যাইয়া ওঠে। অত্যন্ত কঠিন পার্থিব স্থূল বস্তু লইয়া তিনি অঙ্কণ সুরু করেন কিন্তু এই বিচিত্র শৈলীতে ধরা পড়িয়া তাহার স্থূলবস্তুটি সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্মে, অতিসূক্ষ্ম হইতে ইন্দ্রিয়াতীতের অনির্বচনীয়তায় যাইয়া কেবল অনুভূতির বিষয় হইয়া পড়ে। তাই তাঁহার ভয়ানক হইতে ভয় খসিয়া পড়ে, শৃঙ্গারে সম্ভোগের উৎকটতা থাকে না, বিস্ময়ে বৈরাগ্যের ছায়া নামে। অন্য কবির তুলিতে অঙ্কিত ভয়ানক চিত্রের যে উগ্রতা নিতান্ত দুঃসহ হইয়া পড়ে, বাণের সে উগ্রতা "স্পর্শক্ষমম্ রত্নম্"। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—"গিরিতনয়েব স্থানুসঙ্গতা মৃগপতিসেবিতা চ"—এই চিত্রে গিরিতনয়ার দুইটি মূর্তি পাশাপাশি অঙ্কিত; একটি মূর্তিতে তিনি শিব-সঙ্গতা; শিব-পার্ব্বতীর এই মিলনের উপর আসিয়া নামিয়াছে প্রেমের আবীরচ্ছটা—অনুরাগের রক্তোর্মির পিচ্ছিল ফেনভঙ্গ। পার্শ্ববর্তী মূর্তিতে দনুজদলনী সিংহবাহিনী দুর্গামূর্তি; মহাশক্তির রুদ্রতেজে ভয়ঙ্করতার অসহনীয় দীপ্তি। রক্তশতদলের বক্ষে ঊর্ধ্বফণ অজগরের ভীষণতামাখা পৌরুষভয়ঙ্করতায় আবদ্ধ নারীর ললিত যৌবন কান্তি। এই দুইখানি মূর্তি—একই গিরিতনয়ার বিভিন্নভাবের মূর্তি। একখানি প্রেমের,

অপর খানি সংহারের। মূর্তি দুইটিতে ভাবের পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, কেন্দ্রে কিন্তু ঐ একই গিরিতনয়া। পাশাপাশি থাকিবার ফলে গিরিতনয়ার প্রেমে-আরক্ত কপোলখানির রক্তিমচ্ছটা রুদ্রাণীর ভীষণ ভয়াল দুঃসহ মুখে পড়িয়া রৌদ্র-ভাবের উপর শৃঙ্গারের কমনীয়তা মাখাইয়া দিয়াছে। তাহাতে রৌদ্রভাব আর রৌদ্র থাকিতে পারে নাই; স্থায়ীভাবের আলোয় ব্যভিচারীর ছায়া নামিলে স্থায়ীতে ব্যাভিচারীতে মিলিয়া যেমন রসমূর্তির চমৎকারিত্ব ফোটে, তেমনি চমৎকারিত্ব ফুটিয়াছে শৃঙ্গার-রৌদ্রের রৌদ্র-মেঘের আলোছায়ায়। আবার যে প্রেম চিত্তের তটে তটে পূর্ণিমা নামাইয়া আনন্দসাগরের কলধ্বনি জাগাইয়া তোলে, যাহার স্বপন-ছাওয়া জ্যোছনায় নির্বাত নিষ্কম্প হইয়া আত্মমগ্ন হইতে থাকে, সেই আত্মবিলোপী স্থির প্রেমের উপর রুদ্রাণীর রৌদ্র হানিয়া কবি প্রেমের পারাবারে ঢেউখাওয়ার আনন্দ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহার ফলে রৌদ্র যেমন তাহার কাঠিন্য হারাইয়াছে, শৃঙ্গার তেমন সমাধিতে স্থির থাকিতে পারে নাই। একের স্থায়ী অপরের ব্যভিচারী হইয়া অপরের ব্যভিচারী অন্যের স্থায়ী হইয়া রসের পুষ্টি ঘটাইয়াছে।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে যে বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনায় বিষমভাবের ব্যঞ্জনা। ইংরাজীতে যাহাকে বলে, Paradox, ইহা তাহাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ইহা "সীমার মধ্যে অসীম"—"রূপের মধ্যে অরূপ"। কবি বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনার ললাটে যে বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এই সত্যটি ধরা পড়ে—

"অপরিমিত-বহুলপত্রসঞ্চয়াপি সপ্তপর্ণভূষিতা, ক্রূরসত্ত্বাপি মুনিজনসেবিতা, পুষ্পবত্যপি পবিত্রা বিন্ধ্যাটবী নাম।"

বিন্ধ্যাটবী-বর্ণনা প্রকৃতির চিত্রশালা নহে, মনুষ্যহৃদয়ভাব-চলচ্চিত্রের উহা প্রেক্ষা-গৃহ। মনুষ্য-হৃদয়-ভাবের দ্যোতনায় প্রকৃতি জাগিয়া ওঠে। কখনও বাসকসজ্জা নায়িকার তনু সৌন্দর্যে অরণ্যানীর চন্দন, কস্তুরি, অগুরু, তিলক-পরিমলের ছবি জাগে—"কামিনীব চন্দনমৃগমদ-পরিমল-বাহিনী রুচিরাগুরু-তিলকভূষিতা চ"; কখনও বা উৎকণ্ঠিতার অনুভাবের মাধুরীতে জাগে পল্লবানিলের বীজন—"সোৎকণ্ঠেব বিবিধপল্লবানিলবীজিতা সমদনাচ"; কখনও বা পরিত্যক্ত বিবাহ-ভূমির অভিজ্ঞানের স্মৃতিতে ফুটিয়া ওঠে হরিদ্বর্ণের কুশ, সমিধ, শমী ও পলাশশাখার স্বাভাবিক সৌন্দর্য—"কচিদচিরনিবৃত্তবিবাহভূমিরিব হরিৎ-কুশ-সমিৎ-শমী-পলাশ-শোভিতা"; কখনও বা ব্যাঘ্রগর্জন-রোমাঞ্চিতা খণ্ডিতা নায়িকার প্রিয়তমের বাহু-বন্ধনে আত্ম-সমর্পণের আলেখ্যের মাধ্যমে বিন্ধ্যের সিংহশক্তির পরিচয় নিবেদন—

"কচিদুন্মত্তমৃগপতিনাদভীতেব কণ্টকিতা"; কোথাও বিরহ-উন্মত্তার ছবিতে খচিত মত্ত কোকিলকুলের প্রলাপ; কখনও বা বায়ুরোগগ্রস্তা উন্মাদিনীর হাতের তালিতে ভরা "বায়ুবেগকৃততালশব্দা"।

উপরের ছবিগুলির যে আখর দেখিলাম, তাহাতে এই কথাই মনে হয়, বাণ মনুষ্য-চেতনার সোনার কাঠির চুম্বকে অচেতনকে আকর্ষণ করিয়া চির-পরিচিতের অহংতায় ভরিয়া তোলেন। তাহাতে 'প্রস্তুত' 'অপ্রস্তুত' হইয়া থাকে এবং 'অপ্রস্তুতে'ই 'প্রস্তুতের' হাতছানি দেখা যায়। বাণের অঙ্কণশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল এই, তিনি মানুষের বা মানব-সম্বন্ধিনী চিন্তার উপায়নে উপমান সৃষ্টি করেন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি বিশিষ্ট উপাদানে উপমেয় নির্মাণ করেন। তাহার ফলে জীবন-রস-উদ্ভিন্ন চিত্রের চমকপ্রদ প্রেরণায় প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরপরিচিতের মত আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে এবং পরিচিত প্রাণের তরঙ্গের আঘাতে আমাদের সুপ্ত সৌন্দর্যরসিক প্রাণের অসংবৃতি দেখা দেয়। কিন্তু এই ব্যাপারে কবির এমনি ভারসাম্যবোধ যে উপমান ও উপমেয় বিকৃত বা অতিরঞ্জিত না হইয়া পূর্ণোপমারই সৃষ্টি করে। ইহা অলঙ্কার-শিল্পের যাদুবিদ্যা; সৃষ্টিশিল্পের মোহিনী শক্তি।

কবি বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনা করিতে বসিয়া প্রথমেই তাহার ভৌগোলিক সীমা নির্ণয় করিলেন—"পূর্বাপরজলনিধি-বেলাবলগ্না" তাহার পর বলিলেন—ইহা মধ্যদেশের অলঙ্কার স্বরূপ। ইহাতেও কবিমন খুশি নয়; তাই বিন্ধ্যাটবী 'মেখলের ভুবঃ'। পাঠক! ভুল করিবেন না। ইহা ভৌগোলিক মানচিত্রের অতিরঞ্জন নয়, ইহা কবিমনের অনুভূতির মাপ। ভৌগোলিক সত্য কবির মানস-সত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র।[১] যেমনি রূপান্তর হওয়া অমনি কল্পনায় বান ডাকিয়া বসিল। আরণ্য বৃক্ষগুলির উত্তুঙ্গ শাখায় থরে থরে যে ফুল ফুটিয়াছে, ওগুলি ফুল নয়, ওগুলি তারার পুঞ্জ। বৃক্ষগুলি যে আকাশস্পর্শী একথা না বলিয়া বলা হইল শাখায় শাখায় অগণ্য তারা ফুটিয়াছে। তাহাতে ফল হইল এই, বৃক্ষগুলির আকাশ-স্পর্শিতাতো আসিয়া গেলই, অধিকন্তু দুরান্বয়ী জৌলুষে ফুলগুলি যেন হাতে-না-পাওয়া তারার কল্পনায় মাখামাখি হইয়া চকিত হইয়া উঠিল—তারার সৌন্দর্যে

(১) নারদ কহিলা হাসি, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি—
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
—ভাষা ও ছন্দ।

ফুলের সৌন্দর্য লুটাইয়া পড়িল। বর্ণনা-শিল্পের এই ম্যাজিক সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে একা বাণই দেখাইতে পারেন।

ইহার পর কল্পনা উড়িয়া চলিল মরীচপল্লবে। মরীচপল্লব হইতে তমাল-কিসলয়ে। তমাল-কিসলয়ের কালোরূপ ছাড়া আর কী রূপই বা হইবে? কবি বলিতেছেন, ঐ কালোরূপই চাই। ঐ তো কল্পনার রূপ। কল্পনার মতো কালো আর কী হইতে পারে? রাখো, রাখো! ডাকো ডাকো কচি কচি হাতিগুলিকে। ওরা ভাঙিয়া দিক ওর শাখাগুলি। এইবার দেখ কল্পনার কালোয় কী গন্ধ। অন্ধ যুবতীর মনে প্রেম ফোটান, আর কল্পনার তমালগুচ্ছে গন্ধ ছড়ান—একই কথা! কল্পনার বক্ষে যৌবন-জলতরঙ্গ বাজিয়া উঠিল: ফুটিল রঙের নেশা; চলিল কিসলয়ের বর্ণনা। কিসলয়গুলির রং দেখিয়াছ? পুরুষের হৃদয়-রক্তে আঁকা নারীর চরণ-অলক্তকের লালিমা। বনদেবীর চরণযুগলের ছাপ পড়ায় কিসলয়-গুলি অমনি রাঙা। এতো গেল লালিমার প্রসঙ্গ। 'এ হো বাহ্য, আগে কহ আর'। এর কান্তি! সুরাপানের মত্ততায় কেরল-কামিনীর কপোলে যে কোমল কান্তি জাগিয়া ওঠে, সেই কান্তিতে টলটল ঐ কিসলয়গুলি।

লতা-মণ্ডপের বর্ণনা এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প। এ ছবি আধুনিক কালের প্রকৃতি-বর্ণনার পাশে দাঁড়াইয়া আধুনিকতাকে হার মানাইয়া দেয়। আধুনিকতার লক্ষণ হইল অলঙ্কারের স্বল্প পরিবেশনে বিষয়বস্তুর স্বয়ংসম্পূর্ণ তনুরূপের মধ্যে যৌবনছন্দের কম্পমান লাবণ্যকে তুলিয়া ধরা। উদ্ভিন্ন-যৌবনার উচ্ছল লাবণ্য যেন অলঙ্কারের জড়োয়া-শিল্পে ঢাকা না পড়ে। নববধূর সুন্দর মুখখানির উপর অবগুণ্ঠনের মত এই রূপের উপর থাকিবে এক অস্থির ঔৎসুক্য-মাখা রহস্যের আবরণ; যেরূপের অনেকটা দেখিয়া ফেলিয়াছি, সম্পূর্ণটা দেখিতে পাইতেছি না—এই দেখা-অদেখা ঔৎসুক্যের নিরন্তর দোহন। আর ইহার যৌবন-লীলাটি হইবে—"নাতিপরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্য", তবেই সার্থক হইবে চিত্র। লতামণ্ডপের বর্ণনায় বাণের এই দৃষ্টিভঙ্গীটি ধরা পড়ে।

"শুককুল-দলিত-দাড়িমীফল-দ্রবার্দ্রীকৃততলৈরতিচপল-কপিকুলকম্পিত-কম্পিল্ল-চ্যুতপল্লবশবলৈঃ অনবরতনিপতিত-কুসুমরেণুপাংশুলৈঃ পথিকজনরচিত-লবঙ্গ-পল্লবসংস্তরৈঃ অতিকঠোর-নারিকেল-কেতকী-করীরবকুল পরিগতপ্রান্তৈঃ তাম্বূলী-লতাবনদ্ধ-পূগষণ্ডমণ্ডিতৈর্বনলক্ষ্মী-বাসভবনৈরিব বিরাজিতা লতামণ্ডপৈঃ।"

চারিদিকে রেখা না থাকাই এ ছবির বৈশিষ্ট্য। লতামণ্ডপটির সীমানা রক্ষা করিতেছে নারিকেল, কেতকী, করীল, বকুল; গুবাকবৃক্ষগুলিতে জড়াইয়া উঠিয়াছে

তাম্বুলীলতার শিল্প-শোভা। চারিদিক হইতে নানান লতা মিলিয়া মণ্ডপটি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই মণ্ডপের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে চোখ জুড়াইয়া যায়। শুকপাখীরা দাড়িম গাছের ডালে বসিয়া চঞ্চুর আঘাতে ফল ভাঙিয়া বীজ খণ্ডন করিতেছে। তাহার রসে আর্দ্র মণ্ডপতলটি। চঞ্চল বানরগণের উল্লম্ফনে কম্পিল্ল বৃক্ষগুলিতে কম্পন জাগিতেছে; সেই কম্পনে খসিয়া পড়িতেছে ফল ও পল্লব। অঝোরে ঝরিতেছে ফুল। ফুলের রেণুতে অঙ্গনে ধুলোট লাগিয়াছে। পথিকেরা সেখানে লবঙ্গ-পল্লবের আসন বিছাইয়া দিয়াছে। বনলক্ষ্মীর শোভন নিকেতন এই মণ্ডপটি।

বনলক্ষ্মী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। 'লক্ষ্মী' শব্দটিকে জড়াইয়া আছে কবি-কল্পনায় উদ্ভাসিত মানব-সুন্দরীর পেলব সূক্ষ্ম কান্তিমান্ দেহটির কাল্পনিক সংস্কার—আদর্শ সৌন্দর্য-বাসনার প্রেরণায় কম্পমান একখানি স্বপ্নালু মূর্তি। বনসৌন্দর্যের শান্তির নির্ঝরে কৃতস্নানা রম্য মূর্তিটিই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী যেমন নিসর্গ সৌন্দর্য ও পেলব স্পর্শ-সুখের আধার, তেমনি তাহার বাসভবনটি সৌন্দর্যের কম্পিত মৃদু রেখায় অঙ্কিত। রেখা নয়, লাবণ্যের ঊর্মি দিয়া রচিত এই তরঙ্গিত সৌন্দর্যের বেলা-ভূমি। তন্বী সৌন্দর্য-রেখা—জ্যোছনার তনিমায় আচ্ছন্ন। চিত্রখানির রোমান্টিকতা আধুনিক। স্বচ্ছ অলঙ্করণ; স্বচ্ছতায় ভরা উপকরণের সংযম। শরতের আকাশের মধুচ্ছন্দা সুষমার ন্যায় ইহার সুষমা। "কম্পিল্ল" যে কী গাছ জানা যায় না, তবে শব্দটির ধ্বনিগুণ অনুপ্রাসের তরঙ্গে আঘাত হানিয়া উল্লাস তুলিয়াছে।

বাণ কেবল সুন্দরের ছবি আঁকেন নাই, কেবল ভয়ঙ্করের ছবি আঁকেন নাই; তিনি আঁকিয়াছেন ভয়ঙ্কর-সুন্দরের। তাই এ ছবি চটকদার।

বিন্ধ্যাটবীর ভয়ঙ্কররূপের কিছু নমুনা :—

(১) "প্রেতাধিপ-নগরীব সদা সন্নিহিতমৃত্যুভীষণা মহিষাধিষ্ঠিতা চ"

(২) "কাত্যায়নীব প্রচলিতখড়্গভীষণা রক্তচন্দনালঙ্কৃতা চ"

(৩) "কল্পান্তপ্রদোষসন্ধ্যেব প্রনৃত্যন্নীলকণ্ঠা"

(৪) "প্রাবৃড়িব ঘনশ্যামলা অনেকশতহ্রদালঙ্কৃতা চ"

(৫) "ক্বচিৎ প্রলয়বেলেব মহাবরাহদংষ্ট্রাসমুৎখাতধরণীমণ্ডলা"

অচ্ছোদ সরোবর

বাণের বর্ণন সৃষ্টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য Parallellism বা সহচার কল্পনা। কী প্রকৃতি চিত্রে, কী চরিত্র-চিত্রণে, কী জীবন-ব্যাপারের লীলায়িত প্রকাশে তাঁহার প্রতিভার মধ্যে সৃষ্টির একটি যমজ রূপ দেখা যায়। তাহাতে সাদৃশ্যের পৌনঃপুনিক আপীড়নে মনের মধ্যে রূপরসগন্ধস্পর্শের প্রবাহ-পরম্পরা ঘনীভূত হইয়া ওঠে। এই সাদৃশ্যের মধ্যে থাকে বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্য যেমন একই বৃত্তির বার বার উপন্যস্ত একঘেয়েমির হাত হইতে মনের ঔৎসুক্যটিকে রক্ষা করিয়া চলে, তেমনি একই প্রকৃতিকে নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে কেমন দেখায়, তাহার সহিত দৃষ্টিকোণের বৈচিত্র্যজাত রূপ-বৈচিত্র্যরূপায়নের প্রতিভাটিও ইহার মধ্যে ধরা পড়ে। পম্পাসরোবরে আমরা অরণ্যের অন্তঃপুরিকার অবগুণ্ঠনহীন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। গল্পের যে অংশে পম্পাসরোবরের বিন্যাস ঘটিয়াছে, সে অংশে কবি-ঐন্দ্রজালিকের সুপটু হস্তের যে লীলাটি ধরা পড়ে, তাহা romanticism এর লীলা। পাঠক-মনকে দুঃখ-কষ্ট-আকীর্ণ দৈনিক জীবন-যাত্রার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া পিছনে-ফেলিয়া-আসা অতীতের স্বপ্নলোকে—ভাবের মায়ালোকে, যে লোকে মানুষের হৃদয়ানুভূতি প্রকৃতির হৃদয়ানুভূতিতে মিশিয়া একাকার হইয়া ওঠে, মানসবৃত্তি-সামঞ্জস্যের সেই কল্পলোকে ফিরাইয়া লওয়া কবির একমাত্র কাজ। সে কাজে কবি দক্ষতা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানুষের মিল কোথায়? প্রাণময় কোষের সাজাত্যে। মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষে নির্মিত মনুষ্য চৈতন্যে যে ধারা জাগে, প্রকৃতিতে তাহা কোথায়? তাই আমরা যখন প্রকৃতির খুব কাছাকাছি যাইয়া উঠি, তখন বিশ্বময় প্রাণ যাত্রার এক সার্বভৌম স্পন্দন আপন হৃদয়ে অনুভব করি। ব্যক্তি-হৃদয়ের সেতুবন্ধ ভাঙিয়া 'জলসঙ্ঘাতে'র ন্যায় আমাদের খণ্ডিত প্রাণস্রোত বিশ্বের প্রাণ-স্রোতে মিশিয়া একাকার হইয়া ওঠে; আমাদের প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে, বিশ্ব-প্রাণ আমাদের প্রাণে উঠিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে থাকে। প্রকৃতির চিত্রে মানুষের প্রাণকে যদি এইভাবে জাগাইয়া তোলা সম্ভব হয়, তবেই সার্থক হয় রচনা। এই অনন্ত উদ্বেল প্রাণ-সিন্ধুর উতরোলে কবি আমাদের মন ভুলাইয়া সংসার হইতে বহুদূরে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির তীরে আনিয়া ফেলেন। তখন আমাদের চিত্ত সংকোচভাব পরিত্যাগ করিয়া বিস্ফারিত, দীপ্ত ও বিগলিত হইয়া ওঠে। তাই প্রকৃতিতে আমাদের এত আনন্দ; প্রকৃতির

জীবন-রসের তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে আমাদের জীবন-রসের এমনি তরঙ্গধ্বনি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কেবল তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন। যদি তাঁহারা হৃদয় দিয়া প্রকৃতিকে দেখিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতির রস ও আবিষ্কার করিতে পারিতেন। প্রকৃতিকে কেবল উদ্দীপন-বিভাবের সীমানায় দাঁড় করাইয়া আলম্বন বিভাবের প্রহরায় নিযুক্ত রাখিতেন না। যাঁহারা বুঝিয়াছিলেন উদ্দীপন-বিভাব ব্যতিরেকে আলম্বন-বিভাব পুষ্ট হইতে পারে না, তাঁহারা আর একটু অগ্রসর হন নাই কেন? আলঙ্কারিকেরাও তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির কম কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতিকে জরিপ করিয়া সমাসোক্তির সীমানায় পিল্লে গাঁথিয়া তুলিলেন। কবিরাও আলঙ্কারিকদের বিনা হুকুমে এক পাও নড়িতে পারিতেন না। কিন্তু কবির চোখ, আর আলঙ্কারিকদের চোখ—এক চোখ নয়। স্বাধীনতা-হারা কবি প্রতিভা তাই কাব্যের জগতে অনুভূতির কালা পাণি পার হইতে পারে নাই। কবিগণের যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা ভগীরথের ন্যায় জীবানুভূতির নানা খাত এমনিভাবে বহাইয়া দিতে পারিতেন যে এই বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারেও আধুনিকতার খুব কম নমুনাই পাওয়া যাইত।

যাক, যে কথা বলিতেছিলাম! পম্পাসরোবরের রূপায়নে আছে কেবল সরোবর সৃষ্টির তাগিদ, কিন্তু অচ্ছোদসরোবরের কল্পনায় জড়াইয়া আছে অনেক কিছু। কেবল সরোবরের ছবি আঁকা কবির উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসের জীবনে এই সরোবরটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। যেখানে মহাশ্বেতার জীবন-ট্রেজিডি হৃদয়ের কূল ছাপাইয়া সুরধুনীর বারিধারার ন্যায় মর্ত্যের মাটিতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে, যেখানে ঋষিকুমার 'পুণ্ডরীকের তপস্যা প্রেমের চেতনায় আহত হইয়া মহাশ্বেতার রক্ত চরণ-পদ্মের তলায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিবে—"দেহি দেবি, পদপল্লবমুদারম্"; যেখানে সরোবরের কূলে মানব-মানবীর হৃদয়ে যৌবন-চেতনায় রক্ত-কোকনদ ফুটিবে, নিখিল হৃদয়ের আকুতি যেখানে ভ্রমর-গুঞ্জনের প্রলাপ তুলিবে, যেখানে চিত্তের অস্থিরতায় বাজিবে কলহংসের কলধ্বনি, যেখানে যৌন-সংবেদনার মাধবী প্রভাতে চিত্তের অখিল রঙীন বাসনা মেচকাকৃতি পাখা মেলিয়া রক্তোর্মির কূলে কূলে নাচিবে, যেখানে সহজে পাওয়া সহজেই হারাইয়া যায় ও নিত্য পাওয়ার আচম্বিত বাণী জাগে; যেখানে কাম তিরস্কৃত হয়, প্রেম উৎফুল্ল হয়; যেখানে তপস্যা ছাড়া প্রেম হয় না এবং প্রেমের হৃদয়ে বাসা বাঁধে বিশ্ব-বিধি; যেখানে যুবতী-হৃদয়-নিষণ্ণ

বেদনা অশ্রুরূপে উদ্গত হইয়া বিরহিনীর কোলের বীণার কঠিন তারগুলিকে সিক্ত করে; বেদনা যেখানে গান, তপস্যা যেখানে ভজন;—সেই সরোবরকে কেবল সরোবর বলিয়া বর্ণনা করিলে চলিবে না। তাহা যেমন সরোবর, তেমনি জীবন-লীলার আরক্ত পটভূমি। তাই বাণকে নানা দিক চিন্তা করিয়া তবে অচ্ছোদের ছবি আঁকিতে হইয়াছে।

অচ্ছোদসরোবরের প্রান্তিক রেখাগুলি সজল মায়ার শ্যামল স্নেহে আঁকা। ইহার তীরগুলি আবছাওয়া-মাখা অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতায় ভাষা পাইয়াছে রোমান্টিকতা। এই রোমান্টিকতা পশু-পক্ষি-বনফুল-মুনি-ঋষি-অরণ্য-বনদেবতা-সংবলিত রোমান্টিকতা নহে। ইহার উপর নামিয়াছে স্বর্গের ছায়া, দেবদ্যুতি। নন্দন-বনের ছায়ায় চন্দ্রের ছায়াপথ ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। সেই ধূসরতার আখর নামিয়াছে কবি-কল্পনায়। কল্পনার তমাল ছায়ায় পৌরাণিক সংস্কারের আঁকাবাঁকা পথ। সেই পথে-পথে-ঝরা শিল্প-সুষমায় কবিচেতনার জাগৃতি।

অচ্ছোদসরোবরের পটোন্মোচনে গাম্ভীর্যের প্রকাশ। কূলে কূলে যে তরঙ্গ বাজে, তাহার মধ্যে শোনা যায় তপস্যার ঋক্‌গুলি। শান্ত, মৌন, গম্ভীর পরিবেশের আলোছায়ায় জাগে ব্রহ্মার, বালখিল্য মুনিগণের, সপ্তর্ষিগণের, অরুন্ধতীর, সাবিত্রী দেবী ও সিদ্ধ স্ত্রীগণের মূর্তিগুলি। সকলের আকর্ষণ এই অচ্ছোদসরোবর। কুবেরের অন্তঃপুরিকাগণ ইহাতে জল-কেলি করিয়া থাকেন। চন্দ্রধর অর্ধ-নারীশ্বর শম্ভু যখন এই সরোবরে স্নান করেন, তখন তাঁহার জটাজুটের আক্ষেপে যে বেগের আবেগ জাগে, তাহাতে তাঁহার ললাটস্থিত চন্দ্রকলা হইতে অমৃত উছলিয়া পড়ে অচ্ছোদের স্বচ্ছ সলিলে—ভাসে গৌরীর বাম গণ্ডের লাবণ্যরস। শুধু দেবগণ নহে, স্বর্গের পশুকুলও ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্তি পায়না। "ক্বচিদ্বরুণ-হংসোপাত্তকমল-বন-মকরন্দম্, ক্বচিদ্দিগ্গজ-মজ্জন-জর্জরিতজরন্মৃণালদণ্ডম্, ক্বচিৎত্র্যম্বক-বৃষাণ-কোটি খণ্ডিত-তট-শিলাখণ্ডম্, ক্বচিদ্যম-মহিষ-শৃঙ্গ-শিখর-বিক্ষিপ্ত-ফেনপিণ্ডম্, ক্বচিদৈরাত-দশনমুষল-খণ্ডিতকুমুদষণ্ডম্" এইভাবে কবি এক পৌরাণিক আবেশ টানিয়া আনিয়া অচ্ছোদের পটভূমিতে গল্পের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেব-মাহাত্ম্যের রেওয়াজ তুলিয়াছেন। তাহার পর পুরাণের ভিড়ে আচ্ছন্ন পরিবেশের এক কোণে আঁকিয়া তুলিয়াছেন তমালবনের ঘনীভূত ছায়ায় নিকষকালো অনন্ত অন্ধকার। এই অন্ধকারের জমাটবাঁধা কালো রূপের উপর যখন মহাকালের মন্দির হইতে মহাশ্বেতার করুণকণ্ঠের সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার বিলীয়মান ফেনপুঞ্জের নিশিত শরগুলি প্রোথিত হইয়া পড়ে, তখন নিখিল সরোবরের চারিপার্শ্বে যে-ভাবের কুহেলী জাগে,

তাহা মহাশ্বেতার জীবনের ট্রাজেডিসংলাপের সুরে-বাঁধা বীণা। কথা যেখানে ভাষা পায়না, সুরকে দিয়া সেখানে ভাবের আখর ছড়াইতে হয়। সুরের পুষ্পরজে যখন নিখিল চিত্তমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া ওঠে, তখনই তাহার আধো-আলোয় আধো-ছায়ায় দেখা যায় সুন্দরের মুখ ; অনির্বচনীয়তা তখন চিত্তবীণার তারে তারে বাচ্য হইয়া বাজিয়া ওঠে। তাই বলিতেছিলাম, অচ্ছোদ-সরোবরের আবছাওয়া-ভরা দিক-চক্রবালের মধ্য দিয়া যেন দেখা যায় মানব-জীবনের বেদনা-সংবেদনার এক সুগন্ধ সুর-বিতান।

এই অচ্ছোদসরোবর সম্পর্কে চন্দ্রাপীড় মন্তব্য করিয়াছিলেন, "অদ্য পবিসমাপ্ত-মীক্ষণযুগলস্য দ্রষ্টব্যদর্শনফলম্"। এই অচ্ছোদসরোবরের স্বচ্ছতা, শৈত্য ও শুভ্রতার রূপায়নে কবি উপমা সংগ্রহের ত্রুটি রাখেন নাই। মণিময় দর্পণ, স্ফটিকভূমি গৃহ, দশদিক, চন্দ্রকিরণ, হিমালয়, শিবের পুঞ্জীভূত অট্টহাস্য, বৈদূর্যমণিপর্বত, শারদ মেঘপুঞ্জ—ইহাদের প্রত্যেকের দ্রবীভূত রূপের সহিত অচ্ছোদসরোবরের রূপের তুলনা চলে। শুভ্রস্বচ্ছ কৈলাস-পর্বত যদি তরল রূপ ধারণ করিত অথবা আকাশ গলিয়া যদি গঙ্গাবতারের ন্যায় জলাবতার সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত' অচ্ছোদের জোড়া মিলিত। বরুণের দর্পণময় গৃহ, ইহার নূতন সংস্করণ হইতে পারে। হরিণগণের নয়ন-কান্তি ও মুক্তার কিরণ-সমূহের দ্বারা অচ্ছোদের দেহ নির্মিত। সরোবরটির স্বচ্ছতার গুণকীর্তন করিতে যাইয়া কবি বলেন,—"আপূর্ণ-পর্যন্তমপ্যন্তঃস্পষ্টদৃষ্টসকলরত্নান্ততয়া"—জলে পূর্ণ থাকিলেও ভিতরের সকলবস্তু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বন, পর্বত, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সহিত ইহাতে ত্রিভুবন প্রতিবিম্বিত। বায়ুর তাড়নে যখন সহস্র তরঙ্গ ওঠে, তখন তরঙ্গগুলির মাথায় সূর্যকিরণে আঁকা সহস্র ইন্দ্রধনু দেখা যায়—"অনিলোদ্ধৃতজলতরঙ্গ-শিকর-ধূলিজন্মভিঃ সর্বতঃ সংস্থিতৈঃ রক্ষ্যমাণমিবেন্দ্রচাপসহস্রৈঃ"।

অচ্ছোদের বুকে যেমন ভাসে কলিকা, মৃণাল, শ্বেত, রক্ত ও নীল উৎপল, তেমনি ইহার গর্ভে বাস করে মৎস্য, মকর, কূর্ম। চক্রবাক, সারস, হংস, ময়ূর, বানর ইহার সান্নিধ্য রক্ষা করিয়া চলে।

চিত্রের মধ্যে বেগের আবেগ ঢালিয়া দিবার রীতির কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সে বৈশিষ্ট্য অচ্ছোদসরোবরের বর্ণনায় অনুপস্থিত নাই। চিত্রে অঙ্কিত কতকগুলি রেখা-পরম্পরার মধ্যে সংঘাত হানিয়া তিনি যে বেগের আবর্ত তুলিতে পারিতেন, তাহার একটু নমুনা—

"ষন্মুখচরিতমিব শ্রূয়মানক্রৌঞ্চবনিতাপ্রলাপম্"
"ভারতমিব পাণ্ডুধার্তরাষ্ট্রকুলপক্ষকৃতক্ষোভম্"
"অমৃতমথনসময়মিব তীরাবস্থিতশিতিকণ্ঠপীয়মানবিষম্"
"কৃষ্ণবালচরিতমিব তটকদম্বশাখাধিরূঢ়হরিকৃতজলপ্রপাতক্রীড়ম্"
"অরণ্যমিব বিজৃম্ভমাণপুণ্ডরীকম্"
"কংসবলমিব মধুকরকুলোপগীয়মানকুবলয়াপীড়ম্"—

ক্রিয়াগুলির ঘটমানতার বা শানচ্ প্রত্যয়গুলির দিকে লক্ষ্য করিলে কবি-বাসনায় আভাসিত বেগবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বেগের একদিকে যেমন শ্লেষের সংঘাত, অন্যদিকে তেমনি পৌরাণিক ভাস্কর্যবেধজনিত তাড়না। ইহাদের সম্মিলিত সংক্ষোভে জল নাচে, কী প্রাণ নাচে বোঝা দায়।

অতএব দেখা যায়, অচ্ছোদসরোবরের বর্ণনায় প্রকৃতির স্বরূপদর্শন বা Realistic view আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত গ্রন্থের ঘটনাসংঘাতের মূল কেন্দ্রে যেমন এই অচ্ছোদ, তেমনি হৃদয়-সংবেদনার মর্মমূলে ইহার বোধন। তাই এখানে কেবল কবির দৃষ্টি দিয়া প্রকৃতিকে দেখিবার অবকাশ বাণভট্টের নাই। এচিত্রে বর্ণালির আয়োজন যেমন সীমিত, তেমনি রূপের কারুকার্য সঙ্কুচিত। কবি-স্বভাবের ধ্বননের নেশা কিন্তু কোন মানা মানে নাই। কল্পিত পৌরাণিক জীব লইয়াও জীব-স্বভাবের ধর্ম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। শ্লেষ ও পুরাণের খনি হইতে যত মণিই তিনি উদ্ধার করুন না কেন, কবির দৃষ্টিতে গাঁথা প্রকৃতির স্বভাব-ধর্মের বিকলন কিন্তু চাপা পড়ে নাই; মণিময় ভাস্কর্যের মণিবেধের সূক্ষ্ম পথ দিয়া তাহার দ্যুতি বিকীরণ দেখা যায়। বর্ণনার ভাষার মধ্যে চিরন্তন সংলাপের সন্ধানও খুব কম মেলে। তাই বলি, এ সরোবরের সৌন্দর্য যত পরোক্ষ, তত প্রত্যক্ষ নয়। কেবল একটা ব্যঞ্জনার বায়ু যেন ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে। প্রকৃতির পল্লবগুচ্ছে শ্যামল পাতার আড়ালে যেন মানুষের হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া না পড়ে, হৃদয়-কুসুমের বিকাশে বাধা না জন্মে, কবির যেন সেই দিকেই লক্ষ্য।

পম্পা-সরোবরের বর্ণনার সহিত ইহার পার্থক্য এইখানে। পম্পা প্রকৃতির নন্দিতরূপের ললিত বাণী। প্রকৃতি এখানে সহজিয়া। রূপে ও সঙ্গীতে ইহার মন্ময়রূপের আবিষ্কার। মানুষের স্পর্শ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলে পম্পার সহজ রূপটি পাছে না ফোটে তাই পম্পার জলে মানুষের সংস্পর্শ সংযত। প্রকৃতির স্পর্শ হইতে মানুষকে দূরে রাখিলে মানুষ যেমন অসম্পূর্ণ, প্রকৃতির বেলায়ও ঐ একই কথা। প্রকৃতি ও মানুষ—পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তাই প্রকৃতি-

বর্ণনা হিসাবে পম্পা সার্থক সৃষ্টি। অচ্ছোদ-সরোবরে মানুষ অপেক্ষা দেবতা, দেবোপম ঋষি ও ঋষিপত্নী, দেবকল্প যক্ষপত্নী ও সিদ্ধস্ত্রীগণের ভীড়। পশুপক্ষীগুলিরও দেবসংস্করণ দেখা যায় কিন্তু মানুষের সাহচর্য অপেক্ষমান। ইহাদের জীবনলীলা এই অচ্ছোদের তীরে, তাই নাট্যবোধ ও রসবোধের দিক দিয়া অচ্ছোদের প্রথম অঙ্কে ইহাদের উপস্থিত করা হয় নাই। প্রকৃতিও জীবনলীলা—এই উভয়ের মধ্যে ভারসাম্যের (balance) বোধ না থাকিলে শিল্পকে বাধ্য হইয়া আত্মহত্যা করিতে হয়। মানুষের জীবনলীলার জন্য যতটুকু রূপের মোহ, যতটুকু সুরের মায়া প্রয়োজন, অচ্ছোদবর্ণনায় সেইটুকু মোহ ও মায়া থাকিলে প্রকৃতি-চিত্র হিসাবে অচ্ছোদের মূল্যায়ন সার্থক। প্রারম্ভে যাহা ত্রুটি বলিয়া মনে হইয়াছিল, সামাবিধির (Total effect) বিচারে দেখা যাইতেছে, তাহা গুণই। পম্পা প্রকৃতির খণ্ডিত রূপের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকাশ, অচ্ছোদ কাদম্বরীর সামগ্রিক চেতনার মর্ম-উদ্‌ঘাটন। এইমাত্র পার্থক্য।

অচ্ছোদ সরোবরের দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাটি সম্পূর্ণ নাট্যধর্মী। মধুযামিনীর আলোছায়ার নিভৃত অন্তঃপুরে সম্ভোগ-শৃঙ্গারের যে উৎসব জাগিবে, সেই উৎসব-মণ্ডপের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ যেমন উৎসবের অন্তরাত্মার সহিত সঙ্গত হইবার কথা, এখানকার বর্ণনাটি সেই সঙ্গতিরই চিত্রবাণী। নাট্যবস্তুর সার্থক উপস্থাপনার জন্য নাট্যাচার্য যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, অচ্ছোদের বর্তমান দৃশ্য-প্রযোজনায় বাণের ঠিক সেই সতর্কতা—উপস্থাপনা-শৈলীর সেই বৈদগ্ধ্য। এখন প্রশ্ন হইল—পরিবেশটি কেমন হইবে? পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার পূর্বরাগটি ঘনাইয়া তুলিবার জন্য যেমন হওয়া উচিত, পরিবেশটি তেমন হইবে। সাধারণ চিত্রী হইলে বসন্তের সুঠাম বর্ণনায় চিত্রটি ভারাক্রান্ত হইত—রতি-উদ্বোধের উপাদানের পর উপাদান চাপাইয়া চিত্রখানিকে উদ্দীপন-বিভাগের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। তাহাতে জাগ্রত বসন্তের অরুণচ্ছটা নায়ক-নায়িকার মনে অনুরাগের আবীর ছড়াইতে পারিত; হয়তো বা বাহিরের বসন্ত হঠাৎ-জাগা যৌবনের মুখে দৈহিক ক্ষুধার আকুলতা তুলিয়া ধরিতে পারিত। তাহাতে যে ফল হইত, তাহা নায়ক-নায়িকার মিলনকে সুগম করিয়া তুলিতে পারিত সন্দেহ নাই কিন্তু পাঠকের চিত্তকে দোলা দিতে পারিত না। পাঠক ঐ চিত্রকে রসের থিয়োরীর অনুগত একটি বিশিষ্ট অঙ্গের অধিক কিছু মনে করিতেন না। অভিনয়ের সকল অঙ্গ যেমন নটকেন্দ্রিক হইয়া সমূহালম্বন জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রোতার বাসনালোকে প্রবিষ্ট হইয়া অভিনেয় পুরুষের সহিত সহৃদয়ের চিত্তের তাদাত্ম্য ঘটাইয়া রসের অভিব্যক্তি ঘটায়, এক্ষেত্রেও হয়তো

তাহাই হইত। এ অবস্থায় উদ্দীপন-বিভাবকে স্বতন্ত্র করিয়া জানা যায় না, জানিতে হয় শৃঙ্গার দ্যোতনার সাম্যবিধির (Total effect) মাধ্যমে। সেখানে উদ্দীপন-বিভাব সহৃদয়ের অনুমানের বিষয়, প্রত্যক্ষের নয়। বাণ উদ্দীপন-বিভাবকে পৃথক করিয়া সহৃদয়ের প্রত্যক্ষগোচর করিতে চাহিয়াছেন। বাণ কহিতেছেন, চাহিয়া দেখ, এখানে আলম্বন নাই, তাই রতি নাই, অনুভাব নাই, ব্যভিচারী নাই, রসের কথাও উঠিতে পারে না। এখানে যাহা আছে, তাহা কেবল উদ্দীপন-বিভাব। নাট্যারম্ভের বহুপূর্বে তোমাদের চিত্রীকৃত বাসনালোককে এই উদ্দীপন দিয়া মার্জনা করিব। তোমাদের চিত্তগুলিকে সাক্ষাৎভাবে উদ্দীপন-রসে সিক্ত করিব। তাই আমার এই বর্ণনা যতটা বহিরঙ্গ হইবে, তদপেক্ষা অনেক বেশী হইবে অন্তরঙ্গ। বাহিরকে না ধরিয়া অন্তরে উপস্থিতি অসম্ভব, তাই বাহ্য স্থূলবর্ণনার মাথায় দাঁড়াইয়া আন্তর পরিমণ্ডল বর্ণনার পথটি বাছিয়া লইয়াছি।

তাই প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাণ Poetic convention বা কবি-সময়-প্রসিদ্ধির আশ্রয় লইয়াছেন,—[১] মদমত্তকামিনীগণের মুখমদ্য সেচনে বকুলবৃক্ষে মুকুল ধরাইতেছেন, যুবতীর পদাঘাতে মণিময় নূপুর-শিঞ্জিতের তালে তালে অশোকের ডালে ডালে রাঙা রাঙা ফুল ফুটাইতেছেন ; আমের কোমল কলিকাগুলিতে কামুক হৃদয়ের উৎকণ্ঠা মাখাইয়া রাখিয়াছেন ; মদনমহোৎসবে মলয় সমীরণের মৃদু-সঞ্চারণে মদনধ্বজের পতাকাগুলি কাঁপাইয়া তুলিতেছেন ; কামদেবের স্বরাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপ ; প্রোষিতভর্তৃকা দয়িতারা জিগীষু মদনের চ্যালেঞ্জের বিরোধিতা না করিয়া আগে হইতেই তাহাদের হৃদয় দিয়া গিয়াছে ; বিজয়ী মন্মথের আস্ফালনের অন্ত নাই ; পুষ্প-চাপের ঘন ঘন টঙ্কার ; তাহার ভয়াল শব্দে বিরহীদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বিদীর্ণ স্থান হইতে ফোয়ারার ধারায় রক্ত ছুটিতেছে, সেই রক্তে অচ্ছোদের বনভূমির জঙ্গম পথগুলি আর্দ্র ও পিচ্ছিল। কাম-সংবেদনার এমনি তাড়না যে কামবিহ্বল রমণীবৃন্দ দিনের বেলায়ও সঙ্কেত স্থানে ছুটিতেছে; তাহাদের জন্য আর তিমিরাবগুণ্ঠিত রজনীর প্রয়োজন নাই, অভিসারের পথে চলিতে চলিতে মেঘগর্জনে বিহ্বল হইবার শঙ্কাও তাহাদের নাই। তাহাদের হৃদয়স্থিত রতিরসের সাগর যেন ঝঞ্ঝারসমত্ততায় তীরের উপর আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

(১) পাদাঘাতাদশোকো বিকসতি বকুলো যোষিতামাস্যমদ্যৈ-
র্যূনামঙ্গেষু হারাঃ স্ফুটতি চ হৃদয়ং বিপ্রয়োগস্য তাপৈঃ।
মৌর্বী রোলম্বমালা ধনুরথ বিশিখাঃ কৌসুমাঃ পুষ্পকেতো-
র্ভিন্নং স্যাদস্য বাণৈর্যুবজনহৃদয়ং স্ত্রীকটাক্ষেণ তদ্বৎ॥ সা. দ. ৭

বহিরঙ্গ বর্ণনায় বাণ কিছু অভিজ্ঞান আনিয়া মিলনের সংকেত করিতেছেন—। এইরূপ অভিজ্ঞান একটি লতার দোলা। সে দোলা শূন্য নহে; মধুমদ পান করিয়া মাতাল ভ্রমরীরা লতার দোলায় দোদুল দুলিতেছে; সেই দোলনের কাঁপনে লতা হইতে ফুল ঝরিতেছে। দ্বিতীয় অভিজ্ঞান লতামণ্ডপ; ইহার তলদেশ বাঁকা-কেসরে-ভরা পুষ্পশয্যা; ঘন ঘন পুষ্প-রেণুতে ধরণীতল ধবল। অপর অভিজ্ঞান লবলী বৃক্ষ; ইহার উৎফুল্ল পল্লবে আত্মগোপন করিয়া মত্ত কোকিলেরা যে নিপীড়িত পুষ্প-মধুর দুর্দিন সৃষ্টি করিতেছে, তাহা রতিসর্বস্ব অধরের চুম্বন-জর্জর দুর্দিনের সংকেত নহেতো? সহকারের শাখায় শাখায় হৃদয়-গন্ধে বিভোর হইয়া নূপুর-পায়ে কাহারা চলিয়াছে? ওরা কি অভিসারিকা? ওরা ভ্রমরী। একি! কোকিলেরা মুকুলের বুকে নখক্ষত আঁকিতেছে কেন? চন্দন-বীথিকার দ্বারে দাঁড়াইয়া উন্মত্ত ময়ূরেরা কাহাদের ডাকিয়া বলিতেছে, 'এখানে ভুজঙ্গ নাই, এখানে এস।' ঐ যে চন্দন-বনের তলায় পুঞ্জিত কুসুমরেণুর উপরে কলহংসের পায়ের ছাপ দেখা যাইতেছে, ঐ পথেই কি অভিসারিকারা গিয়াছে?

অতএব বাণ যে এই চিত্রে ভাবী হৃদয়-বিনিময়-দৃশ্যের তালে তাল রাখিয়া সহৃদয়ের মানস পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিবার কৌশল ধরিয়াছেন, ইহা অবিসংবাদিত। এই চিত্রে যে রস জমিয়াছে, তাহা একক উদ্দীপন বিভাবের রস। ইহাতে মূলতঃ অচ্ছোদ-সরোবরের বর্ণনা নাই, বর্ণনা যাহা আছে, তাহা সহৃদয়ের মানস-প্রস্তুতির বর্ণনা। সহৃদয়ের বাসনালোকের শৃঙ্গার-উপযোগী বৃত্তিগুলিকে নির্বাচন করিয়া একটি বিশেষ ঐক্যের মধ্যে সেগুলিকে বাঁধিয়া তাহাদের মধ্যে জীবনের আলোড়ন তুলিয়াছেন। তাহাতে নাট্যবৃত্তির মত কাব্যবৃত্তির (activity) সাক্ষাৎ মিলিয়াছে। অভিনব গুপ্তও বলিয়াছেন, নাট্যবৃত্তির ন্যায় কাব্যবৃত্তিও আছে।[১] তিনি মনে করেন, কেবল নাটকে নহে, কাব্যেও ব্যাপার বা ক্রিয়া আছে। ভরতও বলিয়াছেন, সকল প্রকার কাব্যের মূলে আছে বিভিন্ন রকমের ক্রিয়া। ক্রিয়ার সহিত কাব্যের সম্পর্ক মাতার সহিত পুত্রের সম্পর্কের ন্যায়। কাব্যের ব্যাপারে

---

(১) (ক) তত্র কেচিদাহুঃ বৃত্তিপ্রভবত্বং দশরূপস্য সামান্যলক্ষণম, বৃত্তীনাং তদঙ্গানাং চাঽনভিনেয়-কাব্যেষ্বসম্ভবাৎ। এতচ্চাসৎ, আস্তাং কাব্যার্থঃ। সর্বোহি সংসারো বৃত্তিচতুষ্কেণ ব্যাপ্ত ইত্যুক্তং প্রথম এবাধ্যায়েঽস্মাভিঃ। A Bh. Vol II, 407 (খ) যদ্যপি সর্বেষামভিনেয়াঽনভিনেয়ানাং কাব্যানাং বৃত্তয়শ্চেষ্টা মাতর ইব, তাভ্যোঽপি বাচ্যরূপত্বেন কবি-হৃদয়ে ব্যবস্থিতাভ্যঃ কাব্যমুৎপদ্যতে। তথাপি প্রয়োগং প্রযুজ্যমানত্বাৎ প্রযোগযোগ্যত্বমভিসন্ধায় বৃত্তিভ্যো বিনিসৃতমভিনেয় কাব্যম্ প্রত্যক্ষ-ভাবনাযোগ্য বৃত্তিচতুষ্টয়াভিধায়কত্বং দশরূপম্, সামান্যলক্ষণমিত্যর্থঃ A.Bh. vol II, 348.

কবি-মনে উপস্থিত বিভিন্ন বৃত্তি ভাষারূপে আত্ম প্রকাশ করে। যাহা বলিতেছিলাম, সহৃদয়ের বাসনালোক চিত্রণের কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া বাণ গতানুগতিক বর্ণনার পথ হইতে সরিয়া কবি-ব্যাপারের সাধনায় মত্ত। তাই এ চিত্র তাঁহার প্রতিভার নাট্য-ধর্মিতার স্বাক্ষর। সহৃদয়ের বাসনা-রঞ্জিত চিত্তকে—শৃঙ্গার-চেতনাকে—মানুষের জীবনে নিত্যঘটা শৃঙ্গার-ব্যাপারের পূর্ব প্রস্তুতিকে বাণ প্রকৃতির নির্বাচিত পরিভাষায় রূপ দিয়াছেন। সেই রূপে অপেক্ষমাণ শৃঙ্গারের সংকেত-স্থানে যে বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে, সেই বাঁশীর সুরের রেণুতে অচ্ছোদের দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনাটি আচ্ছন্ন।

পাঠক! এইবার আসুন অচ্ছোদের তৃতীয় পর্যায়ের বর্ণনায়—আসুন লতা-মণ্ডপে। মণ্ডপটি বিচিত্ররূপী! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে মণ্ডপটিকে নানা রূপে দেখা যায়। বসন্ত ঋতুর ডালাটিকে নিঃশেষ করিয়া নিখিল ফুল বুঝি এইখানে লুটাইয়া আছে। তাই মনে হয় ফুল দিয়াই মণ্ডপটি তৈয়ারী। পুষ্প-গন্ধে অন্ধ হইয়া যখন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি লক্ষ লক্ষ ফুলে মধু-উৎসবের ভীড় জমাইয়া তোলে, তখন মনে হয়, এ মণ্ডপ মৌমাছি দিয়া তৈয়ারী; শুধু মৌমাছি নয়, কোকিলে কোকিলময়, ময়ূরে ময়ূরময়। এই ভ্রমর, এই কোকিল, এই ময়ূর—এরা কিন্তু মোটেই নিঃস্পৃহ দর্শকমাত্র নয়। এরা মতলববাজ। ভ্রমর কেন সমবেতকণ্ঠে ঝঙ্কার তোলে, দলে দলে কোকিল কেন বসন্তকে নিরন্তর স্বাগত জানায়, কেন বলে, 'বসন্ত, তোমার জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক।' দক্ষিণা বায়ু কেন ফুল নাচাইয়া অজ্ঞাতে গন্ধ লুটিয়া লয়, ভ্রমর-ঝঙ্কার-সংকেতকে ভাসাইয়া লয় কোন্ মানসীর তীরে, কোকিলের পঞ্চম দিয়া কোন্ অবলার বক্ষে করে করাঘাত, চুরি করে তার নিদ্রাটুকু, হাসিটুকু, স্বস্তিটুকু! শুধু এরাই দোষী নহে! কী কাজ এ মণ্ডপে ঐ কচিকোমল-পল্লব-ভূয়িষ্ঠ চন্দন-পাদপের। কর্পূর কি তাহার ভাঙা ভাঙা বাকল হইতে অকারণেই রেণু ছড়ায়? এরা মণ্ডপ-শিঙারে মত্ত। মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের হৃদয়-বেধের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। কাম স্বয়ং পুষ্পচাপ আকর্ষণ করিতে-ছেন, সাহচর্য করিতেছে অচ্ছোদের তীরে আবির্ভূত নব বসন্ত, আর হৃদয়-ময়ূরাক্ষীর মুখে যৌবনের প্লাবন।

লতামণ্ডপের মধ্যে চাহিয়া দেখুন একখানা সুবৃহৎ চন্দ্রকান্তমণি-প্রস্তর। রতিখিন্ন নারীদেহে প্রস্রবমান ঘর্মবিন্দুর ন্যায় মণিদেহ হইতে ঝরিতেছে জলকণা। মণির বুকে সদ্যস্নাত মৃণাললতার একখানি শয্যা। শয্যার উপরে বিছানো

শ্বেতোৎপল, নীলোৎপল, পদ্ম ও নানান জাতির বনফুল। পদ্ম-পাতায় উৎকীর্ণ জলকণা ; কুমুদ-কুবলয়-কমলের বুকভরা রেণুপটল।

দেখুন, মদনাহত পুণ্ডরীক এই কমল-শয্যায় শায়িত। কপিঞ্জল মহাশ্বেতাকে শৃঙ্গার-সম্ভোগে আমন্ত্রণ জানাইতে গিয়াছেন। যতক্ষণ মহাশ্বেতা রক্তরাগ বসন পরিয়া কর্ণে পারিজাত-মঞ্জরী ও কণ্ঠে জপমালা ধারণ করিয়া অভিসারে না আসিতেছেন, যতক্ষণ চাঁদের কিরণ পথে পথে আলো ফেলিয়া মহাশ্বেতাকে লইয়া এখানে না উপস্থিত হইতেছে, ততক্ষণ আমরা অচ্ছোদের এই লতামণ্ডপটির কাণ্ডটা দেখিয়া লই।

দেখুন পুণ্ডরীক শায়িত। তাহার গায়ে ঝরিতেছে কামদেবের বশীকরণচূর্ণের ন্যায় পুষ্পরেণুর অজস্রতা। বায়ু-কম্পিত অশোকপল্লবগুলির রক্তিম আভা পড়িয়াছে পুণ্ডরীকের চন্দন-ধবল দেহে, ঝরিতেছে পুষ্পগুচ্ছের মধুর ধারার টপ-টপানি, আর অলি-নিষণ্ণ চম্পকরাজির নিরবচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি।

অচ্ছোদের তৃতীয় পর্যায়ের উপসংহারে বনভূমির নিখিল পুষ্পিত সৌন্দর্যের উপর বেদনার কালিমা লেপন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে মনুষ্য-হৃদয়ের হাহাকার—আসন্ন সম্ভোগের মুখে বিপ্রলম্ভের কাতর ক্রন্দন!—নিখিল পটভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিয়াছে মানুষী চেতনার সর্বহারা বাণী। নিখিল অরণ্যের পাতায় পাতায় পুষ্পে পুষ্পে যে আখর পড়িল, তাহাতে রচিত হইল বিরহ-বেদনার এক শাশ্বত মহাকাব্য—এক মাথুর পদাবলী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের হৃদয়-সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হইল। ইহার পর প্রকৃতি রহিল নামে, বেদনাভারাক্রান্ত এক সজল-মেদুর আকাশ পাঠকের মন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

চতুর্থ পর্যায়ে এই বেদনার ছবির চরম প্রকাশ। বৈশম্পায়ন ঘুরিতে ঘুরিতে সেই লতামণ্ডপের চন্দ্রকান্তমণি-শিলার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মনে হইতেছে ঐ শিলাখানিকে যেন চিনি। যেন উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে আমার অনন্ত জীবনের সুখ-দুঃখ। এইখানে এই লতামণ্ডপে—এই শিলাতলে কী যেন পাইতে পাইতে হারাইয়াছি। কী সে জিনিস, তাহা জানি না : শুধু এইটুকু জানি, আমার জীবন-রহস্যের গলিত নির্ঝর যেন পাষাণ হইয়া ঐখানেই পড়িয়া আছে। বৈশম্পায়নের পা আর চলিল না ; নয়ন নির্নিমেষ, হৃদয়-আছাড় খাইয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বৈশম্পায়ন স্থির, নিশ্চল, নিথর।

পাঠক! ইহা 'জননান্তর-সৌহৃদানি'র এক অনুভাবময় চিত্র। ইহা একক জীবনের অনুভূতির চিত্র নয় ;—দ্বৈত জীবনের। 'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে

চন্দ্রে'র মত মৃত্যুর আবরণ! একই ঋষিকুমার—পূর্বজন্মে যিনি পুণ্ডরীক ছিলেন, পরবর্তী জন্মে তিনি বৈশম্পায়ন। দুইটি জীবনে একই সত্তার অবিচ্ছিন্ন ধারা বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মাঝখানে মৃত্যুর যবনিকা সত্তার সেই একক প্রবাহকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া অদ্বৈতকে দ্বৈতরূপে প্রতিফলিত করিতেছে। তাই একই নদীর দুই তটের ন্যায় দুইটি জীবন আজ পৃথক্। পৃথক হইলেও নদীপ্রবাহ কিন্তু সমান। মৃত্যু বা বিস্মৃতির আড়াল দিয়া আসিতেছে বলিয়া পূর্ব জীবনের অনুভূতির ধারাকে নাম-ঠিকানা সহ এ জীবনে দাঁড়াইয়া ধরা যায় না। ধরা না গেলেও সে আসে; এ জীবনের চিত্তভূমির উপর দিয়া সে গড়াইয়া যায়। আমাদের চিত্তের অবচেতন অংশে সেই প্রাক্তন অনুভূতি স্থায়ী হইয়া আছে। সেখান হইতে মাঝে মাঝে এক-একটা তরঙ্গ যখন আমাদের চেতনালোকে আসিয়া ধাক্কা দিয়া যায়, তখন আমরা তাহাকে যেমন করিয়াই হউক অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু মৃত্যু বা জন্মান্তরের আড়াল দিয়া আসে বলিয়া এ অনুভূতির শাদা-রূপ। একটি বিশেষ জীবনের নাম, ঠিকানা, সীমা ও কাল তাহাতে থাকে না বলিয়া তাহাকে আমরা চট্ করিয়া ধরিতে পারি না। গোবৎস যেমন করিয়া গাভীর উধ্বদেশে আঘাত হানিয়া দুগ্ধ বাহির করিতে চায়, এই নির্বিশেষ অনুভূতিটিও তেমনি একটা বিশেষ রূপের আবিষ্কারের জন্য আমাদের চিত্তে আঘাত হানিতে থাকে। তখন পূর্ণযৌবনা ধরিত্রীর নিসর্গ সৌন্দর্যে ও সুললিত সঙ্গীতের অসীম-ছাওয়া তানে তানে আমরা হারাইয়া-ফেলা এক দুঃখ-সংবেদনা অনুভব করি। কেমন করিয়া করি, তাহা জানি না, তবে এইটুকু জানি যে ইহা "ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।"

কালিদাস হংস-পদিকার গীতির মধ্যে রাণী বসুমতীর তিরস্কাররূপে যাহার ইঙ্গিত করিলেন, বাণভট্ট তাহা চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করিলেন। হংস-পদিকার গীতিতে অনুবিদ্ধ হইয়া দুষ্মন্ত যেমন শাপ-পূর্ব জীবনের কোন কথাই স্মৃতিতে আনিতে পারেন নাই, কেবল পূর্ব-জীবনের জীবন-সর্বস্বকে হারাইয়া ফেলার এক অবোধপূর্ব বেদনা অনুভব করিয়াছেন, তেমনি এক নির্বাক্ মূঢ় বেদনায় আচ্ছন্ন-হৃদয় বৈশম্পায়ন ঐ চন্দ্রকান্তমণি-শিলার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া চাহিয়া আজ স্থির, নিঃসাড়। পাষাণের বুকে হৃত-তরঙ্গের আকুলতার মত তাহার হৃদয়ে আজ শততরঙ্গের মর্মরধ্বনি। এক অজানা কান্নায় তাহার হৃদয় গুমরিয়া মরিতেছে কিন্তু কেন? কিসের জন্য এই কান্না? কাহার জন্য? হতভাগ্য বৈশম্পায়ন তাহা জানে না। কিন্তু ঐ লতামণ্ডপ ছাড়িয়া আর এক পাও সে

আগাইতে পারে না। ওকি তার বৃন্দাবন? সে কিছুই বুঝিতে পারে না। বুঝুক আর নাই বুঝুক, লতামণ্ডপের নিবিড় আকর্ষণের মর্মপীড়া তাহাকে সর্বত্যাগী করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় পড়িয়া রহিল বন্ধু চন্দ্রাপীড়ের আদেশ, সেনানী ও সৈন্যবাহিনীর অকুণ্ঠ অনুনয়! মুহূর্তে সে সব ত্যাগ করিল—পিতা, মাতা, বন্ধু; ভক্তি, সখ্য, মমতা; কর্তব্য, সংসার, বন্ধন; আহার, নিদ্রা, ভয়। বিনিদ্রনয়নে মহাকালের মত নিমেষহীন পলকে সে চাহিয়া থাকে। বিহ্বল চাহনি! উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি! চোখ-দু'টি তার স্মৃতির পায়ে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া ওঠে—"কথা কও, কথা কও।" কী অকরুণ এই স্মৃতি! পাষাণী।

পাঠক! দেখুন, অচ্ছোদের এই চিত্রে মনুষ্য-চেতনার কী ঠাসবুনানি! বেদনার কেমন নির্বাক্ চিত্র! অন্তর্গূঢ় মর্ম-পীড়ার মুহুর্মুহু কী চকিত উল্লাস! রিক্ত প্রস্তর-খণ্ড! ছায়াময় নাট্যব্যঞ্জনা! ছায়াছবিতে জাগে মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের জীবন-ট্রাজেডি! মানুষ নেই, ছায়া আছে। ছায়ার বুকে জ্বলে বেদনার সূর্যকান্ত—নাচে রক্ত-স্ফুলিঙ্গ!

এমনি করিয়া প্রকৃতিকে কে কবে কোথায় আঁকিয়াছে? প্রকৃতিকে মানুষের চেতনায় অথবা মানুষের চেতনাকে প্রকৃতির পরিভাষায় রূপ দিবার মামুলী পদ্ধতিটি শিল্পিমহলে চলিয়া আসিতেছে। Mood হোক্, মেজাজ হোক্ বা কবির 'আপন মনের মাধুরী' হোক্—সকলের মধ্যেই প্রকৃতি-রহস্য ও মানব-চেতনার—ত্রিবৃৎকরণ বা পঞ্চীকরণ। ইহার ভালমন্দ বা মধ্যপন্থা প্রতিভার তারতম্যের অনুগত। তাহার বেশী নয়। কিন্তু প্রকৃতি দেখিতে দেখিতে প্রকৃতিকে হারাইয়া কেবল মানুষী চেতনার জীবন-নাট্যের ছায়া—এ কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? কতখানি মননের গভীরতা থাকিলে—অবচেতনকে চেতনার স্তরে উৎক্ষিপ্ত করিবার আধ্যাত্মিক শক্তি থাকিলে এরূপ চিত্র-রচনা সম্ভব, তাহা ভাবিয়া দেখিবার দরকার।[১]

---

(১) বলাই বাহুল্য এই চিত্রখানি বাণের অঙ্কিত নয়, বাণের পুত্র ভূষণের। বাণের অপেক্ষায় ভূষণের কবিত্বশক্তি কিছু কম থাকিলেও কল্পনার নাট্যধর্মিতার চমৎকারিত্ব পিতার শক্তিকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। আমরা সামগ্রিকতার দিক হইতে চিত্রখানির আলোচনা এখানে করিলাম।

অচ্ছোদঃ সরোবরের পট-পরিবর্তন

মহাশ্বেতার আশ্রম

অচ্ছোদ-সরোবর শেষ হইয়াও শেষ হইতে চাহে না। ইহার একতীরে মানুষী লীলার অভিনয়ের উপর যবনিকাপাত হইয়াছে, অপর তীর হইতে একটু দূরে ঘন বনের শ্যামল নিকেতনের পত্রপুঞ্জের আড়ালে বার্ক্ষদুর্গের অভ্যন্তরে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে মহাকালের সিদ্ধায়তন; আর একটু দূরে তপস্বিনীর আশ্রম। এই দুই তীরের সেতুবন্ধন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়। একতীরে যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হইয়া গেল, তাহার মূর্চ্ছনা শেষ হইয়াও শেষ হয় না। বিপ্রলম্ভের করুণ বিলাপ, মানুষের বুকভাঙা আক্রন্দন সঙ্গীতের তানে তানে বাজিয়া চলিয়াছে। শোক আজ সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে; মানুষের হৃদয়-ব্যথাকে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সঞ্চারিত করিয়া দিবার সংকল্পেই মহাকালের মন্দিরে রহিয়া রহিয়া বীণা কাঁদিয়া উঠিতেছে। কেবল সুর দিয়া বিশ্বহৃদয়কে স্পর্শ করা যায় বলিয়া এ গীতে আখর নাই, পদ নাই, পদাবলী নাই; আছে কেবল স্বরগ্রামের আরোহ-অবরোহ; কেবল সুরের মূর্চ্ছনা। এই সুরের মূর্চ্ছনায় কেবল চন্দ্রাপীড়ই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সুরের উৎসমুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দেন নাই, বন্য হরিণগুলিও স্বভাবজাত ভয় ভুলিয়া গানের সম্মোহনে টলিতে টলিতে চন্দ্রাপীড়ের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। কেবল চন্দ্রাপীড়ই যে শিবায়তনের অলিন্দে বসিয়া মহাশ্বেতার সঙ্গীতে ঝিমাইতেছেন, তাহা নয়, অরণ্যের হিংস্রপশুরাও শিবায়তনের প্রাঙ্গণে ভীড় জমাইয়া সহৃদয় হইয়া উঠিয়াছে। মহাকালের মন্দির ঐতিহাসিক হইতে পারে, মহাশ্বেতার চরিত্র কিম্বদন্তীর অনুভূতি হইতে পারে কিন্তু যে-সঙ্গীত মহাকালের মন্দিরের শ্বেতপ্রস্তর চূর্ণ করিয়া বাহিরে ছুটিয়াছিল—ছুটিতে ছুটিতে আচ্ছোদের তীরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পাগলিনীর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অচ্ছোদকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আজও থামে নাই, কখনও থামিবে না; যতদিন মনুষ্যলোক থাকিবে—মানুষের হৃদয়ে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আকর্ষণ থাকিবে—ভালবাসা থাকিবে—প্রেম থাকিবে—প্রেমে অভিসার থাকিবে—মিলন ও বিরহ থাকিবে—প্রেম-বৈচিত্ত্য[1] থাকিবে, ততদিন এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনাও থাকিবে। আমরা চোখ

---

(১) প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ উ, নী,

বুজিয়া হৃদয়ের উপর যখন কান পাতিয়া থাকি, তখনই শুনিতে পাই আমাদের হৃদয়-বাসিনী মহাশ্বেতা কী কান্নাই না কাঁদিতেছে। কান্না যখন সাধারণীকৃত হয়, তখনই সে সঙ্গীত। আমরা সেই সাধারণীকৃত কান্নার সঙ্গীতটি আজও শুনিতে পাই, আমাদের পরে যাহারা এই পৃথিবীতে আসিয়া প্রেমের বেসাতি করিবে, তাহারাও শুনিবে। তাই বলিতেছিলাম, ঐ সঙ্গীতে বাজে নিত্যকালের বিরহের মঞ্জুল নূপুর-নিক্কণ।

সরোবরের পশ্চিম তীরের বনশ্রেণীর মধ্য দিয়া শিব-সিদ্ধায়তনে যাইবার পথ। সপ্তপর্ণ, বকুল, এলাচী, লবঙ্গ, লবলী ও নীলবর্ণ তমালবৃক্ষে বনভূমি আকীর্ণ। চন্দ্রপ্রভ পর্বতের নিম্ন প্রদেশে শিবালয় অবস্থিত। শিবালয়ের চতুষ্পার্শ্বে নানা বৃক্ষের বেষ্টনী; নারিকেল, গুবাক, খর্জুর, গাঁঠিয়াল, কর্পূর, অগুরু, পিয়াসাল, পিপুল, দাড়িম্ব, নাগকেশর, চম্পক, গুঞ্জা, বেতস; বৃক্ষগুলি মরকতমণির ন্যায় হরিদ্বর্ণ; তাম্বুললতা ও ওষধিলতায় রচিত ছায়াবিতান। হারিল, কোকিল, চকোর, তিত্তিরি, চটক, কপোত, শুক, সারিকা, চাতক, ও ভ্রমরের মজলিসে বনভূমি মুখরিত; করভ, কৃষ্ণসার, ময়ূরী ও বানরের ক্রীড়াক্ষেত্র ঐ বন। শিবায়তনের অভ্যন্তরে কেতকী কুসুমের নিরন্তর রেণু-বৃষ্টি; আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায় চারিটি স্তম্ভের উপর স্ফটিকময় একখানি ক্ষুদ্র মণ্ডপ; নিম্নে শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত শিবের চতুর্মুখ মূর্তি; মূর্তির চতুষ্পার্শ্বে সদ্য-উৎকলিত সিক্ত শ্বেতপদ্মের অর্ঘ্য; আর্দ্র পদ্মদলাগ্র হইতে রহিয়া রহিয়া বারিবিন্দু ক্ষরিত হইতেছে। এই মূর্তির সম্মুখে মহাশ্বেতা। দক্ষিণাভিমুখী শিব-মূর্তি; উত্তরমুখী হইয়া পদ্মাসনে মহাশ্বেতা আসীনা; বক্ষে তার বীণা; বীণার তারে বাজে সুর, কণ্ঠে বাজে গান, নয়নে নয়নে ঝরে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু। স্তব্ধ অরণ্য, স্তব্ধ পশুপক্ষী, স্তব্ধ মহাকাল; শব্দহীন, অন্তহীন, তরঙ্গহীন এই স্তব্ধতার বুক চিরিয়া ছোটে বেদনার গান; সুরে সুরে ছড়াইয়া পড়ে ছিন্ন হৃদয়ের পুষ্পমঞ্জরী—বাসনার রেণু-কদম্ব; পাপড়ি-ছেঁড়া হৃদয়ের সে কী কাতরতা!

মহাকালের মন্দির হইতে একশতপদ দূরে মহাশ্বেতার আশ্রম। আশ্রমই বা কী, একটি গুহা। গুহার সম্মুখে তমাল বনের জমাট অন্ধকার। পার্শ্বে লতাকুঞ্জ; লতায় লতায় রঙের লীলা; অসংখ্য ফুলের কচি কচি সুন্দর মুখ; ফুলে ফুলে মৌমাছি; মৌমাছির ঝঙ্কারে গুহামুখ মুখরিত। আবার পার্বত্য-নির্ঝরের শোভাই বা কত! শ্বেত শিলার উপর পড়ে পার্বত্য নির্ঝরের জলরাশি; জলপতন, না শঙ্খধ্বনি! পতনের আঘাতে জাগে প্রতিঘাত; প্রতিঘাত ভাঙিয়া

পড়ে রাশি রাশি ফেনপুঞ্জে; নাচে জল অথই অথই; মেলিয়া ধরে ধারার উপর ধারা, লীলায়িত হইয়া ওঠে গতির বিচিত্র ছন্দ। গুহামধ্যে জাগে নীহারবৃষ্টির নিরন্তরতা, গুহার দুইধারে স্বচ্ছ নির্ঝরের পতন;—যেন দ্বারের দুই পার্শ্বে লীলায়িত দুইখানি শ্বেত চামর।

গুহার অভ্যন্তরে দেখা যায়—অনেকগুলি মণিময় কমণ্ডলু, একখানি ঝুলানো পট্টবস্ত্র, শিকার উপরে বাঁধা নারিকেল-বল্কলের পাদুকাযুগল; আর দেখা যায় ভস্ম-ধূসরিত বল্কলময় একখানি শয্যা, চন্দ্রমণ্ডলের মত শঙ্খময় একটি ভিক্ষাপাত্র, অলাবুর ভস্মাধার। আশ্রমটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা তপস্বিনী মহাশ্বেতার। আশ্রমের বৃক্ষগুলিও বাঞ্ছাকল্পতরু; রিক্ত পাত্র লইয়া ঘুরিলেই পাত্রটি আপনা আপনিই ফলে পূর্ণ হইয়া যায়।

এই যে চিত্র, ইহাকে কি বলিয়া অভিনন্দন জানাইব! ইহাকে কি পার্বত্য অরণ্য প্রকৃতির বাস্তব রূপ বলিব! বাস্তবে তো এমন প্রকৃতি নাই। নির্বাচিত বস্তুর বিন্যাসমাত্র এ চিত্র নয়। তাহা ছাড়া যেন আরো কিছু! ইহা কি ঋতু-চন্দ্রোদয়-কোকিল-ভ্রমর-ঝঙ্কার-সমন্বিত কেবল উদ্দীপন বিভাব? না, তাহাও নয়; ইহা তাহারও অধিক। তবে ইহা কি? ইহা এক রোমান্টিক চিত্র। মানুষের চিত্তবৃত্তির বিশেষ অনুভূতির প্রেরণায় কল্পনাযোগে এ চিত্র রচিত। ইহাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক রঙ্ অপেক্ষা অনুভূতির রঙের নিবিড়তা। ইহা কল্পিত চরিত্রের বিশেষ মানসিকতার হৃদয়-বাণী। পুণ্ডরীক-বিসর্জনের পর মহাশ্বেতার মধ্যে যে মানসিকতা দেখা দিয়াছে, নিখিল প্রকৃতি সেই মানসিকতাকে অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে লালন করিতেছে। মহাশ্বেতার জীবনে আজ এমন একটি স্থান চাই যেখানে বসিয়া হৃদয়ের ক্ষত জুড়াইয়া লওয়া যায়; যেখানে বসিয়া মনের মধ্যে মন লুকাইয়া মনের মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়; যেখানে বসিলে কামনার আগুন নিভিয়া যায় এবং তাহারই ভস্মস্তূপ হইতে জাগিয়া ওঠে শুচিসুন্দর নবীন প্রেম। সাধকের চিত্তে বৈরাগ্য যখন প্রেমের তপস্যায় মথিত হইয়া সৌন্দর্যের নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকে, তখন চিত্তের যে নির্জন সৌন্দর্যের অবস্থা—যে অলৌকিক অনুভূতির[১] একটানা স্থায়ী ভাব; শান্ত অথচ সুন্দর, নির্জন অথচ একনিষ্ঠ; নিস্তরঙ্গ অথচ অনুভূতির স্পন্দনে স্পন্দনে তরঙ্গিত সৌন্দর্যের আপ্লাবন; এই অবস্থার বাণীরূপই এই চিত্রখানি। সংসার হইতে অনেক দূরে—কল্পনার

(১) "যদ্যপি স্থায্যপি ন স্থির স্তথাপি সংস্কাররূপতয়া ধারাবাহিসজাতীয়-প্রবাহতয়া চ স্থির এব।"—Abh ১.৬

মানস-সরোবরের তীরে—অনুভূতির রহস্যসুন্দর লোকে চিত্তের যে প্রকাশ স্বাভাবিক, এ চিত্রে তাহাকেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এখানে পৌঁছাইতে কবিকে কম কষ্ট করিতে হয় নাই; অচ্ছোদের তীরে তীরে পার্থিব সৌন্দর্য জড়ো করিতে হইয়াছে; বেদনার আঘাত দিয়া সেই সৌন্দর্যকে ভাঙিতে হইয়াছে; যতো কথা, যতো আলাপ, যতো বিলাপ—সবই সেই অচ্ছোদের দক্ষিণ তীরে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। তাহার পর যাহা রহিল, তাহা শুধু মর্ত্যলোকের বেদনা। এই বেদনাকে গানের সুরে ভরিয়া সৌন্দর্যের পাল তুলিয়া তিনি চিত্তের এমন ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা সাধকের নিজের হইয়াও বিশ্বের,[১] আপনার হইয়াও সর্বলোকের ও সর্বকালের। বেদনায় সঙ্গীতরূপই[২] তাই মর্ত্যক্ষতকে স্বর্গ-সৌন্দর্যের ঘাটে আনিয়া নামাইতে পারিয়াছে। অচ্ছোদের তীরে জাগ্রৎ বসন্তের রক্তচ্ছটায় স্নানার্থিনী যে বালিকাকে পুণ্ডরীকের প্রেমে আবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলাম, সে মানবী; মধুযামিনীর চন্দ্রকিরণে উদ্বেল হৃদয় লইয়া যাহাকে অভিসারে যাইতে দেখিয়াছিলাম, সে মানবী; লতামণ্ডপে চন্দ্রকান্তশিলার উপর পুষ্পশয্যায় শায়িত জীবনহীন পুণ্ডরীকের কণ্ঠ ধরিয়া যাহাকে রোদন করিতে দেখিয়াছিলাম, মরণ-পাণ্ডুর অধরে উন্মত্তের ন্যায় যাহাকে অজস্র চুম্বন করিতে দেখিয়াছিলাম—মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়াছিলাম, বিলাপ করিতে দেখিয়াছিলাম, চিতাগ্নিতে প্রাণ-বিসর্জনে উদ্যত হইতে দেখিয়াছিলাম; সে মহাশ্বেতা মানবী। কবি তখনও তাহার কোন রূপ বর্ণনা করেন নাই। সদ্যোযৌবনা, অজ্ঞাতমন্মথা, আত্মগন্ধে মত্ত কস্তুরী-মৃগের ন্যায় চঞ্চলা লীলাময়ী নারীর যে আদর্শ মানসরূপ, কবি মহাশ্বেতাকে সেই রূপেই দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু যে-স্বচ্ছ মূর্তি আপন রূপের স্বচ্ছতা বিকীর্ণ করিয়া শিব-সিদ্ধায়তনের বনশ্রেণীকেও শুভ্রতায় উদ্ভাসিত করিয়াছিল, পদ্মাসনে আসীনা যাহার হৃদয়ের শ্বেতশুভ্র স্বচ্ছতায় শিবমূর্তির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল, ভজননিরতা যে মূর্তি দেখিয়া চন্দ্রাপীড়েরও সন্দেহ হইয়াছিল, চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এ মূর্তি, এ ছবি, এই দিব্য সুন্দরী পাছে আকাশে উড়িয়া না যায়, এ মূর্তি আমরা এইখানে—এই শিবসিদ্ধায়তনে দেখিলাম। এ মূর্তি মানবী নয়, দেবী নয়, অপ্সরা নয়, কিন্নরী নয়;—এ চিন্ময়ী, এ ভাবময়ী, এ অনুভূতিময়ী, এ আনন্দ-সংবেদনময়ী।

---

(১) পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ সা, দ, ৩

(২) 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'
P. B. Shelley.

তাই বলিতেছিলাম, এখানকার সব কিছুতে যেন এক কমনীয় আলৌকিকতা। মহাশ্বেতার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত এই অলৌকিকতা আনিয়া দিয়াছে। বনশ্রেণীতে সঙ্গীত, পাখির কাকলিতে সঙ্গীত, নির্ঝরে সঙ্গীত ; বেদনা-সঙ্গীত হইতে উচ্ছৃসিত এ পটভূমি ; মহাশ্বেতাও সেই সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসের এক জীবন্ত মূর্তি।

অতএব দেখা গেল, প্রকৃতি এখানে কেবল উদ্দীপন-বিভাব নয়। সংস্কৃত কবিগণের হাতে প্রকৃতি উদ্দীপন-বিভাবের অধিক কিছু নয়। মহাকবি কালিদাসের প্রকৃতির মধ্যে একটা জীবন-চেতনা আছে, প্রকৃতির একটা প্রাণময় বিশেষ সত্তা আছে কিন্তু বাণের এই চিত্রে যাহা আছে, তাহা কালিদাসে নাই। চিত্তবৃত্তির বিশেষ অনুভূতিকে চিত্রে উদ্ভাবিত করা—, ইহা কেবল বাণের পক্ষেই সম্ভব। মহাকাল-মন্দির-পরিবেশের এই চিত্র—একই হৃদয়ানুভূতির সৃষ্টি। যে অনুভূতি হইতে মহাশ্বেতার আধুনিক মানসিকতার সৃষ্টি, সেই অনুভূতি হইতেই পটভূমির সৃষ্টি ; আবার ইহাদের উভয়ের মধ্যে নিবিড় আত্মিক যোগ। অন্তরে যাহা, তাহাই বাহিরে, বাহিরে যাহা, তাহাই অন্তরে ; অন্তর-বাহির একই উচ্ছ্বাসের দ্বৈতমূর্তি। অন্তরে-বাহিরে এই অনুভূতিময় প্রশান্ত স্থির নির্জনতা না থাকিলে এক অপরিচিত তরুণের নিকট লজ্জার মাথা খাইয়া মহাশ্বেতা কি আপনজীবনের কলঙ্ক-কাহিনী বলিতে পারিত ? ইহাই আধুনিক রোমান্টিকতা ; ইহাই লিরিক ; পরিবেশের এই গীতিধর্মিতা—সংস্কৃত-সাহিত্যের আর কোথাও নাই।

বাণের রীতি

বাণের রীতির বিরুদ্ধে Weber যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহার ভাবটি নিম্নলিখিতভাবে বলা যায় :—

"বাণের অনেক দোষ—তাঁহার ভাষার দোষ, রীতির দোষ, দুঃসহ শব্দাড়ম্বরের দোষ, বাক্যার্থগত আসত্তির দোষ, অলঙ্কার-প্রাচুর্যের দোষ। তাঁহার গদ্য দুষ্প্রবেশ্য ভারতীয় অরণ্যবিশেষ। সে অরণ্যের মধ্যকার স্থানটি এমনি জটাজটিল, ভীড়করা লতাপাতায় গাছে-ডালে এমনি আবদ্ধ, যে পথিককে তাহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া যাইতে হইলে কুঠার-হাতে চলিতে হয়। শুধু তাহাই নয়, সেখানে যে-সকল হিংস্র শ্বাপদ ওৎ পাতিয়া আছে, তাহারা হইল—অপ্রচলিত শব্দ, কষ্ট-কল্পিত পুরাবৃত্ত, সুদীর্ঘ বাক্য, বাক্যাঙ্গে সুদীর্ঘ সমস্ত পদরাশির স্তূপের উপর শ্লেষ, অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের বালিয়াড়ি। তাঁহার ভাষার শব্দাড়ম্বরে ঢাকের বাজনা। শব্দের ঠাসাঠাসিতে বাক্যগুলি অতিরিক্ত মালবোঝাই গরুর গাড়ীর মত গাড়োয়ানের গুঁতা খাইয়াও যেন কিছুতেই চলিতে পারে না। অতিরিক্ত কাব্যিকতার আমদানিতে পরিমাপ-জ্ঞানের অভাব ধরা পড়ে। অতিদীর্ঘ বাক্যগুলির কর্তৃপদের সহিত ক্রিয়াপদের শুভদৃষ্টি ঘটে দুই, তিন, এমন কি পাঁচ পৃষ্ঠার পরে। কর্তা ও ক্রিয়ার মধ্যকার গুহাগুলি বুজিয়া আছে অতি দুঃসহ ধরণের বাক্যাঙ্গগুচ্ছে, বিশেষণের পর বিশেষণের স্তূপে। শব্দ লইয়া সারাপথ যে ক্লান্তিহীন খেলা চলিয়াছে, তাহা যে কেবল বরদাস্ত করা যায় না, তাহা নয়, তাহাতে কবির দুর্বলতাও ধরা পড়ে। কবিতার সৌন্দর্য গদ্যে আমদানির দিকে কবির ঝোঁক। জাঁকজমকপূর্ণ রীতিটি স্বাদহীন, অস্বাভাবিক ও জবরদস্তিওয়ালা। তাঁহার অঙ্কিত চরিত্র ও চিত্র—ফিকে, অবাস্তব। এক কথায় অপটু গদ্য-লেখকের সকল প্রকার বাচিক ও মানসিক দোষে তাঁহার রচনা দুষ্ট।"

বিষয় হিসাবে অভিযোগটি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত ভাগগুলি চোখে পড়ে :—

(১) গল্পের অপরিমিত স্ফীতি ; বিষয় মাত্রেরই বিস্তৃতি

(২) চরিত্র ও চিত্রের অবাস্তবতা

(৩) রীতি—স্বাদহীন, অস্বাভাবিক ও জবরদস্তিমূলক ; (verbose) বাগাড়ম্বরপূর্ণ।

(৪) *গদ্যভাষা—পদ্যের সঙ্গে ব্যবধান-তুলিয়া-দেওয়া গদ্যের ভাষা*

(৫) বাক্য—অতিদীর্ঘতা, কর্তৃপদ-ক্রিয়াপদে আসত্তির অভাব; বিশেষণের প্রাধান্য; সমাসের জটিলতা; অলঙ্কারের প্রাচুর্য।

(৬) শব্দ—অক্ষরডম্বরতা।

বাণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রত্যেকটি দফার যথাসাধ্য উত্তর দিতে আমরা চেষ্টা করিব। কোন কিছু বিচারের পূর্বে বিচার্যের নির্ণায়ক (Criterion of Judgement) স্থির হওয়া উচিত। আমরা বাণের কাদম্বরীর ভাষা ও রীতি বিচার করিতে বসিয়াছি কিন্তু বিচার হইবে কিসের নিরিখে? আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রূপ প্রকৃতির নিরিখে? না, প্রাচীন সংস্কৃত উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও রূপ-প্রকৃতির নিরিখে? ইহার উত্তরে বলিব, প্রাচীনকে প্রাচীনের রীতিতে বিচার করিতে হইবে। যে যাহা নয়, তাহা হইল না কেন—এ বলিয়া যে বিচার, তাহা বিচার হইতে পারে না; তাহা আক্ষেপ মাত্র। যবন-সন্তান কেন ব্রাহ্মণ হইল না, এই বলিয়া যাঁহারা যবনের মুণ্ডপাত করিয়া দাড়ি কামাইয়া, টিকি রাখিয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইতে ও কাছা-কোচা দিয়া কাপড় পরিতে রায় দেন, আমরা তাহাদের দলের নই। আমরা শ্রৌত ও স্মার্ত সংস্কৃতি দিয়া ব্রাহ্মণের বিচার করিব, যবনকে তাহার ধর্ম, আচার, সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকা হইতে বিচার করিব। আধুনিক যুগের উপন্যাসের সহিত সংস্কৃত-উপন্যাসের অনেক পার্থক্য আছে, তবে তারতম্যের দিক হইতে যে কথাগুলি নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিতেছি। প্রথম ধরা যাক—গল্প। আধুনিক যুগের গল্পের কাহিনীটাই বড়। ঐ কাহিনীর গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটা বেগ আছে। বেগের আবেগে ঘটনার পর্ব হইতে পর্বান্তরে ছুটিতে ছুটিতে কাহিনী একটি বিশেষ অনিবার্য পরিণামে যাইয়া ওঠে। ঘটনার আঘাতে আঘাতে পরিণামের দিকে গল্পের ছুটিয়া চলার সহিত পাঠক-পাঠিকার মনে একটা দুরন্ত ঔৎসুক্য দানা বাঁধিয়া ওঠে; Hudson এর ভাষায় যাহাকে বলা যায়—"Tell me a story."[১] গল্পের এই গতিবেগ আধুনিক উপন্যাসের যেমন একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তেমনি গল্পের পরিণাম ও কবির কল্পনার মধ্যে থাকা চাই। কারণ সকল ঘটনা আপন আপন আবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তনের ধারায় যে পরিণামকে রূপায়িত করিয়া তুলিবে, ক্রান্তদর্শী ঋষি কবির ধ্যানে তাহা উপস্থিত।

(১) "I suppose", says Mr Henry Arthur Jones, "that the first demand of an average theatrical audience to its author will always be the same as the child's—Tell me a story." I. S. L. Page 186

তাই বলিতেছিলাম, কাহিনীর মধ্যে ঘটনার আবেগ যেমন থাকা চাই, তেমনি থাকা চাই, তাহার পরিণামের চেতনা। কাদম্বরী কাব্য এমন যুগে, এমন মানসিকতায়, এমন সহৃদয়ের রুচির দিকে চাহিয়া জন্ম লাভ করিয়াছিল, যাহাতে উপরোক্ত ঐ দুইটি গুণের বালাই ছিল না। যে-কালে কাদম্বরীর জন্ম, সে-কালে গল্পের প্রতি ভারতীয় মানসিকতার কোন আগ্রহই ছিল না। গল্প একটা হইলেই হইল। গল্পের মধ্যে সে কালের শ্রোতৃবর্গের যা-কিছু আকর্ষণ ছিল, তাহা হইল বর্ণনার পারিপাট্য, কল্পনার মেদুরতা, রূপের মোহান্ধকারিতা, কিংবদন্তীর কথা, পুরাণের কথা, বিশ্বজগৎ ও বিশ্ব-রহস্যের কথা, দেবতা-দানব-অপ্সরা-কিন্নরের কথা, ভাবের কথা, ভাষার কথা প্রভৃতি। আধুনিক গল্প যেমন Jokeyর[১] চাবুকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে থাকে, সেকালের গল্পের তেমন কোন তাগিদই ছিল না। সে গল্প চলিত হাতীর পিঠে, মন্দাক্রান্তা ছন্দে। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, যাহা কিছু ভাল, তাহার তারিফ করিয়া, যাহা মন্দ তাহার মুণ্ডপাত করিয়া পথের দুই ধারের সমস্ত দৃশ্য ও উপভোগ্য বস্তুগুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া উপভোগ করিয়া গল্প চলিত গজেন্দ্র-গমনে। রসিক শ্রোতা সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীতের সংলাপের কথা ভুলিয়া যাইয়া তাহার তানে ঝিমাইতে ঝিমাইতে যেমন ভুলিয়া যায় বেলা বাড়িতেছে, তাহার সংসার ধর্ম আছে, জীবিকার্জনের জটিল সমস্যা আছে, কেবল তানের ফেনিল মত্ততায় মাতাল হইয়া বলিতে থাকে, ঢালো, ঢালো, আরো ঢালো'; কাদম্বরীর শ্রোতাদের মনেও ঠিক অনুরূপ একটা তানের নেশা ছিল। তাই কাদম্বরীর গল্পে আধুনিক গতিবেগের কোন বালাই ছিল না। শুধু কাদম্বরী কেন? অষ্টাদশ পর্বের মহাভারতের, সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মূল গল্প কতটুকু? কুমারসম্ভবের গল্প কতটুকু? বেদব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস—ইঁহারা সকলেই গল্প বলিলে যে বলিতে পারিতেন না, এমন নহে, গল্প শুনিবার লোক ছিল না, তাই তাঁহারা গল্প বলেন নাই। গল্প আসিয়া পড়িলেও গল্পের চাইতে বর্ণনা চলিত বেশী; বর্ণনার শোভাযাত্রার পশ্চাতে গল্প-বেচারা কোন রকমে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিত, অনেক সময় শেষ পর্যন্ত গন্তব্য স্থলে যাইয়াও উঠিত না। দ্বিতীয়তঃ, গল্প যে ছুটিয়া চলিবে, কিসের টানে? আধুনিক গল্পের পরিণামের দিকে ক্রান্তদর্শী কবির যেমন সচেতনতা, তেমনি পাঠকবর্গের নিঃসীম কৌতূহল। ভারতভূমিতে কী কবি, কী পাঠক—কাহারও গল্পের শেষ বলিবার বা শেষ শুনিবার আগ্রহ ছিল না। তাহাদের মানসিকতায় ছিল ভারতের জলে-হাওয়ায়-পরিপুষ্ট

---

(১) ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়সওয়ার

অমোঘ বৈরাগ্য। জীবন ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছি, কাল নাই, আজ যে উজীর, কাল সে ফকির, আজ যেখানে সমুদ্র, কাল সেখানে পর্বত, আজ যে দেবতা, কাল তাহার পশুরূপে আবির্ভাব; ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চিরস্থায়ী নয়; চঞ্চলা লক্ষ্মী, চঞ্চল জীবন-সিন্ধুর ঊর্মি—এইরূপ জীবন দর্শন হইতে ভারতীয় মনের সহজাত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য যে কেবল জীবনে রূপায়িত হইয়াছিল, তাহা নহে, সাহিত্যেও এই বৈরাগ্যের প্রভাব দেখা যায়। গল্পের পরিণামে সে-যুগের কবিরা ছিলেন নির্মম ভাগ্য-বিধাতা। তাঁহারা ভাগ্য গড়িতে যেমন পটু ছিলেন, তেমনি ভাঙিতেও বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করেন নাই। ভাঙাগড়া প্রজাপতির লীলা। প্রজাপতি গড়েন আর ভাঙেন; ভাঙেন নূতন করিয়া গড়িবার জন্য কারণ তাঁহার ভাঙা-গড়া নিরবচ্ছিন্ন, একটী লীলা মাত্র। কিন্তু সে যুগের কবি-প্রজাপতিরা গড়িতেন কেবল ভাঙিবার জন্য। রামায়ণের অতবড় রাম-রাবণের যুদ্ধের ঝড় কাটাইয়া সীতা যখন সকল বিপত্তির হাত হইতে মুক্ত হইয়া স্বামীর সহিত অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাণী হইয়া বসিলেন, তখন রামচন্দ্র কোথায় তাঁহার সহিত সুখের দিনগুলি কাটাইবেন, তাহা না করিয়া প্রজানুরঞ্জনের জন্য সেই সীতাকেই বনে পাঠাইলেন। যাহার জন্য এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অশ্রুপাত, এত যুদ্ধ, অবশেষে কিনা তাহাকেই বর্জন। গড়া জিনিসের উপর এত অনাসক্তি ভারতীয় কবি ছাড়া আর কাহার হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুরুবংশের শেষ অগ্নিশিখাও নির্বাপিত। যুধিষ্ঠির নিষ্কণ্টক রাজ্যে পাত্র-মিত্র সহ কোথা রাজা হইয়া বসিবেন, তাহা না করিয়া বীর্যক্রীত সিংহাসন মাটির খেলনার মত পদতলে দলিত করিয়া সপরিবারে মহাপ্রস্থানে চলিলেন। যে দেশের জাতীয় মহাকাব্যে মনুষ্যের বীর্যশুল্কে ক্রীত ভাগ্যের এই পরিণাম—গড়িয়া ভাঙিবার এত সুখ, ভাগ্যের প্রতি, ঐশ্বর্যের প্রতি, স্নেহ-ভালবাসা-মমতার প্রতি এত তাচ্ছিল্য, এত বৈরাগ্য, সে দেশের সাহিত্যে গল্পের পরিণামের প্রতি কাহারই বা আগ্রহ থাকিতে পারে?—না কবির, না পাঠকের। অতএব বাণভট্টের এবং তাঁহার পাঠকবর্গের কাহারো গল্পের পরিণামের দিকে লক্ষ্য স্বাভাবিকভাবেই না থাকিবার কথা। ছিলনা বলিয়াই গল্পের ছুটিয়া চলিবার জন্যও কোন তাড়া ছিল না। তাই তাঁহার কাহিনীর অপরিমিত স্ফীতি, বিষয় মাত্রেরই বিস্তৃতি। ইহা না হইবার কোন কারণ নাই। "গল্প শুনিবার আগ্রহ অনুসারেই গল্পের প্রকৃতিও ভিন্নরূপ ধারণ করে।"[১]

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ চরিত্র ও চিত্রের অবাস্তবতা লইয়া। প্রথম চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা

(১) রবীন্দ্রনাথ

করা যাক।[২] Aristotle তাঁহার Poetics গ্রন্থে Tragedy সম্পর্কে বলিয়াছেন, চরিত্র না হইলেও Tragedy হইতে পারে কিন্তু Fable থাকা চাই। প্রতিযোগী মানুষগুলির বৃত্তিনিচয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনা যাহাদের মধ্যে দানা বাঁধিয়া ওঠে, তাহারাই চরিত্র। যাহা ঘটে, তাহাই ঘটনা এবং চরিত্র সেই ঘটনার আলম্বন। আমরা বলি, চরিত্র প্রবৃত্তিনিচয়ের ঘাত-প্রতিঘাত-জাত ব্যক্তি বিশেষ। যখন হইতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ব্যক্তিত্ববাদের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তখন হইতে চরিত্র ব্যক্তিত্বের বাহন হইয়া দেখা দিয়াছে। তখন হইতে চরিত্র আর শৌর্য-বীর্য-ঔদার্য-ক্ষমা-প্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণের প্রতিভূ হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। আগে ছিল type, পরে হইল individual[৩] আমাদের দেশে যে কোন কালেই ব্যক্তি-চরিত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তাহা বলিনা। আমাদের রামায়ণ ও মহাভারত ব্যক্তি-চরিত্রের ডালি সাজাইয়া রাখিয়াছে। তবে তখনকার ব্যক্তিত্বের সহিত এখনকার ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য আছে প্রচুর। তখনকার ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিশ্বমঙ্গলের জন্য একটা আত্ম-বিলোপী আদর্শ ছিল। সমাজ রক্ষণে ও সমাজপালনে যে-সকল গুণের একান্ত প্রয়োজন ছিল, জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় সেই সকল গুণের শোধিত আদর্শ রূপের মধ্য হইতে চরিত্র একটি বিশিষ্ট সত্তা লইয়া বাহির হইয়া আসিত। সেই সত্তাটি ধনীর বিলাসী মেদপুষ্ট অকর্মণ্য পুত্রের ন্যায় পৃথিবীর ধূলি-নির্মুক্ত নহে। তাহার দেহে অস্ত্রক্ষতের অঙ্গদ। পৌরুষের অগ্নিকুণ্ডের মধ্য হইতে তাহার অম্লান আবির্ভাব। জীবনের পরীক্ষায় সে বিজয়ী যোদ্ধা। আধুনিক কালের চরিত্রে

---

(২) p.

(৩) "আসল কথা হইতেছে যতক্ষণ পর্যন্ত মানব-সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ পর্যায় আসে নাই, ততক্ষণ উপন্যাসের সম্ভাবনা জাগে নাই। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল—অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আন্বীক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্য-কারণের উপর আস্থা স্থাপন করিল, তখনই মানব-সংস্কৃতিতে modern mind বা আধুনিক মনোবৃত্তির আবির্ভাব হইল। অনতিবিলম্বে সাহিত্য-সৃষ্টিও এই আধুনিক দৃগ্‌ভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইল। দেবদেবী, যক্ষরক্ষ, রাজা-রানী ছাড়িয়া পাঁচপাঁচি মানুষের জীবনের বর্ণহীন রোমান্স কবিকল্পনার বিষয়ীভূত হইল। টাইপ বা অতিব্যক্তির এবং hero বা অতিমানবের স্থানে আখ্যায়িকার নায়ক হইল individual বা ব্যক্তি। সে ব্যক্তি কোন economic বা political অথবা religious শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, সে নিজেরই প্রতিনিধি। সাহিত্যের ইতিহাসে এই যে দৃক্‌কোণের পরিবর্তন, এই পরিবর্তন প্রথম আনিয়া দিল ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলন।"

—বা, সা, ই, ২য় খণ্ড পৃ ২০৫,

সে পৌরুষ না থাকিলেও চলিতে পারে, তাহার মধ্যে সর্বকালের উদ্দেশে আত্ম-বিলোপী উপহার না থাকে না থাকুক কিন্তু এমন হওয়া চাই যাহাতে বাস্তব জগতে ব্যক্তি বলিয়া তাহাকে সনাক্ত করা যাইতে পারে। এখনকার ব্যক্তিত্বকে একেবারে 'নির্জলা' বাস্তব হওয়া চাই। এমন বাস্তবঘেষা ব্যক্তিত্ব সে কালে ছিল না। সেকালের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল বাস্তবতার সহিত অপৌরুষেয় আদর্শের সংমিশ্রণ। —আদর্শবাদের মধ্যে বাস্তববাদের উৎসর্জন। যাহাহোক, রামায়ণ-মহাভারতের পর সংস্কৃত-সাহিত্যে আর চরিত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি যে হয় নাই, তাহার কারণ অহংময়তার সঙ্কোচ ও তন্ময়তার বিকাশ। আপন আসন পরিত্যাগ করিয়া পরের আসন হইতে বস্তুবীক্ষণের শক্তির আবির্ভাবে সাহিত্যে অহংময়তার স্থলে তন্ময়তার প্রতিষ্ঠা। বাণের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই তন্ময়তার। একথা আমরা 'প্রকৃতির কবি বাণভট্ট' পরিচ্ছেদে প্রকৃতিচিত্রের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রামায়ণ-মহাভারত যুগমহাকাব্য, জাতীয় মহাকাব্য (epic of growth)। কিন্তু কালিদাস, মাঘ, নৈষধ সে শ্রেণীর মহাকাব্য নহে। এগুলিকে epic of art বলা যাইতে পারে। পরবর্তী মহাকাব্যগুলি রাজ-ঐশ্বর্যে ও রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট। কাজেই রাজ-পরিবারের বাহিরে দেশের বৃহত্তম চিত্তে ইহাদের কাজ নাই। রাজবংশের প্রশস্তির গাথায় কাব্যধর্মের আবির্ভাব। নাটক তো নিঃসন্দেহে রাজ-পরিবার-কেন্দ্রিক। উপন্যাসের উপর প্রভাব যেমন মহাকাব্যের, তেমনি লোক-কথার। তাই উপন্যাসে আসিয়া চরিত্র-সৃষ্টি অন্যখাতে বহিতে লাগিল। কিন্তু মূলতঃ ইহা নাটকীয় চরিত্রের খাত; নাট্যালঙ্কারে বিধৃত অষ্টাবিংশতি ভাবের স্বতঃ সিদ্ধ মামুলী পদ্ধতির খাত। পদ্ধতি যতই মামুলী হোক না কেন, ইহার মূলে ছিল ভাব-চেতনা। এই ভাব-চেতনা ছিল কল্পনাশ্রয়ী, তাই এই সকল চরিত্র নিঃসন্দেহে রোমান্টিক। শুধু চরিত্রই রোমান্টিক নহে, বিষয়বস্তুও রোমান্টিক। বাস্তব যাহা কিছু, তাহা সেই রোমান্টিসিজমের পাদপীঠ। মহাশ্বেতা-কাদম্বরীর চরিত্র ফিকে হইয়া গিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহার স্বপক্ষে কোন যৌক্তিকতা নাই। ওরা সবই যে কবির ভাব-সন্তান। ভাবমূর্তি কী কখনও বাস্তব মূর্তির সমান হইতে পারে? ভাবের রাজ্যে উহারা ভাস্বর। ভাবের মূর্তিকে বাস্তবের মাটিতে নামাইয়া দেখিলে তাহা ফিকে বলিয়াই মনে হইবে। শুধু কাদম্বরী মহাশ্বেতা নয়। চন্দ্রাপীড়, শূদ্রক, বৈশম্পায়ন কি বাস্তব? গন্ধর্ব-নগরীর কথা ছাড়িয়া দিলাম, উজ্জয়িনী নগরী কি বাস্তব। শুকনাসের উপদেশ, কপিঞ্জলের উপদেশ বাস্তব হইলেও শুকনাস ও কপিঞ্জল বাস্তব

নয়। কিন্তু বাহিরে ইহারা বাস্তব না হইলেও ভাব-রাজ্যে, কবির কল্পনা-রাজ্যে ইহারা বাস্তব। ইহারা যে বাস্তব, তাহার সাক্ষী আমাদের চিত্তবৃত্তি। আমাদের বাসনা-লোকের বিক্ষিপ্ত বাসনা কবি-প্রতিভার ঐক্য ও সামঞ্জস্যগুণে বিধৃত হইয়া বাস্তব-মূর্তিতে দেখা দেয়। আমরা তাহাদের দেখিয়া থাকি—"পুণ্যবন্তঃ প্রমিম্বন্তি যোগিবৎ রস-সন্ততিম্‌"।[১] আসল কথা—"...একালের মধুলোভী যদি অন্যকাল হইতে মধুসংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজকালের প্রাঙ্গণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা পাইবেন না, অন্যকালের মধ্যে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে"।[২]

এখন রীতির প্রসঙ্গ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে রীতি হইল পুরুষীয় সত্তার সামগ্রিক প্রকাশ 'Style is the man', যেমন কবি, তেমনি তাহার রীতি। Shakespeare ও Ibsen এর এক রীতি নয়, Bernard Shaw এব রীতি পৃথক। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রীতি স্বীয় স্বীয় ব্যক্তি-পুরুষের বাহন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে একমাত্র রুয্যকের 'বৃত্তিব' মধ্যে যেন এই পৌরুষের প্রকাশের একটা ক্ষীণ আভা দেখা যায়।[৩] সংস্কৃত-সাহিত্যে রীতি বলিতে দেশ-বিশেষের রচনা-পদ্ধতিকে বোঝায়। নাট্যশাস্ত্রে ইহা 'প্রবৃত্তি' নামে পরিচিত। কালে কালে এই রীতি বা প্রবৃত্তি সর্বসাধারণের রচনার ভঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। এখন যাহা বলিতেছি, তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রেব নিরিখে নয়, সাহিত্য-বোধের দিক হইতে। এই যে রীতি, ইহা কী বস্তু? বিষয়বস্তুব পরিবেশনে কবির মানসিক অভিব্যঞ্জনার প্রকাশের ঢঙ্‌ বিশেষ। ইহাতে কবিপুরুষীয় সত্তার সামগ্রিক আবির্ভাব। কবি-বাসনার অনুপাতে বিচ্ছিন্ন সামগ্রীব নির্ব্বাচন, নানা সম্বন্ধের বিসর্জন, কবিসত্তার আত্মীয়ীকরণ, একীকরণ, সমঞ্জসীকরণ; তাহার পর শিল্পসম্মত উপায়ে ইহার প্রকাশ। এই যে এতগুলি কাণ্ড, ইহাদের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে কবি-ব্যাপার। এই কবি-ব্যাপারের দুইটি দিক, একটি মানস, অপরটি বহিরঙ্গ; অথচ এই দুইটির মধ্যেই এক নাড়ীর সম্বন্ধ। তাই প্রকাশের যে ভঙ্গীকে রীতি বলি, তাহা বিষয়বস্তু হইতে পৃথক নয়। উহারা 'অপৃথকযত্ননির্বর্ত্য'। একদিকে কাদম্বরীর বিষয়বস্তু—লোক কথার কিংবদন্তী, অভিশাপ, ইন্দ্রজাল, রূপান্তর প্রভৃতি, অন্যদিকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক জীবনের একত্র মথন—এই দুয়ের মিশ্রণের সহিত কবির

(১) সাঃ দঃ ১ম পঃ

(২) রবীন্দ্রনাথ

(৩) কা, বি, ৫৭

ব্যক্তি-বাসনা, রুচি, প্রতিভা ও শিল্পবোধ গ্রথিত হইয়া কবি-বৈশিষ্ট্যের অপরিমেয়তা উৎসারিত করিয়া দিয়াছে এই রীতির মধ্যে। তাই এই রীতি, বৈদর্ভী নয়, গৌড়ী নয়, পাঞ্চালী নয়—ইহা কেবল কাদম্বরীর রীতি; কাদম্বরীর গল্পবিন্যাসের ইহা এক অভূতপূর্ব বাঙ্ময় ঢঙ্। ইহার মধ্যে গৌড়ী খুঁজুন গৌড়ী পাইবেন, বৈদর্ভী খুঁজুন বৈদর্ভী পাইবেন, পাঞ্চালী খুঁজুন, পাঞ্চালী পাইবেন। তাই আচার্যেরা বলিয়াছেন —"অতিরেকেণ পাঞ্চালী রীতিঃ; অন্যাপি রীতয়োঽল্পাধিকভাবেন পরিলক্ষ্যন্তে।" এ রীতি কোন্ রীতি? ইহা কি গুণের বিকলন? গুণতো দশটি। কাদম্বরীর রীতিতে কোন গুণ? পণ্ডিতেরা বলেন—"বাহুল্যেন মাধুর্যং গুণঃ, প্রসাদগুণোঽপি ন বিরলঃ?" পণ্ডিতগণের এই সমীক্ষা অনেকটা মহাকাল-মন্দিরে ভজননিরতা মহাশ্বেতাকে দেখিয়া চন্দ্রাপীড়ের বিতর্কের মত-"তদ্ যদি মে সহসা দর্শন-পথান্নাপযাতি, নারোহতি বা কৈলাস-শিখরম্, নোৎপততি বা গগনতলম্, ততঃ 'কাত্বম্, কিমভিধানা বা, কিমর্থং বা প্রথমে বয়সি প্রতিপন্না ব্রতম্' সর্বমেবৈতৎ এনামুপসৃত্য পৃচ্ছামি'। কিন্তু এই যে রীতি ও গুণের স্বরূপ নির্ধারণ, ইহা কোন কালের? যে-কালে কাব্যের আসল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, ইহারা সেই কালের। অলঙ্কারের মধ্যে যাঁহারা কাব্যের রহস্য খুঁজিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন কাব্যের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ঐ অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের মধ্যে। অলঙ্কার-বিপ্লবের পরবর্তী যুগে যাঁহারা আর এক ধাপ আগাইয়া রীতির মধ্যে কাব্যের স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহারা বলিয়াছিলেন, এই রীতি গুণের বিকলন ছাড়া আর কিছুই নয়। যে যাহাই বুঝুন না কেন, কেহই রসের খবর তখনও পান নাই। পরবর্তী কালে কাব্যে রস-প্রতিষ্ঠার পর অলঙ্কার, গুণ, রীতি সকলেই রসের মধ্যে পর্যবসান লাভ করে। অতএব রসের সাক্ষাৎকারের পর আর রীতিতে গুণের বিকলনের অবসর কোথায়? সবই রসময়। অলঙ্কারে, গুণে, রীতিতে সর্বত্রই রসের লুটোপাটি। রসের প্রকাশে সকলের প্রকাশ। আত্মার প্রেরণায় যেমন অবয়ব-সন্ধি ও শারীরিক গুণের প্রকাশ, তেমনি রসের প্রেরণায় গুণ ও রীতির আবির্ভাব; অলঙ্কার সেই আত্মারই শোভাতিশয্য। অতএব আগে অলঙ্কার, গুণ ও রীতি নয়, আগে রস, পরে সেই রসের জোয়ারে ভাসিয়া-আসা গুণ, অলঙ্কার ও রীতি। অতএব এই রীতি সেই রসতীর্থের আভিযাত্রিক।[১] "নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলু কুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা

(১) "ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে"—জগদীশ চন্দ্র বসু

যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।" যে যায়, সে কোথায় যায়? তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম "মহাদেবের পদতলে।" বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে নদী যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের মহাচক্র, কাদম্বরীর রীতিতে তেমনি সেই রসতত্ত্বের মহাচক্র। ইহা রসের জটা হইতে বিগলিত হইয়া আবার রসের পদতলেই ফিরিয়া যায়। কাদম্বরীর রীতি সেই রসের প্রবাহিনী। ইহার গম্যস্থান সেই অশ্রুগঙ্গোত্রী—যেখানে বসিয়া মহাশ্বেতা পুণ্ডরীকের জন্য নিত্যকাল ধরিয়া মহাশূন্যের দিকে চাহিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতেছে; যেখানে বসিয়া কাদম্বরী মৃতস্বামীর পদতলে মাথা খুঁড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে! কাঁদিতেছে আর কাঁদিতেছে! সে কান্নার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! "ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর"[১]—সেই শূন্য মন্দিরের বেদনা যেখানে আছড়াইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতেছে, কাঁদিতেছে আর কাঁদাইতেছে, অশ্রু-গঙ্গোত্রীর সেই পুণ্যতীর্থে—বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সেই রসোদ্গারে কাদম্বরীর রীতির অভিযাত্রা। তাই এই রীতির বর্ণে রস, শব্দে রস, সমাসে রস, অলঙ্কারে রস —'রসময়ী সা'। ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন জল-প্রবাহে কি ঐরাবত ভাসিয়া যায় নাই? হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে গঙ্গার ফেনিল অবতরণ-মুখে কি পাহাড়ের চাঁই ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই? দীর্ঘপদের সমাস, বিশেষণের স্তূপ, দুরূহ পুরাবৃত্তের বালিয়াড়ি, অপ্রচলিত দুর্বোধ শব্দের কুণ্ডলীকৃত বিষধর—সেই রীতির যৌবনোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে। এরা শুধু ভাসে না, রীতির প্রবাহে কখনও বা নৃত্যছন্দের তাল ঠুকিয়া প্রবাহিণীর প্রবহমানতাকে চঞ্চল করিয়া তোলে, কখনও বা আবর্ত সৃষ্টি করিয়া নিখিল প্রবাহকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে। তরঙ্গে তরঙ্গে যে ফেনা জাগে, সেই ফেনার মধ্য হইতে যদি হিংস্র জলজন্তুর ভয়ঙ্কর মুখ উছলিয়া ওঠে, তাহাতে জীবন্ত নদীর প্রাণ-যাত্রারই সাক্ষ্য মেলে। অতএব কাদম্বরীর রীতিকে কেবল পদাবলী হিসাবে বিচার করিলে চলিবে না, রসের সামগ্রিক চেতনার দৃষ্টি দিয়া ইহার বিচার করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া আরও কথা আছে, কবিকে তাঁহার যুগ দিয়া বিচার করিতে হয়। কবি-চেতনার সহিত যুগ-চেতনার বিরোধাভাস কোন কোন স্থলে আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও তত্ত্বতঃ কবির মধ্যেই এই দুইয়ের সামঞ্জস্য ঘটে। তাহা না হইলে কবি কখনও যুগ-কবি বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন না। যে যুগে যে কবি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যতই প্রতিভাধর হউন না কেন, তাঁহার চেতনায় যুগ-

(১) বিদ্যাপতি

চেতনা আসিয়া যাইবেই। ঐ যুগ-চেতনাই তাঁহার রস-চেতনার ব্যভিচারী রূপ। বাণভট্টের যুগ-চেতনার কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য না হইলে কাব্যই হয় না। যেখানে কবি, সেইখানেই সামাজিক। সামাজিকের রসাস্বাদের জন্যই কবি-প্রজাপতির কাব্য সৃষ্টি। বাণকে তাঁহার কালের শ্রোতাদের মুখ চাহিয়া গল্প বলিতে হইয়াছিল। শ্রোতারা উপন্যাসে ঘটনা চাহিত না, চাহিত বর্ণনা, শুনিতে চাহিত চৌষট্টি কলার কথা, কিম্বদন্তীর কথা, পুরাণের কথা, রামায়ণ-মহাভারতের কথা, শৌর্য-বীর্য-প্রেমের কথা, শুনিতে চাহিত ভাষার ইন্দ্রজাল, শব্দ-চাতুরী; অনুপ্রাসের নূপুর-নিক্কণ, যমকের দ্বৈত নৃত্য, মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া তারিফ করিত শ্লেষের মুন্সীয়ানা, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের সমঝদারি। কাজেই রীতির মধ্যে ইহারা সকলেই স্থান পাইয়াছে। ইহা ছাড়া।[১] "সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনি-গাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের এমন কনসর্ট বাজিয়া ওঠে—তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে, কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্-নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না।" একদিকে কালের চাহিদা, অন্যদিকে ভাষার চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার—এই দুইয়ের প্রেরণায় কাদম্বরীর রীতির প্যাটার্ণ নানা কাজের এমব্রয়িডারির জৌলুষে ঝলমল।

বাণের রচনার যতই নিন্দা করা হউক না কেন, তাহার ঐশ্বর্যকে না মানিয়া উপায় নাই। তাহার বাণীকে গোষ্ঠীছাড়া, অতিশয়িত, এমন কি শক্তির অপব্যবহার বলিয়া মনে করিলেও শব্দ-শোভাযাত্রার মধ্যে তাঁহার কম্বুকণ্ঠের যে উদাত্ত ও গম্ভীর মিষ্টধ্বনি শোনা যায়, তাহার বিস্তৃতি যেমন, তেমনি তাহার আভিজাত্য। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কেবলমাত্র ভাষার ইন্দ্রজালে এবং কল্পনার প্রত্যঙ্ককল্পতায় বাণের অতিবৃহৎ উপন্যাসখানি পাঠকের কল্পনায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া মধুচক্রে মৌমাছির মত এমনিভাবে আটকাইয়া পড়ে যে আর উড়িতে পারে না। তাই এক দিকে ভাষার ইন্দ্রজাল, আর অন্য দিকে কল্পনার ইন্দ্রধনুচ্ছটা—ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে বাণের শিল্প-রহস্যটি। এ যেন চাঁদের আলোয় মেলিয়া-ধরা ইন্দ্রধনু। একথা মানিতে রাজি আছি যে বাণের গদ্যরীতিটি দৈনন্দিন সমাজে চলিবার মতো নয়। কিন্তু এটা প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হ'ল—যে উদ্দেশ্যে তিনি এই রীতিটি গ্রহণ করিয়াছেন, এই রীতিতে তাঁহার

---

(১) প্রা. সা

সেই উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে কিনা? রীতির গদ্যভঙ্গীর এই উত্তাল ফেনিল তরঙ্গ-তাণ্ডব লোক-কথার কর্কশ উপল পাথরগুলিকে রোমান্টিক সৌন্দর্যের মণি-মাণিক্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে কি না? যদি তিনি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের প্রভাবে ভাসিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার ভাষা কেবল অলঙ্কারের পিণ্ডিত রূপ নহে; যদি তিনি সুদীর্ঘ পদাবলী রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার পদগুলি দুর্বোধ নয়, যদি[১] সমাস ও বিশেষণ-প্রয়োগে তাঁহার নেই-আঁকড়া মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যক্ষতা, সঙ্গতি ও আভিজাত্য প্রভৃতি গুণে ভাস্বর। বাণ নির্জনতাপ্রিয় কল্পনাপুরুষ নন, অসম্ভাব্যতা ও কষ্টকল্পতার রসিকও নন, পেলব ও করুণ চিত্র আঁকিবার তাঁহার এক অননুকরণীয় প্রতিভা। তরঙ্গিত সৌন্দর্যের সুদীর্ঘ বাক্যগুলির মধ্যে জাগে নানা রঙের নানা বিষয়ের নানা ছবি। সেই ছবিগুলির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য, চিত্তবৃত্তির ওঠা-নামার নানা দোলা, নানা তাল। শব্দ-নির্বাচনে বাণের যেমন এক বিস্ময়কর প্রভুত্ব, তেমনি সঙ্গীত-ধর্মী ও অভিজাত বাক্যাংশ ব্যবহারে তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা। শব্দ-সঙ্গীতের সৌন্দর্য ও কমনীয়তার সহিত চিত্রধর্মিতার মিশ্রণে তিনি অবিশ্রান্ত বিস্ময়ধারার অনুপম সাঙ্কেতিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। একগুঁয়ে মনোভাব লইয়া যাহার মন চলিয়াছে সমগ্র কাব্যখানির দীর্ঘপথে, তাহার কাছে কাব্যখানি হয়তো একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু মন যদি বর্ণনা ও ঘটনার কল্পচিত্রের দিকে চোখ চাহিয়া চলে, তাহা হইলে তাহাকে মজিতে হইবে, বলিতে হইবে—"নয়ন না তিরপিত ভেল।"[২] একটি মাত্র বাক্যের দীর্ঘ পরিমাপের মধ্যে তাঁহার চিন্তাধারার, স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ-কল্পতার কতই না অসংখ্য উপাদান। সামান্য কথায় যেখানে কাজ সারা যায়, সেখানে তিনি অসংখ্য কল্পনার—বিচিত্র চিন্তার সহচর শব্দ-প্রাচুর্যের আয়োজন না করিয়া

(১) দণ্ডী ওজো-গুণের আলোচনায় বলিয়াছেন, "ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বম্ এতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্।" সমাস-ভূয়িষ্ঠ না হইলে ওজোগুণ হয় না। ওজোগুণের মধ্যে আছে শক্তি-সঞ্চারের প্রবণতা। এই শক্তির প্রকাশ সমাস। তাহা ছাড়া বাণ কেবল বড় বড় সমাস দিয়াই তাঁহার সুদীর্ঘ বাক্যের গ্রন্থি বাঁধেন নাই। সমাসের ফাঁকে ফাঁকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ-বিন্যাসও আছে। তাহাতেই সমাস-ভূয়িষ্ঠ বাক্যের চমৎকারিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।" "His long compounds are often clearly built up and interspersed with shorter words simply in order to achieve this effect which Dandin and other writers of poetics extol under the style of ojas, strength."

—H. S. L. 326-27

(২) কবি বল্লভ

থাকিতে পারেন না। তিনি তাঁহার বিলাসী চিন্তা না মাখাইয়া কোন কথাকে ছাড়িতে পারেন না। বাণের শব্দ-শক্তিকে যদি অসংযম বলিতে চাহেন, বলুন। কিন্তু সে অসংযমও আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁহার রচনায় আমরা কেবল প্রাচুর্যকে পাই না, ভাবনার বিদ্রোহেরও সাক্ষাৎ পাই। আমরা তাঁহার সৃষ্টিতে পাই—প্রাচুর্য প্রকাশের আনন্দ, কল্পনার বিশ্বরূপ এবং বাস্তবে ও উপন্যাসে যাহা কিছু উদার ও মহিমান্বিত, তাহারই অকুণ্ঠিত প্রেম।

বাণের রীতির আর একটি দোষ ধরা হইয়াছে। তাঁহার রীতি নাকি বাগাড়ম্বরপূর্ণ—verbose. বাণকে verbose বলা চলে না; কেননা যাহারা verbose, বাগাড়ম্বরের লতা-পাতার-জালে তাহাদের আসল কথা চাপা থাকে, ধোঁয়াটে হইয়া ওঠে। বাণের রচনায় সেরূপ কোন স্থান নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত হর্ষচরিতের ভূমিকায় সম্পাদকমহাশয় বলিয়াছেন যে হর্ষচরিতের কোন কোন স্থান দুর্বোধ হইলেও কাদম্বরীতে এমন স্থান খুব অল্পই আছে যেখানে অর্থবোধ কষ্টকর। সর্বত্রই অনায়াসে পড়িয়া যাওয়া যায়।[১]

এখন বাণের গদ্যভাষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। বাণের গদ্য সম্পর্কে আধুনিকদের সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ—তিনি গদ্য ও পদ্য ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিতে পারেন নাই। কবিতার সৌন্দর্য গদ্যে আমদানির প্রতি কবির নাকি খুব বেশী ঝোঁক। যাঁহারা পদ্য ও গদ্যের ভাষা পৃথক করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলিতে চাহেন, পদ্য 'অসূর্যম্পশ্যা রাজদারা'; বসনে-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া সে মানুষের অন্তঃকরণের অন্তঃপুর আলো করিয়া চক্ষের কটাক্ষ হানিয়া হাসির বিজুরী ছড়াইয়া কম্প্রবক্ষে লজ্জা-মন্থর মৃদু চরণে নূপুরের ধ্বনিতে অব্যক্ত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া পুরুষ-হৃদয়ে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিবে। সে হইবে 'শিষ্যা ললিত কলাবিধৌ'। তাহার অধরে ঝরিবে নিরন্তর মধুর আলাপ, হাব, ভাব ও বিলাসের রামধনু তাহাকে নিত্য নবরূপ দান করিবে। সে হইবে—"রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা"। আর গদ্য! সে পুরুষ! তাহার হস্তে কোদণ্ড, পৃষ্ঠে তূনীর, কক্ষে বিলম্বিত অসিলতা, অঙ্গে অঙ্গে অস্ত্রক্ষতের লাঞ্ছনা "বূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ" সে; তাহার বিহার-ভূমি যুদ্ধক্ষেত্র, জীবনক্ষেত্র, বাহিরের

(১) "...কিন্তু উৎকর্ষ বিষয়ে, পরস্পর তুলনা করিলে, অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক। কাদম্বরীর চমৎকারিতা ও মনোহারিতা হর্ষচরিতে ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয় না। তদ্ভিন্ন অনায়াসে অর্থবোধ জন্মে না, কাদম্বরীতে এরূপ স্থলের সংখ্যা অতি অল্প; হর্ষচরিতে তাদৃশ স্থলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক।" —বিজ্ঞাপন, হর্ষচরিত; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিস্তৃত জগৎ। পুরুষের শৌর্য-বীর্য ও নারীর কান্তি ও লজ্জার যে পার্থক্য, গদ্য-পদ্যের সেই পার্থক্য। অতএব ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা চাই—সীমানার বেড়া থাকা চাই। কিন্তু এমনো তো হইতে পারে, অন্তঃপুর-বাসিনী অসূর্যম্পশ্যা নারী একদিন বীরাঙ্গনা-সাজে যোদ্ধ বেশে নারী-বাহিনী চালনা করিয়া পুরুষ-শ্রেষ্ঠের আত্ম-সমর্পণ দাবি করিয়া বসিবেন এবং পুরুষও আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে! সেদিন কি নারী পুরুষের পার্থক্য সীমানা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে? তবে কি বিষয় বস্তুর হিসাবে গদ্য ও পদ্যের সীমারেখা নির্ণীত হইবে? পদ্যে মহাকাব্য রচিত হউক, গীতিকাব্য রচিত হউক, খণ্ডকাব্য রচিত হউক আর গদ্যে উপন্যাস রচিত হউক। তাহাতেই কি গদ্য-পদ্যের যথার্থ সীমা নির্ণীত হইবে? আসল কথা কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়া গদ্য-ভাষার উৎপত্তি। কথ্যভাষার জীবন-প্রেরণা গদ্য-ভাষার মধ্যে উৎসারিত হইয়া ওঠে বলিয়া এ ভাষার যেমন শক্তি, তেমনি গতিবেগ। বাস্তব জীবন-বোধকে এক হইতে বহুর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে ইহার জোড়া নাই। এই গদ্য-ভাষার নানা রূপ। ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, অর্থশাস্ত্রে, গণিতে, ন্যায়শাস্ত্রে এ ভাষা কেবল বাচ্যার্থ-বোধক। কিন্তু এই গদ্যে যখন সাহিত্য রচিত হইল, তখন ইহার মধ্যে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ ধ্বনিত হইল। আধুনিক উপন্যাস এই গদ্যের আশ্রয়ে বাড়িয়া উঠিতেছে। ধ্বনিগুণ ইহাতে যতই থাকুক না কেন, ইহার বস্তুনিষ্ঠা, ঘটনার কার্যকারণ-পরম্পরার চেতনা, মনের ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্র-বিকাশ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির বিশ্লেষণ—আধুনিক উপন্যাসের গদ্যের প্রধান লক্ষণ। আধুনিক উপন্যাস এই গদ্যে রচিত। আধুনিক উপন্যাসকারের কাজ হইল মনোবিশ্লেষণ—চরিত্রের মাধ্যমে মনুষ্য-জীবনের সূক্ষ্মতর বৃত্তিগুলির বিশ্লেষণ। এই সকল কারণে আধুনিক গদ্যকে বাস্তবতার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হয় এবং এই কারণে পদ্যের motif হইতে গদ্য অনেক সরিয়া আসিয়াছে। "গদ্যের সাজসজ্জা স্বভাবতঃই কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। তাহাকে তর্ক করিতে হয়, অনুসন্ধান করিতে হয়, ইতিহাস বলিতে হয়, তাহাকে বিচিত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—এইজন্য তাহার বেশভূষা লঘু, তাহার হস্তপদ অনাবৃত।"[১] গদ্যের এই বস্তুনিষ্ঠার দিক হইতে কাদম্বরীর গদ্য বিচার করিলে তাহার নানা ত্রুটি চোখে পড়িবে। চোখে পড়িবে—সংস্কৃত কথ্য-ভাষার উপর সংস্কৃত গদ্যভাষা দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। ও ভাষা মৃত ভাষা, অন্ততঃ উপন্যাস যখন রচিত হয়, তখন উহার পরেতত্বে সন্দেহ নাই। কিন্তু

(১) রবীন্দ্রনাথ

স্রষ্টাকে তাহার সৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হয়, তাহা না হইলে বিচারে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। বাণের গদ্যের স্বরূপ আলোচনার পূর্বে আমরা সংস্কৃত গদ্য সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা বলিয়া লইব। ভারতবর্ষে সংস্কৃতের যুগে কাব্য বলিতে কবিতাকেই বুঝাইত। ভারতীয় বিচক্ষণেরা যাহা কিছু মাথা ঘামাইয়াছেন, তাহা ঐ কবিতা লইয়া। এই কবিতার প্রভাব শুধু কাব্যে নয়, দর্শন ও ও তৎস্থানীয় শাস্ত্রে যে ব্যাখ্যা গদ্যে বলা চলিত, তাহা অনায়াসে পদ্যের কারিকায় বলা হইয়াছে। গদ্যে-লেখা টীকাটিপ্পনীর সহিত কারিকাগুলির পার্থক্য হইল,—গদ্যের মধ্যে বিচারশীল মননশীলতার প্রাধান্য। শুধু কারিকা নয়, দর্শনশাস্ত্রে এমন সব গ্রন্থ আছে যাহাদের বিষয়-বস্তুর পরিবেশনের ভাষা বুদ্ধিদীপ্তির দিক্ হইতে গদ্য হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হইয়া পদ্যই তাহার বাহন হইয়াছে। ইহাতেই মনে হয়, সংস্কৃতে পদ্যেরই সার্বভৌম অধিকার। গদ্যের প্রতি কাহারও ঝোঁক ছিল না, কাহারো আগ্রহ ছিল না। রূপ-কথার দুয়োরাণীর ছেলের মত সে নানা অবহেলার মধ্যে নিজে নিজেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। যেদিন তাহার মধ্যে কাব্যধর্মের উন্মেষ দেখা দিল, দেখা দিল পদ্য-কাব্যের সহিত তাহার প্রতিযোগিতার উৎসাহ, সেদিন পদ্য-নবিশ বিশেষজ্ঞেরা বাধ্য হইয়া তাহাকে কাব্যকুলে স্থান না দিয়া পারেন নাই। গদ্য-কাব্য পদ্য-কাব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইয়া আসিলেও পদ্যের কাছে গদ্য গৌণ হইয়া রহিল।

সংস্কৃত টীকাটিপ্পনীর গদ্য-ভাষা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় তাহাতে যেমন বিচারশীল মননশীলতার পরিচয় আছে, তেমনি আছে বুদ্ধি-দীপ্তির অপরিমেয়তা। ইহা হইতে ভবিষ্যতে বাস্তবধর্মী গদ্যের আশা করা যাইতে পারিত, কিন্তু সাহিত্য-সমাজের চিরন্তন অবজ্ঞার চাপে পড়িয়া সে আশাও নির্মূল হইয়াছে। অতএব গদ্যকে কাব্য-সৌন্দর্যের শক্তিতেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল, অন্যপথ ছিলনা।

ভারতীয় মানসিকতার বৈরাগ্য-প্রবণতার ফলে বস্তুবাদ টেকে নাই। ভারতীয়েরা ছিলেন আদর্শের পূজারী। কাজেই বস্তুর প্রতি আসক্তি না থাকায় ভাব-ধর্মিতাকে তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন মনে প্রাণে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের অনুশীলন ছিল তাহাদের একমাত্র তপস্যা। কাদম্বরী উপন্যাসের ভাষা তাই ভাবের ভাষা—অনুভূতির ভাষা। স্বপ্নলোকের কোমল ছায়ার স্পর্শে অনুভূতি-লোকে যে সৌন্দর্য ভাসে, কাদম্বরীর ভাষা সেই সৌন্দর্যের ভাষা। গদ্যের নামে চলিলেও এ ভাষা পদ্যেরই ভাষা। পদ্যের সহিত ইহার পার্থক্য, ইহাতে

ছন্দ নাই, যতি নাই। কিন্তু ছন্দ-স্পন্দ আছে—নানা পর্বের আঘাতে ইহাতে স্বরের—সঙ্গীতের আরোহ-অবরোহ আছে, তাল আছে, মান আছে। ভাষা হইল বাহিরের দিক, ভাব হইল অন্তরের দিক। ভাব ও ভাষা—একই অনুভূতির যমজ সন্তান। যে-ভাবের প্রকাশের জন্য বিষয়-বস্তুর নির্বাচন, সেই ভাবের প্রবাহই ভাষা। কাদম্বরীর বিষয় যেমন স্বপ্নলোকের, ভাষাও তেমনি স্বপ্নের মাধুর্য-মাখা। চিত্তবৃত্তির সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুভূতিকে তন্ময়চিত্তে বর্ণনা করিতে যেটুকু বর্ণের প্রয়োজন, এ ভাষার সেই টুকু বর্ণ, চিত্তবৃত্তির স্পন্দনকে সুরে রূপায়িত করিয়া তুলিতে সঙ্গীতের যেটুকু ঝঙ্কারের প্রয়োজন, এ ভাষার সেইটুকু ঝঙ্কার, গহন মনের আলোছায়ায় যে অতীন্দ্রিয় চিত্র ভাসিয়া ওঠে, এ ভাষায় সেই চিত্র। রূপের আখর ফলাইতে ইহাতে অলঙ্কারের বিন্যাস, মনের গোপন কথাটি ব্যক্ত করিতে ইহাতে ধ্বনির ধ্বনন, আর চিত্তকে বিগলিত করিয়া ইহাতে রসের উৎসার। যে-কাব্য মানুষকে সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া ভাবলোকে উৎক্ষিপ্ত করে, ইহা সেই কাব্যের ভাষা। বাস্তব সংসারের সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই, তাহার ভাষাই বা বাস্তবের দাসত্ব করিবে কেন? চাঁদের আলো দিয়া কে কখন কারখানার লৌহকটাহকে জ্বাল দিয়া থাকে। চাঁদের আলো সংসারের কোন কাজে লাগেনা বলিয়া যদি আক্ষেপ করা যায়, তবে কাদম্বরীর ভাষা বাস্তব উপন্যাসের ভাষা হইল না বলিয়া আক্ষেপ যুক্তি-যুক্ত।

পঞ্চম প্রস্তাব—বাক্য। বাক্যসম্বন্ধে অভিযোগ ২, ৩, বা ৫ পৃষ্ঠার পরে কর্তৃপদ ক্রিয়াপদের সাক্ষাৎ লাভ করে; তাহাতে বাক্যের আসত্তি নষ্ট হয়। তাহা হয় না। এবিষয়ে Winternitz এর বক্তব্য উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে।

"The development of this style can be explained in part by the peculiarities of the Sanskrit language, in which, from the very beginning, nouns preponderate greatly over verbs. For this reason we find even at an early period a predilection for strings of descriptive adjectives and the formation of all kinds of compounds, often exceedingly long. Strange as the compounds often seem to us, there is no denying that they impart to the style an exceptionally forceful artistic effect and make it possible to give such graphic descriptions as are scarcely possible in other languages.

H I.L. Pages 4—5

ষষ্ঠ প্রস্তাব শব্দসম্পর্কে। শব্দের অক্ষরডম্বরতার অপরাধ ; শব্দের ধ্বনিতে ঢাকের বাজনা। শব্দ-নির্বাচনে সংস্কৃত কবিগণের বিরুদ্ধে কোন আপত্তিই সমীচীন নয়। তাঁহাদের শব্দ-নির্বাচনে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি[১]। শব্দ তো দূরের কথা বর্ণকেও তাঁহারা রসের অনুপাতে বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। বর্ণের মধ্যেও তাঁহারা 'বৃত্তি' বা activity আবিষ্কার করিয়াছেন। কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণ ও নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণ—সকলেই 'বৃত্তি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু বিভিন্ন অর্থে। কাব্য-তত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে উদ্ভটই প্রথম ইহার ব্যবহার করেন। অভিনবগুপ্তের মতে, শব্দের শোভা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উদ্ভট দীপ্ত, মসৃণ ও মধ্যম বা অপরুষ ধ্বনির পুনরাবৃত্তির অনুপাতে অনুপ্রাসকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং ধ্বনিমূল্যের দিক হইতে তিনটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বৃত্তি-বিভাগের উদ্দেশ্য হইল—ধ্বনির ভাব-মূল্যের (emotional) পৃথক্ করণ। বৃত্তিগুলির নাম হইল—পরুষা, উপনাগরিকা ও গ্রাম্যা। 'পরুষা'—বলিবার কারণ, ইহাতে দীপ্তধ্বনির পুনরাবৃত্তির আধিক্য। দ্বিতীয় বৃত্তিকে 'উপনাগরিকা' বলা হয় অভিজাত নারীর কোমলতার সহিত তুলনা করিয়া। গ্রাম্য নারীর সহিত তুলনায় তৃতীয় বৃত্তিটিকে 'গ্রাম্যা' বলা হয়। অতএব উদ্ভটের মতে শব্দ-বৈচিত্র্যের পুনরাবির্ভাবের জন্য বৃত্তি—"বর্তন্তে অনুপ্রাসভেদাঃ আসু।" আবার অর্থের দিক হইতে বৈয়াকরণেরা বৃত্তির ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন অভিধাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা প্রায়ই 'ব্যাপার' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৈয়াকরণদের প্রভাবে কোন কোন আলঙ্কারিক বৃত্তির ব্যাখ্যা করিলেন—"ব্যাপারো বা কার্যঃ"—action or function, এই সকল আলঙ্কারিকদের মতে বৃত্তি হইল রসের উপকারক পুনরাবৃত্ত বর্ণ-সমূহের ধ্বনি-ক্রিয়া—"বৃত্তির্নিয়তবর্ণগতো রস-বিষয়ো ব্যাপারঃ।" ব্যঞ্জনাবৃত্তি ধ্বনিবাদিদের আবিষ্কার এবং রসের প্রাণ। ইহা ছাড়া দশটি গুণ লইয়া যে বাক্যের শব-ব্যবচ্ছেদ হইল—অনুলোম-প্রতিলোম অনুসন্ধান হইল, ইহাতে আর যাহাই হউক না কেন, শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া শব্দ-শক্তির রহস্যের কথা যে জানা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কবিগণের হাতে-খড়ি এই আলঙ্কারিকদের হাতে। কবিগণ আলঙ্কারিকদের প্রতিভা আত্মসাৎ করিয়া আপন আপন প্রতিভার রঞ্জন-রশ্মিতে তাহার পূর্ণস্বরূপ অবলোকন করিয়া আপন সৃষ্টিতে তাহার মধ্যে লাবণ্য ভরিয়া দিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণের মন্ত্র কবির

(১) "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্‌ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি" ইত্যাদি বেদবাক্যেভ্যশ্চ সুপ্রসিদ্ধৈব।—সা, দ, ৮

বাণীতে জীবন্ত হইয়া উঠিল—প্রাণরস উছলিয়া উঠিল। আলঙ্কারিকেরা বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন—কবির হাতে তাঁহাদের দেওয়া মন্ত্রের যে রহস্য দেখা দিল, তাহা তাঁহাদেরও অভাবিতপূর্ব। এমনি করিয়া সংস্কৃত ভারতে যুগে যুগে আলঙ্কারিক হইতে কবিতে, কবি হইতে আলঙ্কারিকে শব্দরহস্যের অনন্তলীলা। সংস্কৃত কবিরা আপন আপন প্রতিভা অনুসারে এই লীলায় হাত-পাকাইয়াছেন।

তাহা ছাড়া কবি-চিত্তের পরিস্পন্দনের ফলে কবি এমন সব শব্দ আহরণ করেন যাহার সহিত তাঁহার ভাবময় বিষয়-বস্তুর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে। কবি-চিত্তে তলাইয়া-যাওয়া বিষয়বস্তু নূতন ভাবসত্তায় ছন্দিত হইতে হইতে শব্দের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। সেই শব্দে গ্রথিত হইয়া ওঠে জ্যোতির্ময় কাব্য-লোক। যে সৌন্দর্যের প্রেরণায় ইহার আবির্ভাব, তাহারই দ্যোতনায় সে অর্থকে অতিক্রম করিয়া ওঠে; জাগে অর্থের মধ্যে নূতন জাতীয় একটি স্ফূরণ—একটি আস্বাদ—একটি হ্লাদরস। এই আস্বাদ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও শব্দজাতীয় নয়, ইহা যেন বিজাতীয় আবির্ভাব; দেহ যন্ত্র-গুলির ক্রিয়া-সামান্য হইতে প্রাণের আবির্ভাবের মত ইহার আবির্ভাব।

অতএব সংস্কৃত কবিদের যত দোষই দেওয়া যাক না কেন, শব্দ-নির্বাচনের দোষ তাঁহাদের দেওয়া চলেনা। ভাবের স্ফূরণ।অনুসারে তাহাদের শব্দের অর্থে একটা নূতন জাতীয় অর্থের দ্যোতনা। এক শ্লেষ লইয়া আপত্তি উঠিতে পারে কিন্তু বাণের শ্লেষ কখনও একাকী পরিভ্রমণ করে নাই, যে-কোন অলঙ্কারের সহিত একাত্ম হইয়া তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাহার ফলে বুদ্ধি-দীপ্তির চমৎকারিতার সহিত অপর অলঙ্কারের সৌন্দর্যে মাখামাখি হইয়া কোমলে-কঠোরে তাহার চমৎকারিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘবাক্যে শব্দের ঠাসাঠাসিতে ঢাকের বাজনা বাজে নাই, কনসার্ট বাজিয়া উঠিয়াছে—একটা রমণীর ধ্বনি-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিয়াছে। ঝর্ণার চলার বেগে উপলখণ্ডের নূপুর-ধ্বনির ন্যায় ইহাতে পদাবলী সুন্দরীর আলতাপরা রাঙা পায়ের মঞ্জুল মঞ্জীর বাজিয়া উঠিয়াছে। এই রাঙা চরণ দিয়া আঘাত করিলে পাঠকের চিত্তেও ফুল ফোটে।

অতএব রীতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, তাহা যে রসিকের রস-সমালোচনা নয়, একটা আক্রমণাত্মক মনোভাব, তাহা সহজেই বোঝা যায়। যে দেশের রসিক-জনের রসাস্বাদনের জন্য এ কাব্যের সৃষ্টি, তাহারা কিন্তু কাদম্বরী পড়িতে পড়িতে আহারের কথাও ভুলিয়া যান—"কাদম্বরীরসজ্ঞানমাহারোঽপি

ন রোচতে।" ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ;—"তবুও বাণভট্টের কাদম্বরীতে আধুনিক উপন্যাসের ক্ষীণ পূর্বাভাস দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত 'কাদম্বরী' সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। বর্ণনার আড়ম্বর কমাইয়া চরিত্র-চিত্রণের দিকে যদি বাণভট্ট বেশি লক্ষ্য দিতেন, তাহা হইলে বইটি বিশ্বসাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হইবার গৌরব লাভ করিতে পারিত। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের উপযুক্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির এবং সহানুভূতির পরিচয় বাণভট্টের লেখায় দুর্লক্ষ্য নয়।"[১]

গদ্য-লেখক হিসাবে বাণের নিজের মনেও একটা চেতনা ছিল। চেতনা যে ছিল, তাহার নজির তিনি রাখিয়া গিয়াছেন মহাশ্বেতার বিলাপের ভাষায়। বিষয় বস্তু এক হইলেও গদ্যে ও পদ্যে যে রূপ-প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া থাকে, বাণ তাহা বুঝিতেন। মহাকবি কালিদাসের কুমার-সম্ভবের রতি-বিলাপের ভাষার সহিত কাদম্বরীর মহাশ্বেতা-বিলাপের ভাষা তুলনা করিলে বাণের গদ্য-চেতনা ধরা পড়িবে।

মহাশ্বেতার বিলাপ ঃ

"হা নাথ! জীবিতনিবন্ধন! আচক্ষ্ব, ক মামেকাকিনী মশরণা মকরুণ! বিমুচ্য যাসি? পৃচ্ছ তরলিকাম্, ত্বৎকৃতে ময়া যানুভূতাবস্থা। যুগ-সহস্রায়মাণঃ কৃচ্ছ্রেণ নীতো দিবসঃ। প্রসীদ, সকৃদপ্যালপ, দর্শয় ভক্তবৎসলতাম্, ঈষদপি বিলোকয়, পূরয় মে মনোরথম্, আর্তাস্মি, ভক্তাস্মি, অনুরক্তাস্মি, অনাথাস্মি, বালাস্মি, অগতিকাস্মি, দুঃখিতাস্মি, অনন্যশরণাস্মি, মদনপরিভূতাস্মি, কিমিতি ন করোষি দয়াম্? কথয়, কিমপরাদ্ধম্, কিংবা নানুষ্ঠিতং ময়া, কস্যাং বা নাজ্ঞায়ামাদৃতম্, কস্মিন্ বা ত্বদনুকূলে নাভিরতম্ যেন কুপিতোঽসি। দাসীজনম্ অকারণাৎ পরিত্যজ্য ব্রজন্ ন বিভেষি কৌলীনাৎ? অলীকানুরাগপ্রতারণ-কুশলয়া কিংবা ময়া বাময়া পাপয়া। আ, অহমদ্যাপি প্রাণিমি, হা হতাস্মি মন্দ-ভাগিনী। কথং মে ন ত্বম্, ন তাতঃ, ন বিনয়ঃ, ন বন্ধুবর্গঃ, ন পরলোকঃ, ধিঙ্মাং দুষ্কৃতকারিণীম্, যস্যাঃ কৃতে তবেয়মীদৃশী দশা বর্ততে। নাস্তি মৎসদৃশী নৃশংসহৃদয়া, যাহমেবংবিধং ভবন্তমুৎসৃজ্য গৃহং গতবতী। কিং মে গৃহেণ, কিমম্বয়া, কিং বা তাতেন, কিং বন্ধুভিঃ, কিং পরিজনেন। হা কথমুপযামি শরণম্? অয়ি দৈব! দর্শয় দয়াম্, বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাম্ দেহি দয়িতদক্ষিণাম্। ভগবতি! ভবিতব্যতে! কুরু কৃপাম্,

(১) বা, সা, ই ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ।

পাহি বণিতামনাথাম্। ভগবত্যো বনদেবতাঃ! প্রসীদত, প্রযচ্ছতাস্য প্রাণান্। অম্ব! বসুন্ধরে! সকললোকানুগ্রহজননি! কিমর্থং নানুকম্পসে! তাত! কৈলাশেশ! শরণগতাস্মি তে, দর্শয় দয়ালুতাম্॥"

এ ভাষা কোন্ ভাষা! ইহাতে অলঙ্কার নাই, সমাস নাই, গূঢ়ার্থক ইঙ্গিত নাই, পুরাবৃত্ত নাই; এ কোন্ ভাষা? হৃদয়ের তলায় আগুন ধরাইয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঝলকে ঝলকে বাহির হইতেছে, এ কোন্ ভাষা? নাড়ি ছিড়িয়া রক্ত-প্রস্রবণের মত কল কল করিয়া বাহিরে ছুটিতেছে, এ কোন্ ভাষা? প্রাণ বাহির হইতে চাহিয়াও বাহির হইতেছে না, এ কোন্ ভাষা? অন্তরে অন্তরে মর্ম ছিঁড়িতেছে, রক্ত পড়িতেছে না, এ কোন্ ভাষা? এ ভাষা আন্তরিক শোকের ভাষা, হৃদয়-ভাঙা ভাষা—তাই ইহাতে সজ্জা নাই, অনুলেপন নাই, প্রসাধন নাই। তাই ইহা সর্বরিক্ত শূন্য হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাষা। যিনি রঙ্ না মাখাইয়া শব্দ ছাড়েন না, অলঙ্কার না পরাইয়া পদাবলীকে পাঠকের গৃহে বিসর্জন দেন না, শ্লেষের চতুরতা, পুরাবৃত্তের পৌত্তলিকতাকে না ডাকিয়া কথার ছক কাটিতে পারেন না, তাঁহার একি হইল—

"নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকণ সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।"[১]

—পাঠক বলুন, ইহা কি গদ্যের ভাষা নয়? বস্তুবাদী গদ্যের আদর্শ ভাষা। আর কুমার-সম্ভবের রতি-বিলাপের ভাষা যথার্থ কবিতার ভাষা;—

কুমার-সম্ভবে রতি-বিলাপ :—

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রতি দেখিল, মদনের সেই সৌন্দর্য-নিকেতন দেহখানি আর নাই, পড়িয়া আছে রাশীকৃত ভস্ম। রতির বুক ফাটিয়া যাইতেছে; আজন্ম প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মদন চলিয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে, অভাগিনী রতি। রতির কতই না দুঃখ।

কনু মাং ত্বদধীনজীবিতাম্
বিনিকীর্য্য ক্ষণ-ভিন্ন-সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জল-সঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥

মদন কখনও রতির অপ্রিয় কার্য করে নাই, রতিও কখনও মদনের ইচ্ছার

(১) সাগরিকা

পরিপন্থিনী হয় নাই, তবে কেন এই বিচ্ছেদ! একদিন রতির নামোচ্চারণ কালে মদন ভুল করিয়া মিশ্রকেশীর নাম উচ্চারণ করায় রতি মদনকে কাঞ্চীগুণ দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়াই কি মদন চলিয়া গিয়াছে? অথবা রতির কর্ণভূষণ পদ্মের দ্বারা তাড়না করিবার কালে সেই পদ্ম-বিচ্যুত কেশর মদনের চোখে যে ক্লেশ জন্মাইয়া ছিল, ইহা স্মরণ করিয়াই কি সে চলিয়া গিয়াছে? কথা প্রসঙ্গে মদন রতিকে বলিত, "হৃদয় রঞ্জিনি! তুমি আমার চিত্তের মধ্যে আছ।"—এ কি তবে ছলনা? মদন পরলোকে গিয়াছে, রতিও মদনের অনুসরণ করিবে। হায়! দৈব-বিড়ম্বিতা রতি! মদন আর নাই। নৈশ-অন্ধকার-আবৃত রাজপথে মেঘ-গর্জনে ভীতা অভিসারিকাদের আর কে সঙ্কেতস্থানে লইয়া যাইবে!

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়া-
স্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥

মদনের অভাবে বারুণীপানে মত্ত কামিনীগণের চিত্তে আর কি কামের উদয় হইবে? আকাশে চন্দ্রোদয় নিরর্থক হইবে, চূত-কুসুম নিষ্ক্রিয় হইবে, ভ্রমরের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, কোকিলা আর প্রণয়-দৌত্যে অগ্রসর হইবে না। রতির অনেক কথাই মনে পড়িতেছে;—মনে পড়িতেছে রতির কম্পিত দেহে মদনের আলিঙ্গনের কথা, একান্তে সুরত-লীলার কথা। মনে পড়ে একদিন মদন নিজের হাতে বসন্তকালীন পুষ্পের অলঙ্কারে রতিকে সাজাইয়াছিল। রতির বাম চরণের প্রসাধনের কাজ শেষ হইতে না হইতে দেবরাজ মদনকে স্মরণ করিয়াছিলেন। মদন স্বর্গে গিয়াছে। সুর-সুন্দরীরা যে তাহাকে ভুলাইয়া ফেলিবে! রতির তাহা সহ্য হইবে না। সে মরিয়া আবার তাহার অঙ্কশায়িনী হইবে। রতির কতই না দুঃখ। মরিবার সময় স্বামীর অন্তিম বেশভূষার ব্যবস্থাও সে নিজ হাতে করিয়া দিতে পারিল না। কত কথাই আজ রতির মনে পড়ে! কোলে ফুলধনু রাখিয়া একখানি শায়ক সোজা করিতে করিতে বসন্তের সহিত হাসিয়া আলাপনের মধ্যেও কতবারই না মদন রতির দিকে আড়চোখে চাহিত। মদন-ভস্মে বসন্ত লুকাইয়া ছিল বনের আড়ালে। বসন্তকে দেখিয়া রতির শোক উছলিয়া উঠিল—। রতি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে, কামদেব! আমার জন্য না হোক, তোমার প্রিয়সখা বসন্তের জন্য একবার দেখা দাও—

অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনম্
স্মর পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাম্
ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥

না, বসন্ত, তোমার বন্ধু আর ফিরিবে না।

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মা-
মবিষহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥

আজ আমি একান্তই নিরাশ্রয়—

বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসম্
ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥

তুমি চিতা রচনা কর, আমি সেই চিতায় আরোহণ করিব—

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং বিচেতনৈরপি ॥

ঐ যে সম্মুখে আমার পতিদেহের ভস্মরাশি পড়িয়া আছে, আমি সেই ভস্মে স্তনদ্বয় লিপ্ত করিয়া অনল-শয্যা গ্রহণ করিব—

অমুনৈব কষায়িতস্তনী
সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।
নবপল্লব-সংস্তরে যথা
রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥

সখে! বসন্ত! চিতাগ্নিতে আমার দেহ ভস্মীভূত হইলে আমাদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিও, আর পারলৌকিক কার্য করিবার সময় তোমার সখার উদ্দেশে দিও চঞ্চল কিসলয়-সমন্বিত আম্র-মুকুল; ঐ আম্রমুকুল তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

কুমার-সম্ভবে রতি-বিলাপে যে শোক, সে শোকে আছে শোকের বিলাসিতা। এ শোক সরাসরি হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় না। এ শোক অলঙ্কারের মণ্ডনশ্রী

লইয়া আবিভূর্ত হয়, সৌন্দর্যের লীলায়িত মাধুর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এ শোকের রূপ বাসকসজ্জা নায়িকার রূপ। ইহা শরতের মেঘ-খণ্ডের মত শুভ্র, সুষমাময়, হাল্কা, ভাসমান। ইহার উপরে কালিমা নাই, শ্রাবণ-ঘন-গহন-মেঘের-মেদুরতা নাই। ইহা অন্তঃসারশূন্য, ইহার বক্ষে বিদ্যুতের জ্বালা নাই, নয়নে মর্মছেড়া বেদনার শাওন নাই। হৃদয়ভারে ইহা পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে না। ইহা বেদনার সৌন্দর্য, ব্যথার রূপালি, ইহাতে যে অশ্রু, তাহা কেবল সুন্দরীর নয়ন-শতদলের শোভার জন্য। ইহার নিঃশ্বাসে বসন্তের বাতাস, বিলাপে ভ্রমর-গুঞ্জন, কবরীতে চূত মুকুলের সৌগন্ধ্য। ফুলের-ঘায়ে-মূর্চ্ছা-যাওয়া এ শোক। কালিদাসের শোকে বসন্ত-বাহার, বর্ষার মেঘ-মল্লার নাই। এ শোক বিদ্যুৎ বিলাসের মতো চকিতে ভাসে, চকিতে মিলাইয়া যায়। ইহা শুধু 'চমকে ঝলকে দেখা দিয়া মিলায় পলকে'। ধরিবার আগেই ইহা নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। ইহা কবিতার শোক—কিন্তু কালিদাসের কবিতার। কবিতার বলিয়া ইহাতে সৌন্দর্যের অফুরন্ত লীলা; অলঙ্করণের সুচারু পটুতা; উদ্দীপনের প্রসিদ্ধি-শরণ্যতা। ইহা পদ্যের শোক, কবিতার শোক। এশোকে সালঙ্কারা সীমন্তিনী যুবতী সুন্দরীর চিতারোহন; এ চিতায় অগ্নিশয্যা নাই, আছে অগ্নির মত আতাম্র কচি কিসলয়ের পল্লব-শয্যা।

কিন্তু মহাশ্বেতার শোক নিরাভরণ বৈধব্যের শোক; অনাস্বাদিত মাধুর্যের অগ্নি-সংকারের শোক; অজ্ঞাত জগৎ ও জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের বিকীর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের শোক। ইহার চিত্তদাহে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ; ইহাতে জ্বালা বেশী, ভাষা কম; গহীনতা বেশী, উচ্ছ্বাস কম। ইহা অগ্ন্যুদ্গারের মতই হৃদয়ের তলদেশ ক্ষার করিয়া অগ্নিস্রাবের তরল লাভায় বাহিরে ছুটিয়া আসে। ইহাতে লীলা নাই, বিলাস নাই, ঠমক নাই, আছে শুধু বেদনা-সিন্ধুর অসংখ্য তরঙ্গ-ভঙ্গ। এ শোক মেঘের গায়ে বিদ্যুতের মত মুহূর্তের জন্য লতাইয়া ওঠে না, ইহা পাহাড়ের গায়ে শিলালিপি হইয়া মহাকালের মিউজিয়মে চিরন্তন হইয়া থাকে। ইহার অনুভূতিতে পর্বতের গুরুত্ব, বর্শা-ফলকের তীক্ষ্ণতা, অক্ষচক্রের বেধ, সমুদ্রের গভীরতা, আকাশের ব্যাপ্তি। ইহা উৎক্ষিপ্ত শরের হিংস্র মুখে ছুটিয়া চলে। সমস্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে—আপ্লাবনকে সংযমের দ্বারা কেন্দ্রীভূত করিয়া, তীক্ষ্ণতায় সংহত করিয়া মাটীর পৃথিবীতে সংসারের অঙ্গন দিয়া ইহার প্রবাহিনী। তাই ইহা বাস্তব শোক। এশোকের অন্তরে আছে অসহায়তার দৈন্য, না-জানা-জগতের প্রথম দংশনের জ্বালা। বাস্তব-সংসারের শোক যেমন, ইহা ঠিক তেমনি।

ইহার সংলাপে কথ্য ভাষা। কোন অলঙ্কার নাই। শোকের ছন্দ ছাড়া আর কোন ছন্দ নাই। কালিদাসের শোকে বসন্ত নিজে উপস্থিত, চূত মুকুল, ভ্রমর, কোকিলা—সকলেই উপস্থিত। কোথাও গর্জন-মুখর, অন্ধকার, নৈশ রাজপথ দিয়া অভিসারিকা চলিয়াছে, কোথাও বারুণী পান করিয়া বিলাসিনী রমণীগণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও আলিঙ্গন ও সহবাসের পুরাতন অলক্ষ্য ছবি, কোথাও বসন্তের সহিত মজলিসে রতির প্রতি মদনের মাঝে মাঝে আঁখি-ঠারের স্মৃতি। নানা চিত্রে, স্মৃতিতে, অলঙ্কারে ছন্দে শোক যেন একটা উৎসবের ব্যাপার। বাণ-ভট্টের শোকে অচ্ছোদ-সরোবর থাকিয়াও নাই, বসন্ত ঋতু একান্তে দাঁড়াইয়া বালিকার বিপদ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতেছে, যে-চন্দ্র মহাশ্বেতাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিল, সেও লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। মহাশ্বেতার শোক কেন্দ্রীভূত পুণ্ডরীকে। জগৎ নাই, সংসার নাই, চিত্র নাই, স্মৃতি নাই ; আছে এক অনভিজ্ঞা বালিকা, আর তার মৃত প্রিয়তম। সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া সে কাঁদিতেছে। মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া কাঁদিতেছে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে, হে মৃত্যুপাণ্ডুর নীরবতা, কথা কও, কথা কও ; হে যোগী, তোমার অনন্ত নিদ্রার ধ্যান ভাঙিয়া একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ। চাহিয়া দেখ, আমার কেহ নাই ; চাহিয়া দেখ, আমার তুমি নাই ; চাহিয়া দেখ, আমার মতো অসহায় কেহ নাই। দয়া করো। বল, কী অপরাধ করিয়াছি ? তোমার জন্য কী আমি করি নাই ? রাগ করিয়া মরিও না। হায় ! হায় ! তুমি নাই, অথচ আমি বাঁচিয়া আছি। দেখ ! আমার কেহ নাই ; তুমি নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, লজ্জা নাই, পরলোক নাই। হায় ! হায় ! আমাকে ধিক্। আমি তোমার মৃত্যুর কারণ। হায় ! হায় ! আমি কেন তোমাকে ছাড়িয়া ঘরে গেলাম ! আমার ঘর পুড়িয়াছে, পিতামাতা-বন্ধু-পরিজন, কাহারো আর প্রয়োজন নাই। কোথায় যাইব ? কাহার শরণ লইব ! হে অদৃষ্ট ! দয়া কর, প্রাণেশ্বরকে ভিক্ষা দাও। ভবিতব্যতা ! দয়া কর ! অনাথা বালিকাকে রক্ষা কর। বন দেবতাগণ ! প্রসন্ন হও, আমার প্রিয়তমের প্রাণ আমাকে ফিরাইয়া দাও। মাতা বসুন্ধরা, তুমি তো সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাক, তবে আমাকে দয়া করিতেছ না কেন ? মহাকাল ! পিতা ! আমাকে দয়া কর। দয়া করো, দয়া করো।

তাই বলিতেছিলাম, এ শোক বাস্তব শোক। এ শোকের সঙ্গে আমরা সংসারে নিত্য পরিচিত। ইহার ভাষা সংযত, সংহত, অনলঙ্কৃত। এ ভাষা লৌকিক

কান্নার ভাষা। এ ভাষা গদ্যের ভাষা। ইহা যে গদ্যের ভাষা একই ভাব লইয়া উভয় কবির সংলাপের তুলনা করিলে পার্থক্যটা আরও পরিষ্কার হইবে ;—

মহাশ্বেতা কাঁদিয়া বলিতেছে—

"হা নাথ! জীবিতনিবন্ধন! আচক্ষ, ক মামেকাকিনীমশরণামকরুণ! বিমুচ্য যাসি?"

রতি কাঁদিতেছে—

কণু মাংত্বদধীনজীবিতাম্
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জল-সঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ।

মহাশ্বেতা কাঁদিতেছে ;—"কথয় কিমপরাদ্ধম্, কিংবা নানুষ্ঠিতং ময়া, কস্যাং বা নাজ্ঞায়ামাদৃতম্, কস্মিন্ বা ত্বদনুকূলে নাভিরতম্ যেন কুপিতোঽসি।"

রতি কাঁদিতেছে—

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে
প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্।
কিমকারণমেব দর্শনম্
বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে॥

মহাশ্বেতা কাঁদিতেছে—

"আ, অহমদ্যাপি প্রাণিমি, হা, হতাস্মি মন্দভাগিনী।"

রতি কাঁদিতেছে—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতম্
রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি॥

মহাশ্বেতা কাঁদে—

"হা! কথমুপযামি শরণম্"

রতি কাঁদে—

বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসম্
ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা।

অনপায়িনি সংশ্রয়-দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী।

অতএব যাঁহারা বাণের গদ্যে কবিতার সৌন্দর্য দেখিয়া উন্নাসিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, এতক্ষণে বোধ হয়, তাঁহাদের মন কিছুটা নরম হইয়া থাকিবে। বাণ ভাষার কারিগর—ভাষার খেলোয়াড়। ভাব অনুসারে যখন যে-ভাষার প্রয়োজন, তিনি সেই ভাষা, তখনই পরিবেশন করিতে পারেন। ভাষা-চঞ্চু বাণ।

কেবল বুঢ়োরস্ক সমাসে-ভরা পদাবলী নয়, ঝরঝরে হাল্কা, হাওয়ায় খইয়ের মত শাদা ডানা মেলিয়া উড়িতে পারে, এমন ভাষা দুগ্ধ-তরঙ্গিনীর মত যে তাহার লেখনীর অধর হইতে ঝরিত, তাহার নমুনা উদ্ধার করিয়া দিলাম:

কপিঞ্জলের উপদেশের ভাষা;

"সখে! পুণ্ডরীক! নৈতদনুরূপং ভবতঃ। ক্ষুদ্রজনক্ষুণ এষ মার্গঃ। ধৈর্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণৎসি। কুতস্তবা-পূর্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবঃ? যেনাস্যেবং কৃতঃ। ক তে তদ্ধৈর্যম্, কাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ, ক তদ্বশিত্বং চেতসঃ, ক সা প্রশান্তিঃ, ক তৎ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্যম্, ক সা সর্ববিষয়-নিরুৎসুকতা, ক তে গুরূপদেশাঃ, ক তানি শ্রুতানি, ক তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক তদুপ-ভোগবিদ্বেষিত্বম্, ক সা সুখপরাঙ্মুখতা, কাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ, ক সা সংযমিতা, ক সা ভোগানামুপর্যরুচি, ক তদ্ যৌবনানুশাসনম্।"

বাণের গদ্যের স্বাভাবিক সুর—

"একদা তু নাতিদূরোদিতে নব-নলিনী-দল-সম্পুট-ভিদি কিঞ্চিন্মুক্তপাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি, রাজানমাস্থানমণ্ডপগতমঙ্গনা-জনবিরুদ্ধেন বাম পার্শ্বাবলম্বিনা কৌক্ষেয়কেন, সন্নিহিতবিষধরেব চন্দনলতা-ভীষণ-রমণীয়াকৃতিঃ, অবিরলচন্দনানুলেপন-ধবলিত-স্তনতটা উন্মজ্জদৈরাবতকুম্ভমণ্ডলেব মন্দাকিনী, চূড়ামণি-সংক্রান্ত-প্রতিবিম্বচ্ছলেন রাজাজ্ঞেব মূর্তিমতী রাজভিঃ শিরোভিরুহ্যমানা, শরদিব কলহংস-ধবলাম্বরা, জামদগ্ন্যপরশুধারেব বশীকৃত-সকল-রাজ-মণ্ডলা, বিন্ধ্য-বনভূমিরিব বেত্রলতাবতী, রাজ্যাধিদেবতেব বিগ্রহিণী, প্রতিহারী সমুপসৃত্য ক্ষিতি-তলনিহিতজানুকরকমলা সবিনয়মব্রবীৎ।"

বর্ণ-বিন্যাসের সহিত কবি-হৃদয়ের করুণাধারার মিশ্রণ ঘটিলে সংযমে ও সৌন্দর্যে রচনার সৌকুমার্য ভাষার মধ্যে কীভাবে ফোটে তাহার নিদর্শন—

"………কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিন-সংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কোপলসদৃশান্,

কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্-বিঘটিত-দলপুটপাটলমুখানাং কমল-মুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃ কম্প-ব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখা-সন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।"

বাণের মেজাজ কেবল গম্ভীর নয়, কেবল শৃঙ্গার-রসের ভাণ্ডার নয়, বিদ্রূপাত্মক রসিকতা করিতেও তিনি ছাড়ে না। তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে আধুনিক Satire এর কিছু লক্ষণ আছে। জরদ্দ্রবিড়ধার্মিক বর্ণনায় তাহার পরিচয় মেলে ;—"অতি রোষণতয়া কদাচিদ্ দুর্ন্যস্তাষ্টপুষ্পিকাপাতোৎপাদিত-ক্রোধেন চণ্ডিকামপি মুখভঙ্গিবিকারৈর্ভ্রূশমুপহসতা, কদাচিন্নিবার্যমানা-বাস-রুষিতাধ্বগারব্ধ-বহু-বাহুযুদ্ধ-পাত-ভগ্ন-পৃষ্ঠকেন, কদাচিৎ কৃতাপরাধ-বালক-পলায়নামর্শ-পশ্চাৎ-প্রধাবিত-স্খলিতাধোমুখ-পাত-স্ফুটিত-শিরঃ-কপাল-ভুগ্ন-গ্রীবেণ, কদাচিজ্জানপদকৃত-নবাগতা পরধার্মিকাদরমৎসরোদ্বদ্ধাত্মনা, নিঃসংস্কারতয়া যৎকিঞ্চনকারিণা, খঞ্জতয়া মন্দ-মন্দ-সঞ্চারিণা, বধিরতয়া সংজ্ঞাব্যবহারিণা, রাত্র্যন্ধতয়া দিবাবিহারিণা, লম্বোদরতয়া প্রভূতাহারিণা, অনেকশাঃ ফল-পাতন-কুপিত-বানর-নখোল্লেখ-চ্ছিদ্রিতনাসাপুটেন, বহুশঃ কুসুমাবচয়-চালিত-ভ্রমর-সহস্র-দংশ-শীর্ণকৃত-শরীরেন, সহস্রশঃ শয়নীকৃতা-সংস্কৃত-শূন্য-দেবকুল-কালসর্প-দষ্টেন, শতশঃ শ্রীফলতরু-শিখর-চ্যুতি-চূর্ণিতোত্তমাঙ্গেন, অসকৃদুৎসন্ন-দেবমাতৃ-গৃহ-বাস্যৃক্ষ-নখ-জর্জরিত-কপোলেন, সর্বদা বসন্ত-ক্রীড়িনা জনেনোৎক্ষিপ্ত-খণ্ড-খট্বারোপিত-বৃদ্ধদাসী-বিবাহ-প্রাপ্ত-বিড়ম্বনেন, অনেকায়তন-প্রতিশয়িত-নিষ্ফলোত্থানেন, দৌঃস্থিত্যমপি বিবিধ-ব্যাধি-পরিবৃতং স্বকুটুম্বমিবোদ্বহতা, মূর্খতামপি বহুব্যসনানুগতাং প্রসূতানেকাপত্যামিব দর্শয়তা, ক্রোধমপ্যনেকদণ্ডঘাত-নির্মিত-বন্ধগাত্রগণ্ডকং ফলিতমিব প্রকাশয়তা, ক্লেশমপি সর্বাঙ্গবজ্বলিত-দীপিকা-দাহ-ব্রণ-বিভাবিতং বহুসুখমিব প্রকটয়তা, পরিভবমপি নিষ্কারণ-ক্রুষ্টজনপদদত্ত-পদাকৃষ্টি-শত-সম্প্রবাহমিব দধানেন, শুষ্ক-বনলতা-বিনির্মিত-বৃহৎকুসুম-করণ্ডকেণ, বেনুলতারচিত-পুষ্পপাতনাঙ্কুশিকেন, ক্ষণমপ্যমুক্ত-কাল-কম্বল-খণ্ড-খোলেন, জরদ্দ্রবিড়ধার্মিকেণাধিষ্ঠিতাং চণ্ডিকামপশ্যৎ।"

এ পর্যন্ত কাদম্বরী হইতে নানা উপলক্ষে যে সকল অংশের উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাতে কবির ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাব-অনুসারে ভাষার লীলামাহাত্ম্য যথেষ্ট প্রচার করা হইয়াছে।

অতএব বাণের রীতি কোন স্থান-বিশেষের প্রসিদ্ধ রীতি নয়; ইহা বৈদর্ভী নয়, গৌড়ী নয়, পাঞ্চালী নয়, ইহা সকলের দেওয়া-ফুলে বসন্ত-প্রভাতে নিজের-

হাতে রচা গন্ধমালা। ইহাতে সকল রীতির সমন্বয় হইয়াও তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার সাগর-সেঁচা মাণিক, তাঁহার আদরের ধন, তাঁহার মানসী কন্যা। হর্ষ চরিতের সূচনায় তিনি বলিয়াছেন—

নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্টঃ স্ফুটোরসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুষ্করম্॥

যাহা দুষ্কর, তাহাই তাঁহার রচনায় সুকর হইয়া উঠিয়াছে।

বাণের কাম-শাস্ত্র-জ্ঞান

কামশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অলঙ্কার শাস্ত্র; একথা পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়াও বলিয়াছি যে সংস্কৃত পণ্ডিত-কবিরা কামশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। শুধু পণ্ডিত-কবি কেন, একদা ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যে যে ব্যাপকভাবেই কাম-শাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলন চলিত, বাৎসায়নের কামসূত্রে তাহার প্রমাণ আছে। কাজেই কবিরা কেবল অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিরিখে নয়, কামশাস্ত্রের প্রভূত জ্ঞান লইয়া সাহিত্য রচনা করিতেন। অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার হাব-ভাব-হেলা প্রভৃতি নাট্যালঙ্কারের যে সকল উপদেশ আছে, তাহা বিজ্ঞান-সম্মত ধারাবাহিক আলোচনা নয়। তাহাতে নারীপুরুষের যৌনসংবেদনার খানিকটা বিক্ষিপ্ত পরিচয় আছে; অর্থাৎ সেগুলি এমন সূত্রাত্মা নয়, যাহা সম্মুখে রাখিয়া সাহিত্যে যৌন-সংবেদনার জীবন্ত চিত্র রচনা করা চলে। নাটকে কবিগণের জীবন-দ্যোতনা লইয়া খেলা। সেই খেলা খেলিতে যেখানে যেটুকুর পরিবেশন সমীচীন, তাঁহারা তাহাই করিয়াছেন এবং সকলেই এক পথেই চলিয়াছেন বলিয়া দৃষ্টিতে নূতন চেতনা ধরা পড়ে নাই এবং চরিত্রসৃষ্টিও যান্ত্রিক হইয়া উঠিয়াছে। বাণভট্ট যে কেবল কামশাস্ত্র জানিতেন, অলঙ্কারশাস্ত্র জানিতেন, ইহাই বড়া কথা নয়। তাঁহার একটা নিজস্ব জীবনদর্শন ছিল, জীবন-অভিজ্ঞতা ছিল। সেই অভিজ্ঞতার ফলে নারী-চরিত্রের যে অন্তর্দৃষ্টি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাযথ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই কেবল চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা হইবে বলিয়া। তবু চিরাচরিত প্রথার যান্ত্রিক অধ্যবসায়ের মধ্য হইতে তাঁহার নারী-চরিত্র-চেতনা যেন উঁকি মারিতে থাকে। চক্ষুষ্মান পাঠকের চক্ষু কখনও ইহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। এককালে ইউরোপে Byron-কে 'authority over women' বলা হইত, Shakespeare-এর Byron-এর authority ছিল না বটে, কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল, তাহাতেই তাঁহার নারী-চরিত্র অত সজীব এবং এই সজীবতা দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন যে Shakepeare-ও বুঝি বহু-নারীবল্লভ ছিলেন। কিন্তু তাহা নয়, তাঁহার যাহা ছিল, তাহা অন্যের ছিল না। তাহা হইল তাঁহার চোখ, তাহার অন্তর্দৃষ্টি। এই সম্পর্কে Bagehot সাহেবের 'Shakespeare the man' প্রবন্ধটি আলোচনীয়। Shakespeare-এর

যে চোখ ছিল, বাণেরও সেই চোখ ছিল, কিন্তু কালের চাহিদায়, প্রাচীনধারার প্রতি অন্ধ আনুগত্যে তিনি যাহা দিতে পারিতেন, তাহা দিতে পারেন নাই। তবুও তাঁহার চোখের দৃষ্টির পরিচয় মেলে তাঁহার রচনায়। নিম্নে কাদম্বরীর অনুরাগখিন্ন চেতনার খানিকটা বর্ণনাত্মক অংশ তুলিয়া দিয়া সেই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছি।

"হৃদয়েন সহ প্রিয়তমসমীপমিবোপগতৈরঙ্গৈরুপজনিত-দৌর্বল্যাম্, আশ্যান-চন্দন-পাণ্ডুরঞ্চ রোমাঞ্চমনবরতহার-স্পর্শলগ্নং মুক্তাফল-কিরণ-পুঞ্জম্ ইবোদ্বহন্তীম্, স্বেদ-শীকরিণীঞ্চ কপোলপালীং পক্ষপবনেন বীজয়দ্ভিরনুকম্প্যমানামিবাবতংস-কুসুম-মধুকরৈঃ, অবতংস-কুসুম-মধুকর-রব-দহন-দগ্ধমিব শ্রোত্রমপাঙ্গনির্গতেনাশ্রুস্রোতসা সিঞ্চন্তীম্, অতি-প্রবৃত্তস্য চাশ্রুণো নির্বাহ-প্রণালিকামিব কর্পূরকেতকীকলিকাং কর্ণে কলয়ন্তীম্, আয়ত-শ্বাস-বিধূতিতরলিতেন চ সন্তাপ্য ভয়-পলায়মানেন দেহপ্রভা-বিতানেনেবাংশুকেন বিমুচ্যমান-কুচ-কলসাম্, আপতৎ-প্রচল-চামর-প্রতিবিম্বঞ্চ কুচকলস-যুগলং প্রিয়ান্তিকগমনোৎসুক্যকৃতপক্ষমিব করতলেন নিরুন্ধতীম্, মুহুর্মুহুর্ভুজ-লতয়া তুষার-শিলা-শালভঞ্জিকামালিঙ্গন্তীম্, মুহুঃ কপোল-ফলকেন কর্পূর-পুত্রি-কামাশ্লিষ্যন্তীম্, মুহুশ্চরণারবিন্দেন চন্দন-পঙ্ক-প্রতিযাতনামামৃশন্তীম্, স্তনসংক্রান্তে-নাত্মমুখেনাপি কুতূহলিনেব পরিবৃত্য বিলোক্যমানাম্, কর্ণপূরপল্লবেনাপি স্বপ্রতি-বিম্বপল্লবশায়িনা সোৎকণ্ঠেনেব চুম্ব্যমানকপোলফলকাম্। হারৈরপি মুক্তাত্মভির্মদন-পরবশৈরিব প্রসারিতকরৈরালিঙ্গ্যমানাম্"।

আবার অট্টালিকার উপর হইতে ক্রীড়া-পর্বতের শৃঙ্গে দণ্ডায়মান চন্দ্রাপীড়কে উপলক্ষ্য করিয়া কাদম্বরী যে দৈহিক ও মানসিক চপলতা দেখাইয়াছিল, তাহা হইতেও বাণের নারী-মনস্তত্ত্বের অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতামাতার নিকট হইতে মহাশ্বেতাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিবার ছল করিয়া কাদম্বরী অট্টালিকার উপরে উঠিল; সঙ্গে সামান্য কয়েকজন পরিজন। সেখানে কোনো পরিচারিকা তাহার মাথার উপর স্বর্ণদণ্ডের শ্বেতবর্ণের একটি ছাতা ধরিয়া আছে; চারজন পরিচারিকা চারটি শ্বেতচামর দোলাইয়া বাতাস করিতেছে; মাথার উপর উড়িতেছে পুষ্পগন্ধে আকুল চঞ্চল ভ্রমরের দল। ঠিক ওপারে ক্রীড়া-পর্বতের শৃঙ্গে উদ্যান-দর্শনের বাসনায় দাঁড়াইয়া চন্দ্রাপীড়। চন্দ্রাপীড় চাহিয়া আছে কাদম্বরীর দিকে, কাদম্বরী চাহে, আর চোখ ফিরায়। চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া আরম্ভ হইল কাদম্বরীর যৌবনলীলার লাস্য। যৌবন-লাস্যের নানাছন্দের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রাপীড়কে দেখিতেছে, আর নিজেকে দেখাইতেছে;

যেন আপন যৌবনের রাঙা জলের তরঙ্গ দিয়া চন্দ্রাপীড়ের মনের উপর সম্ভোগ-বাসনার রক্তাক্ত পিচ্‌কারি ছুড়িতেছে। চঞ্চলা কাদম্বরী ; চঞ্চল বাসনার রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক যেন যৌবনের পুষ্পিত প্রলাপের উপর লুটোপুটি খাইতেছে।

কখনও চামরের ঝুটিটা মুঠোয় পুরিতেছে, কখনও ছাতা কাড়িয়া লইতেছে, কখনও বা তমালিকার কাঁধে হাত দুইখানি রাখিতেছে, কখনও বা মদলেখাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতেছে, কখনও বা পরিজনদের আড়ালে লুকাইয়া কেবল অপাঙ্গ দিয়া চন্দ্রাপীড়কে দেখিতেছে ; কখনও বা চঞ্চলভাবে ঘুরিতে ফিরিতে স্রস্ত বসনের ফাঁক দিয়া ত্রিবলীর রেখা-তিনটির দিকে চন্দ্রাপীড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে ; কখনও বা প্রতিহারীর বেত্র-যষ্ঠির উপর নিজের কপোলখানি রাখিতেছে ; কখনও বা অধরের উপর তাম্বুল-বীটিকা ধরিয়া আছে ; কখনও বা কাণ হইতে একটি উৎপল তুলিয়া লইয়া কোন পরিচারিকাকে তাড়াইতে তাড়াইতে কয়েক পা তাহার পিছু ছুটিয়া হাসিতে হাসিতে ভাঙিয়া পড়িয়া চন্দ্রাপীড়কে দেখিতেছে।

অলঙ্কার-প্রয়োগে কবি বাণভট্টের বৈদগ্ধ্য

অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রাচীনত্বের কথা আমরা রীতির পরিচ্ছেদে যথা-সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। অলঙ্কৃত দরবারি সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় যে এককালে অলঙ্কারের বাণ ডাকিয়াছিল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। একদিকে সহৃদয় ও সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কারের ঘন ঘন চাষ, অন্যদিকে বিদগ্ধমণ্ডলীর বোধিবৃক্ষের তলায় বসিয়া জ্ঞানভিক্ষু কাব্যতত্ত্ব-বিদগণের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অতন্দ্রিত সাধনা। ইহার ফলে তত্ত্বে ও সাহিত্যে এককালে যে অলঙ্কার-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহা না হইলে কি নাট্যশাস্ত্রে ভরত-মুনি-উল্লিখিত চারিটি অলঙ্কার হইতে অপ্যয় দীক্ষিত পর্যন্ত অলঙ্কারের সংখ্যা ১২৪ হইতে পারিত? অলঙ্কৃত রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কাব্যে অলঙ্কারের যথাশক্তি পরিপাটী বিনিয়োগ। ইহার পশ্চাতে ছিল অভিজাত পাঠকরুচির জবরদস্তি। বাল্মীকির রামায়ণে ইহার উন্মেষ এবং পরবর্তী কবিগণের পালক-পিতৃত্বের স্নেহে ও যত্নে ইহার ক্রমাভিব্যক্তি। অশ্বঘোষ, ভাস ও কালিদাস যেমন ইহার একদিককার সাক্ষ্য, তেমনি দণ্ডী ও সুবন্ধু অন্য দিককার অর্থাৎ উপন্যাসের সাক্ষ্য। উপন্যাস গদ্যে রচিত। গদ্য পদ্যের মত ছন্দের বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ নয়। পদ্য সসীম, গদ্য অসীম। অসীম বলিয়া—ইহার চলা-ফেরার জায়গার উপর ১৪৪ ধারার কোন বিধিনিষেধ নাই। গদ্য কবিরা খুশিমত তাঁহাদের বাক্যকে সুদীর্ঘ করিতে পারেন এবং দীর্ঘপ্রসারী বাক্য-লতার মাঝে মাঝে কখনও বা ফুল ফুটাইয়া প্রজাপতি ডাকিয়া রঙ-বেরঙের রেণুর ধূলোটে মাতিতে পারেন, কখনও বা কচি কিসলয়ের উৎসব হানিয়া বনলক্ষ্মীর পায়ের আলতাটুকু মুছিয়া লন, কখনও বা তরুণী সুন্দরীদের ডাকিয়া কর্ণ-ভূষণের লোভ দেখান। ইহাতে তাঁহাদের অপরাধ নাই কারণ তাঁহাদের হাতে বে-ওয়ারিশ সময়। তাই তাঁহারা রহিয়া বসিয়া রসিকজনের রুচির কথা জানিয়া শব্দার্থ-শিল্পের নিখিল ভাস্কর্যটুকু রূপায়িত করিয়া তোলেন তাঁহাদের সৃষ্টির তাজমহলে। বাসনালোকের বিচিত্র অনুভূতিকে যথা-যোগ্য রঙে ও রেখায়, শব্দে ও সঙ্গীতে, স্পন্দনে ও নৃত্যে সৃষ্টির মধ্যে ঘনাইয়া তোলেন। তাঁহারা কাব্যসৃষ্টির পথে নামিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দেন না; তাঁহারা চলেন হাতীর পিঠে। নানাদিক দেখিয়া নানা গল্প বলিয়া, ৬৪ কলার কলানিপুণ পরিচয় দিয়া সামাজিক, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক

নানা তর্ক তুলিয়া সমাধান দিতে দিতে অতিমন্থর চালে তাহারা চলেন ; সোজাপথ তাঁহারা চান না। বাঁকাপথে তাঁহাদের যা কিছু প্রলোভন।

এই পথ বিনুনির পথ ; প্যাটার্ণ তুলিবার পথ। অলঙ্কার ভাষা-শিল্পের অন্যতম উপাদান। অলঙ্কারের আকর্ষণ সৌন্দর্য-সৃষ্টি। শাদা কথায় সে সৌন্দর্য কোথায় ? নেড়া কথায় ঘর-সংসারের কাজ চলিতে পারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে, ত্বরান্বিত দৈনিক দিনযাত্রার তড়িৎ-লেখা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাব-রাজ্যে প্রবেশের ভিসা, অহেতুক আনন্দলোকে প্রবেশের পাসপোর্ট তাহার দিবার সাধ্য নাই। তাহার জন্য চাই ভাবের ভাষা—অনুভূতির ভাষা। এ ভাষার রহস্য কোথায় ? অলঙ্কারে, গুণে, রীতিতে, না ধ্বনিতে ও রসে ? এই প্রশ্নের ফলিত রূপেই আমরা পাইয়াছি অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ ও রসবাদ। রসই কাব্যের আত্মা এবং অলঙ্কার রসের পরিপোষক। তাই অলঙ্কার থাকিয়াও নিসর্গ কাব্য হয় না এবং নিরলঙ্কারও উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে। অতএব রসের অনুভূতি যে কবির আছে, তাঁহার কাছেই আমরা অলঙ্কার-সৌন্দর্যের আশা করিতে পারি। আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইব গদ্য কবিগণের মধ্যে একা বাণভট্ট আমাদের সে আশা অনেকটা মিটাইয়াছেন।

বাণের সাহিত্য-খ্যাতির অব্যবহিত পূর্বে যিনি ভাষা-ভাস্কর্যের পীরামিড গাঁথিয়া তৎকালীন পাঠক-সমাজের নিঃশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন 'বাসবদত্তা'র মানস-পিতা সুবন্ধু। সুবন্ধু ও বাণের অলঙ্কার-বিনিয়োগের পার্থক্য অনেকখানি। অবশ্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন সুবন্ধু ও বাণ—একই ধারার কবি ; সুবন্ধু ও বাণের রীতিও এক। কিন্তু সুবন্ধুর যাহা ছিল না ও বাণের যাহা বহুল পরিমাণে ছিল—তাহা হইল কল্পনা-শক্তির অলৌকিকতা ও প্রতিভার লোকোত্তরতা। সুবন্ধুর কল্পনায় ছিল মাধ্যাকর্ষণের 'টানিয়া নামান', আর বাণের ছিল চাপশক্তির 'ঠেলিয়া তোলা'র স্বভাব। সুবন্ধুর কল্পনা মুক্ত বিহঙ্গের মত মাঝে মাঝে নীলাকাশের হাতছানিতে উড়িতে চেষ্টা করিলেও পায়ে-বাঁধা শিকলের টানে সে মাটির পৃথিবীতেই নামিয়া আসিতে বাধ্য হইত, কিন্তু বাণের কল্পনা মাটির পৃথিবীতে শুকনো ঝরাপাতায়-বাঁধা বাবুইয়ের বাসা হইতে উড়িয়া চলিত নীলাকাশের নীলাব্ধির ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে ; উড়িত, আর ফিরিত না। তবুও স্বীকার করি বাণ সাহিত্যের প্যাটার্ণে সুবন্ধুর নিকট ঋণী। কিন্তু ঋণ করিলেই সে মানুষ ছোট হইয়া যায়, একথা মনে করি না। অশ্বঘোষ বাল্মীকির

নিকট ঋণী, কালিদাস ভাসের নিকট ঋণী, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিকট ঋণী। তবে কি বলিব—ভাস কালিদাসের চাইতে বড় এবং কালিদাস রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ছোট? তাহা বলিব না। পৃথিবীতে যাহা ভাল, তাহা চিরকালই থাকে এবং নানান্ কালের নানান্ গুণী সেই ভালটুকু লইয়া আবার নূতন সৃষ্টির পত্তন করেন।

সুবন্ধুর বাসব-দত্তায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি চোখে পড়ে;—শ্লেষ, বিরোধ, পরিসংখ্যা, মালাদীপক, উৎপ্রেক্ষা, যমক, প্রৌঢ়োক্তি, রূপকাতিশয়োক্তি, অক্রমাতিশয়োক্তি, ভেদকাতিশয়োক্তি, সম্বন্ধাতিশয়োক্তি, কাব্যলিঙ্গ, মিলিত, অনুপ্রাস, সম, বিধি, কারণমালা, উদাত্ত, কৈতবাপহ্নুতি, লোকোক্তি ও স্বভাবোক্তি। কী পদ্যে, কী গদ্যে—শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, শ্লেষ ও যমকের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় নাই, এমন কবি নাই। অর্থালঙ্কারের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। সুবন্ধু তাঁহার কাব্যের ভূমিকায়—"প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রবন্ধ-বিন্যাস-বৈদগ্ধ্য-নিধিঃ"—বলিয়া শ্লেষ-নিপুণতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্লেষের একটু নমুনা; "বানরসেনাম্ ইব সুগ্রীবাঙ্গদোপশোভিতাম্।" বাণের শ্লেষ সাধারণতঃ একাকী নিঃসহায়ভাবে বিচরণ করে নাই। অন্য অলঙ্কারের সহিত মিলিত হইয়া সে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে ফল হইয়াছে এই, বুদ্ধি-সর্বস্ব শ্লেষ অপরের সৌন্দর্যে স্নান করিয়া যেমন ইহার কাঠিন্য হারাইয়াছে, তেমনি প্রতিবেশী অলঙ্কারের কমণীয় সৌন্দর্যের মধ্যে আপনার দীপ্তি হানিয়া তাহার মাধুর্য অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে। বাণের এইরূপ শ্লেষের একটি দৃষ্টান্ত শ্লেষ-সঙ্কীর্ণা শাব্দী ও আর্থী পরিসংখ্যা অলঙ্কার। 'পরিসংখ্যা' অলঙ্কারের পরিচয়স্থলে ইহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। শুধু পরিসংখ্যা নয়, বিরোধ, বিরোধাভাস, পূর্ণোপমা, সহোক্তি প্রভৃতি বহু অলঙ্কার শ্লেষের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ। সুবন্ধুর যমকের নমুনা—"আন্দোলিতকুসুমকেসরেকেশরেণুমুষিরণিতমধুরমণীনাং রমণীনাং বিকচ-কুমুদাকরে মুদাকরে।" বাণের যমক—যেমন অগস্ত্যাশ্রম বর্ণনায়—"যত্র চ···দশবদনলক্ষ্মী-বিভ্রম-বিরামো রামো···।" সুবন্ধুর অনুপ্রাসের নমুনা—"মদকল-কলহংস-সারস-রসিতোদ্ভ্রান্ত-ভাহকূটবিকট-পুচ্ছচ্ছটা-ব্যাধূত-বিকচ-কমলখণ্ড-বিগলিত-মকরন্দ-বিন্দু সন্দোহ-সুরভিত সলিলয়া···উপকূল-সঞ্জাত-নল-নিকুঞ্জ-পুঞ্জিত-কুলায়-কুক্কুট-ঘটা-ঘুৎকার-ভৈরবতীরয়া।"

বাণের অনুপ্রাস, যেমন পম্পাসরোবর বর্ণনায়—"অনেক-জলচর-পতঙ্গ-শত-সঞ্চলন-চলিত-বাচাল-বীচিমালম্"। সুবন্ধুর কাব্যলিঙ্গ—"খলঃ পুনঃ তদ্ অনিষ্টমনুচিতমেবাবধারয়ন্ত্যা অনিষ্টোদ্ভাবনরসোত্তরং হি খল-হৃদয়ম্"; বাণের কাব্যলিঙ্গ

যেমন,—চন্দ্রাপীড়ের উজ্জয়িনী-প্রস্থান নিবন্ধে—"ন খলু দেবীং প্রতি প্রবল-লজ্জাতিভার-মন্থরং মে হৃদয়ং যথা মহাশ্বেতাং প্রতি। নিয়তমেনামলীকাধ্যারোপণ-বর্ণিতাস্মদ্‌গুণসম্ভারামস্থানপক্ষপাতিনীমসকৃদুপালপ্স্যতে দেবী।" সুবন্ধুর বিরোধ-অলঙ্কারের নমুনা—"অগ্রহেনাপি কাব্য-জীবজ্ঞেন"; বাণের, যেমন বিন্ধ্যাটবী বর্ণনায়—"অপরিমিত-বহুল-পত্র-সঞ্চয়াপি সপ্তপর্ণভূষিতা, ক্রূরসত্ত্বাপি মুনিজনসেবিতা, পুষ্পবত্যাপি পবিত্রা বিন্ধ্যাটবী নাম।" সুবন্ধুর পরিসংখ্যা—"নেত্রোৎপাটনং মুনীনাম্"; বাণের যেমন,—উজ্জয়িনী বর্ণনায়,—"যস্যাঞ্চানিবৃত্তিঃ মণি-দীপানাম্, তরলতা হারলতানাম্, অস্থিতিঃ সঙ্গীত-মুরজ ধ্বনীনাম্, দ্বন্দ্ববিয়োগশ্চক্রনাম্নাম্, বর্ণ-পরীক্ষা কনকানাম্, অস্থিরত্বং ধ্বজানাম্, মিত্রদ্বেষঃ কুমুদানাম্, কোষগুপ্তি-রসীনাম্।" সুবন্ধুর স্বভাবোক্তি—

"পশ্চোদঞ্চদবাঞ্চদঞ্চিতবপুঃ পশ্চার্দ্ধপূর্বার্দ্ধভাক্
স্তব্ধোত্তানিতপৃষ্ঠনিষ্ঠিতমনাগ্‌ভুগ্নাগ্রলাঙ্গুলভৃৎ।
দংষ্ট্রা কোটিবিশঙ্কটাস্যকুহরঃ কুর্বন্ সটামুৎকটা
-মুৎকর্ণঃ কুরুতে ক্রমং করিপতৌ ক্রূরাকৃতিঃ কেসরী॥

বাণের স্বভাবোক্তি, যেমন—অনপত্যতাবিষাদে—

"কদা অন্তঃপুরিকা-নূপুর-নিনাদ-সঙ্গতান্ গৃহকলহংসকান্ অনুসরন্ কক্ষান্তর-প্রধাবিতঃ কনক-মেখলা-ঘণ্টিকা-রবানুসারিণীমায়াসয়িষ্যতি ধাত্রীম্।"

আর কত বলিব? ইহা হইতেই পাঠক উভয়ের শক্তির তারতম্য বুঝিয়া লইবেন। আমরা এখন বাণের অলঙ্কার-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের গোপন কথাটি আমাদের সাধ্য অনুসারে প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। পৃথিবীতে দেখা যায়, সকল মানুষের আকৃতি সমান মাপের নহে; কেহ শালপ্রাংশু, কেহ বামন, কেহবা মধ্যপ্রমাণ। কেবল আকৃতিতে নয়, শক্তিতেও এই তারতম্য। প্রাণের প্রাণায়ামও সকলের সমান নয়। বাণের ছিল প্রাণের প্রাচুর্য; তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দীর্ঘতা ছিল রুদ্রের নিশ্বাসের মত। আমাদের ক্ষীণতর শ্বাস-প্রশ্বাসের অল্প-প্রাণ বায়ুর আগমন ও নির্গমনের কথা আমরাই উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু রুদ্রের নিঃশ্বাস যখন কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝারূপে পৃথিবীর বুক কাঁপাইয়া প্রলয়নাচন নাচিতে থাকে, তখন তাহার আবির্ভাবের সংবাদ কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া দিতে হয় না। বাণের প্রাণায়াম, বাণের শ্বাস-প্রশ্বাস এমনি দীর্ঘায়িত ছিল বলিয়া তাহার বাক্যেরও এমনি দীর্ঘতা। পাতার উপর পাতা জুড়িয়া তাহার একটি পদক্ষেপ। তাহার জন্য তাহাকে নিন্দা করিতে যাঁহারা পঞ্চমুখ

হইয়াছেন, তাঁহাদের ডাকিয়া বলিতে চাহি,—কবির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য মাপিয়া দেখুন। কেবল বাক্যের দীর্ঘতায় নহে, ভাবের অভিব্যঞ্জনায়, অনুভূতির ইন্দ্রধনুচ্ছটায় তাহার ব্যক্তিত্বের—কবি-পুরুষের-অপরিমেয়তা ভাবিয়া দেখুন। অলঙ্কার-বিন্যাসেও ঐ একই কথা। তাঁহার অলঙ্কার কচিৎ কদাচিৎ একাকী। সর্বত্রই সে বাহিনী লইয়া চলে। তাঁহার অলঙ্কার-শিল্পের গুহাহিত তত্ত্ব—'সর্বসাধ্যসার' সঙ্কর ও সংসৃষ্টি অলঙ্কারের মধ্যে। রচনার ছত্রে ছত্রে সঙ্কর অলঙ্কারের মণিদীপ্তি। সঙ্কর অলঙ্কারে দুই-অলঙ্কারের যৌথনির্মিতি; ক্ষীর-নীর ন্যায়, দুইয়ে মিশে এক হওয়া, একের জন্য অপরের অপেক্ষা। সংসৃষ্টিতে তিলতণ্ডুল ন্যায়; পরস্পরের অপেক্ষা না রাখা; বহুর স্বাধীন মিলন। একই ভাবের সৌন্দর্য-বিন্যাসে একাধিক অলঙ্কারের সুযোগ দিয়া তিনি সৌন্দর্যের এমনি এক জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, যাহাকে রসের ভাষায় বলিব অনির্বচনীয়তা। দীঘার সমুদ্র অপেক্ষা পুরীর সমুদ্র ভাল কেন? দীঘার সমুদ্র শান্ত ভাল মানুষটির মত; পুরীর সমুদ্র মাতাল উর্বশীর নৃত্য। তার স্রোত ও অবস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে জাগে নিরবচ্ছিন্ন ফেনভঙ্গ, জাগে গতির তাণ্ডব, জাগে গর্জন, জাগে রূপের উপর রূপের অপ্রকৃতিস্থ তরঙ্গ, জাগে পাগল, জাগে দিশেহারার দিগ্‌ভ্রান্তি। এ যে কী, তাহা যে দেখিয়াছে, সেই জানে। জানে—এ বচনের অতীত, ভাষার অতীত;—কেবল ভাবের অনির্বচনীয়তা। বাণ তাঁহার পদাবলীতে সংসৃষ্টি সঙ্কর-অলঙ্কারের দ্যোতনায় ভাবের এই অনির্বচনীয়তা আনিয়া দিয়াছেন; ফেনাইয়া তুলিয়াছেন পাঠকের চিত্তলোকে এক নিদারুণ সংক্ষোভ; জটিলতার পাকে পাকে ঝরাইয়া দিয়াছেন নিপীড়িত দ্রাক্ষার মাধুর্য। এ এক অদ্ভুত প্যাটার্ণ। নানা রূপের নানা কাজের ঠাসবুনানি। সঙ্কর ও সংসৃষ্টি তো বাণের সৃষ্টি নয়, তবে কেন এতো জয়গান? সকল কবিই সঙ্কর-সংসৃষ্টির জন্য কিছু কিছু স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন, একথা মানি, কিন্তু সঙ্কর-সংসৃষ্টি দিয়া এমনিভাবে কাব্যের বিশেষ প্যাটার্ন তুলিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এই নূতন প্যাটার্ণটি যে কেবল তাহার হাতে উঠিয়াছে, তাহা নহে, এই পাটার্ণটি তাঁহার মনেও ছিল। অন্য কবির সহিত বাণের পার্থক্য হইল এই, এই প্যাটার্ণের কথা অন্য কাহারো কখনও মনে পড়ে নাই; পড়িলে সৃষ্টিতে তাহার স্বাক্ষর থাকিত। আগে, সংসৃষ্টির উদাহরণ ধরা যাক;—

(১) সংসৃষ্টি—ভ্রান্তিমান্, অতিশয়োক্তি, ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা ও গুণোৎপ্রেক্ষা;

"যস্যাঞ্চানুপজাত-তিমিরত্বাদবিঘটিত-চক্রবাক-মিথুনা ব্যর্থীকৃত-

স্মরতপ্রদীপাঃ সঞ্জাত-মদনানল-দিগ্‌দাহা ইব যান্তি কামিনীনাং
ভূষণ-প্রভাভির্বালাতপ-পিঞ্জরা ইব রজন্যঃ।" —(উজ্জয়িনী বর্ণনা)

(২) সংসৃষ্টি—নিরঙ্গ কেবল রূপক, ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা ও সভঙ্গশ্লেষ ;

"স্তনযুগমশ্রুস্নাতং সমীপতরবর্তি হৃদয়-শোকাগ্নেঃ।
চরিত বিমুক্তহারং ব্রতমিব ভবতো রিপুস্ত্রীণাম্॥ (শুকপ্রশংসা)

সঙ্কর ঃ—ভ্রান্তিমান্ ও উৎপ্রেক্ষা ;

(১) "অতিচপল-রাজলক্ষ্মীবন্ধন-নিগড়-শঙ্কামুপজনয়তেন্দ্রনীলকেয়ূরযুগলেন মলয়জরস-গন্ধলুব্ধেন ভুজঙ্গদ্বয়েনেব বেষ্টিতবাহুযুগলম্" (শূদ্রকবর্ণনা)

(২) অতিশয়োক্তি ও উপমা ;

"কুপিতহরহুতাশন-দহ্যমানমদন-ধূম-মলিনীকৃতামিব রতিম্"
(চণ্ডালকন্যা বর্ণনা)

(৩) স্মরণ ও অতিশয়োক্তি ;

"অধুনাপি যত্র জলধরসময়ে গম্ভীরমভিনব-জলধর-নিবহ-নিনাদমাকর্ণ্য ভগবতো রামস্য ত্রিভুবন-বিবর-ব্যাপিনশ্চাপঘোষস্য স্মরন্তো ন গৃহ্নন্তি শষ্প-কবল-মজস্রমশ্রু-জললুলিতদীনদৃষ্টয়ো বীক্ষ্যশূন্যা দশদিশো জরাজর্জরিত-বিষাণ-কোটয়ো জানকী-সংবর্ধিতা জীর্ণমৃগাঃ" (অগস্ত্যাশ্রম বর্ণনা) .

(৪) সমাসোক্তি ও হেতূৎপ্রেক্ষা ;

"পুরাতনতয়া পতনভয়াদিব—গগনস্কন্ধলগ্নঃ" —(শাল্মলীতরু বর্ণনা)

(৫) পুনরুক্তবদাভাস ও উপমা ;

"অতিবহল--পিণ্ডালক্তক--রস -রাগ--পল্লবিত--পাদপঙ্কজাম্, অচির- মৃদিত-মহিষাসুর-রুধির-রক্ত-চরণামিব কাত্যায়নীম্"
—(চণ্ডালকন্যা বর্ণনা)

(৬) ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা ও কাব্যলিঙ্গ ;

"চিরশূন্যেঽদ্যাপি যত্র শাখা-নিলীন-নিভৃত-পাণ্ডু-কপোত-পঙ্‌ক্তয়ো লগ্ন-তাপসাগ্নিহোত্র-ধূমরাজয় ইব লক্ষ্যন্তে তরবঃ।"
—(অগস্ত্যাশ্রম বর্ণনা)

(৭) বাচ্যক্রিয়োৎপ্রেক্ষা ও লুপ্তোপমা ;

"সরভস-প্রচলিত-সামন্তশত-চরণতলাভিহতস্য চাস্থানমণ্ডপস্য নির্ঘোষ-গম্ভীরেণ কম্পয়তেব বসুমতীং ধ্বনিনা,"
—(শূদ্রক সভাভঙ্গ)

(৮) রূপক ও উৎপেক্ষা ;

"আসন্নবর্তিনীভিঃ সেবার্থমাগতাভিরিব দিগ্বধূভির্বারবিলাসিনীভিঃ পরিবৃতম্," —(শূদ্রক বর্ণনা)

এবার উৎপ্রেক্ষার কথা বলি। উৎপ্রেক্ষা তো অনেক কবিই ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু একই উৎপ্রেক্ষার নানা বৈচিত্র্য দিয়া—ক্রিয়া, দ্রব্য, জাতি, গুণ প্রভৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভেদের যুগপৎ সংঘাত হানিয়া—বেগ সঞ্চারিত করিয়া সাহিত্য-পুষ্পের স্তবক বাঁধিতে কি কাহাকেও দেখিয়াছেন? দেখুন উৎপ্রেক্ষার স্তবক—উৎপ্রেক্ষার মঞ্জরীগুচ্ছ! যেন নব বসন্তের ইশারায় সাহিত্যসহকারের ডালে ডালে মৌমাছির গুঞ্জনভরা গুচ্ছ গুচ্ছ আম্রমঞ্জরী ; নানা অবয়বের, নানা ভঙ্গীর, নানা শিল্পের, নানা সৌন্দর্যের।

"অঙ্গৈরেব ধবলয়ন্তী কৈলাস-গিরিম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা), অন্তর্দ্রষ্টুরপি লোচনপথ-প্রবিষ্টেণ শ্বেতিমানমিব মনো নয়ন্তীম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা), অতিধবল-প্রভা-পরিগত-দেহতয়া স্ফটিকগৃহগতামিব দুগ্ধসলিলমগ্নামিব বিমলচীনাংশুকান্তরিতামিব আদর্শ-তলসংক্রান্তামিব শরদভ্রপটল-তিরস্কৃতামিব অপরিস্ফুট-বিভাব্যমানাবয়বাম্ (পাঁচটি ক্রিয়োৎপ্রেক্ষার সঙ্কর), পঞ্চমহাভূতময়মপহায় দ্রব্যাত্মকমঙ্গনিষ্পাদনোপকরণ-কলাপং ধবলগুণেনৈব কেবলেনোৎপাদিতাম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা), দক্ষাধ্বর-ক্রিয়ামি-বোদ্ধত-গণ-কচগ্রহ-ভয়োপসেবিতত্র্যম্বকাম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা), নিরন্তরভস্মোদ্ধূলন-সিতাঙ্গীং রতিমিব মদন-দেহনিমিত্তং হরপ্রসাদনার্থমাগৃহীতহারারাধনাম্ (দ্রব্যোৎ-প্রেক্ষা), ক্ষীরোদাধিদেবতামিব সহবাস-পরিচিত-হর-চন্দ্রলেখোৎকণ্ঠাকৃষ্টাম্ (দ্রব্যোৎ-প্রেক্ষা), ইন্দুমূর্তিমিব স্বর্ভানু-ভয়-কৃত-ত্রিনয়ন-শরণ-গমনাম্ (দ্রব্যোৎপ্রেক্ষা), ঐরাবত-দেহচ্ছবিমিব গজাজিনাবগুণ্ঠনোৎকণ্ঠিত-শিতিকণ্ঠচিন্তিতোপনতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), পশুপতিদক্ষিণ-মুখহাসচ্ছবিমিব বহিরাগত্য কৃতাবস্থানাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), শরীরি-নীমিব রুদ্রোদ্ধূলন-ভূতিম্ আবির্ভূতাম্ (জাত্যুৎপ্রেক্ষা), জ্যোৎস্নামিব হরকণ্ঠান্ধ-কারবিঘট্টনোদ্যম-প্রাপ্তাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), গৌরীমনঃশুদ্ধিমিব কৃত দেহপরি-গ্রহাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), কার্তিকেয়-কৌমার-ব্রত-ক্রিয়ামিব মূর্তিমতীম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা), গিরীশ-বৃষভ-দেহদ্যুতিমিব পৃথগবস্থিতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), আয়তন-তরু-কুসুম-সমৃদ্ধিমিব শঙ্করাভ্যর্চ্চনায় স্বয়মুদ্যতাম্ (জাত্যুৎপ্রেক্ষা), পিতা-মহতপঃসিদ্ধিমিব মহীতলমবতীর্ণাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), আদিযুগপ্রজাপতি-কীর্তিমিব সপ্তলোক-ভ্রমণ-খেদ-বিশ্রান্তাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), ত্রয়ীমিব কলি-যুগ-ধ্বস্ত-ধর্ম-শোক-গৃহীত-বনবাসাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), আগামি-কৃতযুগবীজকলামিব প্রমদা-

রূপেণাবস্থিতাম্ (জাত্যুৎপ্রেক্ষা), দেহবতীমিব মুনিজন-ধ্যানসম্পদম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), অমরগজ-বীথিমিবাভ্রগঙ্গাভ্যাগম-বেগপতিতাম্ (জাত্যুৎপ্রেক্ষা), কৈলাসশ্রিয়মিব দশমুখোন্মূলন-ক্ষোভ-নিপতিতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), শ্বেত-দ্বীপ-লক্ষ্মীমিবান্যদ্বীপাবলোকন-কুতূহলাগতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), কাশকুসুম-বিকাশ-কান্তিমিব শরৎসময়মুদীক্ষমাণাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), শেষ-শরীরচ্ছায়ামিব রসাতলমপহায় নির্গতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), মুষলায়ুধদেহপ্রভামিব মধুমদবিঘূর্ণনায়াস-বিগলিতাম্ (গুণোৎপ্রেক্ষা), শুক্লপক্ষ-পরম্পরামিব পুঞ্জীকৃতাম্ (জাত্যুৎপ্রেক্ষা), সর্বহংসৈরিব ধবলতয়া কৃতসংবিভাগাম্ (ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা)।

ইহার পর পরিসংখ্যা অলঙ্কারের গঙ্গাবতার দেখুন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ লাফাইয়া পড়িয়া জড়াজড়ি করিয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে যেন এক অজানার উদ্দেশে ছুটিয়াছে। এ স্রোতের যেন বিরাম নাই, শেষ নাই। ইহার উচ্ছল জলচ্ছটা যেন পাঠকের চোখেমুখে আসিয়া পড়ে। বাণের শ্রেষ্ঠনিপুণতা এই অলঙ্কারের বিন্যাসে। ইহাতে গদ্যছন্দের ভাস্কর্য আছে, ছোটবড় পর্বের ওঠানামায় এক অপূর্ব সঙ্গীত বাজিয়া ওঠে।

শ্লেষসঙ্কীর্ণা শাব্দী পরিসংখ্যা ঃ

"যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু ন চরিতেষু, মুখরাগঃ শুকেষু ন কোপেষু, তীক্ষ্ণতা কশাগ্রেষু ন স্বভাবেষু, চঞ্চলতা কদলীদলেষু ন মনঃসু, চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু ন পরকলত্রেষু, কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু ন সুরতেষু, মেখলাবন্ধো ব্রতেষু নের্ষ্যাকলহেষু; স্তনস্পর্শো হোমধেনুষু ন বনিতাসু, পক্ষপাতঃ কৃকবাকুষু ন বিদ্যাবিবাদেষু, ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু ন শাস্ত্রেষু, বসুসঙ্কীর্তনং দিব্যকথাসু ন তৃষ্ণাসু, গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু ন শরীরেষু, মুনিবালনাশঃ ক্রতুদীক্ষয়া ন মৃত্যুনা, রামানুরাগো রামায়ণেন ন যৌবনেন, মুখভঙ্গবিকারো জরয়া ন ধনাভিমানেন।" —জাবালাশ্রমবর্ণনা

ইহা কেবল শব্দকল্লোল নয়,পর্বের পর পর্বের ওঠানামার সঙ্গীত-তরঙ্গ নয়, ইহা জীবন-দর্শনের চলচ্চিত্র। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের নানা অনুভূতির ছবি। ছবিগুলি ভাসে জোড়ায় জোড়ায়। সেই মাণিকজোড়ের মধ্যেও আর্যীকরণের মনোবৃত্তিটি স্পষ্ট। ভাবটি এইরূপ ;—

"তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস ? আমিই বা-কারে ? বল্ দেখি, পাখী, কারে ? যে সুন্দর, তাকেই ডাকি ; যে ভাল তাকেই ডাকি।"

—কমলাকান্তের দপ্তর

শ্লেষ-সঙ্কীর্ণা আর্থী পরিসংখ্যা ঃ

"যস্মিংশ্চ রাজনি গিরীণাং বিপক্ষতা, প্রত্যয়ানাং পরত্বম্, দর্পণানামভিমুখাবস্থানম্, শূলপাণি-প্রতিমানাং দুর্গাশ্লেষঃ, জলধারাণাং চাপধারণম্, প্রতীহারাণামসিধারণম্, তৈক্ষ্ণ্যমসিধারাণাম্, ধ্বজানামুন্নতিঃ, ধনুষামবনতিঃ, বংশানাং শিলীমুখক্ষতিঃ, দেবতানাং যাত্রা, কুসুমানাং বন্ধনস্থিতিঃ, ইন্দ্রিয়ানাং নিগ্রহঃ, বনকরিণাং বারিপ্রবেশঃ, ব্রতীনামগ্নিধারণম্, গ্রহাণাং তুলারোহণম্, অগস্ত্যোদয়ে বিষশুদ্ধিঃ, কেশনখানামায়তিভঙ্গঃ, জলধরদিবসানাং মলিনাম্বরত্বম্, রত্নোৎপলানাং ভেদঃ, মুনীনাং যোগসাধনম্, কুমারস্তুতিষু তারকোদ্ধরণম্, উষ্ণরশ্মৌ গ্রহণাশঙ্কা, শশিনো জ্যেষ্ঠাতিক্রমঃ, মহাভারতে দুঃশাসনাপরাধাকর্ণনম্, বয়ঃপরিণামে দণ্ডগ্রহণম্, অসিপরিবারেষু কলঙ্কযোগঃ, কামিনীকুচপত্রভঙ্গেষু বক্রতা, করিণাং দানবিচ্ছিত্তিঃ, অক্ষক্রীড়াসু শূন্যগৃহদর্শনম্।" —তারাপীড় বর্ণনা

কেবলমাত্র পূর্ণোপমায় মালা গাঁথার শিল্পটি দেখুন !

পূর্ণোপমা ঃ

"ইন্দ্রায়ুধৈরিব ঘনাবস্থানৈঃ, কুমুদৈরিবাদত্ত-দিনকর-প্রবেশশিশিরাভ্যন্তরৈঃ, দাশরথিবলৈরিবাঞ্জন-নীল-নল-পরিগত-প্রান্তৈঃ, প্রাসাদৈরিব সপারাবতৈঃ, ভবনতাপসৈরিব সন্নিহিতবেত্রাসনৈঃ, রুদ্রৈরিব নাগলতা-বদ্ধ-পরিকরৈঃ, উদধিকূল-পুলিনৈরিব নিরন্তরোদ্ভিন্ন-প্রবাল-লতাঙ্কুর-জালকৈঃ, অভিষেক-সলিলৈরিব সর্বৌষধি-কুসুম-ফল-কিশলয়-সনাথৈঃ, আলেখ্যগৃহৈরিব বহুবর্ণ-চিত্র-পত্র-শকুনিশত-শোভিতৈঃ, কুরুভিরিব ভারদ্বাজোপসেবিতৈঃ, মহাসমরমুখৈরিব পুন্নাগ-সমাকৃষ্ট-শিলীমুখৈঃ, মহাকরিভিরিব প্রলম্ব-বাল-পল্লব-স্পৃষ্টভূতলৈঃ, অপ্রমত্ত-পার্থিবৈরিব পর্যন্তাবস্থিত-বহুগুল্মকৈঃ, দংশিতৈরিব ভ্রমর-সঙ্ঘাত-কবচাবৃতকায়ৈঃ, প্রমাণাভিমুখৈরিব বানর-করাঙ্গুলি-স্পৃষ্টগুঞ্জৈঃ, অবনিপাল-শয়নৈরিব হসিংহপাদাঙ্কিতলৈঃ, আরব্ধপঞ্চতপঃক্রিয়ৈরিবোচ্ছিখ-শিখিমণ্ডল-পরিবৃতৈঃ, দীক্ষিতৈরিব কৃতকৃষ্ণসার-বিষাণ-কণ্ডূয়নৈঃ-জরদ্গৃহমুনিভিরিব জটাল-বালক-মণ্ডলধরৈঃ ইন্দ্রজালিকৈরিব দৃষ্টিহারিভিঃ" —(শিব-সিদ্ধায়তন বর্ণনা)

এইবার কেবলমাত্র বৃত্ত্যনুপ্রাসের মালাটি দেখুন। ইহাতে কেবল গুম্ফন-শিল্পের নিক্কন শোনা যায় না, সেই মঞ্জুল মঞ্জীরধ্বনির শব্দ-চিত্রে জাগে পশুপক্ষি-পতঙ্গসম্ভৃত আনন্দমুখর এক আরণ্যপ্রকৃতি।

বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ

"অচকিত-চকোর-চঞ্চু-চুম্বিত-মরিচাঙ্কুরৈঃ, চম্পক-পরাগ-পুঞ্জ-পিঞ্জর-কপিঞ্জল-জগ্ধপিপ্পলীফলৈঃ, ফলভরনিকর-নিপীড়িত-দাড়িম-নীড়-প্রসূত-কলবিঙ্কৈঃ, প্রক্রীড়িত-কপিকুল-করতল-তাড়ন-তরলিত-তাড়ীপুটৈঃ, অন্যোন্য-কলহ-কুপিত-কপোত-পোত-পক্ষপালী-পাতিত-কুসুমৈঃ, কুসুম-রজোরাশি-শার-সারিকাশ্রিত-শিখরৈঃ, শুক-শত-মুখ-নখ-শিখর-শকলিত-ফলস্ফীতৈঃ, জলধর-জললুব্ধ-বিপ্রলব্ধ-মুগ্ধ-চাতক-ধ্বনি-মুখরিত-তমালষণ্ডৈঃ, ইভকলভকোল্লূন-পল্লব-বেল্লিত-লবলী-বলয়ৈঃ, আলীয়মান-নব-যৌবন-মদমত্ত-পারাবত-পক্ষক্ষেপ-পর্যস্ত-কুসুমস্তবকৈঃ,"

—(শিব-সিদ্ধায়তন বর্ণনা)

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা হইতে একথা কি প্রতিপন্ন হয় নাই যে বাণের অলঙ্কার-শিল্পের চেতনা অনন্য-সাধারণ। পরিশ্রম করিয়া যে শিল্প শেখে, তাহাকে বলে, 'দক্ষ', 'ওস্তাদ', 'expert', আর যাহার শিল্প শিল্পীর জীবনাবেগের একটি মাত্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, যাহাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের পরিভাষায় বলছে যে 'অযত্ননির্বত্যতা', তিনি প্রতিভাধর। আচার্য মম্মট কাব্য-কৃতির কারণ-রূপে যে শক্তিত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বাণভট্ট তাহার জীবন্ত উদাহরণ। বোধ হয় সংস্কৃত-সাহিত্যের যুগে এতবড় প্রতিভা কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। একাধারে কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, জীবন-পর্যবেক্ষণ, ভূয়োদর্শন, চৌষট্টিকলায় নিপুণতা বেদ-পুরাণ-ইতিহাস-ভূগোল-রসায়ন-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা, বৈদিক-পৌরাণিক ও লৌকিক আচারের অভিজ্ঞতা, কিম্বদন্তীতে অনুস্যূত বৃহত্তম ভারতের লোকজীবনের মর্মগ্রাহিতা, লোককথার নখদর্পণতা প্রভৃতি বাণের কবি-পুরুষের মধ্যে যেমন যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছিল, এমনটি আর কাহারও মধ্যে হয় নাই। কবি-হিসাবে কালিদাস বাণের অপেক্ষা অনেক বড়, কিন্তু সর্ব-বিদ্যার সমানুপাতিক যুগপৎ উপস্থিতি যেমন বাণের মধ্যে ছিল, কালিদাসের মধ্যে তাহা ছিল না। বাণ তাঁহার বৃহত্তর জগতের জ্ঞান—কাল-পরম্পরা প্রবাহিত ধারার জ্ঞান, সিদ্ধ ও সাধ্যজ্ঞান—সকল জ্ঞানের মিলিত দ্যোতনা লইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অলঙ্কার-সৃষ্টিতে কেবল দক্ষতার কারিগরি নাই, প্রতিভার প্রকাশ আছে। যাঁহারা Expert, যাঁহারা হাতে-কলমে শিখিয়া দক্ষ হইয়াছেন, তাঁহারা যে-কোন জিনিস লইয়া যে-কোন অলঙ্কার ফলাইতে পারেন, কিন্তু তাহা কখনও কালজয়ী হয় না। কালজয়ী হইতে হইলে সেই দক্ষতার সহিত অপূর্ব-নির্মিতির, সেই প্রতিভার স্ফূরণ থাকা চাই। বাণের

তাহা ছিল বলিয়া তাহার অলঙ্কার কোথাও নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাহা জীবন-বৈচিত্র্যের এক বিশেষ অনুভূতির জীবন্ত শিল্প হইয়া দেখা দিয়াছে। তাহার অলঙ্কারের চকিতদীপ্তির মধ্যে যেন বিশ্বজীবনের পশুপক্ষী-মানুষ-তরুলতার রাষ্ট্র-সমাজ-ব্যক্তির বেদাচার-পুরাণাচার-লোকাচারের অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর—এক কথায় বিরাটবিপুল অখণ্ড জীবনের যেন ঠেলাঠেলি; কে আগে ঢুকিবে যেন তাহারই প্রতিযোগিতা। তাই তাঁহার অলঙ্কারের শিল্পো-পন্যাসের মধ্যে জীবনের ফেনিলতা—লাবণ্যের আকুলতা। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে দেখিব, সকলই যে চলিয়া যায়! বিশ্বজীবনচেতনার এই 'চলিয়া যাইবার-ভাসিয়া যাইবার' ঔৎসুক্য-ভরা শিল্পলাবণ্যটি তৈয়ারী বলিয়া বাণের অলঙ্কারের এমন সজীবতা।

আরও কয়েকটি অলঙ্কার :—

উপমা : প্রভাতবর্ণনা—

"একদা তু প্রভাত-সন্ধ্যারাগ-লোহিতে গগনে চ কমলিনী-মধুরক্ত-পক্ষসম্পুটে বৃদ্ধহংস ইব মন্দাকিনী-পুলিনাদপর-জলনিধিতটমবতরতি চন্দ্রমসি"

লুপ্তোপমা : শুকোৎপত্তি—

"প্রহত-হরিণ-রুধিরানুরক্ত-শার্দূলনখকোটিপাটলেন চঞ্চুপুটেন"

মালোপমা : জাবালিবর্ণনা—

"অত্যুগ্রতপোভির্ভুবনমিব সাগরৈঃ, কনকগিরিমিব কুলাচলৈঃ, ক্রতুমিব বৈতানবহ্নিভিঃ, কল্পান্তদিবসমিব রবিভিঃ কালমিব কল্পৈঃ সমন্তান্মহর্ষিভিঃ পরিবৃতম্,"

শ্লেষাশ্রিত পূর্ণোপমা : বিন্ধ্যাটবীবর্ণনা—

"প্রেতাধিপনগরীব সদাসন্নিহিত-মৃত্যুভীষণা মহিষাধিষ্ঠিতা চ, সমরোদ্যত-পতাকিনীব বাণাসনারোপিত-শিলীমুখা বিমুক্ত-সিংহনাদা চ, কাত্যায়নীব প্রচলিত-খড়্গভীষণা রক্তচন্দনালঙ্কৃতা চ, কর্ণীসুতকথেব সন্নিহিত-বিপুলাচলা শশোপগতা চ, কল্পান্তপ্রদোষসন্ধ্যেব প্রনৃত্যন্নীলকণ্ঠা পল্লবারুণা চ, অমৃতমন্থনবেলেব শ্রীদ্রুমোপ-শোভিতা বারুণী-পরিগতা চ,"

গুণসাম্য ও ক্রিয়াসাম্যের ন্যায় শব্দসাম্যও উপমার প্রযোজক। এখানে বাণ যাহাদের উপমানরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন, তাহারা বৃহৎকথা, রামায়ণকথা

ও মহাভারতকথার প্রসিদ্ধির জ্ঞাপক। এগুলি হইতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক অনুষ্ঠানেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বাক্যার্থোপমা, ব্যঙ্গতোপমা প্রভৃতি আরও অনেক উপমার দৃষ্টান্ত আছে কাদম্বরীতে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

পরম্পরিতরূপক ঃ প্রভাতবর্ণনা—

"সমুৎসার্যমানে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে"

একদেশবিবর্তি রূপক ঃ প্রদোষবর্ণনা—

"ক্রমেণ চ প্রতীচীকর্ণপুর-রক্তোৎপলে লোকান্তমুপগতে ভগবতি গভস্তিমালিনি"

নিরঙ্গকেবল রূপক ঃ শুকনাসের উপদেশ—

"উদ্দামদর্প-শ্বয়থু-স্থগিত-শ্রবণ-বিবরাশ্চোপদিশ্যমানমপি তে ন শৃণ্বন্তি।"

পরম্পরিত রূপক সঙ্কীর্ণ বিরোধাভাস ঃ শূদ্রকবর্ণনা—

"উৎসাদিতাশেষদ্বিষদিন্ধনমপি জ্বলৎপ্রতাপানলম্"

বিরোধাভাস ও শ্লেষে সঙ্কর ঃ শবরসেনাপতিবর্ণনা—

"অভিনবযৌবনমপি ক্ষপিতবহুবয়সম্"

অতিশয়োক্তি ঃ পম্পাসরোবরবর্ণনা—

"অভিষেকাবতীর্ণ-পুলিন্দ-রাজ-সুন্দরী-কুচ-চন্দন-ধূলি-ধবলিত-তরঙ্গম্"

ভ্রান্তিমান্ ঃ শুকোৎপত্তি—

"সুরগজোন্মূলিত-বিদলদাকাশগঙ্গা-কমলিনীশঙ্কামুপজনয়ন্তঃ"

অর্থান্তরন্যাস ঃ নিদ্রাবস্থাবর্ণনা—

"সর্বথা ন কঞ্চিৎ ন খলীকরোতি জীবিততৃষ্ণা।"

বাণের অর্থান্তরন্যাস কালিদাসের অর্থান্তরের ন্যায় উপাদেয় নহে।

সহোক্তি ঃ অনপত্যতাবিষাদ ;

"কদা চ ক্ষিতিরেণুধূসরা মণ্ডয়িষ্যতি মম হৃদয়েন দৃষ্ট্যা চ সহ পরিভ্রমন্ ভবনাঙ্গনম্"

অপ্রস্তুতপ্রশংসা ঃ মহাশ্বেতাজন্মবৃত্তান্ত—

"জনয়তি হি প্রভুপ্রসাদ-লবোঽপি প্রাগল্ভ্যমধীরপ্রকৃতেঃ।"

বিষম ঃ মহাশ্বেতাজন্মবৃত্তান্ত—

"কেদং বয়ঃ, কেদং তপঃ, কেয়মাকৃতিঃ, কচায়ং লাবণ্যাতিশয়ঃ, কেয়মিন্দ্রিয়াণামুপশান্তিঃ।"

দৃষ্টান্ত ঃ মহাশ্বেতাজন্মবৃত্তান্ত—

"ন হ্যল্পীয়সা শোক-কারণেন ক্ষেত্রীক্রিয়ন্ত এবংবিধা মূর্ত্তয়ঃ।
ন হি ক্ষুদ্র-নির্ঘাত-পাতাভিহতা চলতি বসুধেতি।"

সমাসোক্তি ঃ মহাশ্বেতা-স্নান-বিবরণ-বৃত্তান্ত—

"মধুমদ-বিড়ম্বিত-মধুকরী-কদম্বক-সংবাহ্যমান-লতাদোলেষু"

অপহ্নুতি ঃ পুণ্ডরীক-বর্ণনা—

"যদ্ ত্রিভুবনাদ্ভুতরূপসম্ভারং ভগবন্তং কুসুমায়ুধমুৎপাদ্য তদাকারাতিরিক্তরূপ-রাশিঃ অয়মপরো **মুনিমায়াময়ো** মকরকেতুরুৎপাদিতঃ।"

প্রেয়ো ঃ পুণ্ডরীকদর্শনে মহাশ্বেতার অবস্থা—

"ন বিভাব্যতে, কিং তদ্রূপসম্পদা, কিং মনসা, কিং মনসিজেন, কিমভিনব-যৌবনেন, কিমনুরাগেণ বা উপদিশ্যমানা, কিমন্যেনৈব বা কেনাপি প্রকারেণ, অহমপি ন জানামি কথং কথমিতি তমতিচিরং ব্যলোকয়ম্।"

বিভাবনা ঃ মহাশ্বেতাদর্শনে পুণ্ডরীকের অবস্থা—

"কুতশ্চেদমতিনৈপুণ্যম্, যচ্চক্ষুষৈবান-ক্ষরমেবমন্তর্গতো হৃদয়াভিলাষঃ কথ্যতে।"

ব্যাজোক্তি ঃ মদনাকুল মহাশ্বেতার অবস্থা—

"ইত্যেবম্ অভিধীয়মানশ্চ তেন কিঞ্চিদুপজাতলজ্জ ইব প্রত্যবাদীৎ—

"সখে! কপিঞ্জল! কিং মামন্যথা সম্ভাবয়সি। নাহমেবমস্যা দুর্বিনীত-কন্যকায়া মর্ষয়াম্যক্ষমালাগ্রহণাপরাধমিমম্."

তুল্যযোগিতা ঃ মদনাকুল মহাশ্বেতার অবস্থা—

"স্মরজনিত-পক্ষপাতা চ, তৎপরিগ্রহানুনিবেশস্য অগ্রাম্যতাং তদাস্পদতয়া যৌবনস্য চারুতাং তচ্ছ্রবণসম্পর্কাৎ পারিজাতকুসুমস্য মনোহরতাং তন্নিবাসাৎ সুর-লোকস্য রম্যতাং তদ্রূপসম্পদা কুসুমায়ুধস্য দুর্জয়তাম্ অধ্যারোপয়ন্তী,"

সমুচ্চয় ঃ মদনাকুল মহাশ্বেতার অবস্থা;

"এষা খলু ভগবতঃ শ্বেতভানোরংশুসম্ভূতায়াম্ অপ্সরসি গৌর্য্যাং সমুৎপন্না, দেবস্য সকল-গন্ধর্ব-মুকুট-মণি-শলাকা-শিখরোল্লেখ-মসৃণিতচরণ-নখচক্রস্য প্রণয়-প্রসুপ্ত-গন্ধর্ব-কামিনী--কপোল-পত্রলতা--লাঞ্ছিত-ভুজতরু-শিখরস্য পাদপীঠীকৃত-লক্ষ্মী-করকমলস্য গন্ধর্বাধিপতের্হংসস্য দুহিতা মহাশ্বেতা নাম গন্ধর্বাধিবাসং হেমকূটাচলমভিপ্রস্থিতা।"

মালারূপা নিদর্শনা ঃ পুণ্ডরীক কপিঞ্জলের উক্তিপ্রত্যুক্তি—

"স খলু ধর্মবুদ্ধ্যা বিষলতাবনং সিঞ্চতি, কুবলয়মালেতি নিস্ত্রিংশলতামালিঙ্গতি, কৃষ্ণাগুরুধূমলেখেতি কৃষ্ণসর্পমবগূহতে, রত্নমিতি জ্বলন্তমঙ্গার-মভিস্পৃশতি, মৃণালমিতি দুষ্টবারণদন্তমুষলম্ উন্মূলয়তি, মূঢ়ো বিষয়োপভোগেষ্বনিষ্টানুবন্ধিষু যঃ সুখবুদ্ধিমারোপয়তি।"

পুনরুক্তবদাভাস ঃ পুণ্ডরীক-কপিঞ্জলের উক্তি-প্রত্যুক্তিঃ

"তত্র চ সুখ-নিষণ্ণস্য প্রত্যাসন্নবর্তিনাং চন্দন-বিটপিনাং মৃদুনি কিসলয়ানি নিষ্পীড্য তেন স্বভাবসুরভিনা তুষার-শিশিরেণ রসেন ললাটিকামকল্পয়ম্, আচরণাদঙ্গচর্চ্চাঞ্চারচয়ম্।"

পরিকর ঃ মহাশ্বেতা বৃত্তান্তের উপসংহার—

"সাহমেবংবিধা পাপকারিণী নির্লক্ষণা নির্লজ্জা ক্রূরা চ নিঃস্নেহা চানৃশংসা চ গর্হণীয়া নিষ্প্রয়োজনোৎপন্না নিষ্ফলজীবিতা নির্নাথা নিরবলম্বনা নিঃসুখা চ।"

অর্থাপত্তি : কাদম্বরীর স্ববিকারজাত চিন্তা—

"স্থূলবুদ্ধয়োঽপি তাদৃশীং বিনয়চ্যুতিং বিভাবয়েয়ুঃ, কিমুতানুভূত-মদনবৃত্তান্তা মহাশ্বেতা সকলকলাকুশলা সখ্যো বা রাজকুলসঞ্চারচতুরো বা নিত্যমিঙ্গিতজ্ঞঃ পরিজনঃ।"

শুদ্ধ সন্দেহ ঃ চন্দ্রাপীড়ের নিকট কাদম্বরীর উপহার প্রেরণ ;

"কিমু খলু ভগবানোষধিপতিরকাণ্ড এব শীতাংশুরুদিতো ভবেৎ, উত যন্ত্র-বিক্ষেপ-বিশীর্যমাণ-পাণ্ডুর-জলধারা-সহস্রাণি ধারাগৃহানি মুক্তানি, আহোস্বিদনিল-বিকীর্যমাণ-শীকর-ধবলিত-ভুবনাম্বর-সিন্ধু-র্ধরাতলমবতীর্ণেতি।"

ব্যতিরেক ঃ চন্দ্রাপীড়ের নিকট কাদম্বরীর উপহার প্রেরণ ;

"ন চ নারায়ণোঽত্র ভবন্তমতিরিচ্যতে, নাপি কৌস্তুভমণিরণুনাপি গুণলবেন শেষমতিশেতে, ন চাপি কাদম্বরীমাকারানুকৃতিকলয়াপ্যল্পীয়স্যালক্ষ্মীরনুগন্তুমলম্।"

হেতু ঃ পুনঃ সন্ধ্যাবর্ণনা—

"উদগাদ্ভগবানীক্ষণোৎসবঃ সুধাসূতিঃ।

উল্লেখ ঃ শূদ্রকবর্ণনা—

"কর্তা মহাশ্চর্যাণাম্, আহর্তা ক্রতূনাম্ আদর্শঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্, উৎপত্তিঃ কলানাম্, কুলভবনং গুণানাম্, আগমঃ কাব্যামৃতরসানাম্।"

স্মরণ ঃ অগস্ত্যাশ্রমবর্ণনা—

"অধুনাপি যত্র জলধরসময়ে গম্ভীরমভিনব-জলধর-নিবহনিনাদমাকর্ণ্য ভগবতো রামস্য ত্রিভুবন-বিবর-ব্যাপিনশ্চাপঘোষস্য স্মরন্তো"

দীপক ঃ সভাভঙ্গবর্ণনা—

"ইতশ্চেতশ্চ নিষ্পতন্তীনাং স্কন্ধদেশাবসক্তচামরাণাং চামরগ্রাহিণীনাং কমলমধু-পানমত্তজরৎকলহংসনাদজর্জরেণ পদে পদে রণিতমণীনাং মণিনূপুরাণাং **নিনাদেন** বারবিলাসিনীজনস্য সঞ্চরতো জঘনস্থলাস্ফালনরশিতরত্নমালিকানাং মেখলানাং মনোহারিণা **ঝঙ্কারেণ** নূপুররবাকৃষ্টানাঞ্চ ধবলিতাস্থানমণ্ডপসোপানফলকানাং ভবনদীর্ঘিকাকলহংসকানাং **কোলাহলেন** রশনারশিতোৎসুকানাঞ্চ তারতরবিরা-বিনামুল্লিখ্যমানকাংস্যক্রেঙ্কারদীর্ঘেন গৃহসারসানাং **কূজিতেন**······সর্বতঃ ক্ষুভিতমিব তদাস্থানভবনমভবৎ।"

বাণের রস-চেতনা

বাণের রস-চেতনা আলোচনার পূর্বে সাহিত্য তত্ত্বের যে উত্তপ্ত পটভূমিতে বাস করিয়া তিনি কাদম্বরী গদ্য-কাব্য সৃষ্টি করিলেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া একান্ত কর্তব্য। পূর্বে কী ছিল না, পরে কী হইল, জীবন-হীন ধূসর মরুভূমির উপর দিয়া কেমন করিয়া জীবন-গঙ্গার ফেনিল কল-কল্লোল বহাইয়া দিয়া বাণ তাঁহার সমসাময়িক সাহিত্যতত্ত্বের বিশুষ্ক মরুভূমিকে শস্যশ্যামল, জীবন-স্পন্দনে উচ্চকিত করিয়া তুলিলেন, তাহা জানিবার জন্য রসানুভূতির দিক হইতে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সাধন-পীঠের পটভূমির সম্যক জ্ঞান থাকা চাই। কাব্যতত্ত্বের বৈদ্যেরা যখন কাব্য-শরীরের শবদেহকে শব-ব্যবচ্ছেদ আগারে ফেলিয়া তাহার উপর ছুরি চালাইয়া জানিতে চাহিতেছিলেন, কাব্যশরীরের কোন্ কোষে কোন্ নাড়ীর গোপন কোঠায় কাব্য-সৌন্দর্যের রহস্য লুকাইয়া আছে, তখন বাণ তাঁহাদের হইতে দূরে আপন কুটীরের সারস্বত আসনে বসিয়া আপন সৃষ্টির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞগণের জিজ্ঞাসার চরম কৌতূহল কেমন করিয়া নিবৃত্ত করিলেন, তাহা না জানিলে রস-বাদিগণের বিরোধী সম্প্রদায়ের অন্ধসংস্কারের পূর্ণ পরিচয় যেমন পাওয়া যাইবে না, তেমনি বাণের দিক দিয়াও জানা যাইবে না—যে তিনি তাঁহার কালের কাব্য-তত্ত্বজ্ঞদের হইতে অনেক বড় ছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্যবোধ তাঁহার সমসাময়িক আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা অনেক সজ্ঞান ছিল এবং তাঁহার সজ্ঞান সদানন্দ অনুভূতিতে তিনি কেমন করিয়া দুই বিরোধীদলের বিরোধী মতের সমন্বয় করিলেন—কাব্য-তত্ত্বজ্ঞদের অলঙ্কারবাদ, গুণবাদ, রীতিবাদের সহিত ভরতপন্থী সাধকগণের রসবাদ মিলাইয়া দিয়া রস যে কাব্যের আত্মা এবং অলঙ্কার, গুণ, রীতি সবই যে সেই রসের প্রেরণায় অনুস্যূত, এই ভাবে শরীর ও আত্মার সম্পর্কের ন্যায় সকলকেই রসে আনিয়া পরিসমাপ্ত করিলেন। বহুকাল পরে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত তত্ত্বের আসন হইতে যে বাণী তাত্ত্বিক ভারতকে শুনাইয়াছিলেন, সেই বাণীরই ফলিতরূপ সেই মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে বাণ যে হাতেনাতে ফলাইয়াছিলেন, তাহাই বুঝিবার জন্য অতিসংক্ষেপে রসবাদ ও অলঙ্কারবাদের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার খবরটা শুনাইয়া লইতে চাই।

রসবাদ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তিভূমি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহার প্রথম আবির্ভাব এবং বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে কাব্যের আত্ম-

স্বরূপে ইহার পরিণতি। ভরত হইতে বিশ্বনাথ পর্যন্ত—এই দীর্ঘকালের অবসরে ক্রমোন্মেষের পথে চলিতে চলিতে এই রসবাদ সৌন্দর্যবোধের মধ্যমণি হইয়া বিরাজ করিতেছে। কী করিয়া নাট্যশাস্ত্রের এই রস কাব্যতত্ত্বের প্রস্থানগুলির দ্বারা ন্যক্কৃত ও অবহেলিত হইয়া উত্তরকালে বিভিন্ন প্রচলিত প্রস্থানগুলির উপর সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া বিজয়-গৌরবের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল, তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা এক দিনের ঘটনা নয়। দীর্ঘকালের উপচীয়মান ইতিবৃত্তের প্রত্যেকটি নূতন পাতায় তাহার বিবর্তনের ইতিহাস মুদ্রিত হইয়া আছে। রস-সম্বন্ধে পারিভাষিক মতের না হোক, একটা সহজ ঋজু ধারণার সহিত প্রাচীন আলঙ্কারিকদের পরিচয় থাকিবার কথা। রসবাদের প্রথমযুগে নাটকেই ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল, কাব্যতত্ত্বের বিশেষ মতবাদ হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা তখনও অনুভূত হয় নাই। এই প্রয়োজনের কথা সর্বপ্রথম প্রামাণ্যরূপে উপস্থাপিত করেন নবম শতকের কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন। আনন্দবর্ধন যাহার সূত্র রচনা করিলেন, অভিনবগুপ্ত তাহার এমন বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেন, যাহার ফলে রসবাদ সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া সকল প্রতিযোগী প্রস্থানের প্রতি-যোগিতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া ভবিষ্যৎ ক্রম-বিকাশের পথ বাঁধিয়া দিল। একথা অনস্বীকার্য যে আনন্দবর্ধনের বহুপূর্বেও এই রসবাদের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সে অস্তিত্ব রসবাদের পরিণতরূপ নয়, অপরিণত অঙ্কুর-অবস্থা মাত্র; তাহাও আবার নাট্যের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে। নাট্যের আওতার বাহিরে কাব্যে ইহার প্রভাব তেমন স্বীকৃত হয় নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অলঙ্কার ও রীতিপ্রস্থানের চাপে পড়িয়া রসবাদ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভরতকে কেন্দ্র করিয়া রসের একটানা আলোচনা চলিতেছিল এবং সে আলোচনায় বহু মনীষীর অংশগ্রহণের ফলে রসের সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া ওঠে;—ভট্ট-লোল্লটের উৎপত্তিবাদ, ভট্টশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ প্রভৃতি। ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, ভট্টনায়ক—ইঁহারা সকলেই নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের আরো অনেক টীকাকার ছিলেন। উল্লিখিত মনীষিগণের আলোচনা নাট্যকেন্দ্রিক হওয়ায় এবং সমসাময়িক প্রতিযোগী অধিক শক্তিশালী অলঙ্কার ও রীতিপ্রস্থান রসবাদিগণের রসবাদের মূল্য না দেওয়ায় রসবাদ ও তাহার ব্যাখ্যাতৃ-গণ ধ্বনিবাদকর্তৃক রস-স্বীকৃতির কাল পর্যন্ত অবহেলিত ছিলেন। দীর্ঘদিনের এই নিমজ্জন দশায় পড়িয়াও রসবাদ তাহার প্রতিযোগী শক্তিশালী অলঙ্কার ও রীতি-প্রস্থানগুলির উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে এবং তাহার ফলে

ধীরে ধীরে অলঙ্কার ও রীতিপ্রস্থান তাহাদের মতবাদের নিম্নভূমিতে রসকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

কাব্যতত্ত্বের অনুগামী এমন কয়েকটি প্রস্থান ছিল, যাহারা কবিতার নাট্য-সম্পর্কশূন্য এক স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিত। প্রত্যেকটি প্রস্থানের কাব্যতত্ত্বে নিজ নিজ আদর্শ ছিল। আদর্শগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করিত কাব্য-সৌন্দর্য উপলব্ধির দৃষ্টিকোণের তারতম্যের উপর। কবিতার মূলতত্ত্ব কি? কবিতার শেষ কথা কি?—ইহাই ছিল প্রত্যেকটি প্রস্থানের জিজ্ঞাসা। কাব্যতত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে ধারণা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়া পরিণামে ভরত ও তাঁহার অনুগামীদের নাট্যরসকেই কাব্যের আত্ম-স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের সহিত নাট্য-তত্ত্বজ্ঞদের পার্থক্য কেবল কবিতার আদর্শবোধের দিক হইতেই ছিল না, কাব্যগত অনুব্যবসায়ের (experience) দিক হইতেও ছিল। অলঙ্কার-শাস্ত্রের যে-সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ভামহের কাব্যালঙ্কার সর্ব-প্রাচীন কিন্তু গ্রন্থখানি এমনি খণ্ডিত উপাদানে পরিপূর্ণ যে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া নন্দন-তত্ত্বের অনুব্যবসায় সম্পর্কে কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণের কী ধারণা ছিল, তাহা বলা কঠিন। তথাপি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নানা উক্তির মাধ্যমে কাব্য হইতে উদ্ভূত অনুব্যবসায়ের ক্ষীণ উপলব্ধি যে পাওয়া যায় না, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভামহ এই অনুব্যবসায়-দ্যোতক যে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ভরতের রসাস্বাদ নহে, তাহা হইল—'প্রীতি'।[১] কবির পক্ষ হইতে অনুব্যবসায়ের এই উক্তিটি করা হইয়াছে, সহৃদয় পাঠকের পক্ষ হইতে নয়। কিন্তু পরবর্তী যুগের আলঙ্কারিক শিরোমণি অভিনবগুপ্তের অনুব্যবসায়ের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হইতে জানা যায় যে দুই শ্রেণীর অনুব্যবসায়ের মধ্যে মিল আছে। অতএব ঐ নজিরে কবির পক্ষ হইতে ভামহ যে উক্তি করিলেন, তাহা পাঠকের পক্ষেরও বলিয়া ধরা যায়। অন্যত্র তিনি এই আনন্দের সহিত শ্রুতিসুখ-জন্য আনন্দের তুলনায় বলিয়াছেন যে, শ্রুতিসুখ-জন্য আনন্দটি সঙ্গীতের আনন্দের মত। ঐ আনন্দ উপস্থাপিত বিষয়ের প্রমেয়-গত বা বস্তুগত জ্ঞান হইতে উৎপন্ন, প্রমাতৃগত স্থায়ী ভাবের উচ্চগ্রামের অভিব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নয়। নাট্যে ও কাব্যে অনুব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে যথেষ্ট। নাট্য হইতে যে অনুব্যবসায় জাগে তাহাতে প্রমাতা ও প্রমেয়ের ব্যক্তিসত্তা লোপ পায়। ইহা হইল বিভাবাদির সহিত

(১) "প্রীতিং করোতি কীর্তিঞ্চ সাধুকাব্যনিবন্ধনম্"—কাব্যালঙ্কার।

একাত্ম স্থায়ী ভাবের সাধারণীকৃত এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি। বিভাবাদির কেন্দ্রগত নায়কের সহিত প্রেক্ষকের একাত্মবোধ হইতে এই অনুব্যবসায়ের উৎপত্তি। ইহাই হইল নন্দনতত্ত্বসুলভ নাট্যগত অনুব্যবসায় (experience)। আচার্য্য ভরতই সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ করেন। কাব্যতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুব্যবসায়ের ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[১] ইহা নাট্য-তত্ত্ববিদগণের অনুব্যবসায় নয়, ইহা হইল কাব্যতত্ত্বজ্ঞ-গণের রুচি-বিচার (Judgement); ইহা প্রেক্ষকের আত্ম-বিস্মৃতি ও বিভাবাদির কেন্দ্রগত নায়কের সহিত একাত্মবোধ হইতে জাত নয়, পরন্তু উপন্যস্ত বস্তুর জ্ঞান-গোচরতা ও তদ্‌গ্রহণযোগ্য মানসিক প্রবণতা হইতে ইহা উৎপন্ন। বস্তুর ক্ষেত্রেও নাট্যতত্ত্বজ্ঞগণের সহিত কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের পার্থক্য বড় কম নয়। ইঁহাদের মতে প্রমেয় যে ভাবাত্মক হইবে, এমন কোন কথা নাই। লৌকিক জগতের চমৎকারহীন অতি সাধারণ ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ছাড়া যে-কোন ভাষাগত-উপন্যাসের মধ্যে যদি বক্রত্ব ধর্ম থাকে, যদি শিল্প-উপাদান থাকে, যদি বস্তু উপন্যাসের এমন ধর্ম থাকে যাহা কবি-মানসে একটা তীব্রতা আনিয়া দিতে পারে, যাহা সহৃদয় পাঠকের কলাসম্মত রুচির উদ্বোধনে সহায়তা করে, তাহা হইলে উহা কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের মতে নন্দনতত্ত্বসুলভ অনুব্যবসায়ের পক্ষে যথেষ্ট হইল। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের নন্দনতত্ত্বসুলভ অনুব্যবসায়ের পার্থক্য হইল—চেতনধর্মের স্বীয় প্রকৃতিতে এবং প্রমাতা ও প্রমেয়ের দিক হইতে। প্রাচীন গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে তাই এই কথা মনে হয় যে প্রারম্ভিক যুগে সাহিত্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব—পরস্পব সাপেক্ষত্বহীন দুইটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে উন্মেষলাভ করিয়াছিল। নাট্য-তত্ত্বের আদর্শ ছিল রস-বিশ্লেষণ এবং কাব্যতত্ত্বের আদর্শ ছিল ভাষা-শিল্পের সকল আঙ্গিকের বিশ্লেষণ। ভাষা-শিল্পের মাধ্যমে কাব্যতত্ত্বজ্ঞেরা যত প্রকার আঙ্গিক হাতে পাইয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে প্রকাশ-ধর্মের বৈশিষ্ট্য ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ ছিল। কবি-কল্পনা প্রকাশের উপাদানের পার্থক্যে তাঁহাদের মতবাদেরও পার্থক্য দেখা যায়। তাই কাহারো মতে অলঙ্কার, কাহারো মতে গুণ, আবার কাহারো মতে রীতি সাহিত্যের সর্বসাধ্যসার হইয়া দেখা দিল।

এই ভাবে এই উভয় সম্প্রদায় পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। কাব্যতত্ত্ব-

---

(১) আচার্য অভিনবগুপ্ত, কিন্তু, দুইটি অনুব্যবসায়কেই একজাতীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নাট্য হইতে যে ভাবে রস আস্বাদিত হয়, কাব্য হইতেও ঠিক সেইভাবেই রসাস্বাদ ঘটে। এই প্রবন্ধের শেষে অভিনবগুপ্তের এই সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

বিদ্‌গণের নেতৃস্থানীয় ভামহ এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন—বক্রোক্তি লইয়া। কিন্তু এই বক্রোক্তি কী জিনিস? ইহার সংজ্ঞা কি? ইহার প্রমাণ কি? তিনি এ-সকল প্রশ্নের কোন উত্তরই দেন নাই। দেন নাই বলিয়াই মনে হয়, বক্রোক্তি ভামহের প্রাতিভ-সৃষ্টি নয়। যেভাবে তিনি এই বক্রোক্তির আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে ইহা বহু-পরিচিত মতবিশেষ। যদি তিনি ইহাকে স্বীয় প্রতিভার দান বলিয়া মনে করিতেন, যদি মনে করিতেন যে তাঁহার এই বক্রোক্তির কেহ নামও শোনে নাই, এমন কি সকলে ইহাকে স্বীকার করিয়াও লয় নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ইহার সংজ্ঞা দিতেন এবং সে-সংজ্ঞা প্রামাণ্যের দ্বারা ধ্বনির ইতিহাসে আনন্দ-বর্ধনের মত প্রমাণ করিয়া দিতেও ছাড়িতেন না। কবিতার প্রকার-ভেদ আলোচনা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে কবি-ভাবনার ভাষাগত উপন্যাস এমন হওয়া চাই যাহা সহৃদয়ের আনন্দবর্ধন করে। ইহাকেই তিনি বক্রোক্তি বলিয়াছেন।[১] এই বক্রোক্তিই তাঁহার মতে কবিতার প্রয়োজনীয় পদার্থ। একটি কবিতা যদি উত্তম রীতিতে লেখা হয়, এবং তাহাতে যদি মাধুর্য ও স্ফুটত্ব-গুণও থাকে কিন্তু তাহাতে যদি বক্রোক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে কবিতা কবিতাপদবাচ্য নয়, তাহা কেবল সঙ্গীতের মতই কানকে মুগ্ধ করে।[২] ভামহ মাত্র তিনটি গুণ স্বীকার করেন—মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ। তাঁহার মতে এই গুণত্রয় কোন কবি-কৃতির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। তাহাদের সাঙ্গীতিক মূল্য থাকিলেও কাব্যিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই। যে-কাব্যে বক্রোক্তি নাই, অথচ ঐ গুণত্রয় আছে, তাহা সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহার মতে ভাষা-ভিত্তিক কবিকৃতি পুরাপুরি অনুভববেদ্যতার সৃষ্টি করুক আর নাই করুক, ইহাতে যদি বক্রত্ব থাকে, তাহা হইলে ইহা যথার্থ কবিতা। মোটের উপর বক্রোক্তির দ্বারা তিনি বলিবার ভঙ্গী-বৈচিত্র্যই বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য স্বভাবোক্তিকে অলঙ্কার বা কাব্য বলিয়া মানেন নাই। যেরূপ ঘটনা স্বভাবতঃই ঘটে, তাহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে বর্ণনা করিলে তাহাতে বাচন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য থাকে না। তাই তিনি বলিয়াছেন—'সূর্য অস্তমিত হইয়াছে', 'চন্দ্র কিরণ দান করিতেছে', 'পক্ষীরা আপন আপন নীড়ে প্রত্যাগমন করিতেছে'—এইরূপ বাক্যে বাচন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্য

---

(১) "যুক্তং বক্রস্বভাবোক্ত্যা সর্বমেবৈতদিষ্যতে।"—কাব্যালঙ্কার।

(২) "অপুষ্টার্থমবক্রোক্তি প্রসন্নমৃজু কোমলম্।
ভিন্নং গেয়মিবেদং তু কেবলং শ্রুতিপেশলম্॥"— ঐ

নাই বলিয়াই ইহা কাব্য হইল না, ইহা সংবাদ মাত্র।[১] তাঁহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র—অলঙ্কারই কবিতার মুখ্য উপাদান। চমকপ্রদ শব্দের মাধ্যমে চমকপ্রদ ভাবনার চমকপ্রদ উপন্যাস-পদ্ধতি হইল অলঙ্কারবিন্যাসের পদ্ধতি।[২] ভামহের "সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে"—বক্রোক্তি-কেন্দ্রিক এই শ্লোকটির উপর টীকা করিতে যাইয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে রস বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা তিনি ঐ শ্লোকটির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন এবং 'বিভাব্যতে' শব্দটির পারিভাষিক অর্থে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "প্রমোদোদ্যানাদিঃ বিভাবতাং নীয়তে, বিশেষণ চ ভাব্যতে রসময়ীক্রিয়ত ইতি"[৩]। অভিনব মনে করেন, ভামহ বলিতে চাহিয়াছেন যে বক্রোক্তির দ্বারা কবিতার অর্থ রসোপাদানে পর্যবসিত হয়। অভিনবগুপ্ত 'বিভাব্যতে' শব্দটির যে অর্থ করিলেন, তাহা ধরিলে মনে হইবে যে ভামহ যেন বলিতে চাহেন যে রস ও অলঙ্কার উভয়েই বক্রোক্তি হইতে উৎপন্ন। মনে হয় ভামহের কালে রস লইয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা ও গবেষণা হয়তো আরম্ভ হয় নাই। পরবর্তীকালের রস-বাদিদের বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ভামহ বা দণ্ডী কেহই ব্যবহার করেন নাই। পক্ষান্তরে ভামহ হয়তো এইরূপ মনে করিতেন, কবিতায় যে রসকে থাকিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। তিনি আরও বলেন, যে-কবিতায় রসের আলোচনা থাকিলেও অলঙ্কার নাই, সে-কবিতা কাঁচা বেলের মত কুৎসিত[৪]। কবিতায় যাহার একান্ত উপস্থিতি থাকা চাই, তাহা হইল বক্রোক্তি! ভামহ কাব্যরসের কথা বলিলেও তাঁহার কাব্যরস পারিভাষিক-অর্থশূন্য সাধারণ কাব্য-সৌগন্ধ। কিন্তু অভিনবগুপ্ত[৫] ইহার মধ্যে যে পারিভাষিক অর্থের সন্ধান দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা রসের যে প্রীতি উৎপাদনের অতিরিক্ত আর কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে, তাহা জানিতেন না। কবিতায় রস-ক্রিয়া সম্বন্ধে ভামহের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল বলিয়া মনে

(১) গতোঽস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।
ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্ত্তামেনাং প্রচক্ষতে॥— ঐ

(২) তদেভিরঙ্গৈ র্ভূষ্যন্তে ভূষণোপবনস্রজঃ।
বাচাং বক্রার্থশব্দোক্তিরলঙ্কারায় কল্পতে॥ ঐ

(৩) লোচন

(৪) অযুক্তিমদনুভি (নি) র্ভেদং রসবত্ত্বেঽপ্যপেশলম্।
কাব্যং কপিত্থমাত্রং চ কেষাঞ্চিৎ সদৃশং যথা॥

(৫) লোচন

হয় না। কেবলমাত্র রসবৎ অলঙ্কারের মধ্যেই তিনি রসের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই রসবৎ অলঙ্কারই রসের প্রকাশ ঘটাইতে সমর্থ[১]। রসকে তিনি অলঙ্কার-বিশেষের মধ্যে স্থান দিয়া অলঙ্কার-প্রস্থানে তাহাকে গৌণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভামহ যে কেবল কাব্যরসের কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি মহাকাব্যের রসের কথাও বলিয়াছেন।

এ পর্যন্ত ভামহ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে রসের পারিভাষিক অর্থ তাঁহার জানা ছিল না বলিয়া তিনি রসকে গৌণ স্থান দিয়া অলঙ্কারের মধ্যেই তাহাকে টানিয়া লইয়াছিলেন।

রসের উপযোগিতার প্রতি ভামহ অপেক্ষা দণ্ডী অধিক সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভামহের ন্যায় দণ্ডীও রসকে অলঙ্কারের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার জন্য গৌণ স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। রীতির অন্তর্গত মাধুর্যগুণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দণ্ডী রসের কিছু প্রাধান্য দিয়াছেন। এ সম্পর্কে তাঁহার বাগ্‌রস ও বস্তুরস উল্লেখযোগ্য। রস-শব্দের দুইটি অর্থ; একটি সাধারণ, অপরটি পারিভাষিক। সাধারণ অর্থে রস বলিতে বোঝায় স্বাদ, পারিভাষিক অর্থে—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি। দণ্ডীর বাগ্‌রস বা বস্তুরস সম্ভবতঃ স্বাদকেই বুঝাইত। বাগ্‌-রসের মধ্যে অনুপ্রাস প্রভৃতির বাহুল্যজনিত মনোহারিতা এবং বস্তুরসের মধ্যে গ্রাম্যতাদোষমুক্ত অর্থের স্বাদসম্ভোগ-সম্ভাবনা। তিনি মনে করিতেন অলঙ্কারের সহিত অর্থ-রস জড়িত এবং অগ্রাম্যতার বাহনে ঐ রস অর্থে অবগাহন করিতে সক্ষম। কিন্তু ভরত যে-অর্থে রস-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, দণ্ডীর তাহা না জানিবার কথা নয়। মহাকাব্যের প্রসঙ্গে তিনি রস ও ভাবের নিরন্তরতার কথা বলিয়াছেন। রসবদ্‌, প্রেয়ঃ ও উর্জস্বি অলঙ্কারের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি যে ভরতোক্ত আটটি রসের সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটির নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও করুণের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া সেগুলিকে অলঙ্কারের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া-ছেন। অভিনবগুপ্ত ভরতের রস-সূত্রের টীকায় বলিয়াছেন যে, রস-সম্বন্ধে দণ্ডীর মত অনেকটা ভট্টলোল্লটের মতের অনুরূপ। তাঁহাদের রসবোধ ছিল বস্তুনিষ্ঠ (objective)। তাঁহারা উভয়েই রসের উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস করিতেন। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে যে রসের উৎপত্তি হয়, এইরূপ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। খুব বিশদভাবে না বলিলেও "রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা' 'রূপ-

(১) "রসবৎ দর্শিতস্পষ্টশৃঙ্গারাদিরসম্।"—ঐ

বাহুল্যযোগেন', 'ইত্যারুহ্য পরাং কোটিং ক্রোধো রৌদ্রাত্মতাং গতঃ,' 'ইত্যুৎসাহঃ প্রকৃষ্টাত্মা', 'ইতি কারুণ্যমুদ্রিক্তম্'—প্রভৃতির উল্লেখ দর্শনে অভিনব গুপ্তের মন্তব্যই প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। মোটের উপর ভাব হইতে রসের উৎপত্তির কথা তিনি জানিতেন এবং বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের নাম উল্লেখ না করিলেও তাঁহার কবিতাগুলি হইতে জানা যায় যে তিনি তাহাদের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং কোন্ স্থায়ীভাবের কী ব্যভিচারী, তাহাও তিনি জানিতেন। শুধু তাহাই নয়, 'প্রেয়ঃ', অলঙ্কারে 'দেবাদিবিষয়া রতি' এবং উর্জস্বি অলঙ্কারে 'গর্বাখ্য ব্যভিচারী ভাবের'ও পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু এই-সকল অলঙ্কারে উল্লিখিত রসগুলি 'অলঙ্কারতয়া স্মৃতম্'। এখানে এমনি একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে রস ও ভাব প্রভৃতির সহিত পরিচিত থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি রসের প্রাধান্য দিলেন না? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, রসের বস্তুবাদিতায় বিশ্বাস থাকায় তিনি অলঙ্কারের মধ্যে রসের স্থান দিয়া রসের গৌণত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। অলঙ্কারবাদিগণের মতে অলঙ্কার্য হইল—কাব্য, রস নহে। তাই রস অলঙ্কাররূপে দেখা দিয়াছে। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যখন তিনি রসবদ্ অলঙ্কারের আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মতের পরিবর্তন আসিলেও তিনি তাঁহার স্বীয় গ্রন্থের আনুপূর্বিকতার কথা স্মরণ করিয়া হয় তো বা রসের প্রাধান্য দিতে পারেন নাই। সংস্কৃত পণ্ডিত মহলে তাই দণ্ডীর এই ব্যাপারকে 'ঐচ্ছিক' বলা হইয়া থাকে। প্রাচীনদের মতে রসের অঙ্গিত্বে অলঙ্কার্যত্ব, পরাঙ্গত্বে অলঙ্কারত্ব। মম্মট প্রভৃতি রসের পরাঙ্গতা স্থলে গুণীভূত ব্যঙ্গত্বের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু দণ্ডীর মতে রসবদ্ অলঙ্কারত্ব সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক।

দণ্ডীর কাব্যতত্ত্বের উপর নানা দিক দিয়া উন্নতিসাধন করিলেও বামন যে রসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার পূর্ববর্তিগণ অপেক্ষা বিশেষ কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তিনি গুণ ও অলঙ্কারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের রেখা টানিয়া গুণকে নিত্য ও অলঙ্কারকে কাব্যের অনিত্যধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই দিক দিয়া ভামহ ও দণ্ডী অপেক্ষা তিনি রসের অভিমুখে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্ববর্তীদের মত তিনি রসকে কেবল রসবদ্ অলঙ্কারের মধ্যে বন্দী করিয়া তাঁহার কাজ চুকাইয়া দেন নাই। তিনি নিত্যধর্ম বা গুণের মধ্যে ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অর্থ-গুণ 'কান্তি'র সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে যাইয়া তিনি তাহার মধ্যে দীপ্ত রসত্বের সন্ধান দিয়াছেন[১]। তাহার অর্থ-

(১) দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ দীপ্তাঃ রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ো যস্য স দীপ্তরসঃ।

গুণের মধ্যে রস দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই দীপ্তরসত্বের মধ্যে যেন তাঁহার ঋষিদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। ভবিষ্যতের রস-কীর্তনের দিব্যোন্মাদের আগমনী যেন বাজিয়া ওঠে। সাহিত্যতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হিসাবে রসকে গ্রহণ করিলেও তিনি উহার তাত্ত্বিক অর্থের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তিনি উহাকে কাব্যের এক সহকারী উপাদান হিসাবেই জানিতেন। তাঁহার ধ্বনি সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না, তাই তিনি উহাকে একটি বিশেষ অলঙ্কারের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভামহের মতাবলম্বী এবং বামনের সমসাময়িক আলঙ্কারিক উদ্ভট তাঁহার পূর্ববর্তীদের মতেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন এবং রসকে গৌণরূপে গ্রহণ করিয়া ভামহের ন্যায় রসবদ্ অলঙ্কারের মধ্যেই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার রসবদ্ অলঙ্কারের সহিত ভামহের রসবদ্ অলঙ্কারের খুব সামান্যই পার্থক্য আছে। তাহাতে নানা রসের সহিত স্থায়ী ভাব, ব্যভিচারী ভাব, অনুভাব ও বিভাবের আলোচনা আছে। তবুও তাঁহার মতে রস আত্মা নয়, অলঙ্কার মাত্র।[১] উদ্ভট রসবাদের সহিত এবং ইহার পরিভাষাগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, কারণ তিনি বিভাব, স্থায়ী, সঞ্চারী এবং অনুভাব শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন এবং ভরতের অনুসরণে প্রাচীন আটটি রস এবং একটি অতিরিক্ত শান্তরসেরও উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল যে এসব তিনি অলঙ্কার হিসাবেই ব্যবহার করিয়াছেন। রসের জন্য রসকে তিনি গ্রহণ করেন নাই, অলঙ্কারের উপকারক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। রসের সম্পর্কে তাঁহার ধারণা সত্যই কৌতুকাবহ। অভিনব গুপ্তের কথায় জানা যায় যে তিনি ভামহের কাব্যালঙ্কারের উপর একখানি ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একখানি—এই দুইখানি টীকা রচনা করেন। অতএব তিনি কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব—এই উভয়বিধ তত্ত্বের সমঝদারির সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দুইখানি টীকার একখানিও পাওয়া যায় নাই। অতএব তাঁহার রসের সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল, তাহা বলা যায় না। 'কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ' তাঁহার স্বাধীন রচনা। ঐ গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে মনে হয় তিনি কাব্যে ভরতের মতবাদই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ক্লুয্যক বলেন তিনি অলঙ্কার-প্রস্থানের লোক ছিলেন এবং ভামহের মতাবলম্বী ছিলেন।

(১) রসবদ্দর্শিতস্পৃষ্ট-শৃঙ্গারাদিরসোদয়ম্।
স্বশব্দস্থায়িসঞ্চারি বিভাবাভিনয়াস্পদম্।
রসাঃ খলু তস্তালঙ্কারাঃ। —কাব্যালঙ্কারসংগ্রহ।

উদ্ভট ভামহের অনেক অলঙ্কার যথাযথ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভামহের গ্রন্থের উপর 'বিবরণ' নামে একটি টীকা রচনা করেন।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে রুদ্রটই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রভাবে রসের আলোচনা করেন। রসের সহিত কাব্যের যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন আটটি রসের সহিত প্রেয়ঃ ও শান্তরস যোগ করিয়া রসের সংখ্যা করিলেন দশ। রসও তাহার আনুষঙ্গিক নায়ক-নায়িকার আলোচনা করিলেও তিনি রসের কোন তত্ত্বরূপ দিতে পারেন নাই—রসের সহিত কাব্যের কী যোগ তাহা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের ষোলটি পরিচ্ছেদের মধ্যে দুইটি পরিচ্ছেদে মাত্র রসের আলোচনা করিয়াছেন—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ আলোচনা যতটা বর্ণনার দিকে, ততটা তত্ত্বের দিকে নয়; বাকি অংশ অলঙ্কারের আলোচনায় পরিপূর্ণ। তাহাতে মনে হয়, তিনি অলঙ্কারের প্রতিই আসক্ত। তত্ত্বের দিক দিয়া তাঁহার রসের সহিত কোন যোগাযোগ ছিল না, ছিল অলঙ্কার-প্রস্থানের সহিত। রুয্যক বলেন, রুদ্রট অলঙ্কারকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং অলঙ্কারের মধ্যেই বস্তু ও অলঙ্কার-ধ্বনির সহিত রস-ধ্বনিরও ব্যবহার করিয়াছেন এবং রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কারেও রস ও ভাবকে অলঙ্কারের সহায়ক উপাদান হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। মোটের উপর ভামহ, দণ্ডী, বামন, উদ্ভট, রুদ্রট—কাহারো মধ্যে আমরা রসচেতনার পরিচয় পাই না।

এ-পর্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে বোঝা গেল, প্রাচীন কাব্যতত্ত্বজ্ঞগণের অলঙ্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য থাকিলেও রসকে তাঁহারা একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। রসকে যেমন অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তেমনি তাহার মর্ম-উদ্ঘাটনও করিতে পারেন নাই। তাহা যদি পারিতেন, তাহা হইলে রসবাদ ফেলিয়া অলঙ্কারবাদকে কাঁধে তুলিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন না। অলঙ্কার লইয়া মাথা ঘামাইতে ঘামাইতে অলঙ্কার্যের প্রশ্নও তাহাদের মনে উঠিয়াছিল। কিন্তু উঠিলে কী হইবে? সেখানেও ভ্রান্তি। কাব্যকেই তাঁহারা অলঙ্কার্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু রসবাদিদের চেতনায় দেখা যায় যে রসই অলঙ্কার্য, রসই কাব্যের আত্মা। এই রস কেবল নাট্যের নয়, কাব্যেরও আত্মা। মানবাত্মার বহিরঙ্গ উপাধির সংবিদ্ হইতে প্রাপ্ত মানব-চিত্তের আন্তর অনুব্যবসায়ের যে-ধারণা ভরত রস-ব্যাপার ও রসসংবিদের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মতাবলম্বী বিদগ্ধ জন ও টীকাকারগণ নানাভাবে, নানা দৃষ্টি-

কোণ হইতে, নানা দার্শনিক তথ্যের কষ্টিপাথরে মাজিয়া ঘসিয়া তাহার নানামুখী আলোচনা করিয়াছেন এবং সে বিস্তৃত আলোচনার ধারা ধ্বনিকার, আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তে আসিয়া মুখ্যতঃ শেষ হইয়াছে। অতএব নাট্যতত্ত্ব হইতেই রসের ধারণা কাব্যে ও কাব্যতত্ত্বে গৃহীত হইয়াছে। এই সংক্রমণের কাজ যখন স্বভাব-কাব্য হইতে চিত্তবৃত্তির-উদ্বোধক-কাব্যে যাইয়া শেষ হইল, তখন তত্ত্ববিদেরা আরও অগ্রসর হইয়া রসকেই নন্দনতত্ত্বমূলভ অনুব্যবসায়ের অন্যতম উৎস বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আনন্দবর্ধন বেশ পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন—"এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেন কাব্যনিবন্ধনম্ ভরতাদৌ অপি সুপ্রসিদ্ধম্।"—নাট্যরস কাব্যতত্ত্বের উপর পড়িয়া কাব্যতত্ত্বের এতদিনকার ধারণা একেবারে ওলটপালট করিয়া দিল। অভিনব-গুপ্তও কাব্যপ্রসঙ্গে রায় দিয়া বসিলেন—"নাট্যাৎ সমুদয়রূপাৎ রসঃ, নাট্য এব রসঃ, কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ কাব্যার্থঃ।"

আমরা দেখিয়া আসিলাম ভামহ হইতে রুদ্রট পর্যন্ত কেহই রসকে কায়মনো-বাক্যে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। রসতত্ত্বে ইহারা কেহই, হয় বিশ্বাসী ছিলেন না, না হয়, তত্ত্বের সম্পর্কে তাঁহাদের সজ্ঞান চেতনা ছিল না। ছিল না বলিয়াই রসকে অলঙ্কারের মধ্যে বড় জোর গুণের মধ্যে স্থান দিয়া গৌণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা যে কেবল রসকে পুরাপুরি মানেন নাই, তাহা নহে, যাহা লইয়া সাধনা করিলেন, সেই অলঙ্কার বা গুণ, তাহার মাধ্যমেও সাহিত্য-সৌন্দর্যের চরম রহস্যটিও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহারা যা-কিছু করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইত যদি আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত আসিয়া রসের সঞ্জীবনী দিয়া সেগুলিকে না বাঁচাইতেন—যদি রস-চেতনার মধ্যে অলঙ্কার-গুণকে সুসমঞ্জস করিয়া না তুলিতেন। কিন্তু একটি আশ্চর্য ঘটনা হইল এই যে, কাব্য-তত্ত্বজ্ঞেরা যখন তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন বাণভট্ট তাঁহার সাহিত্যে রসকে স্বীকার করিয়া লইয়া অলঙ্কার, গুণকে সেই রসের চেতনায় ভরিয়া তুলিয়া এক অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। ভামহ ও দণ্ডী হইতে বাণ খুব দূরবর্তী নন; একযুগেরই মানুষ। একযুগে বাস করিয়া আলঙ্কারিকেরা যাহার স্বাদ পাইলেন না, ঋষিদৃষ্টি সম্প্রসারিত করিয়াও যাহার নাগাল কোনমতেই পাইলেন না, বাণ স্বচ্ছন্দে তাঁহার অপূর্ব নির্মাণক্ষমা প্রতিভা লইয়া সেই অসাধ্য সাধন করিলেন, রসের সহিত অলঙ্কার, গুণ প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করিয়া এমন এক অপূর্ব কাব্য নির্মাণ করিলেন, যাহা সমগ্র তত্ত্বচেতনার ললাটে জীবন্ত জাহ্নবী-ফেন-লেখার ন্যায় চন্দ্রলেখা আঁকিয়া দিল।

শুধু, অলঙ্কার-গুণ কেন, বাণ যে ধ্বনির সহিত পরিচিত ছিলেন, এ প্রমাণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অসংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ ও সংলক্ষ্য-ক্রমব্যঙ্গ ধ্বনির সহিত পরিচিত ছিলেন। আনন্দবর্ধন তাঁহার 'ধ্বন্যালোকে' হর্ষ-চরিত হইতে একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া ধ্বনির উদাহরণ দিয়াছেন। রসের তো কথাই নাই। শৃঙ্গার রসের নিখুঁত পূর্ণ ছবি তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন কাদম্বরীর পাতায়। তিনি জানিতেন শৃঙ্গারের চরমরূপ সম্ভোগে নাই, আছে বিপ্রলম্ভে। বিপ্রলম্ভ না হইলে শৃঙ্গারের পুষ্টি হয় না। তাই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া বিপ্রলম্ভেরও বৈচিত্র্য আনিয়াছেন। রস যে ব্যঞ্জনাময়, একথা তিনি অনেকের আগেই জানিতেন বলিয়া ব্যঙ্গার্থের অনেক মণিময় বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন কাদম্বরীর সোনার পাতায়। শুধু তাহাই নয়, নায়ক-নায়িকার বৈচিত্র্যজ্ঞান যেমন তাঁহার ছিল, তেমনি নাট্যালঙ্কার-বিধৃত অষ্টাবিংশতি ভাবের রূপ-মার্জনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অবস্থাভেদে নায়িকার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের নিপীড়িত মাধুর্যে তিনি শৃঙ্গারের এক তরঙ্গিত অচ্ছোদ রাখিয়া গিয়াছেন দুই নারীর প্রেমবন্ধনে। তাঁহার চন্দ্রাপীড় অনুকূল ধীরোদাত্ত। তাঁহার কাদম্বরী কন্যা পরকীয়া মুগ্ধা নায়িকা। প্রধান রস[১] বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার, পূর্বার্ধে ও উত্তরার্ধের কোন কোন অংশে পূর্বরাগ, উত্তরার্ধের শেষে করুণ। করুণ ও হাস্যরসেরও অভাব নাই। শুধু হাস্য, করুণ, শৃঙ্গার নয়, বাৎসল্য, সখ্য, শান্ত ও অদ্ভুত রসের পরিবেশন করিতেও ছাড়েন নাই। কাহিনী যত অগ্রসর হইয়াছে, অদ্ভুত রস ততই যেন বেশী ফুটিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে কাদম্বরী ও হর্ষচরিত যেমন আলঙ্কারিকদের কথা-আখ্যায়িকার দীর্ঘমেয়াদী বিতণ্ডার মীমাংসা করিয়া দিয়াছিল, তেমনি রসবাদী ও অলঙ্কারবাদিদের সাম্প্রদায়িক কলহকেও মিটাইয়া দিয়া চিরন্তন ভ্রাতৃত্বের রাঙা রাখী সকলের হাতে পরাইয়া দিয়াছে।

নিম্নে তাঁহার ধ্বনিজ্ঞানের প্রমাণ স্বরূপ কিছু কিছু অংশ কাদম্বরী হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

---

(১) "অপরস্তু অভিলাষ-বিরহের্ষ্যা-প্রবাস-শাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।" —কা. প্র. ৪

যুনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনরলভ্যে।
বিমনায়তে যদৈক স্তদা ভবেৎ করুণ-বিপ্রলম্ভাখ্যঃ।" —সা. দ. ৩০

ব্যঙ্গার্থ :—(১) প্রকাশমব্রবীৎ—"দেবি ! জানামি কামরতিং নিমিত্তীকৃত্য প্রবৃত্তোঽয়মবিরলসন্তাপতীব্রো ব্যাধিঃ।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রাপীড় প্রকাশ্যে বলিলেন—"দেবি ! আমি মনে করি—কোন অনির্বচনীয় বৈরাগ্যনিবন্ধ আপনার এই রোগ জন্মিয়াছে এবং নিরন্তর সন্তাপিত করায় উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।" ইহা বাচ্য অর্থ। 'কামরতিং'—শব্দের বাচ্যার্থ—কোন অনির্বচনীয় বৈরাগ্য—কামপি অনির্বচনীয়াম্ অরতিং বিরাগম্'। ব্যঙ্গার্থ হইল—কামরতি অর্থাৎ মদনানুরাগ।

(২) "সুতনু ! সত্যং ন তথা ত্বামেষ ব্যথয়তি যথাস্মান্।"

"হে সুন্দরি ! এই ব্যাধি আমাকে যেরূপ ব্যথিত করিতেছে, সেরূপ আপনাকে করিতেছে না।"—বাচ্যার্থ। ব্যাধি ব্যাধিতকে যতটা ক্লেশ দেয়, তাহা অপেক্ষা ব্যাধিতের স্নেহসম্পর্কিত যাহারা, তাহাদের বেশি ক্লেশ দেয়—ইহাই লৌকিক সত্য। এখানকার ব্যাঙ্গার্থ হইল—ইহা কাম।

অনুরূপ যেমন শকুন্তলায়, রাজা শকুন্তলাকে বলিয়াছিলেন—

"তপতি তনুগাত্রি ! মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।"

(৩) "ইচ্ছামি দেহদানেনাপি স্বস্থামত্রভবতীং কর্তুম্"—"অতএব আমি নিজের দেহ দিয়াও আপনাকে সুস্থ করিতে চাই।" নিজের দেহ অপেক্ষা আপনার দেহ অধিক প্রিয়—ইহাই বক্তার বক্তব্য। ইহা বাচ্যার্থ। ব্যঙ্গার্থ হইল, আমি আপনার রতিবন্ধু হইয়া আপনাকে আমার দেহ দান করিতে চাই।

(৪) "উৎকম্পিনীমনুকম্পমানস্য কুসুমেষু পীড়য়া পতিতামবেক্ষমানস্য পততীব মে হৃদয়ম্।"—"রোগের প্রভাবে আপনি কাঁপিতেছেন ; সুতরাং আপনাকে দেখিয়া আমিও কাঁপিতেছি। আপনি রোগের জ্বালায় পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছেন, ইহা দেখিয়া আমার হৃদয়ও ভাঙিয়া পড়িতেছে।"—আপনার কষ্ট দেখিয়া আমারও দারুণ কষ্ট হইতেছে, এইরূপ ভাব। ইহা বাচ্যার্থ।

ব্যঙ্গার্থ হইল—প্রবল কামের উত্তেজনায় আপনার শরীরে কম্পাখ্য সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে ; রমণের দ্বারা আমি আপনার প্রতি অনুকম্পা করি, এই অনুভবে আমি কাঁপিতেছি। কাম-বেদনায় আপনি পুষ্পশয্যায় স্রস্তাঙ্গী হইয়া পড়িয়া আছেন। আপনাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ও রমণের উদ্দেশ্যে আপনার নিকট ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে।—ইহাই ব্যঙ্গার্থ।

(৫) "অনঙ্গদে তনুভুতে তৈ ভুজলতে গাঢ়সন্তাপতয়া চ দৃষ্ট্যা বহতি স্থল-কমলিনীমিব রক্তামরসাম্।"—

"রোগের জ্বালায় আপনার বাহুলতা-দুইটি কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাই তাহাতে কেয়ূর নাই; অন্তর্জ্বরে জারিত নয়ন-যুগল যেন রক্তকমলা স্থলপদ্মিনীকে ধারণ করিতেছে।"

ব্যাধিপ্রভাবে কৃশ হওয়ায় পাছে খুলিয়া পড়ে, এই ভাবনায় আপনার বাহুযুগলে কেয়ূর নাই। গাঢ় সন্তাপের ছটা নয়নে ব্যক্ত হওয়ায় মনে হইতেছে নয়নযুগলে রক্তকমলের সহিত স্থলকমলিনী ধারণ করিতেছেন। এই দুইটিই মহৎ-দুঃখের জ্ঞাপক। ইহাই বাচ্যার্থ।

ব্যঙ্গার্থ হইল—হে অনঙ্গদে! কামোদ্দীপনদাত্রি! আপনার ভুজলতা-দুই-খানি কামপীড়ায় কৃশতাপ্রাপ্ত। তীব্রসন্তাপসূচক দৃষ্টির দ্বারা আপনি পদ্মিনী-নায়িকার মদনানুরাগ ব্যক্ত করিতেছেন। (তীব্র মদন সন্তাপসূচক দৃষ্টির দ্বারা স্থলে=পদ্মিনী আদি নায়িকা-স্থলে কমলিনী=চারিশ্রেণীর নায়িকার মধ্যে আপনি পদ্মিনী-নায়িকা; অরসা=রমণরূপ-শৃঙ্গারফলবর্জিতা; রক্তা=কেবলমাত্র অনুরক্তা।)

(৬) দুঃখিতায়াঞ্চ ত্বয়ি পরিজনেঽপি চানবরতকৃতাশ্রুবিন্দুপাতেন বর্ততে মুক্তাভরণতা। গৃহাণ স্বয়ং বরার্হাণি মঙ্গল-প্রসাধনানি। সকুসুমশিলীমুখা হি শোভতে নবালতা" ইতি।"—

"বিশেষ করিয়া আপনি দুঃখভোগ করায় পরিজনেরাও অনবরত অশ্রুপাত করিয়া অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে। অতএব আপনি নিজে উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মাঙ্গলিক অলঙ্কার ধারণ করুন। কারণ, নবীনলতা পুষ্পে ও ভ্রমরে শোভা পায়।" ব্যাধি-হেতু আপনি দুঃখভোগ করিতে থাকায় আপনার প্রতি অনুরাগ বশতঃ আপনার দুঃখে দুঃখী হইয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতেছে এবং অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে। অতএব আপনি স্বয়ং আপনার উপযোগী উৎকৃষ্ট মাঙ্গলিক অলঙ্কার গ্রহণ করুন। তাহা হইলে পরিজনেরাও আশ্বাস লাভ করিয়া পুনরায় আভরণ ধারণ করিবে। তাহা ছাড়া, নূতন লতা ভ্রমরে ও কুসুমে শোভা পাইয়া থাকে, কুসুমহীন ও ভ্রমর-সঙ্গ বর্জিত লতা কখনও শোভা পায় না। ইহাই বাচ্যার্থ।

ব্যঙ্গার্থ হইল—আপনি মদনবেদনায় পড়িয়া থাকায় আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া পরিজনেরা অনবরত অশ্রুমোচন করিতেছে এবং অলঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে। অতএব স্বয়ম্বরের যোগ্য হস্ত-সূত্রাদি মাঙ্গলিক আভরণ গ্রহণ করুন। ইহাতে আপনার শোভা বাড়িবে। কামবিদ্ধ যুবতীরই যথার্থ শোভা; কামহীন যুবতীর কোন সৌন্দর্য নাই।

(স্বয়ংবরার্হাণি = স্বয়ংবরের যোগ্য ; নবালতা = যুবতী ; যাহার বালতা অর্থাৎ শৈশব নাই ; কুসুমশিলীমুখ = কাম ; কুসুমই শিলীমুখ অর্থাৎ বাণ যাহার।)

অনুরূপ যেমন মালতী-মাধবে——প্রথমাকে "মহাভাগ! সুশ্লিষ্টগুণতয়া"—ইত্যাদি।

২। 'হর্ষ-চরিত' হইতে

"অত্রান্তরে কুসুম-সময়-যুগম্ উপসংহরন্ অজৃম্ভত গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্ল-মল্লিকা-ধবলাট্টহাসো মহাকালঃ।"—

"ইতিমধ্যে গ্রীষ্মনামক মহাকাল কুসুম-সময়ের ঋতু উপসংহার করিয়া প্রস্ফুটিত মল্লিকার ধবল অট্টহাস্যে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইল।"—

কবি এখানে বসন্তঋতুর পর গ্রীষ্মঋতুর আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছেন। বসন্তঋতুর দুইটি মাস—ফাল্গুন ও চৈত্র। ঐ দুইটি মাসের পরই গ্রীষ্মের আগমন। গ্রীষ্ম-ঋতুতে চারিদিকে ফুল্ল মল্লিকার শুভ্রহাসি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ হাসিটুকু মাখিয়া গ্রীষ্মের আবির্ভাব। ইহাই বাচ্যার্থ।

ব্যঙ্গার্থ হইল—কালের সংহর্তা মহাদেব ধ্বংসের উল্লাসে অট্টহাসি হাসিতেছেন। তাঁহার অট্টহাসি ধ্বংসের আনন্দে উপছাইয়া পড়িতেছে। 'যুগম্' 'উপসংহরন্' 'ধবলাট্টহাসঃ' 'মহাকালঃ'—ব্যঙ্গার্থের সহায়ক।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি :—(১)

বস্তুর দ্বারা বস্তুধ্বনি—

"তদেবমবস্থিতে যদত্রাবসরপ্রাপ্তম্ ঈদৃশস্য চানুরাগস্য সদৃশম্, অস্মদাগমনস্য চানুরূপম্ আত্মনো বা সমুচিতম্, তত্র প্রভবতি ভবতী" ইত্যভিধায় কিময়ং বক্ষ্যতীতি মন্মুখাসক্তদৃষ্টিস্তূষ্ণীমাসীৎ।

(পুণ্ডরীক সন্তাপশান্তি চেষ্টা)

—"এইরূপ অবস্থায় এখন যাহা উচিত, এইরূপ অনুরাগের যাহা যোগ্য, আমার আগমনের পক্ষে যাহা বিধেয়, আপনার নিজেরও যাহা উচিত, তাহাই আপনি করিতে পারেন, এই কথা বলিয়া 'ইনি কি বলেন', এই জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।"

আপনি নিজে যাইয়া পুণ্ডরীকের সহিত মিলিত হউন,—ইহাই এই অংশের ধ্বনি। এখানে বস্তুর দ্বারা বস্তুর চমৎকারিত্ব ঘটায় ধ্বনি হইল বস্তুধ্বনি।

বস্তুর দ্বারা অলঙ্কার-ধ্বনি—

"স্তিমিত-মুরজ-রব-গম্ভীর-গর্জিতেষু সলিল-শীকরাসার-রচিত-দুর্দ্দিনেষু পর্যস্ত-রবি-কিরণ-রচিত-সুর-চাপ-চারুষু ধারাগৃহেষু মত্তময়ূর-মণ্ডলৈ-র্মণ্ডলীকৃত-শিখণ্ডৈ-স্তাণ্ডবব্যসনিভিরাবধ্যমান-কেকারব-কোলাহলা"

(উজ্জয়িনী বর্ণনা)

"জল-যন্ত্রের গৃহের অভ্যন্তরে মত্ত ময়ূরেরা পুচ্ছদেশ মণ্ডলীকৃত করিয়া নাচিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেকারবে কোলাহল করিয়া থাকে; কারণ সেই জলযন্ত্রের গৃহাভ্যন্তরে মেঘগর্জনের ন্যায় মৃদঙ্গধ্বনি ভিত্তির আবরণে আবদ্ধ হয়, জলযন্ত্র হইতে নিরবচ্ছিন্ন জলবিন্দু বর্ষণে দুর্দিন করিয়া তোলে এবং কাচের কপাটের উপর সূর্যের কিরণ পড়িয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করে।"

অলঙ্কারের দ্বারা বস্তুধ্বনি—

"যঞ্চ রতি-প্রলাপ-জনিত-দয়ার্দ্র-হৃদয়-হর-নির্মিতমপরমিব মকরকেতুমমংস্ত লোকঃ।

(তারাপীড় বর্ণনা)

—"এবং মহাদেব রতির বিলাপে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যেন আর একটি কামদেবকে নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া যে তারাপীড়কে সকলে মনে করিত।"

এখানে দ্রব্যোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ফলে উপাদেয়ত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অলঙ্কারের দ্বারা বস্তুধ্বনি হইয়াছে।

অলঙ্কারের দ্বারা বস্তুধ্বনি—

"চতুর্মুখ-মুখকমলবাসিভিশ্চতুর্বেদৈঃ সুচিরাদিব দ্বিতীয়মিদমাসাদিতং স্থানম্।"

(জাবালি বর্ণনা)

—"চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখকমলবাসী চতুর্বেদ যেন বহু কালের পর এই দ্বিতীয় স্থান লাভ করিল।"

এখানে গুণোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের ফলে ব্রহ্মার মুখের তুল্য তপোবনের পবিত্রতা ব্যঞ্জিত হওয়ায় অলঙ্কারের দ্বারা বস্তুধ্বনি হইয়াছে।

অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কারধ্বনি—

"কোটরাভ্যন্তর-নিবিষ্টৈঃ সজীব ইব মধুকর-পটলৈঃ"

(শাল্মলীতরু বর্ণনা)

—"ভ্রমরসমূহ কোটরের মধ্যে থাকিয়া বিচরণ করায় সেই শাল্মলী-বৃক্ষকে সজীব বলিয়া মনে হয়।"

প্রাণের ন্যায় ভ্রমর-সমূহের অবিরত স্পন্দন হেতু গুণোৎপ্রেক্ষা 'অলঙ্কার আবার মধুকরসমূহই জীবন হওয়ায় নিরঙ্গ কেবল রূপক অলঙ্কার। অতএব এখানে অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কার-ধ্বনি হইয়াছে।

অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কারধ্বনি—

"অচির-প্রোষিতে চ সবিতরি শোক-বিধুরা কমল-মুকুল-কমণ্ডলু-ধারিণী হংস-সিত-দুকূল-পরিধানা মৃণাল-ধবল-যজ্ঞোপবীতিনী মধুকরমণ্ডলাক্ষবলয়মুদ্বহন্তী কমলিনী দিনপতি-সমাগমব্রতমিবাচরৎ॥"

—"কেবলমাত্র সূর্য অস্তমিত হইলে শোক-বিধুরা পদ্মিনী পদ্ম-কলিকারূপ কমণ্ডলু, হংসরূপ শ্বেতবস্ত্র, মৃণালরূপ ধবল যজ্ঞোপবীত এবং ভ্রমর-পঙক্তি-রূপ জপের মালা ধারণ করিয়া সূর্যের সহিত মিলনের জন্যই যেন কোন ব্রত আচরণ করিতে লাগিল।"

এখানে ক্রিয়োৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার এবং কমলিনী ও সূর্যে নায়িকা-নায়ক-ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলঙ্কার। উভয়ে মিলিয়া সঙ্কর। আবার শ্লেষের দ্বারা সাধ্বী পদ্মিনী যেন স্ত্রী, এই ভাবে উপমা-অলঙ্কারও ব্যঞ্জিত হইতেছে। অতএব অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কার ধ্বনি।

বাণের নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান

রীতি-পরিচ্ছেদে কবি-প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা যে সকল গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের অন্যতম হইল নীতিজ্ঞান। সংস্কৃতে নীতি দুই প্রকার—(১) রাজনীতি ও (২) ব্যবহারিক নীতি। কবির পক্ষে যেমন রাজনীতিতে, তেমনি ব্যবহারিক নীতিতে নিষ্ণাত হওয়া চাই। বাণ এই দুই নীতিতেই কৃতশ্রম ছিলেন। শুকনাসের উপদেশে তাঁহার রাজনীতির চেতনা এবং কপিঞ্জলের উপদেশে ব্যবহারিক নীতির মাধুর্য ধরা পড়ে। বাণ মুখ্যতঃ কবি, তাই তাঁহার কবিত্বের স্বচ্ছ-প্রবাহিণীর মুখে যাহা পড়ে, তাহাই গলিয়া ঝরিয়া অমৃত হইয়া ওঠে। শুকনাসের উপদেশটুকু যদি রাজনীতির ছাঁচে পরিবেষণ করা হইত, তাহা হইলে নীতিজ্ঞেরা মাথা নাড়িয়া সমঝদারি করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাব্যের সহিত তাহা মিলিত না, কাব্যরসিকেরা উন্নাসিক হইয়া উঠিতেন। বাণভট্টের কাব্যবোধ যথেষ্ট ছিল বলিয়া তিনি রাজনীতিকে—রাজার কর্তব্য-অকর্তব্যকে, আপন পরিমণ্ডলে নির্লিপ্ত হইয়া চলিবার জন্য আদর্শ জ্ঞানের খনিটুকুকে এমনি রসনিস্যন্দের মাধ্যমে পরিবেষণ করিলেন, যে রাজনীতির শুষ্কতা আর শুষ্কতা থাকিল না, তাহা কবিত্বের ছটায় জ্ঞানবৃক্ষের অমৃতময় পাকা ফল হইয়া শ্রোতার মনে রসের আকর্ষণ ঘনাইয়া তুলিল। যাহার জন্য এই নীতি-উপদেশ, শুধু সেই যে মুগ্ধ হইল তাহা নয়, পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া ওঠে। শুধু তাই কেন, নামকরা কবিও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া না বলিয়া না কহিয়া হাত বাড়াইয়া ফলটি হরণ করিয়া আপনার সারস্বত কুঞ্জের বিশেষ শাখায় চাঁচিয়া ছুলিয়া লট্‌কাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শুকনাসের উপদেশের অন্তর্গত—

—"নিসর্গত এব অভানুভেদ্যমরত্নালোকচ্ছেদ্যম্ অপ্রদীপপ্রভাবনেয়ম্ অতিগহনং তমো যৌবনপ্রভবম্"—এই অংশটুকু আবার কাব্যাদর্শের ২।১৯৭ শ্লোকে রূপান্তরিত-রূপে দেখিতে পাই।

"অরত্নালোকসংহার্যমবার্যং সূর্যরশ্মিভিঃ।
দৃষ্টিরোধকরং যূনাং যৌবনপ্রভবং তমঃ॥"

তাই বলিতেছিলাম, কবির পক্ষে যাহা সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেয়, সাধারণ রসিক-

পাঠকের মন যে তাহা হরণ করিয়া লইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কী আছে। তাই কাদম্বরীর শুকনাসের উপদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়া আসিতেছে। তরুণ চন্দ্রাপীড় গুরুগৃহ হইতে সবেমাত্র শিক্ষা সমাপন করিয়া রাজবাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক আসন্নপ্রায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাহার তরুণ মনের উপর, তরুণ মনের কাঁচা সোনার স্বপ্নের উপর, স্বপ্নের সজল মেদুরতার উপর রঙ ছড়াইয়া, লাবণ্যের আবীর ঝরাইয়া কুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত নবীন সূর্যের মত সহস্র রাঙা কিরণের পাখা মেলিয়া নামিল—উপদেশের রাঙা-রবির লাবণ্য-স্রোত; পূর্ণ করিয়া দিল তাহার মনের রন্ধ্রগুলি, সৌন্দর্যের রামধনু হাতে লইয়া নাচিতে লাগিল উপদেশের রাঙা রাঙা ঢেউ।

"আলোকয়তু তাবৎ কল্যাণাভিনিবেশী লক্ষ্মীমেব প্রথমম্। ইয়ং হি সুভট-খড়্গ-মণ্ডলোৎপল-বন-বিভ্রম-ভ্রমরী লক্ষ্মীঃ ক্ষীরসাগরাৎ পারিজাতপল্লবেভ্যো রাগম্, ইন্দুশকলাদেকান্তবক্রতাম্, উচ্চৈঃশ্রবসশ্চঞ্চলতাম্, কালকূটান্মোহন-শক্তিম্, মদিরায়া মদম্, কৌস্তুভমণে রতিনৈষ্ঠুর্যম্, ইত্যেতানি সহবাস-পরিচয়-বশাদ্বিরহবিনোদ-চিহ্নানি গৃহীত্বৈবোদ্গতা।"

তাহার পর কপিঞ্জলের উপদেশ। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যেমন উপদেশ স্বাভাবিক, এ উপদেশ তেমনি। উপদেশের পাত্র যিনি, তিনিও উপদেষ্টার একই বয়সের, একই শিক্ষা-সংস্কারের। দুই জনই মুনিকুমার। দুই জনই ব্রতী। একজনের পদস্খলন দেখিয়া অপরের তিরস্কার। সে তিরস্কারের একদিকে যেমন চাপা ক্রোধ, অন্যদিকে দুর্দশাগ্রস্ত বন্ধুর প্রতি সমবেদনা। ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ যেন উপদেশের বুক চিরিয়া ফিন্‌কি দিয়া উঠিতেছে। গেল গেল, রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে আমার বন্ধুর বুঝি হৃদয়খানিও চুরি গেল। আবার ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে বুক। সেই ভাঙা বুক লইয়া উপদেশ :

"স খলু ধর্মবুদ্ধ্যা বিষলতাবনং সিঞ্চতি, কুবলয়মালেতি নিস্ত্রিংশলতামালিঙ্গতি, কৃষ্ণাগুরুধূমলেখেতি কৃষ্ণসর্পমবগূহতে, রত্নমিতি জ্বলন্তমঙ্গারমভিস্পৃশতি, মৃণালমিতি দুষ্টবারণ-দন্তমুষলম্ উন্মূলয়তি, মূঢ়ো বিষয়োপভোগেষ্বনিষ্ঠানুবন্ধিষু যঃ সুখবুদ্ধি-মারোপয়তি।"

—তাই বলিতেছিলাম, কেবল কাঠিন্যের উপর পেলবতার মৃদু আবরণ নয়, কেবল একলা-চলা নীতিকথা নয়, কেবল অবগুণ্ঠিত শ্রেয়ঃ নয়; নীতি জীবনের অংশ

হইয়া উঠিয়াছে ; জীবনের সুরে সুর ভাজিয়া ইহা মরমে যাইয়া উঠিয়াছে। নীতি যে জীবনের জন্য, জীবন যে নীতির সাহচর্য চায়, সাপেক্ষত্বের আকৃতিময় এই সত্যটির উপলব্ধি যেমন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি নীতির জন্য। বাণ এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন জীবনের দিক হইতে, জীবনের শ্রেয়ঃ প্রেয়ের জিজ্ঞাসার তাগিদে। তাই তাঁহার নীতিতে জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, নীতিও জীবন-মর্মরে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু কাদম্বরীতে নয়, হর্ষচরিতেও এই নীতির অনেক ধুয়া শোনা যায়। কিন্তু সেখানে নীতির এমন জীবন-স্বাদ নাই।

বাণের প্রতিভা

বাণের প্রতিভার প্রায় সকল দিকের আলোচনা করা হইল। তাঁহার বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের জ্ঞান, পুরাণ-জ্ঞান, ইতিহাসের জ্ঞান, কিম্বদন্তীর জ্ঞান, অলঙ্কার-জ্ঞান, রীতিজ্ঞান, ধ্বনিজ্ঞান, রসজ্ঞান, লৌকিক-বাস্তবের জ্ঞান, স্মৃতি ও রাজনীতির জ্ঞান, ব্যবহারিক নীতির জ্ঞান,—এক কথায় ঐতিহ্যবাহী ও সমসাময়িক জ্ঞানের সকল শাখায় তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন। কালিদাসের পরে এরূপ প্রকাণ্ড কবি-পৌরুষ লইয়া আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার অলোক-সামান্য কবিত্বে। কিন্তু বাণের বৈশিষ্ট্য কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের যুগপৎ সংমিশ্রণে। তাঁহার প্রতিভার মধ্যে কবি-কল্পনা ও বৈদগ্ধ্যের রাখীবন্ধন। যেমন বর্ষাকালে দিগন্ত-বিস্তৃত দুইটি ক্ষেত্রের মধ্যে আলি দিয়া পৃথকরূপে সনাক্ত করা সত্ত্বেও আপ্লাবনের ফলে দুইটি ভিন্ন ক্ষেত্রের জলরাশি একাকার হইয়া ওঠে, অথবা দুইটি জলধারার মধ্যে সেতুবন্ধন সত্ত্বেও বন্যার স্ফীত জলরাশি যেমন দুয়ে মিলিয়া একাকার হইয়া যায়, বাণের প্রতিভায়ও তেমনি কবি-কল্পনা ও বৈদগ্ধ্যের রাখীবন্ধন—একাকারত্ব। বাণের তুলনায় কালিদাসের প্রতিভা ছিল কবিত্বপ্রধান, পাণ্ডিত্য ছিল গৌণ। কালিদাস যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন ভারতে বিদ্যাচর্চা নিতান্ত প্রবল ছিল। ভারতের সর্বত্রই তখন বিদ্যাচর্চার—জ্ঞান-লিপ্সার খরস্রোত প্রবাহিত। তখন সুরসিক সুপণ্ডিত সামাজিকের অভাব ছিল না। বিদ্যার গৌরবে, শিল্পের গৌরবে, কলার গৌরবে ভারত তখন জগতের শীর্ষ স্থানীয়। এমনি সময়ে—ভারতের ঐ প্রকার স্পর্ধার দিনে কোন দিকে কোন বিষয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করিলে বা অতি মাত্রায় কোন কার্য করিতে গেলেই যে তৎক্ষণাৎ সুপণ্ডিত সমাজে অপদস্থ হইতে হইবে, এ তত্ত্বটা কবি-সার্বভৌম কালিদাস বিলক্ষণ জানিতেন। সেই কারণে তাঁহার গ্রন্থাবলীর কোথাও অনাবশ্যক বিদ্যা-প্রকাশের বলিষ্ঠ ভঙ্গী নাই। সর্বত্রই ভাব-সংযম রক্ষা করিয়া তিনি লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। সমৃদ্ধির পুষ্পে ভারতের হৃদয় বিকশিত; তাই তাঁহার কল্পনাও সর্ব-ব্যাপিনী, সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ও ওজস্বিনী। বাণের কালে মহাকালের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের চিত্ত বুদ্ধি-দীপ্তির দিকে

ঝুঁকিয়াছে বেশী। পাণ্ডিত্যের নেশা তখন ভারতের গিরিকান্তারের দুর্গম রেণু-পিচ্ছল পথ দিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিতেছে। পুরাণের পেয়ালায় ভরিয়া তখন তাঁহারা জীবন-দ্রাক্ষার নিপীড়িত ফেনপুঞ্জ রহিয়া রহিয়া পান করিতে ব্যস্ত। ইতিহাস অপেক্ষা কিম্বদন্তীর মৌতাত তাঁহাদের তখন প্রিয়তর। বাস্তব জগৎ অপেক্ষা স্বপ্নের রাজ্যে বিহারের জন্য তাঁহাদের মন-ভোমরা পাখা মেলিয়া গুঞ্জন করিয়া ওঠে। বস্তু চাইনা, স্বপ্ন চাই; সে-স্বপন যত দূরের হোক; দেবতার হোক, অপ্সরা-কিন্নরের হোক, কিম্বদন্তীর ছায়াময় নর-নারীর হোক; স্বপ্ন চাই, কল্পনা চাই, আর চাই শৃঙ্গার—রতিবিলাস। ইহাই ছিল সে যুগের রসিক-মনের দাবী। বাণকে তাঁহার যুগের পাঠক-রুচির এ দাবি মিটাইতে হইয়াছে। কাব্য-শরীর বা আঙ্গিকের দাবি ছিল—বুদ্ধি-দীপ্তির রোমাঞ্চকর ইন্দ্রজাল। ভাষার অঙ্গ-রাগে শব্দের কটাক্ষে যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া ওঠে। আমরা নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাহি না, বুদ্ধির বিদ্যুদ্দামে নয়নকে বিদ্ধ করিতে চাই। হোক, ক্ষণিক, আমরা ক্ষণিককে চিরন্তন করিয়া রাখিব। বুদ্ধিটাকে শান দিয়া চিকন করিয়া তুলিব। এ যুগেই বাণের সহিত কাব্যে অর্থ-গৌরবের কবি ভারবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই দুই কবির মধ্যেই সে যুগের রসিক-রুচির রহস্যটি লুকাইয়া আছে।

কিংবদন্তী ও কাদম্বরী

কাদম্বরীর শিল্পকলায় যেমন একদিকে মনুষ্য-চেতনার বাস্তব সুখ-দুঃখের সজাগ অনুভূতি, যেমন দুইটি উন্মুখ হৃদয়ের মিলনের রঙীন নেশা ও বিরহের অশ্রুজল, যেমন ঘটনার ইশারায় প্রেমের অগ্রগতি, সংশয়, সন্দেহ ও সন্দেহের নিরাকরণ, যেমন মিলনের অনুকূল আবহাওয়া ও বাধার দৈবপ্রতিকূলতা, তেমনি ভারতবাসীর হৃদয়ের আকুতিমাখা বিশ্বাস-পিনদ্ধ আবহমানকাল-প্রবাহিত কিংবদন্তী পরম্পরার বর্ণ-বহুল সূচীকর্ম। জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়ের কাজই মানুষের সবখানি নয়, কল্পনাও স্বপ্ন তাহার অপরাধ। যাহা পাইয়াছি, তাহাই আমার সবটুকু নয়, যাহা পাই নাই, সেই না-পাওয়ার দুঃখ আমার জীবন ভরিয়া আছে। সেই না-পাওয়াকেই আমাদের শিল্পের মধ্যে নূতন করিয়া পাইতে হয়। তাই প্রত্যক্ষ ও কল্পনা, বাস্তব ও স্বপ্ন লইয়া আমাদের জীবনের বেসাতি। শিল্প আমাদের সেই বেসাতিতে সাহায্য করে। কাদম্বরী এই দুই দিক্‌কার অনুভূতির এক চমৎকার সমন্বয়। প্রাচীন ভারতবাসীর জীব-ধর্মের পাওনাটুকু বাদ দিলে বাকি অংশের সবটুকুই ছিল স্বপ্নের। সেই স্বপ্নময় অজানা রাজ্যের অস্পষ্ট আলোছায়ায় প্রকৃতির অচেনা রূপের রহস্যটিকে তাঁহারা বিশ্বাসের চাঁদের আলোয় স্নান করাইয়া মনের গহনে গ্রহণ করিতেন। প্রকৃতি ও জীবনকে নাজানার অপরাধ তাঁহাদের যতই হউক, বিশ্বাসের মূল্যের মধ্যেই যে তাঁহাদের জীবনের মূল্য নিহিত ছিল, একথা যিনি না মানিবেন, তাঁহার পক্ষে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা পণ্ডশ্রম হইবে। একাল সেকাল নহে। তাই একালে বসিয়া একালের চেতনা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া সেকালের বিচার করিলে বিচারে ভুল হইবে। একালে বসিয়া সেকালকে জানিতে হইলে কিংবদন্তীর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নাই। শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর যে কোন জাতির প্রাচীন জীবনানুভূতি জানিতে হইলে তাহার জাতীয় জীবনের কিংবদন্তীর অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।' কারণ ঐ কিংবদন্তীর মধ্যেই তাহার জীবন, তাহার জীবনের বাস্তবতা। বাস্তবতার কোন স্থায়ী রূপ নাই। যুগে যুগে ইহার পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীনের বাস্তবতা—তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, বেদনা, তাহার বিশ্বাস, তাহার জীবনের নির্ভরতা, জীবনাবেগ, জীবনের সহিত হৃদয়-যোগের নিবিড়তা—সবই ঐ কিংবদন্তীর পাকে পাকে জড়াইয়া আছে। একালের চেতনা, একালের জীবনবোধ, জীবন-অভিজ্ঞতা,

শিল্পজ্ঞান লইয়া কাদম্বরী আলোচনা করিতে বসিলে সবই অদ্ভুত মনে হইবে। অদ্ভুত এই জন্য যে একালের জীবন-চেতনা ও শিল্প-চেতনার সহিত তাহার মিল নাই। চন্দ্রলোক হইতে এক মহাপুরুষ নামিয়া আসিয়া পুণ্ডরীকের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া আকাশে উঠিলেন—একথা একালে বসিয়া বিশ্বাস করা যায় না। মহাপুরুষ যদি প্যারাস্যুটিস্ট হইতেন, তবে তাঁহার অবতরণ মানিয়া লওয়া যাইত। যে চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য আমরা এই বৈজ্ঞানিক যুগে এত মাথা খোটাখুটি করিতেছি, বৈজ্ঞানিক যান নির্মাণ করিয়াও এখনও যাইয়া উঠিতে পারি নাই, সেই চন্দ্রলোকে কপিঞ্জল বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকেই মহাপুরুষের পিছন পিছন যাইয়া উঠিলেন, ইহাই বা কী করিয়া বিশ্বাস করা যায়? তাহার পর, পুণ্ডরীক যে মারা গেলেন, কী অসুখ হইয়াছিল তাঁহার? শুধুমাত্র কামবেদনায় মৃত্যু তো সম্ভব নহে? করোনারি থ্রমবসিস্ হইলে বিশ্বাস করা যাইত। তাঁহার মৃতদেহ? তাহাও চন্দ্রলোকে যাইয়া পচিল না, গলিল না, একেবারে অবিকৃত থাকিয়া গেল এবং শাপান্তে একবার-পরা জামার মত সেই পুরানো দেহ পরিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া উঠিলেন, এই বা কেমন কথা। অমন কথা বলিতে নাই, কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাহার পর জন্মান্তর। এবার যাহোক করিয়া জন্মিয়াছি, ইহার পর আর জন্মিব কিনা, তাহারই বা কী নিশ্চয়তা—"ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" জননান্তরসৌহৃদানি? ও এক পাগলামি। এ জন্মেই দুই দিন দেখা না হইলে আমরা চেনা মানুষকে কতই না মনে রাখি, তা আবার জন্মান্তরীণ প্রেম। ও বাজে কথা। আর ফিরিস্তি দিতে চাই না। কাদম্বরীর অনেক কথাই এমনি বাজে কথা মনে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, প্রাচীন সাহিত্যের জন্য প্রাচীন জীবন-চেতনার অভিজ্ঞতা চাই। তাহারই জন্য কিংবদন্তীর আলোচনা অপরিহার্য। এখন কিংবদন্তীর আলোচনা করা যাক। পণ্ডিতেরা বলেন, কাদম্বরীর নায়ক চন্দ্রাপীড়। সেই চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার। চন্দ্র ও সোম অভিন্ন। তাই সোমের কিংবদন্তী আমাদের প্রথম আলোচ্য—

সোম :

সোমযজ্ঞ বৈদিকযজ্ঞের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া সোম বৈদিক দেবগণের মধ্যে এক বিশিষ্ট দেবতা। চারিটি বা পাঁচটি সূক্তে তাঁহাকে আবাহন করা হইয়াছে এবং ছয়টি সূক্তে দ্বান্দ্বিক দেবতা হিসাবে ইন্দ্র, অগ্নি, পূষন্ বা রুদ্রের সহিত তাঁহাকে আবাহন করিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে শতাধিকবার এই

দেবতাটির নামের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই পৌনঃপুনিক উক্তির নজিরে বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া বৈদিক দেবগণের মধ্যে সোমের তৃতীয় স্থান। ইন্দ্র ও বরুণের মনুষ্যকল্প রূপের মত সোমের রূপ স্পষ্ট নহে। সোমগুল্ম ও সোমরসের ঘন ঘন ডাক পড়ায় কবিগণের কল্পনায় অপ্রত্যক্ষতা অপেক্ষা প্রত্যক্ষতার আধিক্য ধরা পড়ায় ইহার মনুষ্যোচিত রূপ-কল্পনায় বাধা ঘটিয়াছে প্রচুর। সেই কারণে তাঁহার মনুষ্যোচিত আকৃতি ও ক্রিয়াকারিত্বের উল্লেখ খুব কমই করা হইয়াছে। অন্যান্য শক্তিশালী দেবগণের আশ্চর্যজনক ও বীরত্বব্যঞ্জক কার্যাবলীর প্রচুর বর্ণনা আছে। সোমের ভাগ্যে উহা খুব কমই জুটিয়াছে। অন্যান্য দেবগণের ন্যায় ইন্দু বা সোমনামে তাঁহাকেও যজ্ঞে আবাহন করা হইয়াছে।

সোমগুল্মের নিপীড়ীয়মান অংশকে 'অংশু' বলা হয়। পীড়নের চাপে বৃন্ত হইতে দুগ্ধ উছলিয়া ওঠে। শ্যেনপক্ষী এই সোমগুল্ম স্বর্গ হইতে মর্ত্যে বহিয়া আনিয়াছে। সোমরসকেও ইন্দু বলা হয়। সোম বলিতে যেমন রসকে বোঝায়, তেমনি গুল্মকেও বোঝায়। দুগ্ধ বা ঘৃতকে যেমন 'মধু' বলা হইত, তেমনি 'মধু' বলিতে সোমকেও বুঝাইত। কিংবদন্তীর দিক হইতে 'অমৃত' বুঝাইতে সোমকেও 'মধু' বলা হইত। সোমের যত রূপক নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত নামটি হইল 'ইন্দু'। নিপীড়িত সোমের নির্যাসকে নদীতরঙ্গের সহিত তুলনা করা হইত। ইহাকে সরাসরি মধুতরঙ্গ বলা হইত। পাত্রস্থ রসকে মহাসমুদ্র বলা হইত। সোমগুল্ম, সোমরস ও সোমদেবতার বর্ণ-বর্ণনায় 'বভ্রু', 'অরুণ' ও 'হরি'—শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। সোম অরুণ-বৃক্ষের শাখা, দুগ্ধবতী অরুণ প্রশাখা। ব্রাহ্মণগুলিতে সোমগুল্মের বর্ণ অরুণবর্ণ এবং সোমযজ্ঞে সোমক্রয়ে-মূল্যায়নীকৃত গাভীকেও অরুণবর্ণ হইতে হইত কারণ সোমের বর্ণের সহিত তাহার বর্ণের সাদৃশ্য থাকা চাই।

ঋগ্বেদে সোমের মধ্যে তিন শ্রেণীর মিশ্রণ দেখা যায়—দুগ্ধ, দধি ও যব। এই মিশ্রণের রূপক নামটি হইল বাস বা বস্ত্র। এইখানে সোমের সৌন্দর্য ও প্রসাধন-শ্রীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আপ্যায়ন' যজ্ঞে সোম চন্দ্রের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন। সোমরসের সহিত জল মিশ্রণের সূত্রে সোমের সহিত জলের সম্পর্ককে নানা ভাবে ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি নদীগুলির প্রভু ও রাজা, স্ত্রীগণের স্বামী, সামুদ্রিক রাজা ও দেবতা। কতিপয় স্থানে দুহ্যমান সোমকে বৃষ্টি বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর ব্রাহ্মণে জল ও অমৃত একাত্ম।

এই একাত্মীকরণ হইতেই শ্যেন কর্তৃক স্বর্গ হইতে মর্ত্যে সোম আনয়নের কিংবদন্তীটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

সোম হইল জলের মধ্যে জায়মান বিন্দুটি। অতএব সোম হইল জলের ভ্রূণ। জলের নবজাত শিশুটি হইল গন্ধর্ব এবং জল তাহার জননী।

রসের হরিদ্বর্ণটি কবি-কল্পনায় দাঁড়াইল সোমের ঔজ্জ্বল্য। উহাই তাহার কায়িক সৌন্দর্য। তাহার কিরণেরও উল্লেখ আছে এবং সূর্যের সহিতও তাঁহার সমন্বয় ঘটিয়াছে। তাঁহার দীপ্তি সূর্যের মত; কখনও বা সূর্যের সহিত তিনি দীপ্ত হইয়া ওঠেন; কখনও বা সূর্যের কিরণে তিনি আবৃত। কখনও বা সূর্যের মতনই তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে কিরণমালায় পূর্ণ করিয়া তোলেন। জন্মের পর সূর্যকন্যা তাঁহার শুচিতা বিধান করেন। সেই কারণে তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তিনি অন্ধকারকে কিরণমালায় বিতাড়িত করিয়া উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করেন।

সোমের বৈদ্যোচিত শক্তিও কম নয়। তিনি পীড়িতের ঔষধ-বিশেষ। তিনি চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসায় পীড়িত স্বাস্থ্যলাভ করে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায় এবং খঞ্জও চলচ্ছক্তি লাভ করে। তিনি হইলেন মনুষ্যদেহের অধি-দেবতা। মানুষের শরীরের প্রতি অঙ্গে তাঁহার প্রভাব। তাঁহারই কৃপায় মানুষ এ জগতে পরমায়ু লাভ করে।

অগ্নি, পূষন্ ও রুদ্রের সহিত সোমকে আবাহন করা হয়। সোম অন্তরীক্ষ দেবতা হইয়াও স্বর্গীয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সত্যকারের আবাসভূমি হইল স্বর্গ। সোম স্বর্গস্থ দেবতা এবং মর্ত্যে তাঁহাকে আনা হইয়াছে। বোধহয় এইরূপ বিশ্বাস হইতেই সোম ও শ্যেনের কিংবদন্তীটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিংবদন্তীটি পুরাপুরি ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে ইনি গায়ত্রীরূপে সোমকে বহন করিয়া লইয়া যান। ঋগ্বেদে শ্যেনই ইন্দ্রের নিকট সোম বহন করিয়া লইয়া যান। একটিমাত্র স্থানে সোম যজ্ঞে উপস্থিত ইন্দ্রকে শ্যেন বলা হইয়াছে। Bloomfield-এর মতে মেঘ হইতে বিদ্যুতের অবতরণ ও বৃষ্টিপাত সূচক প্রাকৃতিক ঘটনা ইন্দ্র-শ্যেন কিংবদন্তীটির মূলে আছে।

ওষধিপতিত্ব ব্যতিরেকেও সোমকে রাজা বলা হয়। তিনি নদীর রাজা, পৃথিবীর রাজা, দেবগণের রাজা, ব্রাহ্মণের রাজা, মরণশীল জীবনের রাজা।

বৈদিকোত্তর সাহিত্যে চন্দ্রই সোমের বাচক। দেবতারা তাঁহাকে পান করিয়া ফেলেন, তাই তিনি ক্রমশঃই ক্ষীয়মান এবং সূর্য তাহার ক্ষতিপূরণ করেন। ছান্দোগ্য

উপনিষদে আছে চন্দ্র হইলেন রাজা সোম। ইনি দেবগণের আহার। দেবতারা উঁহাকে পান করিয়া ফেলেন। অথর্ববেদের কতিপয় স্থানে সোম চন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনেকের মতে ঋগ্বেদের কতিপয় অর্বাচীন সূক্তে সোম ও চন্দ্র একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন। সোমের সহিত সূর্যকন্যা সূর্যার বিবাহ সূক্তেই এই একাত্মতা বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে। যে পদ্ধতিতে দ্যুস্থান সোম চন্দ্রের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। এক দিকে সোম হইলেন দ্যুস্থানগত এবং উজ্জ্বল ; কখনও বা অন্ধকারের নাশক এবং জলের মধ্যে উপচীয়মান ; অন্যদিকে ইনি ইন্দু বা বিন্দু। তুলনায় চন্দ্রের ধারণাই আসিয়া পড়ে। কোনস্থানে পাত্রস্থ সোমকে জলের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইতে আবাহন করা হইয়াছে। অন্যস্থানে সমুদ্রাভিমুখী ইন্দুরূপী সোমকে গৃধ্রচক্ষু বলা হইয়াছে। ইনিই চন্দ্র।

Hillebrandt ঋগ্বেদের কয়েকটি স্থানে ইহার একাত্মতাই কেবল স্বীকার করেন নাই, ঋগ্বেদের নবম অষ্টকে সোমই চন্দ্র বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই অংশে সোম কোথায়ও গুল্মমাত্র নয়। নবম অষ্টকখানি প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রসূক্ত। তাঁহার মতে ঋগ্বেদের কী প্রথম অংশে, কী অর্বাচীন অংশে, সোম কোথাও বা গুল্ম বা রস, কোথাও বা চন্দ্র দেবতা। তাঁহার ধারণা, চন্দ্র দেবতা হিসাবেই সোম বৈদিক মত ও বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি। জগৎ সৃষ্টি ও শাসনের ব্যাপারে ইনি সূর্য অপেক্ষাও শক্তিশালী। জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে চন্দ্রের পরেই ইন্দ্রের স্থান।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে এইরূপ তর্ক তোলা হয় যে ঋগ্বেদের সোম সম্পর্কে যে প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দেবতা গুল্ম ও রস। তাহা ছাড়া পরবর্তী সাহিত্যেই সোমের সহিত চন্দ্রের একাত্মতা খুব স্পষ্ট এবং সমগ্র ঋগ্বেদে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নাই যেখানে সোম ও চন্দ্র একাত্ম বা সোম দেব-ভোজ্য। কেবল যে সকল ক্ষেত্রে সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট সোমের ঔজ্জ্বল্য খুব হাল্‌কাভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রেই চন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ইহাই সম্ভব যে সোমসূক্তের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপরিস্ফুট বিস্তৃত রূপকগুলির মধ্যে সোমের সহিত অমৃতের অবগুণ্ঠিত একাত্মতাই ফেনাইয়া উঠিয়াছে। সোমের জ্যোতিষ্ক প্রকৃতি অথবা চন্দ্রের বৃদ্ধি স্বভাবের সমান্তরাল সোমের আপ্যায়ন স্বভাব উক্ত ধারণার মূলীভূত কারণ। মোটের উপর কয়েকটি পরবর্তীকালের দৃষ্টান্ত ছাড়া ইহাই মনে হয় যে ঋগ্বেদের ঋষিগণের চক্ষে সোম হইলেন অন্তরীক্ষস্থান গুল্ম ও রসের প্রতিরূপ। ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে, যে-সকল

বৈদিক ভাষ্যকারেরা সোম ও চন্দ্রকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা জানিতেন না যে ঋগ্বেদে সোম বলিতে চাঁদকেই বোঝায়।

বেদের সোম আবেস্তার Haoma। ইন্দো-ইরানীয় যুগে ইহার প্রস্তুতি ও উৎসব প্রচলিত ছিল। কী বেদে, কী আবেস্তায়, সোমের আবাস হইল স্বর্গে। স্বর্গ হইতে ইহার মর্ত্যে আগমন। উভয়তঃই সোমরস দেবাভিমানী ও রাজা বলিয়া কথিত। এই দিব্য মাদক পানীয়ে বিশ্রাম সম্ভবতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের।

তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল এই, সোম প্রথমে ছিল গুল্ম বিশেষ। তাহার পর ইহার অভিধেয় হইল রস। রসের বর্ণচ্ছটায় ইহার সৌন্দর্য আবিষ্কৃত হইল। ইহার অপর নাম হইল অমৃত। এই অলৌকিক মাদক পানীয় পৃথিবীর নহে, স্বর্গের। স্বর্গ হইতে ইহার মর্ত্যে পরিক্রমণ। পরিক্রমণের ব্যাপারে সোমের সহিত জড়িত হইয়া উঠিল শ্যেন পক্ষীর কিংবদন্তীটি। ইহার গুরুত্ব দেখা দিল এবং তাহার ফলেই সোমযজ্ঞের সৃষ্টি। সোম দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং বৈদিক দেবগণের মধ্যে সোম তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন। দেবতাদের সহিত সম্পর্ক থাকায় ইনি দেবভোজ্য হইয়া উঠিলেন। আবার সোমপাত্রে যখন ইহার আপ্যায়ন দেখা দিল, তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল, তখন তাহার মধ্যে চন্দ্রের প্রকাশ ঘটিল। সৌন্দর্যে ও স্বচ্ছতায় সোম চন্দ্রতুল্যই বটে। চন্দ্রের ভূমিকায় সোম সূর্যের পাশে আসিয়া উঠিলেন। ইহার যেমন অন্ধকার নাশের ক্ষমতা জন্মিল, তেমনি ইনি দেবভোগ্য হইলেন। দেবভোগ্য হওয়ায় ইহার ক্ষয় দেখা দিল, সে ক্ষয় পূরণ করিলেন সূর্য। শুধু দেবতা নন, শুধু আলোকের আধার নয়, শুধু অমৃতের ধারক নন, ইনি রাজা, বনস্পতির রাজা, পৃথিবীর রাজা, দেবতাদের রাজা। সূর্যার সহিত ইহার বিবাহ হইল। ইঁহার অনেক স্ত্রী। স্ত্রীগণের অন্তঃপুর হইল চন্দ্রলোকে। ইনি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য, ইঁহার কৃপায় অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায়, খঞ্জ পায় চলচ্ছক্তি। ইঁহার উপাসকদের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। সে লোকে অনন্ত অক্ষয় আলোক। সেখানে থাকেন যম। এখানে আসিয়া সাধকেরা অমরতা লাভ করেন। অতএব দেখা গেল, সামান্য গুল্ম ভূমিকা হইতে সোম উত্তীর্ণ হইলেন দেবত্বে। যে-সে দেবতা নয়, আলোকের দেবতা, অমরতার দেবতা। চন্দ্র সম্পর্কে এই কিংবদন্তী ভারতের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি নয়। ইহার পশ্চাতে মানব মনের যে বিশ্বাস জড়াইয়া আছে, তাহার বয়স ইন্দো-ইরানীয় সংস্কৃতির বয়স নহে, তাহা ইন্দো-ইউরোপীয়। এই বৈদিক সংস্কারের পর সোমের যে পৌরাণিক সংস্কার দেখা দিল, তাহাতে তাহার বৈশিষ্ট্য আরও বাড়িল।

পৌরাণিক যুগে দেখা যায়, দেবতারা মানুষের অনেক কাছাকাছি আসিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের মনুষ্য কল্পরূপটি অনেক স্পষ্ট, বৈদিক দেবগণের মত অত অস্পষ্ট নয়। পার্থিব রাজগণের সহিত দেবগণের মেলামেশা অনেক সহজ হইয়া উঠিয়াছে। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের সাহায্যের জন্য পার্থিব রাজাদের ঘন ঘন ডাক পড়িতেছে। রাজারাও সেই ডাকে সাড়া দিয়া ইন্দ্রের পক্ষে অসুরদের সহিত লড়াই করিতেছেন। বিজয় লাভের পর দেবরাজ ইন্দ্রের হাত হইতে পারিজাতের মালা লইয়া কণ্ঠে দোলাইয়া তাঁহারা অলকানন্দার তীর বাহিয়া বা আকাশপথে পুষ্পক যানে মর্ত্যে ফিরিতেছেন। পৌরাণিক যুগের স্বর্গ-মর্ত্যের অতি-সান্নিধ্যের ছায়া পড়িয়াছে যুগকাব্যে, মহাকাব্যে ও নাটকে। রাজা দিলীপ দৈত্য বিজয়ের পর অলকানন্দার তীর বাহিয়া ফিরিবার পথে স্বর্গ-গঙ্গার কল-কল্লোলে সুরভি ধেনুর আহ্বান শুনিতে না পাইয়া অভিশপ্ত হইলেন। দুষ্মন্ত মালতির মুখে ইন্দ্রের আমন্ত্রণ পাইয়া স্বর্গে গেলেন এবং শত্রুজয় করিয়া পুষ্পক বিমানে ফিরিবার কালে মারীচের আশ্রমে অবতরণ করিয়া পুত্র ভরত ও পত্নী শকুন্তলার সহিত মিলিত হইলেন। সৌন্দরানন্দের নন্দ সুন্দরী অপেক্ষা স্বর্গ কন্যারা আরও সুন্দরী কিনা, তাহা জানিবার জন্য স্বর্গে সফর করিতেছেন। ইন্দ্র বিপন্ন হইলেই পুরূরবা স্বর্গে যাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় পাণিপ্রার্থী দেবগণ বিফল মনোরথ হইয়া স্বর্গে ফিরিতেছেন। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় শচীদেবীর উপস্থিতি। স্বর্গ কন্যা উর্বশীর প্রেমে মর্ত্যের মানুষ প্রতিষ্ঠানের রাজা পুরূরবা উন্মত্ত। মর্ত্য প্রেমের আকর্ষণে স্বর্গকন্যা উর্বশীর স্বর্গচ্যুতি, ভরতের অভিশাপ। মাঘে কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নারদের আকাশ হইতে অবতরণ। মেনকার সখী সানুমতীর ভূতলে লুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে কুড়াইয়া লইয়া আকাশপথে মারীচের তপোবনে উপস্থিতি। অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া রঘুর সহিত ইন্দ্রের লড়াই। কিরাতে অর্জুনের বীর চর্যার ভয়ে অর্জুনের নিকট ছদ্মবেশী ইন্দ্রের আগমন; কিরাত বেশী শিবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ। মর্ত্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সোরগোলের জন্য ইন্দ্রের ভয়ের অবধি নাই। ইন্দ্রত্ব হারাইবার ভয়। দিলীপের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিয়া কপিলের আশ্রমে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিতেছেন, মর্ত্যবাসীর উগ্রতপস্যায় ইন্দ্রত্ব খসিয়া যাইবারও ভয় কম নাই। বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে পাঠাইতেছেন। তাহার পর অবতারবাদ। মর্ত্যের বিপ্লবে স্বর্গের দৈবসভাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রাবণ বধের জন্য বিষ্ণুলোক ছাড়িয়া বিষ্ণু রাম অবতার গ্রহণ করিতেছেন, বামনাবতারে বলিকে পাতালে পাঠাইতেছেন,

কৃষ্ণাবতারে কংস নিধন করিতেছেন। পরশুরাম অবতারে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিতেছেন। আবার ইহার অধোগতিও বড় কম নয়; মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ। আবার এই অবতারবাদের সহিত জড়াইয়া আছে প্রাক্তন কর্মফল। ইহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড অব্যাহতি পান নাই। তাহার পর অভিশাপ। বৈদিক যুগেই অভিশাপের উন্মেষ ঘটিয়াছে, পরে মহাকাব্যের মধ্য দিয়া পৌরাণিকযুগে ইহা পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অভিশাপের বৈশিষ্ট্য হইল এই, অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আশ্বাসও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। অভিশাপ আবার জন্মান্তরেরও কারণ। কর্ম ছাড়া জন্ম নাই এবং জন্মের নির্দেশক প্রাক্তন কর্ম। তাহাছাড়া আর একদল স্বর্গের বাসিন্দা আছেন। তাঁহারা হইলেন—গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নরী ইহাদের কথা পরে বলিতেছি। পৌরাণিক যুগে ইঁহারাও দেবতাদের ছাড়িয়া মর্ত্যের মানুষের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। আপাততঃ ইঁহারা হিমালয়ের নিকটবর্তী কিংবদন্তীর রাজ্য হেমকূটে অথবা কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেছেন।

তাই বলিতেছিলাম, এই যুগের টানে সোম যে কেবল তাহার গুল্মত্ব ও রসত্ব ছাড়াইয়া দেবত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সূর্যাকে বিবাহ করিয়া স্বামীত্বে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, নদীর রাজা, পৃথিবীর রাজা, মরণশীলের রাজা, দেবগণের রাজা হইয়া অগ্নি, পূষন্ ও রুদ্রের সহিত যজমানের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, লোক-প্রিয় দেবতা হিসাবে ইন্দ্রকেও হটাইয়া দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আর বৈদিক দেবগণের মত ছায়াপুরুষ নন, তিনিও প্রয়োজন হইলে কায়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বিশেষ করিয়া বিষ্ণু ও মহেশ্বর। শিব বিষ্ণু হইতেও প্রাচীন। তাই তিনি দেবাদিদেব। সেই শিবও চন্দ্রকে মানিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহার ললাটে শশিকলা। শুধু তাহাই নয়, তিনি উমার সহিত যুক্ত হইয়া সোম। তাঁহার এই সোমত্বের সূচনা অবশ্য পৌরাণিক যুগের অনেক পূর্ব হইতে। সায়নাচার্য তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 'সোম' শব্দের টীকায় বলিয়াছেন 'উময়া সহ বর্তমানঃ'—অর্থাৎ উমার সহিত বর্তমান যে ব্রহ্ম, তিনিই সোম। এখানে উমা ব্রহ্মার জ্ঞানরূপা। বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যে মহীধর এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে ভট্ট ভাস্করমিশ্র সোম-শব্দের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক মনে রাখিতে হইবে, এই সোম বৈদিক যুগেই বনস্পতিত্ব লাভ করিয়াছেন, চিকিৎসা শক্তিতে তিনি নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূজারী বা সাধকগণকে তাঁহার শাশ্বত ধামে লইয়া রাখেন। তাঁহার ধামে শাশ্বত আলোক। এখানে আসিলে

সাধক অমরতা লাভ করিয়া যমের সহিত বাস করিতে পারেন। এ ধাম অক্ষয়। সোমের এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ চন্দ্র যদি পুণ্ডরীকের মৃতদেহ চন্দ্রলোকে লইয়া রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শবদেহ বিকৃত হইবার কথা নয়। মৃত্যুর পূর্বে যেমনটি ছিল তেমনটি থাকিবার কথা। কেবল পার্থক্যের মধ্যে এ দেহে জীবন থাকিবে না। তাহা ছাড়া সোম নিজেই যখন সুবৈদ্য বলিয়া পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁহার চিকিৎসাধীনে শবদেহের বিকৃতির কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল ইন্দ্রায়ুধ-অবতার-মুক্ত কপিঞ্জলের জবানীতে নয়, মহাশ্বেতার আশ্রমে কাদম্বরীর দেহস্পর্শে মৃত চন্দ্রাপীড়ের দেহনির্গত আলোকদীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণীর মাধ্যমে চন্দ্রের স্বীয় উক্তির মধ্যে এই সত্যের সমর্থন আছে। শুধু পুণ্ডরীকের শবদেহ কেন, চন্দ্রাপীড়ের শবদেহ মহাশ্বেতার আশ্রমে থাকিয়াও যে অবিকৃত থাকিবে, তাহারও কারণ চন্দ্রাপীড়ের শবদেহের উপর চন্দ্রের আধিপত্য। দ্বিতীয় প্রস্তাব চন্দ্রলোক হইতে মহাপুরুষটি যে অচ্ছোদের তীরে অবতরণ করিয়া পুণ্ডরীকের শবদেহ লইয়া চন্দ্রলোকেই ফিরিয়া গেলেন, ইহা সোমের উপর পৌরাণিক চেতনার ফল। পৌরাণিক যুগে স্বর্গ ও মর্ত্যের সম্পর্ক আধুনিক যুগে শহর ও মফঃস্বলের সম্পর্ক।[১] মর্ত্যের রাজারা যেমন ঘন ঘন স্বর্গ ঘুরিয়া আসিতেছেন, স্বর্গের দেবতারাও যে প্রয়োজনে মর্ত্য ঘুরিয়া যাইবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কী আছে। পূর্বেই বলিয়াছি অভিশাপ এড়াইবার সাধ্য দেবতারও নাই। তাই পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রকেও চন্দ্রাপীড়ের অবতার গ্রহণ করিতে হইয়াছে; শুধু তাহাই নয়, একই জীবনে দুইবার জন্মাইতে হইয়াছে। পুণ্ডরীক মৃত্যুর পূর্বে চন্দ্রকে যে অভিশাপ দিয়াছিল, তাহার মূলে কাদম্বরীর প্রতি তাহার অনঙ্গবেদনা ব্যাতিরেকেও যে সত্যটি আছে, সে সত্যটি বৈদিক যুগেই প্রতিষ্ঠিত। Macdonell-এর ভাষায় তাহা হইল —"Soma also awakens eager thought". বুঝিলাম সোম ও চন্দ্র অভিন্ন। সোম দেবতা এ কথাও মানি। চন্দ্র যে চন্দ্রাপীড়ের অবতার গ্রহণ করিলেন, তাওতো দেখিতেছি, কিন্তু সেই চন্দ্রাপীড় যিনি পূর্বজন্মে চন্দ্র দেবতা ছিলেন, তাহাকে দিয়া আবার প্রেমের বেসাতি কেন? ইহার উত্তর হইল এই, সোমযজ্ঞের সহিত প্রেমিক-প্রেমিকার সূক্ষ্ম সূত্রের সম্বন্ধ আছে। সোমযজ্ঞে দুইটি অরণির সংঘর্ষের ফলে যজ্ঞীয় অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত। ঐ অরণি দুইখানিকে প্রেমিক-প্রেমিকা মনে করা হইত, যেমন পুরূরবা ও উর্বশী। অতএব সোম প্রেম-কাহিনীতে নিজেকে জড়াইবার দাবি রাখে এবং এ দাবি খুব প্রাচীনকালেই

(১) "আনাকরথবর্ত্মনাম্"—রঘুবংশম্। সূর্যবংশ পুরাণে একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ।

উদ্ভাসিত। চন্দ্রাপীড়ের সম্পর্কে আর একটু কথা পত্রলেখাকে লইয়া। পত্রলেখা পূর্বজন্মে রোহিণী ছিলেন। চন্দ্র চন্দ্রাপীড় অবতার গ্রহণ করিলে চন্দ্রাপীড়ের পরিচর্যার জন্য রোহিণী পত্রলেখার অবতার গ্রহণ করেন। যজুর্বেদে আছে সোম চন্দ্রলোকটি তাঁহার স্ত্রীগণের জন্য রাখিয়াছেন। বিক্রোমোর্বশীতে দেবী ঔশীনরী বলিয়াছেন—"এষাহং দেবতামিথুনং রোহিণী-মৃগলাঞ্ছনং সাক্ষীকৃত্য আর্যপুত্রমনু-প্রসাদয়ামি।" রোহিণীকে চন্দ্রের স্ত্রীরূপে কল্পনাও বৈদিকোত্তর যুগের। ঋগ্বেদে ইহার সম্পর্ক গন্ধর্বের সহিত।

অতএব দেখা গেল বাণ চন্দ্রাপীড়-চরিত্রের ভিত্তিরচনায় ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা-বিন্যাসে চন্দ্রকে লইয়া যে ব্যাপারটি ঘটাইলেন, তাহা সোমের কিংবদন্তীতে অনুস্যূত এবং যাহাদের জন্য এই রচনা, তাঁহারা এই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিতেন। সহৃদয়ের এই বিশ্বাসের পটভূমির উপর কাদম্বরী রচিত হওয়ায় সেকালের পাঠকেরা ইহার মধ্যে কোন অনৌচিত্য বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেন না। বরং তাঁহাদের চেতনার মধ্যে যাহা ছিল, কাব্যের মধ্যে তাহাকে পাইয়াই তাঁহারা খুশি হইয়াছিলেন। কিংবদন্তীর প্রতি বাণের পাঠকদের যে কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহার নজির আছে হর্ষচরিতে বাণের বংশবর্ণনার জবানীতে। তিনি যখন নানাদেশ ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়াছেন, তখন গল্প শুনিবার জন্য উৎসুক শ্রোতারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। কবির প্রশ্ন—কোন্ শ্রেণীর গল্প চাই? তাহাদের উত্তর—কিংবদন্তীর রাজাদের। তৎকালীন ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা কিংবদন্তীগত চরিত্রের প্রতি সেকালের পাঠকের যে ঔৎসুক্য ছিল বেশী, তাহা বাণের হর্ষচরিতোক্ত বিবৃতি হইতে জানা যায়।

দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় গন্ধর্ব-অপ্সরা :—

গন্ধর্ব ঃ

ঋগ্বেদে অপ্সরাদের প্রসঙ্গেই গন্ধর্বের উল্লেখ আছে। গন্ধর্ব হইল পুরুষ। ঋগ্বেদে গন্ধর্ব শব্দের কুড়িবার উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে তিনবার আছে বহুবচনে, কিন্তু অথর্ববেদে দেখা যায় ৩২ বারের মধ্যে ১৬ বার বহুবচনে। আবেস্তায় গন্ধর্বের প্রতিশব্দ হইল Gandarewa দৈত্য বিশেষের অর্থে। ইহার উল্লেখও কয়েকবার দেখা যায় কিন্তু শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত। এক হইতে বহুবচনে উল্লেখ থাকায় মনে হয় কালক্রমে গন্ধর্ব একটা জাতিতে পরিণত হয়। পরবর্তী সংহিতায় দেখা যায় দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অসুরদের পাশে ইহারা একটি জাতি-

বিশেষ। যজুর্বেদে তাহাদের সংখ্যা ২৭ এবং অথর্ববেদে ৬৩৩৩। ইহা হইতে মনে হয় গন্ধর্বদের কল্পনার উৎস ইন্দো-ইরানীয় যুগে। ঋগ্বেদে গন্ধর্ব সম্পর্কে যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহা এত অস্পষ্ট যে তাহা হইতে তাহাদের মৌলিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত গন্ধর্ব শব্দের একবার উল্লেখ আছে কিন্তু অষ্টম মণ্ডলে ইন্দ্রশত্রু হিসাবে ইহার দুইবার উল্লেখ আছে। শব্দটি কেবল নাম হিসাবেই ব্যবহৃত। কখনও কখনও বিশ্বাবসু শব্দটিকে ইহার বিশেষণ রূপে দেখা যায়। একটি মাত্র সূক্তেই দেখা যায় বিশ্বাবসু শব্দটি গন্ধর্ব শব্দ ছাড়াই ব্যবহৃত হইয়া গন্ধর্বের বাচক হইয়াছে। অর্বাচীন সংহিতায়, ব্রাহ্মণে এবং বৈদিকোত্তর সাহিত্যে একক গন্ধর্ব হিসাবে ইহার বহুল প্রয়োগ আছে।

ঋগ্বেদে গন্ধর্বের স্থান হইল বায়ু বা আকাশের উচ্চতর পদবীতে। সেখানে তাহার অবাধ গতি। বায়ুস্তরের গভীরেও সে চলাফেরা করে। সে দিব্য এবং স্বর্গের উচ্চ মঞ্চে তাহাকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। সে অপ্সরা-প্রেমিক। তাঁহার বাস স্বর্গে এবং পুণ্যবানেরা তাহার সহিত বাস করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্পর্কে এক বিশেষ ধরণের দিব্য আলোকের বর্ণনাও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সূর্য, সূর্য-পক্ষী, সূর্যাশ্ব এবং সূর্যের যাহারা প্রিয়, তাহাদের সকলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। চন্দ্র-কক্ষের ২৭ তারার সহিত, বিশেষ করিয়া রোহিণীর সহিত সে সংশ্লিষ্ট। ঋগ্বেদের একটিমাত্র সূক্তে ইন্দ্রধনুর সহিতও তাহাকে সম্পৃক্ত দেখা যায়। বৈদিক সংহিতায়—অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বায়ুর সহিত তাহার উল্লেখ আছে। বৈদিকোত্তর সাহিত্য ইন্দ্রজালের নামান্তর হইল—'গন্ধর্ব-নগরী'। ঋগ্বেদে বিশেষ করিয়া নবম মণ্ডলে সোমের সহিত ইহার সম্পর্কের কথা জানা যায়। সে অমৃতের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। এই দিক্ দিয়া সে দেবগণেরও রক্ষক। স্বর্গের মঞ্চে দাঁড়াইয়া সে সোমের নানা অবস্থা লক্ষ্য করে। পর্জন্য ও সূর্যার সহিত বসিয়া সে অমৃত চায়। গন্ধর্বের মুখ দিয়া দেবগণ সোম পান করেন। সোমের সহিত সম্পর্ক থাকায় তাহার গ্রহদের সম্পর্কে জ্ঞান আছে। সোমের সম্পর্কে গন্ধর্ব ও ঋগ্বেদে ইন্দ্রশত্রু। বায়ুস্তরে অবস্থানকালে ইন্দ্র তাহাকে তীর বিদ্ধ করেন। অর্বাচীন পাঠে দেখা যায় শ্যেনরূপে বিশ্বাবসুকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সোমের আবাহন করা হইয়াছে। বিশ্বাবসু সোমকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় সোম গন্ধর্বদের সহিত বাস করিতে থাকেন। নারী জাতির প্রতি গন্ধর্বদের মোহ ছিল; বাক্ হইলেন নারী; বাকের বিনিময়ে তাই গন্ধর্বদের নিকট হইতে সোমকে

ফিরাইয়া আনা হয়। শক্রভাবের এই পরিচয়টি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। আবেস্তায়ও অনুরূপ গুল্ম আছে। বিশেষ করিয়া তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে, যে-ধনুর্ধর কৃশানু সোম-অপহারক শ্যেন পক্ষীটিকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করেন, তিনি একজন গন্ধর্ব।

জলেও গন্ধর্ব আছে। যম ও যমীর পিতামাতা বলিয়া জল-গন্ধর্ব ও অপ্সরার উল্লেখ আছে। সোম জলে ঢালিলে হইল জল-গন্ধর্ব। অথর্ববেদে আছে অপ্সরার সহিত গন্ধর্ব জলে বাস করে। আবেস্তায়ও রসাতলের প্রভু হিসাবে Gandarewa এর জলে বাস করার কথার উল্লেখ আছে।

গন্ধর্ব ও অপ্সরার মিলন অনেকটা বৈবাহিক মিলনের মত। সেই কারণে বিবাহ-উৎসবের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে। অনূঢ়া বালিকা গন্ধর্ব, সোম ও অগ্নির অধীনে। বিবাহের প্রথম দিকে গন্ধর্ব বিশ্বাবসুকে স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করা হয়। গন্ধর্বের নারীলোলুপতার কথা পরবর্তী সাহিত্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। সন্তানকামীরা সন্তান লাভের জন্য গন্ধর্ব-অপ্সরার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয় গায়ক হিসাবে মহাকাব্যে ও পরবর্তী সাহিত্যে গন্ধর্বদের যে পরিচয় আছে, ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে তাহাদের শারীরিক সৌন্দর্যের দুই-তিনটি উল্লেখ আছে। তাহাদের চুল বাতাসের মত এবং অস্ত্রগুলি খুব উজ্জ্বল। অথর্ববেদে তাহাদের আকৃতির বর্ণনা আরও স্পষ্ট। তাহারা লোমশ এবং তাহাদের অর্ধাঙ্গ পশুর আকৃতি বিশিষ্ট। তাহারা নরদ্রোহী। অন্যত্র দেখা যায় তাহারা সুশ্রী। ঋগ্বেদে তাহাদের সুরভি পরিচ্ছদের কথা আছে, আর অথর্ববেদে আছে গন্ধর্বেরা পৃথিবীর গন্ধের ঘ্রাণ লইয়া থাকে। অবশ্য 'গন্ধ' হইতে গন্ধর্ব শব্দের উৎপত্তি ধরিয়া লইলেও ইহা ইহার মৌলিক ধারণার উপর কোন আলোকপাত করে না। তাহার মৌলিক ধারণা সম্পর্কে বরং এই কথাই বলা চলে যে গন্ধর্ব এক শ্রেণীর উজ্জ্বল দিব্য প্রাণী। সে কখনও কখনও তাহার স্ত্রী অপ্সরার সহিত জলে বাস করে। কাহারো মতে গন্ধর্ব বায়ুর অপদেবতা, কাহারো মতে চন্দ্রের অপদেবতা, কাহারো মতে সোমের, কাহারো মতে উদীয়মান সূর্যের, কাহারো মতে মেঘের। কেহ কেহ বলেন, ইন্দ্রধনু গন্ধর্বের সৃষ্টি।

গন্ধর্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার এখন প্রয়োজন নাই। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে সোম বা চন্দ্রের সহিত গন্ধর্বের সম্পর্ক কতদূর। বেদে দেবতা, পিতৃপুরুষও অসুর যেমন জাতি, গন্ধর্বও তেমনি একটা জাতি। বৈদিক সংহিতায়

অগ্নি, সূর্য, বায়ু, ও চন্দ্রের সহিত তাহার উল্লেখ থাকায় তাহারা দেবতা পর্যায়ে না পড়িলেও তাহাদের কাছাকাছি যাইয়া ওঠে। দেবতারা গন্ধর্বদের মুখ দিয়া সোম পান করেন। তাহার পর সোমের সহিত তাহাদের সম্পর্ক নিবিড়। সে স্বর্গের মঞ্চে দাঁড়াইয়া সোমের নানা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। সোমের অপর নাম মধু বা অমৃত। সে অমৃতের প্রহরায় নিযুক্ত থাকে। পর্জন্য ও সূর্যার সহিত বসিয়া সে অমৃত চায়। এই সোম লইয়াই ইন্দ্রের সহিত শত্রুতা। গন্ধর্ব বিশ্বাবসু সোমকে অপহরণ করায় সোম গন্ধর্বদের সহিত বাস করিতে থাকে। যে ধনুর্ধর সোম অপহারক শ্যেনপক্ষীটিকে তীরবিদ্ধ করেন, তিনিও গন্ধর্ব। কাহারো মতে গন্ধর্ব চন্দ্রের অপদেবতা বা অতি প্রাকৃতি শক্তি, কাহারোবা মতে সোমের। অতএব দেখা যাইতেছে সোম বা চন্দ্রের সহিত গন্ধর্বের সম্পর্ক নিবিড়। এই কারণে সোম বা চন্দ্রের অবতার চন্দ্রাপীড়ের সহিত কবি গন্ধর্ব-কন্যা কাদম্বরীর যে প্রেমের কাহিনী জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহার সূত্রেরও একটা ঐতিহাসিকতা আছে। সে ঐতিহাসিকতা কিংবদন্তীর। দুইটি তরুণ-তরুণী হইলেই যে প্রেম করান যাইতে পারে, এইভাবে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীকে বাণভট্ট প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেন নাই। প্রেম-বিন্যাসের ঔচিত্য-বোধের দিক দিয়া এই প্রেম-কাহিনীর আড়ালে কিংবদন্তীর চেতনার প্রতি তিনি সচেতন। তাহা ছাড়া সোমের অবতার চন্দ্রাপীড়ের প্রেম চেতনার ঔচিত্যবোধ তিনি টানিয়া আনিয়াছেন সোমযজ্ঞের যজ্ঞীয় অগ্নি-প্রজ্বালনের উপায়ন অরণি দুইটি হইতে। ঐ অরণি-দুইখানিকে প্রেমিক যুগল মনে করা হইত। যেমন পুরূরবা ও উর্বশী। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে পুরূরবা অবশেষে যে উর্বশীর সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন, সে গন্ধর্বদের কৃপায়। গন্ধর্বদের নিকট অগ্নিযজ্ঞ শিক্ষা করিয়া তিনি গন্ধর্ব হইয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব হইবার পরে উর্বশীর সহিত তাহার মিলন হয়।

অবশ্য পুরাণে এই গন্ধর্ব মানুষের অনেক সান্নিধ্যে আসিয়া উঠিয়াছে। বেদে সোমকে কেন্দ্র করিয়া দেবতাদের সহিত তাহার কারবার, পুরাণে দেবতাও মানুষ উভয়কে লইয়া। পুরাণে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের উল্লেখ আছে। বেদে এক বিশ্বাবসুও ছাড়া অন্য কোন নাম পাওয়া যায় না। পৌরাণিক যুগে বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম। চিত্ররথের নাম বেদে নাই। মহাকবি কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে দেখা যায় যে পুরূরবার নির্দেশে চিত্ররথ উর্বশীকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন এবং কেশীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মূর্চ্ছাভঙ্গের পর যখন পুরূরবাকে দেখিয়া উর্বশী মুগ্ধ বা পুরূরবার প্রেমে পড়িয়াছে, তখন 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর'

নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্য চিত্ররথ তাহাকে স্বর্গে লইতে প্রতিষ্ঠানে আসিয়া হাজির। বাণের কাদম্বরীতে এই চিত্ররথ কাদম্বরীর পিতা। গন্ধর্বেরা স্বর্গীয় গায়ক বলিয়া বেদে কোন্ উল্লেখ নাই। মহাকাব্যেও পরবর্তী সাহিত্যই স্বর্গীয় গায়ক হিসাবেই গন্ধর্বদের পরিচিতি। এই পরিচয়টুকু কাদম্বরীতে আছে। কাদম্বরী অতি শৈশব হইতেই নৃত্য, গীত ও বাদিত্রে নিপুণ। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সহিত কাদম্বরী ভবনে প্রবেশ করিতেই শুনিতে পাইলেন বিশুদ্ধ তানমানলয়ে বেণুবীণা ঝঙ্কারের সহিত সঙ্গীত চলিতেছে। তাহার পর চন্দ্রাপীড়ের বিশ্রামস্থান কাদম্বরীর প্রসাদের সমীপবর্তী প্রমোদবনে ক্রীড়াপর্বতের প্রস্থদেশস্থ মণিমন্দিরে ব্যবস্থা হইলে চন্দ্রাপীড় যখন সেই স্থানাভিমুখে চলিলেন, তখন তাহার সহিত চলিল কতিপয় বীণাবাদিকা ও গায়িকা। চন্দ্রাপীড় যখন মণিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শিলাতলবিন্যস্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তখনও তাহার আনন্দবর্ধনের জন্য বীণা-সহযোগে সঙ্গীতের ফোয়ারা ছুটিতেছে। অবশ্য বৈদিকোত্তর সাহিত্যে 'গন্ধর্ব-নগর' বলিতে ইন্দ্রজাল বুঝাইলেও চিত্ররথের গন্ধর্ব-নগর ইন্দ্রজাল নয়। উহা বস্তুজগতের কল্পনার ঐশ্বর্যে ভারাক্রান্ত। বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের যে ঐশ্বর্য কালিদাসের কল্পনায় পড়িয়া ঠিকরিয়া লেখনী মুখে বাহির হইয়াছিল, রাজা হর্ষবর্ধনের রাজপ্রসাদের যে ঐশ্বর্য বাণ নিজের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, চিত্ররথের রাজ-বাড়ী তাহারই কল্পনাদীপ্ত রূপ। ইহার বেশী নহে। আবার কাদম্বরী অনূঢ়া বালিকা। বেদে অনূঢ়া বালিকা গন্ধর্ব, সোম ও অগ্নির অধীনে। চন্দ্রাপীড় সোমের অবতার। অতএব কাদম্বরী যদি চন্দ্রাপীড়ের প্রেমের নাগপাশে পড়িয়া থাকেন, তাহাতেও কিংবদন্তীর সূত্রেরই অবগাহন আছে।

অপ্সরা ঃ

ঋগ্বেদে অপ্সরার উল্লেখ থাকিলেও তাহার আকৃতির উল্লেখ নাই। মাত্র পাঁচটি স্থানে উল্লেখ থাকায় তাহার পরিচয়ও খুব সীমিত। স্বর্গের উচ্চতম স্থানে গন্ধর্বের দিকে চাহিয়া প্রেয়সী অপ্সরার হাসির উল্লেখ আছে। অপ্সরা হইতে বশিষ্ঠের জন্ম এবং বশিষ্ঠদের অপ্সরাগণের খুব কাছাকাছি বসিয়া থাকিবার উল্লেখ আছে। সোমরসের সহিত জল মিশাইবার প্রসঙ্গে সামুদ্রিক অপ্সরাগণের সোমের নিকট ভাসিয়া যাইবার উল্লেখ আছে। দীর্ঘকেশ ঋষি তাহার দিব্যকল্প শক্তিতে অপ্সরা ও গন্ধর্বদের পথ পরিক্রম করিতে পারেন। অপ্সরা যখন জল-পরী বা 'অপ্যাযোষা', তখন সে জলগন্ধর্বের পত্নী।

অথর্ববেদে অপ্সরাদের সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আছে। জলে তাহাদের বাস। এই জল হইতে অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহারা যাতায়াত করিতে পারে। তাহাদের নিকট প্রার্থনা করা হয়, তাহারা যেন মানুষের সান্নিধ্য ছাড়িয়া নদী বা জলাশয়ের তীরে যাইয়া থাকে। গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর সহিত যে-সকল দেবী চলাফেরা করেন, মেঘ, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রদের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাদের বর্ণনা করা হয়। তাহারা গন্ধর্বগণের স্ত্রী বলিয়া কথিত এবং গন্ধর্বগণের সহিত তাহাদের সম্পর্ক পরবর্তী সংহিতায় দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অপ্সরাগণ একশ্রেণীর জলচর পক্ষিরূপে রূপান্তরিত বলিয়া বর্ণিত। বৈদিকোত্তর সাহিত্যে দেখা যায় তাহারা অরণ্য, জলাশয় ও নদীতে, বিশেষ করিয়া গঙ্গায় বিহার করে এবং সমুদ্রে বরুণালয়েও তাহারা বাস করে। অপ্সরা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্ভবতঃ "অপ্সু সরতি।"

উক্ত উপাদানগুলির নিরিখে বলা যায় যে অপ্সরাদের সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা হইল, তাহারা এক শ্রেণীর দিব্য জলপরী। ঋগ্বেদ তো স্বীকারই করিয়াছেন যে গন্ধর্বের পত্নী হইল অপ্সরা। পরবর্তী সংহিতায় অপ্সরার স্থান পৃথিবীর দিকে আগাইয়া গেল, বিশেষ করিয়া বৃক্ষেও তাহাদের বাসস্থান নির্ণীত হইল। ন্যগ্রোধ ও অশ্বত্থ বৃক্ষে তাহারা বাস করে এবং ঐ সকল বৃক্ষে তাহাদের বীণা ও করতাল বাজিতে শোনা যায়। উডুম্বর ও প্লক্ষ বৃক্ষে গন্ধর্ব-অপ্সরারা বাস করে। তাহাদের কাছে অনুনয় করিয়া বলা হয়, তাহারা ঐ সকল বৃক্ষে থাকে থাকুক, তাহারা যেন বিবাহ-শোভা-যাত্রার প্রতি নজর না দেয়। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে অপ্সরারা নাচ, গান ও অভিনয় করে। বৈদিকোত্তর সাহিত্যে যে-সকল পর্বত অপ্সরা-গন্ধর্বগণের বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত, যে পর্বতগুলির কিছু কিছু বাস্তব, কিছু কিছু কিংবদন্তীগত। অথর্ববেদে বলা হইয়াছে যে অক্ষক্রীড়াও অপ্সরাদের প্রিয় এবং তাহাদের কৃপায় অক্ষক্রীড়ায় জয়লাভ হয় কিন্তু মস্তিষ্কবিকৃতির কারণ বলিয়া তাহাদের উদ্দেশে মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

অপ্সরার প্রেম যে কেবল গন্ধর্বদের ভাগ্যে জোটে, তাহা নয়, মানুষের ভাগ্যেও জোটে। মনুষ্যভাগ্যায়ত্ত একটি অপ্সরার প্রেমের কাহিনী বৈদিক সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। আর কয়েকটি অপ্সরার নাম মাত্র সেখানে উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে তিনটি নাম পাওয়া যায়—উগ্রজিৎ, উগ্রম্পশ্যা ও রাষ্ট্রভৃৎ, কিন্তু কয়েকটি সংহিতায় উর্বশী ও মেনকার উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে শকুন্তলা ও উর্বশীর নাম আছে। ঋগ্বেদে কেবল উর্বশীর নাম আছে। উর্বশী যে অপ্সরা, তাহার প্রমাণ,

একটি সূক্তে উর্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্মের কথা বলা হইয়াছে। আবার পরবর্তী সূক্তে আছে, বশিষ্ঠ এক অপ্সরা হইতে জাত। নদীর সহিত তাহাকে একবার আবাহনও করা হইয়াছে। পরবর্তী একটি সূক্তে ইড়ার পুত্র পুরূরবার সহিত সংলাপের সূত্রেও তাহার নাম করা হইয়াছে। সেখানে সে অন্যা। সে যেমন বায়ুমণ্ডল পূর্ণ করিয়া আছে, তেমনি দিব্য গন্ধর্বের মত দিক্‌পরিক্রমাও করিতেছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে সে মানুষের মধ্যে চারিটি শরৎ অতিবাহিত করিয়াছে এবং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু সে অনুরোধ সে রাখে নাই। তবে পুরূরবা এইটুকু ভরসা পাইয়াছেন যে তাহার পুত্র দেবপূজার অধিকার লাভ করিবে এবং পুরূরবা স্বর্গে আসিয়া সুখ ভোগ করিবে।৮ শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার পুরা কাহিনী আছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি লইয়া শতপথ ব্রাহ্মণ পুরা গল্প ফাঁদিয়াছেন। সেখানে দেখা যায় উর্বশী পুরূরবার সহিত একটি সর্তে মিলিত হইতে চাহিয়াছেন। সর্তটি হইল এই যে উর্বশী যেন পুরূরবাকে কখনও উলঙ্গ না দেখেন। গন্ধর্বেরা উর্বশীকে ফিরাইয়া লইবার জন্য চক্রান্ত করিয়া রাত্রিতে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি করিল। পুরূরবা নগ্ন অবস্থায় লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমনি সময়ে বিদ্যুতের আলোকে উর্বশী নগ্ন পুরূরবাকে দেখিয়া ফেলিল। সর্ত ভাঙিয়া গেল। উর্বশী অন্তর্হিত লইল। পুরূরবা তাহার অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি পদ্মপূর্ণ সরোবরের তীরে আসিয়া উঠিল। সেই সরোবরে আরও কয়েকটি অপ্সরার সহিত জলচর পক্ষিরূপে উর্বশী সাঁতার কাটিতেছে। উর্বশী তাহার নিকট আত্ম-প্রকাশ করিল। পুরূরবার অনুনয়ের উত্তরে বলিল, এক বৎসর পরে একটি রাত্রির জন্য সে তাহার সহিত মিলিত হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে পুরূরবা আসিয়া হাজির হইল। পরদিন গন্ধর্বেরা তাহাকে এই বর দিল যে বিশেষ পদ্ধতিতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সে গন্ধর্ব হইয়া উঠিবে।

পুরূরবা-উর্বশীর কাহিনী ঋগ্বেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে, বৃহদ্দেবতায়, মৎস্য পুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, পদ্মপুরাণে, হরিবংশে, ভাগবতে ও কথাসরিৎ সাগরে পাওয়া যায়।

নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের জন্য পিতামহ আচার্য ভরতকে কতিপয় অপ্সরা দান করেন—মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিত্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, বিপুলা, সুমালা, সন্ততি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সপুষ্কলা, কমলা। ইহাদের উৎপত্তি কিংবদন্তী কিনা বলা কঠিন।

বাণভট্ট অপ্সরাদের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় অপ্সরাগণের বাস দেবলোকে। অপ্সরাদের চতুর্দশ কুল। ব্রহ্মার মানস হইতে এক কুল; দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন, অমৃত, সূর্যরশ্মি, চন্দ্রকিরণ, সৌদামিনী, মৃত্যু, মকরকেতু—এই একাদশ হইতে একাদশ কুল; দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা মুনি ও অরিষ্টার সহিত গন্ধর্বদিগের সমাগমে আরও দুই কুল—একুনে চতুর্দশ কুল। মুনির গর্ভে চিত্ররথের এবং অরিষ্টার গর্ভে হংস জন্মগ্রহণ করেন। চিত্ররথ ও হংস উভয়েই গন্ধর্বরাজ। চিত্ররথের স্ত্রী অপ্সরা মদিরা। অপ্সরাদের যে কুল অমৃত হইতে উৎপন্ন, মদিরা অপ্সরা সেইকুল জাত। গন্ধর্বরাজ হংসের স্ত্রী অপ্সরা গৌরী। গৌরী কোন্ কুলোদ্ভূত সেকথা না বলিলেও গৌরী যে অপ্সরা তাহাও বলিয়াছেন। চিত্ররথ-গন্ধর্ব ও মদিরা-অপ্সরার কন্যা কাদম্বরী এবং গন্ধর্ব হংস ও অপ্সরা গৌরীর কন্যা মহাশ্বেতা। বাণের এই বিবৃতি হইতে দুইটি সত্যের উদ্ধার মিলিতেছে; প্রথমটি হইল ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত। গন্ধর্ব-অপ্সরাদের সম্পর্কে ধারণার যে ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, বাণ তাহা জানেন। জানেন যে তাহা আমাদের বিবরণীর সহিত বাণ-প্রদত্ত চতুর্দশ কুলের পঞ্জী মিলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে। দ্বিতীয় সত্যটি হইল, গন্ধর্ব ও অপ্সরার উৎপত্তি স্থল এবং পুরুষ হইলে গন্ধর্ব এবং স্ত্রী হইলে অপ্সরা। এখন দেখা যাক, কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা—এই দুই গন্ধর্বকন্যা বা অপ্সরাকে বাণ তাঁহার কাব্যের মধ্যে কীভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইবে, তাঁহার সাহিত্যের চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে যে মানবিকতা বা বাস্তবস্পর্শ আছে, তাহার সহিত কিংবদন্তী মিলাইয়া তিনি কেমন করিয়া আলোয়-আঁধারে কীরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বাণের সাহিত্য চেতনার দুইটি দিক—একটি বাস্তব বা মানবিক চেতনা, অপরটি কিংবদন্তী চেতনা। একটি আধেয়, অপরটি আধার; একটি বস্তু অপরটি রূপ। এই উভয়ের সামঞ্জস্যে তাঁহার চরিত্রগুলির সৃষ্টি বলিয়া সে চরিত্রে উগ্র মানবিক বস্তুর প্রখর সূর্যালোক নাই আবার কেবল কল্পনাঘন কিংবদন্তীর নিঃসাড়-অস্পষ্ট অন্ধকারও নাই। যাহা আছে, তাহা তনু অন্ধকারের অস্পষ্টতায় প্রশান্ত চন্দ্র-কিরণের অবগাহন। মিহি অন্ধকারের উপর চাঁদের রজত কিরণের ঘন বর্ষায় দিনের মত মনে হইলেও চন্দ্রালোকদীপ্ত রজনী দিন নহে। উহা না-দিন, না-রাত্রি। দিন ও রাত্রির আলো অন্ধকারের মিলনে উহা এক তৃতীয় বস্তু। কঠিন বাস্তববোধকে কল্পনায় চাঁদের আলোয় স্নান করাইয়া লইলে উহার যে রূপ হয়, উহা তাহাই। পার্থিব জটিলতায় অপূর্ণ, অপুষ্ট ও অসুন্দর বস্তুটিকে কল্পনার মার্জনায় সুন্দর করিয়া

চিরন্তন করিয়া মানুষের সৌন্দর্য-আস্বাদনের মাধ্যমে রসিক জনের চিত্তে উহাকে গাঁথিয়া তোলাই বাণের একমাত্র লক্ষ্য। সেই কারণে চরিত্রগুলির রূপ বর্ণনা সম্পর্কে যাঁহারা বলিয়াছেন যে তাহার মহাশ্বেতা বা কাদম্বরীর রূপ অলঙ্কারের চাপে ফিকে হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা না বুঝাইয়া বাণের প্রতিভার অপ্রস্তুত প্রশংসাই করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী অপ্সরা। অপ্সরা যে কেবল গন্ধর্বের প্রেম ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা নহে, মানুষের প্রেমেরও ভোক্তা। ভোক্তা যে তাহা আমরা ঋগ্বেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে অপ্সরা সংবাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। বেদে উর্বশীর সহিত একটি রাত্রির জন্য মিলনে পুরূরবাকে বিশেষ পদ্ধতিতে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া গন্ধর্ব হইতে হইয়াছিল। সেখানে উর্বশী পুরূরবাকে তাহার দেহদান করিয়াছে মাত্র, বিনিময়ে পাইয়াছে পুরূরবার অকৃত্রিম প্রেম। সর্তভঙ্গে অন্তর্হিতা উর্বশীর জন্য সে পথে পথে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে, পাহাড়ের উচ্চতম শীর্ষ হইতে ঝাঁপ দিয়া বাঘের মুখে পড়িয়া জীবন নষ্ট করিতে চাহিয়াছে। উর্বশীর বিরহে তাহার তপ্ত জীবনে বেদনার মাথুর ঘনাইয়া উঠিয়াছে। পুরূরবার প্রতি উর্বশীর একটা সমবেদনা আছে মাত্র। ইহার বেশী কিছু নাই। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যে উর্বশী-পুরূরবার প্রেমের মানবিক সংস্কার হইতে মহাকবি কালিদাসের হাতে তাহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে। কালিদাসের উর্বশী কেবল মাত্র অপ্সরা-হৃদয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াই পুরূরবার প্রেমের মূল্যায়ন করে নাই। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে চোখ মেলিয়া পুরূরবাকে দেখিয়া সে মজিয়াছে। সে পুরূরবাকে তাহার হৃদয়-মন দিয়াছে। তাই লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়ে পুরুষোত্তমের নাম করিতে সে পুরূরবার নাম করিয়াছে। লতা হইয়া সে পুরূরবাকে যতখানি কাঁদাইয়াছে, সে কান্নার ক্ষতি পূরণ দিয়াছে মেঘ হইয়া 'খেল গমনে'। আবার স্বীয় পুত্রকে রাজ-সমীপে উপস্থিত দেখিয়া পুরূরবাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাহার কী মর্মান্তিক বেদনা। তাহার কান্নায় সমগ্র প্রতিষ্ঠান নগরী শোকমগ্না-উর্বশীর মধ্যে এই মানবিক হৃদয়-বোধের সঞ্চার কেবল কালিদাসের অপূর্ব কীর্তি নয়, অপ্সরার মধ্যে মানবিক হৃদয়ের ব্যাপ্তি সঞ্চারে ভারতীয় চেতনার অগ্রগতিরও সাক্ষ্য মিলিতেছে। তবুও কালিদাসের উর্বশী অপ্সরাই। বৈদিক উর্বশী হইতে কালিদাসীয় উর্বশীর পার্থক্য হইল, বৈদিক উর্বশীর মধ্যে মনুষ্য-হৃদয় বোধের পরিচয় নাই, কালিদাসীয় উর্বশীতে মনুষ্য-হৃদয় বোধের প্রাচুর্য। প্রাচুর্য থাকিলেও স্বর্গের বন্ধন অনেকটা কাটাইয়া উঠিলেও একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কিন্তু অপ্সরা মহাশ্বেতা ও অপ্সরা কাদম্বরী শুধু অপ্সরার ট্রেডমার্ক। তাহারা পুরাপুরিই মানবী। হেমকুট, কৈলাস পর্বত ও অচ্ছোদ সরোবরের পরিবেশ সরাইয়া লইয়া কোন জনবহুল নগরের পরিবেশে যান-বাহন-আপিস-আদালত বাজার-সিনেমা-ঘেরা নাগরিক পরিবেশের মধ্যে আনিয়া রাখিলে আমরা যে ভাবে চাই সেই ভাবেই তাহাদের পাইতাম। তাহাতে আমরা যাহারা আধুনিক, তাহারা খুশি হইলেও যাহাদের জন্য এই কথা-কাব্যের রচনা, সেই সেকালের পাঠকের ভাল লাগিত না। একালের পরিবেশে তাঁহাদের টানিয়া আনিবার দাবি, কেবল তাহাদের মানবিক সত্তার স্বাভাবিকতা দেখিয়া। তাহারা একালের আধুনিকাদের মত প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে। একালের আধুনিকাদের মতই তাহারা আপন প্রিয়কে কাছে টানিতে চায় এবং মিলনের আত্যন্তিক বাধা ঘটিলে একালের প্রেমিকাদের মতই তাহাদের হৃদয়ে শূন্য মন্দির গড়িয়া ওঠে, সুন্দরী পৃথিবী তাহাদের চারিপার্শ্বে হাহাকারের অট্টহাসি হাসিতে থাকে। একালের প্রেমের আখ্যানে কোন নায়িকা নিজেকে ব্যর্থ প্রেমিকা মনে করিলে সে হয়ত টেলিফোন হাউসের সাত তলা হইতে লাফ মারিয়া মাটিতে পড়িয়া আত্মহত্যা করে, বা লেকের জলে ডুবিয়া মরে, বা রেল লাইনের তলায় পড়িয়া জীবন বলি দেয়; কিন্তু সেকালের নায়িকা আত্মহত্যার পরিবর্তে তপস্যা করে। তপস্যা করিয়া শুচি সুন্দর হইয়া একনিষ্ঠ প্রেমের পূর্ণতার দ্বারা সকল বাধা চূর্ণ করিয়া ঈপ্সিতকে লাভ করে। একালের প্রেমে আছে সমাজ বিমুখিতা—বিশ্ববিমুখিতা। সেকালের প্রেমে ছিল—সংসার ও বিশ্ব-কল্যাণের রাখী-বন্ধন। তাই বলিতেছিলাম, একাল সেকাল নহে, এবং সেকালও একাল নহে। তবে মানুষের চিত্তবৃত্তি,—মানুষের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহ, হাসিকান্না, আত্মলাভ ও আত্মত্যাগ সর্বকালের মনুষ্য হৃদয়ের সনাতন ধর্ম। কেবল পরিবেশের পার্থক্যে চিত্তবৃত্তির পরিবেশনের পার্থক্য। মানব-হৃদয়ের চিরন্তন প্রেমকে সেই দূরের পিছনে ফেলিয়া আসা রোমান্টিক পরিবেশে বাঁধিতে যাইয়া দূরের চেতনাকেই টান দিতে হইয়াছে;—জমাট কঠিন বাস্তবতাকে রোমান্টিক উপকরণের সাহায্যে তরল করিয়া মিহি করিয়া কল্পনার রূপালী পর্দায় পৃথিবীর পুষ্পে পল্লবে শ্যামলতার লালিমায় সরোবরের স্বচ্ছতায়, অরণ্যের গভীরতায় নির্ঝরের গানে প্রভাতের রঙ খেলায় নৈশ জ্যোছনার মোহিনী মায়ায় ঝরা .পাতার মর্মরে পাখীর গানে ভরিয়া পাঠক মনের বীণায় রহিয়া রহিয়া ঝঙ্কার তুলিতে হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, সেকালের চেতনায় নারী হৃদয়ের কল্পনাস্থান অপ্সরা,

একালে রক্তে-মাংসে গড়া বাস্তব মানবী। এই উভয়ের সেতুবন্ধ কাদম্বরী-মহাশ্বেতার রূপায়ণে। বৈদিক সভ্যতার লৌকিকমুখী অগ্রগতির চলন্ত পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে তাহার পদক্ষেপ লোকালয়ের দিকে। কালিদাসের রচনায় মানবের কল্যাণে স্বর্গ হইতে অভিশপ্ত হইয়া সে মর্ত্যে নামিয়াছে, বাণের মধ্যে তাহার স্বর্গের কোন চিহ্ন নাই। সে মর্ত্যের। কেবল নেশা ছুটিবার পর যেটুকু মৌতাত নেশাখোরের চোখের পাতায় লাগিয়া থাকে, বাণের সৃষ্টিতে স্বর্গীয় কল্পনার সেইটুকু মৌতাত। কাদম্বরী-মহাশ্বেতাকে কখনই মনে হয় না ইহারা স্বর্গের ; মনে হয় না ইহারা অপ্সরা। আমাদের হৃদয় বাসিনী ঘরের প্রিয়াকে স্বপ্নে দেখিলে যেমন দেখি, প্রাচীন ভারতের স্বপ্নরাজ্যে কাদম্বরী-মহাশ্বেতাও ঠিক তেমনি। সংসারের নিত্যকর্মের মধ্যে, হিংসা-দ্বেষ-সংগ্রাম-সংঘাতের মধ্যে আমাদের ঘরের প্রিয়ার যে রূপটি হারাইয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না, কাদম্বরী-মহাশ্বেতার মধ্যে সেই রূপটি নিত্যকালের নিত্য হৃদয়ের হইয়া আছে। তাই বলিতেছিলাম মানুষী প্রিয়ার স্বাপ্নিক সংস্করণ ঐ কাদম্বরী, ঐ মহাশ্বেতা।

একটি প্রশ্ন এখানে তোলা যায় ;—অপ্সরার মধ্যে কি মানবী-চেতনার উদ্ধার সম্ভব? অতি প্রাকৃত শক্তির সৌন্দর্যময়ী কল্পনার রূপই অপ্সরা। তাহার মধ্যে মানবীয় চেতনা সঞ্চারের ঔচিত্য কোথায়? ইহার উত্তরে বলিব, ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া এই প্রশ্নেরই গবেষণা করিয়াছে। উত্তর পাইয়াছে নাট্যাচার্য ভরতের মুখে।

> "যদা মানুষসংযোগো দিব্যানাং যোষিতাং ভবেৎ।
> তদা সর্বে প্রকর্তব্যা যে ভাবা মানুষাশ্রয়াঃ॥
> শাপাদ্ ভ্রংশস্তু দিব্যানামঙ্গনানাং যদা ভবেৎ।
> কার্যো মনুষ্যসংযোগ স্তথা চৈবোপসর্পণম্॥
> যে ভাবা মানুষাণাং তু যদ্গতং যচ্চ চেষ্টিতম্।
> তৎ সর্বং মানুষং প্রাপ্য কার্যং দিব্যৈরপি দ্বিজৈঃ॥

(নাট্যশাস্ত্র ২৪, ৩১৪-১৫, ৩১৮)

শকুন্তলা অপ্সরা-সম্ভবা। সে যে অপ্সরা, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি।

অশ্ব :

বৈদিক অনুষ্ঠানের ধ্যানধারণা, ক্রিয়াকর্ম ও কিংবদন্তীর মধ্যে প্রাণি-জগতের ধারণাও অনুস্যূত। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অশ্ব। দেবগণের রথের

বাহক এই অশ্ব এবং নানা নামে, এই জীবটি সূর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। বৈদিক অনুষ্ঠানে ইহাকে সূর্য এবং অগ্নির প্রতীক মনে করা হইত। এই বিষয়ে ঋগ্বেদের দুইটি সূক্তে আলোচনা আছে। সে আলোচনার সূত্রে আরও জানা যায় যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেই অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। ঋষিরা গোধনের সহিত অশ্বেরও প্রার্থনা করিতেন। যুধ্যমান আর্যগণের নিকট যুদ্ধরথ টানিবার জন্য অশ্বের বিশেষ মূল্য ছিল। রথ-চালনার প্রতিযোগিতা প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম ক্রীড়া ছিল। অশ্বের প্রয়োজন তাহাতে অনিবার্য হইয়া ওঠে। তখন পর্যন্ত আরোহীর বাহন হিসাবে ইহার প্রচলন ছিল না। পশুমেধ যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান ছিল মুখ্য। বৈদিক কিংবদন্তীতে অশ্বের কয়েকটি নাম পাওয়া যায়—দধিক্রা, তার্ক্ষ্য, পৈদ্ব, এতাশ। বৈদিক যুগের জন্মান্তর ও কর্ম ফলের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া পৌরাণিক যুগে অশ্বের কল্পনা পল্লবিত হইয়া উঠিল। সূর্যের সাতটি রঙ সাতটি অশ্ব হইয়া দেখা দিল। সূর্যাশ্বের কল্পনায় ইন্দ্রাশ্বও রূপায়িত হইয়া উঠিল। ইহারই প্রভাবে শকুন্তলায় রাজা সারথিকে বলিতেছেন—"সত্যমতীত্য হরিতো হরীংশ্চ বর্তন্তে বাজিনঃ।" হরিৎ সূর্যাশ্ব, হরি ইন্দ্রাশ্ব। সমুদ্র মন্থনে যে অশ্ব উঠিল, তাহার নাম উচ্চৈঃশ্রবা। উচ্চৈঃশ্রবার পুত্র আশুশ্রবা। যেমন উচ্চৈঃশ্রবা, তেমনি আশুশ্রবা—সবই কিংবদন্তীর। বেদেই কর্মফল ভোগের জন্য জন্মান্তরবাদের প্রথম উন্মেষ। এই জন্মান্তরবাদের ফলে দেবগণও অধম জন্মে অবতার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পুরাণে কর্মফলের সহিত যুক্ত হইল অভিশাপ। কর্মফল ভোগের জন্যই অভিশাপ। অভিশাপ ভোগের জন্য নীচ জন্ম ভোগ। অভিশাপের সহিত যুক্ত থাকিত মুক্তির আশ্বাস। সকলে মিলিয়া পৌরাণিক জন্মান্তরে প্রাক্তন কর্ম বড় হইয়া দেখা দিল এবং তাহার ফলে নীচ যোনিতে জন্মিয়াও কাহারো কাহারো প্রাক্তন সুকর্মের ফল টিকিয়া গেল। কথা-সরিৎ-সাগরে বিদ্যাধররাজ সিংহবিক্রম পূর্বজন্মে সর্বশাস্ত্রবিদ্ একজন ঋষি ছিলেন। পরবর্তী নীচ শুকজন্মেও তাঁহার বেদ-বিদ্যার ধারা, শাস্ত্রস্মৃতি অব্যাহত থাকিয়া গেল। কাদম্বরীর বৈশম্পায়ন শুকেরও একই পরিণাম। বিমানচারীকে উল্লঙ্ঘন করায় কপিঞ্জল অভিশপ্ত হইলেন। অভিশপ্ত হইয়া অনুনয়ের ফলে ইন্দ্রায়ুধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বাবতারে ইন্দ্রায়ুধ হইয়াও পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রহিল। ইন্দ্রায়ুধ উদ্দেশ্যপূর্বক ও সজ্ঞানে কিরাত নগর হইতে কিন্নর মিথুনের অনুসরণে চন্দ্রাপীড়কে অচ্ছোদে টানিয়া আনিলেন। বাণের ইন্দ্রায়ুধত্ব-কল্পনার বৈশিষ্ট্য কেবল ঐতিহ্যের অনুসৃতি নয়, জন্মান্তর, অভিশাপ ও অবতারবাদের মধ্যে সখ্য

ভাবের প্রেরণার গুম্ফন। কপিঞ্জলের চরিত্রে আগাগোড়াই সখ্যভাবের দ্যোতনা। নিজের জন্য নয়, সখ্যভাবের অদম্য প্রেরণায়ই তাহার জন্মান্তর ও অশ্বাবতারত্ব। অতএব এই অবতারবাদের মধ্যে পূর্বজন্মার্জিত অনপনেয় কেবল পুণ্যফল, বেদবিদ্যা প্রভৃতি ঋষিজনোচিত গুণের অনুসৃতি নাই। সখ্যভাবের আত্মিক প্রেরণাও জন্মান্তরের কারণ হইতে পারে, কপিঞ্জলের অশ্বাবতার ইন্দ্রায়ুধত্ব কল্পনার মধ্যে বাণের ইহা এক অভিনব অবদান, এক নূতন চিন্তা, এক অভিনব আলোকপাত। ইহার আরও বিশেষত্ব, ইহা কিংবদন্তীর হইয়াও আধুনিক, পৌরাণিক হইয়াও বাস্তব। ইতিহাসের ছাপে ইহার পৌরাণিকত্ব বাণের কালের সমসাময়িকত্বে উত্তীর্ণ। হর্ষবর্ধনের অশ্ব, প্রতাপের অশ্ব চৈতক যেমন, ইন্দ্রায়ুধ তাহাদেরও স্বগোত্র। তাহার বেগবত্তা, প্রভুভক্তি ও প্রভুর মৃত্যুতে অশ্রুবিমোচন আমাদের গৃহপালিত পশুপ্রকৃতির আত্মীয়তাঘন এক বাস্তব অনুভূতিরই জাগরণ ঘটায়।

পক্ষী ঃ

বৈদিক কিংবদন্তীতে পক্ষীর স্থানও গৌণ নয়। সোমকে কখনও বা পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কখনও বা পক্ষী বলা হইয়াছে। অগ্নিকেও পক্ষী বলা হইয়াছে। অগ্নিই আকাশে সঞ্চারমান শ্যেন অথবা গরুড়। সূর্যকেও কখনও কখনও পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্ততঃ দুইবার তাহাকে 'গরুৎমৎ' বলা হইয়াছে। বোধ হয় এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়া বৈদিকোত্তর কিংবদন্তীতে পক্ষীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষী গরুড়ই বিষ্ণুর বাহন। বেদে এই পক্ষীটির মুখ্য কল্পনা ইন্দ্রের নিকট সোমের বাহকরূপে এবং বিদ্যুতের প্রতীকরূপে। সাধক সংহিতায় ইন্দ্রই শ্যেনরূপে সোম অপহরণ করেন। লোক কথায় পক্ষিগণের মধ্যে শুক অতি পরিচিত। শুকের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সেখানে ইহার বর্ণ হরিৎ। যজুর্বেদে এই শুক রীতিমত পোষ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং সেখানে ইহার মানুষের মত কথাবলার গুণপনার গুণগান করা হইয়াছে।

বৈদিক যুগেই দেখা গেল, শুক গৃহপালিত পক্ষী। মানুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইহা মানুষের মতই কথা কহিতে শিখিয়াছে। ইহার অধিক পরিচয় বৈদিক যুগে নাই। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ইহা জন্মান্তরবাদের বাহন হইয়া উঠিল এবং পূর্ব হইতেই মানুষের মত কথা বলার শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ায় শাপগ্রস্ত ও সর্বশাস্ত্রবিদ ঋষিরূপে তাহার সম্পর্কে কল্পনা পল্লবিত হইয়া উঠিল। শাপগ্রস্ত দেবদ্বিজের শুক হইল নূতন ভূমিকা। এই ভূমিকায় নূতনভাবে যুক্ত হইল প্রাক্তন

সংস্কৃতির স্মৃতি। কাহারো মুখে আত্ম-জীবনের কাহিনী শুনিয়া সে জাতিস্মর হইয়া ওঠে। অতএব এই সময়ে শুকের আরও নূতন গুণের আবিষ্কার তাহার জাতিস্মরতা। এই শুক বা শুকদম্পতী লোক-কথার কিংবদন্তীতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। বোধ হয় ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে চক্রবাক মিথুনের দাম্পত্য জীবনের আলোকে শুকের জীবনেও দাম্পত্যভাবের আরোপ হইল। ঋগ্বেদে চক্রবাক দম্পতীর মত অশ্বিন-দ্বয়ের প্রাতঃকালীন আবির্ভাব হইয়াছিল। অথর্ববেদে সেই চক্রবাক মিথুন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতীক। ইহারই আলোকে শুকেরও কপাল খুলিল। সেও জায়া লাভ করিয়া দাম্পত্য জীবনে উত্তীর্ণ হইল এবং তাহার দাম্পত্য জীবন লোককথার বিলাসিতারূপে দেখা দিল। কেবল কাদম্বরী-কথায় কাদম্বরী ভবনে নয়, সুবন্ধুর বাসবদত্তায়ও এই শুকদম্পতীর কেবল স্থান নয়, ঘটনার কার্যকারিতাও আছে। দাম্পত্যজীবনে যুগলমূর্তির ভূমিকায় ইহাদের প্রেম-কলহ চিরন্তন হইয়া আছে। লোক-কথায় কিন্তু একক শুকেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কথাসরিৎসাগরে ইহার মাত্র একক ভূমিকা। কাদম্বরীতে দ্বৈত ভূমিকা. যেমন কথাসরিৎসাগরে, তেমনি কাদম্বরীতে একক শুকের অভিশপ্ত জীবন। কথাসরিৎসাগরে এবই জীবনানুভূতির তৃতীয় ভূমিকা শুক। কাদম্বরীতেও তাই। কিন্তু পার্থক্য অনেক। কথাসরিৎসাগরে একই জীবনের তিনটি ভূমিকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; কাদম্বরীতে তিনটি ভূমিকায় একই জীবন সংস্কারের বহমান ফল্গুস্রোত। কথাসরিৎসাগরে ঋষি, সিংহবিক্রম ও শুক—একই জীবনসত্তার তিনটি সংস্করণ হইলেও ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; কাদম্বরীতে একই জীবনসত্তার তিনটি রূপের মধ্যে একই প্রবৃত্তির বন্ধন। পুণ্ডরীক, শুকনাসপুত্র বৈশম্পায়ন ও শুক বৈশম্পায়ন—এই তিনটি ভূমিকায় মহাশ্বেতার সহিত মিলনের জন্য একই উন্মুখতা। পুণ্ডরীক জীবনে অচ্ছোদ-সরোবরের লতাকুঞ্জে অনঙ্গপীড়িত অবস্থায় মহাশ্বেতার অভিসারের পথ চাহিয়া অধীর প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে করিতে মিলনের পূর্বেই মৃত্যু; মন্ত্রি-পুত্র বৈশম্পায়নের জীবনে মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া অবোধপূর্ব চাওয়ার উত্তেজিত মুহূর্তে মহাশ্বেতার অভিসম্পাতে মৃত্যু ও তির্যকযোনিত্ব প্রাপ্তি; বৈশম্পায়ন শুকজীবনে পূর্বস্মৃতির উদয়ের পর মহাশ্বেতার আশ্রমের উদ্দেশ্যে ছুটিতে ছুটিতে ব্যাধের জালে পিনদ্ধ বন্ধন—পারস্পরিক এই তিনটি জীবনে জীবন-সংস্কারের একই ধারার অগ্রপ্রবাহ। জীবন তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহাদের ভাববন্ধনের অনাহত ঐক্য কাদম্বরী-বিধাতার শিল্পচেতনারই সমর্থক। তিনটি বিবিক্তজীবনকে এমনি করিয়া একটি ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত

করিতে কথাসরিৎসাগরের স্রষ্টা তো অনেক দূরের কথা, নিখিল সংস্কৃত সাহিত্যে আর কেহ নাই।

কাদম্বরীর বৈশম্পায়নের আরও নূতনত্ব আছে। সিংহ বিক্রমের অধঃপতিত শুকজীবনের কোন কারণ নাই, বৈশম্পায়নের আছে। মহাশ্বেতা লম্পট ব্রাহ্মণ-কুমারকে 'তির্যক্ যোনিতে পতিত হউক' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। শুক তির্যক্ যোনি। সিংহ বিক্রমের শুকজন্মে পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিলেও যে-কন্যাশোকে তাহার প্রাণ-বিয়োগ হইল, সে-কন্যার জন্য তাহার কোন চিন্তা নাই, কোন হৃদয়াবেগ নাই। বৈশম্পায়নের আছে। পূর্বস্মৃতিতে তাহার প্রেমের স্মৃতি জাগিল, জাগিল প্রিয়তমা মহাশ্বেতার স্মৃতি। যেমনি স্মৃতির মন্থন, অমনি তাহার প্রতিক্রিয়া। তাহার পাখা ওঠে নাই, সে ভাল করিয়া চলিতেও পারে না; তবুও তার থাকিবার উপায় নাই। তাহার হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতা—ঈপ্সিতকে পাইবার—পূর্ব পূর্ব জন্মের হারানো প্রিয়াকে দেখিবার তাহার এমনি হৃদয়োচ্ছ্বাস, এমনি অন্তর্দাহ, এমনি চিত্তের আলিঙ্গন ভরা ব্যগ্র আকুলতা যে সে তাহার বন্ধুর অনুনয়, পিতার অনুশাসনও মানিল না। যাইতে তাহাকে হইবেই, তাই সে উড়িয়া পড়িয়া পড়িয়া উড়িয়া মহাশ্বেতার আশ্রমের দিকে শারীরিক চেষ্টায় যতটা না হউক, মনের চেষ্টায় ছুটিয়া চলিয়াছে। অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে, কেবল কিংবদন্তীর সূতায় গাঁথিয়া কাদম্বরী রচয়িতা তাহার সাহিত্যিক চিন্তাকে ঊর্ধ্বাকাশে উড়াইয়া দেন নাই। তাহার উপর জীবনের তপ্ত কামনা ঢালিয়া তিনি তাহাকে জীবনময় করিয়া তুলিয়াছেন. শুক বৈশম্পায়নকে মানুষের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব—এইখানেই তাঁহার সাহিত্যের উপাদানীভূত কিংবদন্তীর উপর জীবনবোধের বিজয়-পতাকার উত্তোলন।

শূদ্রক ঃ

চরিত্রের রূপায়ণে কিংবদন্তীর আলোচনায় শূদ্রক চরিত্রের রূপায়ণের মূল রহস্যটির আবিষ্কার অনিবার্য হইয়া ওঠে। কাদম্বরীর সূচনায় শূদ্রকের দৃশ্যোন্মোচন সম্পূর্ণ নাটকীয়। রাজধানী বিদিশা। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা শূদ্রক। তিনি 'চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা' এবং 'দ্বীপান্তরাগতানেক-ভূমিপাল-মৌলিমালা-লালিত-চরণযুগলঃ'। বিদিশার দরবার আলো করিয়া যিনি সিংহাসনে বসিয়া, এই শূদ্রক কে? বিদিশায় যাঁহার রাজধানী, খুঁজিলে তাঁহার কি কোন বাস্তব পরিচয় মিলিবে না? উৎসুক হইয়া ওঠে পাঠক চিত্ত। রাজাশূদ্রক—

ইতিহাসের, না কিংবদন্তীর ? ইহা লইয়াই তো পণ্ডিত সমাজের মধ্যে দলাদলি। দলাদলির ইতিহাস রচনা আমাদের প্রয়োজনের বহির্ভূত। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা রাজা শূদ্রককে কেন্দ্র করিয়া এই দলাদলির উৎপত্তি। ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজশেখরের নথি ঘাটিয়া পাওয়া গিয়াছে, রামিল এবং সোমিল শূদ্রক কথার রচয়িতা। আবার আলঙ্কারিক বামনও শূদ্রককে গ্রন্থকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা রাজা শূদ্রক। ইনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ঋগ্বেদে, সামবেদ, গণিত, কলা, হস্তি-শাস্ত্র, কৃষি-বাণিজ্য বিদ্যা প্রভৃতিতে কৃতশ্রম। পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ১১০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কহ্লন রাজতরঙ্গিণীতে ,তাঁহার ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্থান বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পূর্বেই হওয়া উচিত। স্কন্দ পুরাণে ইনি অন্ধ্র ভৃত্যগণের আদিম। বেতালপঞ্চবিংশতির মতে তাঁহার বয়স শতবর্ষ এবং তাহার রাজধানী হয় বর্ধমান, না হয়, শোভাবতী। কথা-সরিৎ-সাগরের মতে এক ব্রাহ্মণ আপন জীবন বিনিময়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। কাদম্বরীতে তাঁহার রাজধানী বিদিশা এবং হর্ষচরিতে তিনি চকোরের রাজা চন্দ্রকেতুর শত্রু। দণ্ডীর দশকুমার চরিত তাঁহার নানা অভিযানের কাহিনীতে সমৃদ্ধ। রাজশেখরের মতে তিনি সাতবাহন, বা শালিবাহনের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠানসহ অর্ধরাজ্য দান করেন। শূদ্রককেই কেন্দ্র করিয়াই বীর-চরিত, শূদ্রক-চরিত, শূদ্রক-কথা প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত। রামিল ও সোমিল তাঁহাকে লইয়া যে কথা রচনা করেন, সে কথায় তাঁহার চরিত্র কিংবদন্তী মূলক।

এইরূপ নানা মুনির নানামত হইতে যদি কোন সত্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা হইল এই যে, রাজা শূদ্রক ঐতিহাসিক নয়। কিংবদন্তীর স্তন্যরসে তিনি পালিত। কাদম্বরীর শূদ্রকই আমাদের আলোচ্য এবং আমাদের আলোচনা কাদম্বরী কেন্দ্রিক।

কাদম্বরীতে রাজা শূদ্রক সোমের দ্বিতীয় ভূমিকা। চন্দ্রাপীড় প্রথম ভূমিকা। পুণ্ডরীকের শাপে সোমকেও দুইবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে ;—প্রথমবার চন্দ্রাপীড়রূপে, দ্বিতীয় বার শূদ্রকরূপে। বৈশম্পায়নের মুখে গল্প শুনিয়া পূর্বস্মৃতি জাগিবার পর সোমকে শূদ্রকের দেহত্যাগ করিয়া আবার চন্দ্রাপীড়ের দেহে ফিরিতে হইয়াছে। অতএব সোমের অবতারের দুইদিক্—চন্দ্রাপীড় ও শূদ্রক।

এই দুই অবতারেরই মূল সোম। সোম কিংবদন্তীর। চন্দ্রাপীড়ও কিংবদন্তীর রাজা। আমাদের পরিচিত উজ্জয়িনীর পরিবেশে তাঁহাকে অনেকটা বাস্তব বলিয়াই মনে হয়। এই বাস্তবতা ভ্রান্তির মূল কারণ যেমন একদিকে কিংবদন্তী, তেমনি অন্যদিকে কথাকাব্যের উপর মহাকাব্যের প্রভাব। মহাকাব্যের রাজাদের যে সকল গুণ, চন্দ্রাপীড়ের উপর সেই সকল গুণের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শূদ্রক যদি কিংবদন্তীগত সোমের দ্বিতীয় অবতারই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও যে কিংবদন্তীগত হইবেন এবং তাঁহার কিংবদন্তীগত স্বভাবের উপর বাস্তব বিদিশা রাজধানীর পরিচিতত্বের ভান দেখা দিবে, ইহাও স্বাভাবিক। তাহা না হইলে সোমের দুইটি ভূমিকার মধ্যে ঐক্য থাকে না। আমরা পূর্ববর্তী নানা আলোচনায় দেখাইয়া আসিয়াছি, বাণের মধ্যে দুইটি চেতনা পাশাপাশি রহিয়াছে; —কিংবদন্তীগত চেতনা ও বাস্তব চেতনা। রূপকথার কাহিনীকে কথাকাব্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে বাস্তব চেতনার বাষ্প তাহাকে কিংবদন্তী চেতনার উপর ঘনাইয়া তুলিতে হইয়াছে। আরও দেখা যায়, তাঁহার শূদ্রকের কোন ক্রিয়া নাই। এই ক্রিয়াহীন রাজাটি রাজ্য ও অন্তঃপুরের মায়ায় সৃষ্ট এক ইন্দ্রজালেরই ছায়ামূর্তি। তাঁহার রাজ্য আছে, রাজকার্য নাই, অন্তঃপুর আছে, রাণী নাই। রাজোচিত যে সকল কার্য রাজার অপেক্ষিত, সেগুলি চন্দ্রাপীড়ই করিয়াছেন। তাই শূদ্রকের কোন কাজ নাই, মাত্র ভোগ আছে। এ যেন পুরুষের পক্ষে কোনো রকমে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সময় কাটানো। ডাক পড়িলেই ছুটিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কাদম্বিনীর শূদ্রক, ইতিহাসের নয়, কিংবদন্তীর। কিংবদন্তীর উপর ইতিহাসের একটু ভান আছে মাত্র। ইতিহাসও কিংবদন্তীর এই লুকোচুরি কেবল পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টির উপযোগী কাব্যিক কলা মাত্র।

কিংবদন্তীর উপাদানে উপন্যাসের উপাদান

জন্মান্তর ও কর্মফল ঃ

জন্মান্তর ও কর্মফল বাণের সময়কার গণ-চেতনার পটভূমির প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

অভিশাপ ঃ

অভিশাপ জন্মান্তরের অনুষঙ্গী ব্যাপার বিশেষ। জন্মান্তরের ভিত্তি কর্মফল এবং জন্মান্তরকে প্রবাহিত করিবার মূলে আছে, অভিশাপ। অভিশাপের বিশেষত্ব হইল এই, যেখানে অভিশাপ আছে, সেইখানেই অভিশাপ হইতে মুক্তিরও ব্যবস্থা আছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ঋগ্বেদের ঋতের ধারণার নৈতিক নিয়মের মধ্যেই জন্মান্তরবাদের প্রথম উন্মেষ ও উপনিষদের যুগে আসিয়া ইহার পরিণতি। পৌরাণিক যুগে অভিশাপ বলিতে যাহা বুঝায়, বৈদিকযুগে তাহার সেইরূপ স্পষ্ট রূপ না থাকিলেও তাহার মূল যে বেদেই আছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যজুর্বেদের গদ্য-রূপের মধ্যে কতকগুলি ইন্দ্রজাল-মূলক প্রার্থনার মন্ত্র আছে। সেগুলি রাক্ষস পিশাচাদি তাড়নার মন্ত্র ও অভিশাপ। সেখানে এমন সব যজ্ঞ-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, সেগুলির দ্বারা শত্রুর ক্ষতি করা যাইতে পারে। তাহার পর অথর্ববেদে ঐ শ্রেণীর মন্ত্রাদির বহুল চর্চা দেখা যায়। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম হইল—'অথর্বাঙ্গিরস'। মূলে অথর্বন্ ও অঙ্গিরস ছিলেন দুই শ্রেণীর পুরোহিত। পরে ঐ দুইটি শব্দের অর্থ দাঁড়াইল—ইন্দ্রজাল। তাহার মধ্যে অথর্বন্ হইল মঙ্গল জনক বা পবিত্র ইন্দ্রজাল এবং অঙ্গিরস হইল হিংসাত্মক ইন্দ্রজাল। অথর্বন্‌দের মন্ত্র ছিল রোগ-উপশমের মন্ত্র এবং অঙ্গিরসদের মন্ত্র ছিল অভিশাপ—শত্রু, প্রতিপক্ষ ও অনিষ্টকর যাদুকর প্রভৃতির উদ্দেশে অভিশাপ। সমষ্টিগতভাবে অথর্ববেদ ছিল বিচিত্র ইন্দ্রজালের সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাক্ষস পিশাচাদির তাড়না। হিংসাত্মক দুর্ধর্ষশক্তি, রোগব্যাধি, অনিষ্টকর প্রাণী, দানব, ঐন্দ্রজালিক, শত্রু এবং ব্রাহ্মণদের প্রপীড়ক যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ মন্ত্রগুলি নিযুক্ত হইত। হিংসাত্মক ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ রোধ ব্যাধির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইত। রোগ ব্যাধি প্রভৃতির মধ্যে পড়ে জ্বর (তক্মন্), কুষ্ঠরোগ, পাণ্ডুরোগ, উদরীরোগ, গলগণ্ড, কাসি, চক্ষুরোগ, কেশহীনতা, জীবনীশক্তির হ্রাস,

হাত-পা ভাঙা, শুচিবায়ু প্রভৃতি। সর্প বা বিষাক্ত পতঙ্গের দংশন ও বিষের বিরুদ্ধেও ইহাদের অভিযোজন হইত। ব্রাহ্মণগুলির উপকথার মধ্যে বিশেষ করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেফের কাহিনীর মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বরুণের অভিশাপের কথা জানা যায়। বরুণের অভিশাপে হরিশ্চন্দ্রের ঔদরিক ব্যাধি হইয়াছিল।

কল্পনা প্রবণতার উদগ্র নেশায় পুরাণে অভিশাপের বহর জমকালো উঠিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কাব্যে অভিশাপের প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। অদিতিও[১] কামদেবের প্রতি ব্রহ্মার, মণিমান্ ও নহুষের প্রতি অগস্ত্যের, নিমির প্রতি বশিষ্ঠের, দেবরাজের প্রতি পুলোমার, চন্দ্রের প্রতি দক্ষের, রাবণের প্রতি নলকুবেরের, রম্ভার প্রতি বিশ্বামিত্রের, কল্মাষপাদের প্রতি শক্তি মুনির, শনির প্রতি চিত্রগুপ্ত কন্যার, ইন্দ্র, শকুন্তলা,[২] ও যদুগণের প্রতি দুর্বাসার, পরীক্ষিতের প্রতি শৃঙ্গীর, সগর পুত্রগণের প্রতি কপিলের,[৩] প্রিয়ংবদ গন্ধর্বের প্রতি মতঙ্গ মুনির, জয়-বিজয়ের প্রতি ঋষিগণের, ছায়ার প্রতি যমের, অহল্যা ও[৪] ইন্দ্রের প্রতি গৌতমের,[৫] দশরথের প্রতি অন্ধকমুনির, কচের প্রতি দেবযানীর,[৬] কর্ণের প্রতি ব্রাহ্মণ ও পরশুরামের[৭] দিলীপের প্রতি সুরভির, উর্বশীর প্রতি ভরত মুনির[৮], যক্ষের প্রতি[৯] কুবেরের, পুত্রগণের প্রতি জমদগ্নির,[১০] হরিণী-নাম্নী সুরঙ্গনার প্রতি তৃণ-বিন্দু ঋষির, গণেশ ও তুলসীর পারস্পরিক অভিশাপ প্রভৃতি বহু অভিশাপের কাহিনী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। বৃহৎ-কথায় পুষ্পদন্ত ও মলয়বাণের প্রতি পার্বতীর, কথাসরিৎসাগরে মকরন্দিকার প্রতি সিংহবিক্রমের, দশকুমারচরিতে মহারাজ শাম্বের প্রতি রাজ-হংসের, বাসবদত্তায় শৃঙ্গার শেখরের কন্যা বাসবদত্তার প্রতি ঋষির অভিশাপ।

অভিশাপের তাৎপর্য সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,

"যাঁহারা শাপ মানেন না, তাঁহারা বলিবেন, শাপ আবার একটা কি? গুরুতর পাপের গুরুতর শাস্তি। যে যে-কোন ঝোঁকে পড়িয়া আপনার ধর্ম পালন করিতে না পারে, তাহাকে শাস্তি পাইতেই হয়। এই যে পাপের শাস্তি, ইহাকে আমাদের সেকালের লোকে শাপ বলিত। ব্রহ্মশাপ ভিন্ন লোকের সর্বনাশ হয় না। আমার এ দুর্দশা কেন হইল, জিজ্ঞাসা করিলেই সে-কালের কর্তারা ব্রহ্মশাপ বলিয়া দিতেন। পূর্ব জন্মের পাপ পুণ্যের ফলভোগ ত ছিল কিন্তু হঠাৎ একটা বিশেষ বিপদ হইলে সে ব্রহ্মশাপের উপরই পড়িত। বল্লাল সেন মরিলেন—ব্রহ্মশাপে।

(১) কুমারসম্ভবে (২) শকুন্তলায় (৩) রঘুবংশে (৪) মহাভারতে (৫। রামায়ণে ও রঘুবংশে (৬) মহাভারতে (৭) রঘুবংশে (৮) বিক্রমোর্বশীতে (৯) মেঘদূতে (১০) রঘুবংশে

কত রাজা উৎসন্ন গেলেন—ব্রহ্মশাপে এমন যে রামচন্দ্র, তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইলেন—ব্রহ্মশাপে। এত বড় বাহ্‌মনী মুসলমান রাজবংশ উৎসন্ন গেল—ব্রহ্মশাপে। পুরাণে পড়, কাব্যে পড়, আখ্যায়িকায় পড়, সর্বত্রই ব্রহ্মশাপ। সেকালের লোক বিশ্বাস করিত ব্রহ্মশাপে। কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন ব্রহ্মশাপে। তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।"

অতএব উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কাদম্বরীতে পুণ্ডরীক ও চন্দ্রের পারস্পরিক অভিশাপ, কপিঞ্জলের প্রতি বিমানচারীর অভিশাপ, লম্পট ব্রাহ্মণ কুমাররূপে প্রতীয়মান শুকনাসপুত্র বৈশম্পায়নের প্রতি মহাশ্বেতার অভিশাপ একালের রুচির নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হইলেও সেকালের মানুষের বিশ্বাসের অনুগত। এ অভিশাপ শুধু নিরঙ্কুশ অভিশাপ নয়, ইহার ফলেই জন্মান্তর ও দুঃখ ভোগ এবং এই দুঃখ ভোগের মধ্যেই যে বেদনাটুকু তাহাই কাব্য-রসের মূলীভূত উপাদান। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—"সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই, ভালোরও নয়, মন্দেরও নয়। হৃদয়ের-সত্যিকারের অনুভূতি সুখ দুঃখের আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে যদি বিকসিত হইয়া না উঠিল, তবে তাহা সাহিত্য পদবাচ্য নয়।" তাই বলিতেছিলাম, এই দুঃখটুকু না থাকিলে কাব্য দাঁড়াইত কোথায়? এই দুঃখটুকু না থাকিলে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী কখনও সাহিত্যিক চরিত্র হইয়া উঠিতে পারিত না। তাহার পর এই অভিশাপের সহিত জড়িত হইয়া আছে মুক্তির উপায়। অতএব দেখা যাইতেছে প্রাক্তন কর্ম, অভিশাপ, জন্মান্তর ও মুক্তির উপায়—ইহারা সকলেই কাদম্বরীর কাহিনী-বিন্যাসের প্লট রচনায় ঘটনার সহিত আত্মিক সম্পর্কে দেখা দিয়াছে।

ইন্দ্রজাল ঃ

ইন্দ্রজাল প্রাচীন ঐতিহ্যেরই বাহন। অতি প্রাচীন কালে স্বর্গ-মর্ত্যের সম্পর্কে ধারণা ছিল, স্বর্গ-মর্ত্য যেমন আদিম ও সার্বজনীন জনক-জননী, তেমনি ইন্দ্রজালেরও মৌলিক উৎস। বৈদিক ভাষার সাক্ষ্যেও এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে বেদে যে স্তোত্র ও সঙ্গীত, মন্ত্র ও ইন্দ্রজালের পরিচয় আছে, তাহাও অতি প্রাচীনত্বেরই অভিজ্ঞান। যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতাগণের স্তুতিগান ঋগ্বেদের মুখ্য বিষয় হইলেও ভারতের আদিমকাল হইতেই পারিবারিক জীবনের অনুষ্ঠানগুলির সহিত জড়িত ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলিও ইহাতে আছে। ঐন্দ্রজালিক ও পুরোহিত প্রাচীন-

কালে একই ব্যক্তি ছিলেন। কালক্রমে মানব-ইতিহাসে এমন সময় আসিল যখন দেবতাতত্ত্ব ও ঐন্দ্রজালিকত্বের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইল এবং ইহার ফলে দেবতন্ত্রী পুরোহিতেরা দানবনিষ্ঠ ঐন্দ্রজালিকগণের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন। পুরোহিত শ্রেণী তখন ঐন্দ্রজালিকগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারটি যেমন পৃথিবীর সর্বত্র, তেমনি ভারতবর্ষেও। বেদের যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কর্মের অনুবর্তী সকল সাহিত্যই ইন্দ্রজালের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণ যাতু বা ইন্দ্রজালকে দানবীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও—ইহাতে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতাদের জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও বহ্‌বৃচদের পাশেই যাতুবিদ্‌দিগের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন! ব্যবহারিক বুদ্ধি-নিষ্ণাত ব্রাহ্মণগণ কেবল নিজের জন্য নয়, রাজা ও জন-সাধারণের মঙ্গলার্থে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রগুলি ব্যবহার করিতেন। ঐন্দ্রজালিকগণের পেশাই ছিল রহস্যের আবরণে প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করিয়া ইন্দ্রজালের মধ্যে অদ্ভুত বা বিস্ময়ভাবের সকৌতুক গুম্ফন।

বেদে, ব্রাহ্মণে ও সূত্রসাহিত্যে ইন্দ্রজালের বিস্তৃত পরিচয় মেলে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রায় বারোটি কবিতায় ইন্দ্রজালের সংবাদ আছে এবং বিষয় বস্তুর দিক দিয়া এই কবিতাগুলি অথর্ববেদের একাংশের সগোত্র। বৈবাহিক আশীর্বচন-সংযুক্ত কয়েকটি মন্ত্রে ইন্দ্রজালেরই পরিচয় বেশী। তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ইন্দ্রজালের মন্ত্র আছে, যাহার দ্বারা অপদৃষ্টি, অশুভ ইন্দ্রজাল এবং দৈত্যের হাত হইতে বধূকে রক্ষা করা যায়। ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলি কোথাও পৃথকভাবে নাই। ঋগ্বেদে অন্ততঃ তিরিশটি ইন্দ্রজালের মন্ত্র আছে। ইহাদের কয়েকটি আশীর্জ্ঞাপক, কয়েকটি রোগব্যাধির উপশমক, কয়েকটি গর্ভিণীর ভ্রূণরক্ষার হাতিয়ার, কয়েকটি অশুভ স্বপ্নের ব্যর্থতামূলক, কয়েকটি অশুভ পূর্ব নিমিত্তের প্রতিরোধক, কয়েকটি শত্রু ও অনিষ্টকারী ঐন্দ্রজালিকের ধ্বংসের জন্য কল্পিত, কয়েকটি বিষ ও বিষাক্ত পতঙ্গের হাত হইতে মুক্তির উপায়, কয়েকটি প্রতিপক্ষের অপসারণের জন্য কল্পিত। ইহা ছাড়াও শস্যক্ষেত্রের প্রচুর ফসলের জন্য, গোধনের বৃদ্ধির জন্য, যুদ্ধজয়ের জন্য, ঘুমপাড়ানোর জন্য—এমনি অনেক শুভফলের উদ্দেশ্যে রূপায়িত অনেক ইন্দ্রজালের মন্ত্র আছে। ইহাদের মধ্যে ভেকের সঙ্গীত অন্যতম। ভেক-প্রশস্তিটি প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি আনয়নের ইন্দ্রজাল বিশেষ। Bloomfield-এর মতে ইহা একশ্রেণীর ইন্দ্রজাল। ভেকের ডাকে বৃষ্টি নামে ভারতীয়দের মধ্যে এমনি একটি প্রাচীন বিশ্বাস ছিল, এখনও আছে। প্রাচীন ভারতীয়েরা ভেকগুলিকে যাদুবিদ্যার ওস্তাদ বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীনেরা অক্ষক্রীড়ার মধ্যেও ইন্দ্রজালের প্রভাব

আছে বলিয়া মনে করিতেন। অক্ষক্রীড়কের বিলাপের মধ্যে আছে যে তাহার নিজের জীবনেরও সমস্ত পরিবারের ওপর ঘনায়মান ধ্বংসের দৃশ্য মানসনেত্রে দেখিতে পাইলেও তিনি অক্ষের মধ্যে ইন্দ্রজালের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। মোটের উপর ঋগ্বেদের ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলি অথর্ববেদের মন্ত্র হইতে পৃথক নয়।

সামবেদের রহস্য সঙ্গীতের উপর ইন্দ্রজালের প্রভাব আছে। অথর্ববেদ সংহিতায় ইন্দ্রজালের বিস্তৃত আলোচনা আছে। বিষয়বস্তুর অনুপাতে অথর্ববেদের ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলি যেমন প্রাচীন, তেমনি জনপ্রিয়। অথর্ববেদ-সংহিতার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহাতে প্রাচীন বাস্তব ধ্যান-ধারণারই হদিস মেলে। ইহাতে অসংখ্য দানাদৈত্য, পিশাচ রাক্ষস—এক কথায় ইন্দ্রজালের পুঁজিপাটায় প্রভাবিত পুরোহিত তন্ত্রের প্রাচীন ধর্মমতের পরিচয় ধর্ম ইতিহাসের ভিত্তিভূমি-হিসাবেই গ্রথিত হইয়া আছে। ইহাতে আছে রোগ-উপশমের ইন্দ্রজাল, রক্তপাত-নিরোধের ইন্দ্রজাল, অঙ্গ-স্ফীতি উপশমের ইন্দ্রজাল, বালক-বালিকাদের শরীরস্থিত কৃমি-কীটের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতির ইন্দ্রজাল।

অথর্ববেদের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের যাজ্ঞিক মন্ত্রগুলির সমবয়স্ক হইলেও ইন্দ্রজাল লইয়া উভয় বেদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে বিস্তর। ঋগ্বেদের ইন্দ্রজালের মন্ত্রগুলি অথর্ববেদের ইন্দ্রজালের মন্ত্র হইতে ভিন্ন জাতির। অথর্ববেদে আমরা সম্পূর্ণ এক পৃথক জগতে আসিয়া উঠি। ঋগ্বেদে আকাশ দেবতাদেরই প্রাধান্য। ইঁহারা প্রকৃতির শক্তিশালী রূপেরই প্রতীক। ঋষিরা ইঁহাদেরই মহিমা কীর্তন করেন, ইঁহাদেরই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন। অথর্ববেদে কৃষ্ণকায় দানবীয় শক্তিরই প্রাধান্য। ইহারা মানবজাতির উপর রোগ-ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য বহন করিয়া আনে। ইহারা পিশাচ; ইহারা রাক্ষস। ঐন্দ্রজালিক ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই অভিশাপের তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেন; ইহাদিগকে নানা স্তোকবাক্যে সরাইয়া দিবারও চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সকল ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীত ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন একটি ধারণা বা মতবাদের পরিচয় আছে, যাহার প্রভাব শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। তাই নানা দেশের নানা জাতির নানা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সাদৃশ্য মেলে। উত্তর আমেরিকার ভারতীয়দের মধ্যে, আফ্রিকার নিগ্রো জাতির মধ্যে, মলয় ও মঙ্গোল জাতির মধ্যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জাতির মধ্যে, এমন কি আধুনিক কালের য়ুরোপের কৃষি-জীবিদের মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীত ও ক্রিয়াবিধি সংক্রান্ত একই মতবাদ, একই চিন্তাধারার অনুস্যূতি দেখা যায়। ঠিক এমনটি দেখা যায় অথর্ববেদে।

বিবাহ ও প্রেম সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রজাল অথর্ববেদের অন্যতম অবদান। কৌষিক-সূত্রে 'স্ত্রীকর্মাণি' নামে পরিচিত অংশে প্রেমের নানা ইন্দ্রজাল ও অনুষ্ঠানের সন্ধান মেলে। এই সম্পর্কে দুই শ্রেণীর ইন্দ্রজাল আছে। এক শ্রেণীর ইন্দ্রজালের মধ্যে আছে সমাজ ঘেষা শান্তিপূর্ণ নিশ্চিন্ত মনের আবহাওয়া। এগুলি বিবাহ ও সন্তান কামনার সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত। কুমারী কন্যার বরলাভ এবং তরুণের স্ত্রীরত্ন লাভ, মাথা পাতিয়া লওয়া দাম্পত্য-জীবনের আশীর্বাদ, গর্ভধারণের, সুপুত্র লাভের, গর্ভিণীর গর্ভরক্ষার, অপুত্রিকার পুত্রলাভ এবং নব জাতকের, জীবন রক্ষা প্রভৃতি নানা কল্যাণ ঘন কামনা ও ক্রিয়া এই শ্রেণীর ইন্দ্রজালের বিষয়। অথর্ববেদের বৈবাহিক সূক্তের এই ইন্দ্রজালগুলিকে ঋগ্বেদের বৈবাহিক মন্ত্রগুলির পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্দ্রজাল আছে রাক্ষস পিশাচাদির তাড়না ও অভিশাপ। এগুলি বৈবাহিক জীবনের উৎপাত ও অবৈধ প্রেম-সম্বন্ধী। ইহাদের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি ইন্দ্রজালের মন্ত্র আছে, যে-গুলির মধ্যে কোনো ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এক চমৎকার হৃদয়-গ্রাহী শান্ত আবহাওয়ায় এগুলি ভাসমান। ইহাতে কোথাও পত্নী তাহার স্বামীর অন্য কামিনীর প্রতি আসক্তি হ্রাসের জন্য ব্যগ্র; কোথাও বা স্বামী তাহার স্ত্রীর অন্য পুরুষের প্রতি কামনা উৎখাত করিতে কৃত-সংকল্প; কোথাও বা প্রেমিক তাহার প্রিয়তমার সহিত গোপনে মিলিত হইবার জন্য সমস্ত পরিবারের উদ্দেশে ঘুম-পাড়ানিয়া ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের আবাহনে বদ্ধ-পরিকর; কোথাও বা পশু প্রবৃত্তির তাড়নায় পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে বলপূর্বক আকর্ষণের জন্য মন্ত্র আওড়াইতেছে: কোথাও বা চিত্রের সাহায্যে পুরুষ বা নারী নারী বা পুরুষের উপর, হয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য, না হয় ক্ষতি সাধনের জন্য বিড বিড় করিতেছে; কোথাও দেখা যাইতেছে, নারী প্রেমে আকুল কোন পুরুষ সেই নারীর মৃন্ময় চিত্র রচনা করিয়া শনের ছিলা নির্মিত ধনুক হাতে লইয়া, কাঁটার অগ্রভাগ, পেচকের পাখ্না ও একখণ্ড কৃষ্ণ কাষ্ঠদণ্ডে কামদেবের পুষ্পশর নির্মাণ করিয়া ধনুকে যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে এবং শরাঘাতে সেই চিত্রের বক্ষঃস্থল আমূল ছিন্ন করিতেছে, আর ইন্দ্রজালের মন্ত্র আওড়াইতেছে। নারী হৃদয়-জিগীষু উন্মত্ত প্রেমিকের এ যেমন এক তীক্ষ্ণ তীব্র উত্তেজনা, তেমনি পরপুরুষ হৃদয়া নারীরও অনুরূপ অপ্রকৃতিস্থতা। নারীও সপত্নী দ্বেষদীর্ণ জুগুপ্সা-মথিত-হলাহল-কৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে করিতে জেয়-পুরুষের প্রতিকৃতিখানি সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাণাঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে।

কেবল ইহাই নয়। নারীর বন্ধ্যাত্ব ও পুরুষের পুরুষত্ব-হীনতার উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রগুলির ভাষা হইতে যেন প্রবৃত্তির তাথৈ-তাথৈ তাণ্ডব-তরঙ্গ উপছাইতে থাকে। মানুষের আদিম প্রেম-প্রকৃতির এই অপ্রকৃতিস্থতা কেবল ভারতবর্ষের নহে, নিখিল বিশ্বের। বিশ্বের ইতিহাস ইহার সাক্ষী।

যজুর্বেদের প্রসঙ্গে অভিশাপের অনুবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কেবল এই কথাটিই এখানে বলিবার আছে যে মন্ত্রশব্দে পূর্বে বৈদিক সংহিতার ঋক্ ও যজুকেই বুঝাইত, পরবর্তীকালে উহা হইল ইন্দ্রজালের বাচক। যজুর্বেদেই আমরা মন্ত্রার্থের এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করিতে পারি। যজুর্বেদ অথর্ববেদের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রগুলির অধিকাংশ এবং সামবেদের রহস্য সঙ্গীতগুলি ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ঐন্দ্রজালিক আলোচনার বহু অগ্রবর্তী।

'ষড়্ বিংশ' ব্রাহ্মণের শেষ অংশটির নাম 'অদ্ভুত ব্রাহ্মণ'। ইহাতে ইন্দ্রজালের আলোচনা আছে। গৃহ্য সূত্র ইন্দ্রজালের বিধান থাকায় অথর্ববেদের সহিত সূত্র সাহিত্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বৈতান শ্রৌতসূত্র ও কৌষিক সূত্র ইন্দ্রজালের গ্রন্থ। ভারতীয় ইন্দ্রজালের অনেক প্রাচীন তথ্য এই দুইখানিতে পাওয়া যায়। সূত্র-সাহিত্যের অন্তর্গত, সামবিধান, ব্রাহ্মণ গ্রন্থখানি ইন্দ্রজালের তথ্যে পরিপূর্ণ।

তাহার পর নাট্যশাস্ত্রে আসিয়া একটি প্রশ্ন ওঠে—ভরত রসের ঐতিহাসিক সূত্রের প্রসঙ্গে অথর্ববেদের নাম করিলেন কেন? ইহার সমর্থনে অভিনবগুপ্ত বলেন, অথর্ববেদে শান্তিক মারণাদি[১] কর্মের মধ্যে ঋত্বিকের অনুভাবের উদয় হয় এবং প্রজাশক্র প্রভৃতির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে আত্মার মধ্যে যে স্তম্ভন দেখা দেয়, তাহার মধ্যেই রসের সূত্র আছে। আমাদের মনে হয়, রসের চমৎকার প্রাণতার মধ্যে যে বিস্ময়ভাবের অবগাহন রহিয়াছে, তাহার মূল অথর্ববেদের ইন্দ্রজালের মধ্যে। অথর্ববেদের ঐ ইন্দ্রজাল একদিকে যেমন বিস্ময় পরতন্ত্র, তেমনি সাহিত্যের মাধ্যমে নারী-পুরুষের প্রেম এবং প্রেম সংঘাতের প্রথম প্রকাশভূমি। শৃঙ্গার রসের অনুভূতির মূল ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বটি ইন্দ্র-জালের গুহায় নিহিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই ইন্দ্রজাল কেবল

---

(১) (ক) জগ্রাহপাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণদাপি ॥ নাট্যশাস্ত্র ১।১৭

(খ) আথর্বণবেদে তু শান্তিকমারণাদিকর্মসু নটস্যেব তস্য ঋত্বিজঃ প্রস্ফুটবৈষুগ্ণ্যাদ্যনুভাবানাং প্রজাশক্রপ্রভৃতিনাঽবধান-গ্রহণাদিনা লোহিতোষ্ণীষাদে নৈপথ্যস্য তেষু তেষু চ কর্মসু বিশিষ্ট-প্রযত্ন-পুরুষ-সম্পাদ্য-মনোঽবষ্টম্ভাত্মনঃ সত্ত্বস্য সম্ভবাৎ ততোঽভিনয়ানামগ্রহণম্"। নাট্যভারতী।

মানবমনের অনাদি ও অনন্ত বিশ্বাসের সোনার কাঠি নয়, উহা মানব-জীবন-রহস্যেরও অঙ্গীভূত। জানার মধ্যে সেখানেই অজানা, পরিচিতের মধ্যে সেখানেই অপরিচয়ের অকূলজলধি, সীমার মধ্যে সেখানেই অসীম, সেইখানেই বিস্ময়। সেই বিশ্বাসের প্রাচীন নাম—ইন্দ্রজাল।

তাহার পর Aristotle Tragedy-র যে পাঁচটি ভাগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে Complex Tragedy বা বিস্ময়-প্রধান Tragedy প্রথম ভাগ। অনেক পরবর্তীকালে এলার ডাইস নিকল Tragedy-র উদ্দেশ্য বিস্ময়ভাব ও অদ্ভুত রসের বিকলন বলিয়া যে নূতন মতবাদ স্থাপনার অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন, তাহার বীজ Aristotle এর Complex Tragedy এর মধ্যে থাকিলেও নিকলের বিস্ময়ভাব ও অদ্ভুতরস ইন্দ্রজাল। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার পূর্বপুরুষ নারায়ণের দোহাই দিয়া নাটকের নির্বহণসন্ধিতে অর্থাৎ ঘটনার পরিণামে যে অদ্ভুতরস উপস্থাপনার আবশ্যিক বিধান দিয়াছেন, সে অদ্ভুতরস ইন্দ্রজাল। তন্ত্র-শাস্ত্রে মন্ত্রে ও যন্ত্রে, আভিচারিক কর্মে এই ইন্দ্রজাল। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে ও নাথ-সাহিত্যে, বঙ্কিমের রোমান্সে—চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল-কপালকুণ্ডলায়, বিশেষ করিয়া রজনীতে—রজনীহীন শচীন্দ্রের নির্মলচিত্তে আভিচারিক মন্ত্রের সাহায্যে রজনীচেতনার সৃষ্টি—শচীন্দ্রের মর্মমূলে রজনী-সত্তার ঘননিবিড় সঞ্চার, ক্বথন, মথন, বিস্ফারণ, বিজৃম্ভন, বিঘূর্নন, আলোড়ন—রজনীতন্ময়তা —তদাকারীকারিতা, জন্মান্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তিলাভ, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত—এ সবই ইন্দ্রজাল। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ইন্দ্রজাল। শিলাজলে ভাসে, মানুষ আকাশে ওড়ে, এই যে আমরা—পাঠকের দল কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে সারা বিশ্ব ঘুরিয়া আসি, ইহা কি? ইহা ইন্দ্রজাল। যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভাষায় বলি—

"কলা কৃত্রিমকে অকৃত্রিম দেখায়, মিথ্যাকে সত্য ভ্রম করায়। এর স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পটে। কোথায় গাছ, কোথায় বা পাহাড়; আমরা পটে গাছ-পাথর দেখি। চিত্রকর রং দিয়ে ইন্দ্রজাল করেন, কবি ভাষার শব্দ দিয়ে করেন। কবির ইন্দ্রজাল, কবিতা।"

আবার ফিরিতে হইল। ফিরিয়া চলি পুরাণে। পুরাণে বৈদিক ইন্দ্রজালের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নাই, ফলশ্রুতি আছে। ব্যাপার যা, তা নেপথ্যে। কল্পনার ঘন মৌতাতে আচ্ছন্ন চেতন পুরাণ ইন্দ্রজাল ছাড়া এক পাও চলিতে পারেন না। জন্মদিনে সংস্কৃত কাব্যকে পুরাণ ইন্দ্রজালের উপহার দিয়াছিলেন। সংস্কৃতকাব্যে

শ্রব্যকাব্যে, দৃশ্যকাব্যে, কথা-কাব্যে সেই ইন্দ্রজালেরই চকিত চমক ; বাঁকা নয়নের কুটিল অপাঙ্গ-বিক্ষেপ। লোককথায় কথায় কথায় ইন্দ্রজালের সোনালী নক্সা। বৃহৎকথায়, কথাসরিৎসাগরে, বৃহৎকথামঞ্জরীতে, বৃহৎকথা-শ্লোক-সংগ্রহে ইন্দ্রজালের ঠাসবুনানি। রামায়ণে, মহাভারতে, বিশেষ করিয়া মহাভারতের বিরাট পর্বে ইন্দ্রজালের ধূলোট উৎসব। বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা ইন্দ্রজালের সমন্তক মণি।

রঘুবংশে হিমালয়ের গহ্বরে নন্দিনীসেবায় নিযুক্ত ধনুর্ধর দিলীপের সম্মুখে সিংহের আকস্মিক আবির্ভাবে দিলীপের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির স্তম্ভন ও সিংহের কণ্ঠে মানুষী ভাষা ; রঘুর ধনাগারে আকাশ হইতে স্বর্ণবৃষ্টি ; কুম্ভদেশে অজ কর্তৃক আহত হস্তীর গন্ধর্বরূপপ্রাপ্তি ও অজের গন্ধর্ব অস্ত্র লাভ। ইন্দুমতীর মৃত্যুর মারণ তাহার স্তনাগ্রচূড়ে আকাশ হইতে নারদের বীণা-বিচ্যুত পুষ্পমালার পতন ; রঘুবংশের রাজাদের 'যোগেনান্তে তনুত্যজাম্' ; শকুন্তলায় স্ত্রী-সংস্থান জ্যোতির ভূলুণ্ঠিতা শকুন্তলাকে কুড়াইয়া লইয়া অপ্সরাতীর্থে গমন ; দুষ্যন্তপুত্র ভ[illegible] মারীচ -প্রদত্ত অপরাজিতা ঔষধি ; বিক্রমোর্বশীতে উর্বশীর ছায়া-শরীর ও 'সঙ্গম' মণি ; রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিকের মায়াময় অগ্নি [illegible] উত্তররাম-চরিতে রামভদ্রের অস্ত্রাঘাতে শম্বুকের দিব্য-দেহপ্রাপ্তি ; ভাগীরথী [illegible] বনদেবতাগণেরও অলক্ষ্য সীতার ছায়া-শরীর ; লবের জৃম্ভকাস্ত্র ; মালতী-মাধবে গগনমার্গে ভয়ঙ্কর সুন্দর বেশে কপালকুণ্ডলার পরিক্রমা ; পিশাচাদির অব্যক্তশব্দ, বিকট চীৎকার ; আভিচারিক উপায়ে 'খট'এর উপর হইতে নিদ্রিতা মালতীকে শ্মশানস্থ করালার মন্দিরে আভিচারিক আকর্ষণ ;—এ সবই ইন্দ্রজাল ; ইন্দ্রজালের হাউই বাজী।

তাহা হইলে এখনও কি বলিতে হইবে যে কাদম্বরীর পরিকল্পনায় ইন্দ্রজালের ঔপাদানিক বিন্যাস অমার্জনীয় ? একটা আকস্মিক ব্যাপার ? আকস্মিক তো নয়ই, বরং শিল্পের কালোচিত হাতিয়ার। বিস্ময় ভাব সৃষ্টির জন্য এই হাতিয়ারটির অনিবার্যতা। পুণ্ডরীকের অনঙ্গ-বেদনার আতিশয্যে মৃত্যু, মহাশ্বেতার অভিশাপে বৈশম্পায়নের মৃত্যু ; বৈশম্পায়নের মৃত্যুসংবাদে চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু, বৈশম্পায়ন শুকের কাহিনী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রকের মৃত্যু ; এ সব ইন্দ্রজাল। জলে ঝাঁপ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রায়ুধের কপিঞ্জলস্বরূপে প্রত্যাবর্তন ; কপিঞ্জলের অচ্ছোদ-সরোবর হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে শ্বেতকেতুর কুটীরের উদ্দেশে, শ্বেতকেতুর কুটীর হইতে জাবালির আশ্রমে—এই যে গতাগতি—এসব ইন্দ্রজাল। বৈশাম্পয়ন শুকের খোলস ছাড়িয়া পুণ্ডরীকের স্বস্বরূপে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই

তাহার পাশেই কপিঞ্জলের আবির্ভাব; এ সব ইন্দ্রজাল। লক্ষ্মীদেবীর নিষাদ-কন্যারূপে আবির্ভাব—এও ইন্দ্রজাল; ইন্দ্রজালের জালিয়াতি। ব্যোম-গমনীবিদ্যা, মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা, তিরস্করিণী বিদ্যা—সবার মূলেই ইন্দ্রজাল। জন্মান্তর বলুন, অভিশাপ বলুন, ইন্দ্রজাল বলুন,—সবই এক সূতোর মালা। একটিকে টান-দিলে আরগুলি আসিয়া পড়ে। কাদম্বরী-পাঠকের মনে অখণ্ড জটিল ভারতীয় চেতনার সংক্ষোভের জন্য এই ইন্দ্রজালের উপাদান। বৈদিক যুগ হইতে সোজা টানা রাস্তায় লোককথার আঙ্গিনা পার হইয়া কথাকাব্যে ইহা সরাসরি আসিয়া উঠিয়াছে। তাই কাব্য ও নাটক অপেক্ষা কথাকাব্যে ইন্দ্রজাল গুলজার করিয়া বসিয়াছে।

দৈব-বাণী ঃ

দৈব-বাণী যে কবে কোথায় প্রথম ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, তাহা এযুগে বসিয়া অনুমান করা কঠিন। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে উপনিষদ্ যুগের পরে, সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগে ইহা বর্তমান আকার লাভ করে। অর্থাৎ যে-সময় হইতে মানুষ ও দেবতার মধ্যে দূরবর্তী ব্যবধান রচিত হইল, ইহা সেই যুগের কল্পনা। এই কল্পনার মূলে ছিল মানুষ ও দেবতার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের অবলুপ্তি। বৈদিক যুগে দেখা যায় দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা স্বর্গস্থ আকাশের চতুঃসীমায় বিহার করিতেছেন। ইন্দ্র যেমন সোমযজ্ঞে আসিয়া পাতা পাতিয়া বসিতেছেন, অগ্নিও শ্যেনরূপে সোম লইয়া ছুটিতেছেন। মানুষের মৃত্যুর পর অগ্নি শবদেহকে দেবলোকে বা পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অথর্ববেদ অনুসারে মৃত-ব্যক্তির চিতা-প্রজ্বালনের সঙ্গে সঙ্গেই বলি-প্রদত্ত ছাগটি আগে আগে পিতৃলোকে যাইয়া মৃত্যুর খবরটি পৌঁছাইয়া দিতেছে; ঋগ্বেদের মতে একই উদ্দেশ্যে দেবলোকে ছুটিয়া চলিতেছে বলি-প্রদত্ত অশ্ব ও ছাগ। মহাকাশের কুরুক্ষেত্রে দেবতা-দানবের লড়াই, একটানা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উপনিষদে আসিয়া দেব, মানব ও দানব—সকলেই প্রজাপতির পুত্র। অবশ্য বৈদিকযুগের দেব-মুখিতায় উপনিষদের যুগে ভাটা নামিয়াছে। নামিবারও কারণ আছে। ঋগ্বেদের দেব-প্রাধান্য ব্রাহ্মণ-যুগে যজ্ঞ আসিয়া হরণ করিয়া লইয়াছে। যজ্ঞের পাশেই দেখা দিয়াছে সার্বভৌম পুরোহিত-তন্ত্র। পুরোহিত তখন দেবতার স্থলাভিষিক্ত। দেবতা ও মানুষের মাঝে দাঁড়াইয়া দেব-প্রতিভূ পুরোহিত। কিন্তু বহির্জগতে, আকাশে, অন্তরীক্ষে, সুন্দর ও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেবমুখিতার প্রতিক্রিয়ায় যে-বিপ্লব দেখা দিল,

উপনিষদ তাহারই অন্তরতম প্রকাশ। উপনিষদে দেবতার স্থান মানুষের অন্তরে; অন্তরে-বাহিরে মিলন; আত্মা ও ব্রহ্মের সামঞ্জস্য। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের যদি কোনো বাস্তব অবদান থাকে, তাহা হইল মনন-শীলতা। দেবগণের সমঞ্জসীভূত বহির্জগতের ব্রহ্ম মানুষের অন্তরে উঠিয়া অন্তর্যামী হইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে বৈদিক দেবতার স্থান যেমন গৌণ হইয়া দেখা দিল, তেমনি মানুষের মনন-শীলতার উৎকর্ষে জাগিল আত্ম-চৈতন্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। দেব-প্রাধান্যের গৌণত্বে এবং আত্ম-চৈতন্যে ব্রহ্মচৈতন্যের সাক্ষাতের ফলে —ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্যের ফলে বাহ্য দেবতা ও মানুষের মধ্যে দেখা দিল এক বিরাট ফাঁক। সেই ফাঁকটি ভরাটের উদ্দেশ্যে তোলা হইল এক বিরাট প্রাচীর। কিন্তু প্রাচীর তুলিলে কী হইবে? এতকালের সংস্কার কি জলের দাগ যে চট্ করিয়া মুছিয়া যাইবে? সেই সংস্কার কল্পনায় আসিয়া বাসা বাঁধিল। দৈব-বাণী যে সেই সংস্কারেরই প্রকাশ-বিশেষ, ইহাই আমাদের মনে হয়। কেন মনে হয়, তাহাই বলিতেছি।

আগে একটি গল্প বলি। গল্পটি বৃহদারণ্যকের। প্রজাপতিপুত্র দেব, দানব ও মানব। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহারা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত। প্রত্যেকের মনে মনে ইচ্ছা, প্রজাপতির নিকট কিছু চাই। দেবতারা প্রজাপতির নিকট প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু, কিছু উপদেশ।" প্রজাপতির মুখ দিয়া একটি ধ্বনি বাহির হইল —"দ"। দেবতারা খুশি। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝিলে কি?" দেবতারা বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি বলিলেন—"দাম্যত; সংযমী হও।" প্রজাপতি বলিলেন—"ঠিক"। তাহার পর মানুষের দল ধরিয়া বসিল, "আমাদের কিছু উপদেশ দিন, প্রভু!" এবারেও প্রজাপতির মুখে ফুটিল—"দ"। মানুষেরা প্রজাপতির মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বুঝিলে কিছু?" "বুঝিয়াছি, আপনি বলিলেন—'দত্ত; দান কর।' 'ঠিক বুঝিয়াছ।' এবার দানবদের পালা। তাহারা মানুষ অপেক্ষাও বুদ্ধিজীবী। কথায় একটু প্যাঁচ কসিয়া বলিল—"আমাদের তপস্যা কি বৃথা যাইবে? আমরা কোন্ মুখে খালি হাতে ঘরে ফিরিব? আমরাও যে কিছু চাই।" প্রজাপতির মুখে ঐ এক ধ্বনি—'দ'। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুঝিলে?" দানবেরা যেন একটু লজ্জিত হইয়াই বলিল, "বুঝিয়াছি; আপনি বলিলেন—"দয়ধ্বম্; দয়া করো।' "ঠিক বলিয়াছ।"

যজ্ঞধূমে মলিন আকাশ। আকাশের বুকে জাগে নিকষ-কালো বিপুল বিরাট মেঘ। চমকায় বিদ্যুৎ। আগুনের রেখা মেঘের পাথুরে বুকে চকিতে লতাইয়া

ওঠে। আলোয় পোড়ে কালো। কড়্-কড়্-কড়্; মেঘ ডাকে—কড়্-কড়্-কড়্। ঋষিরা শোনেন—"দ-দ-দ"; "দাম্যত—দত্ত-দয়ধ্বম্।"

এই বাণীর শ্রুতিগোচরতা কিরূপে সম্ভব? সম্ভব চেতনার ঘনীভূত স্বরূপের প্রকাশে। 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'র লেখক ভাগীরথীর জল-কল্লোলের মধ্যে কেমন করিয়া শুনিতেন নদীর বাণী? প্রশ্ন হইত, 'কোথা হইতে আসিতেছ, নদি! জল-কল্লোলে নদীর উত্তর ভাসিয়া আসিত, 'মহাদেবের জটা হইতে।' এযুগেও চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসিয়া, যে যেমন ভাবে, ট্রেনের চলধ্বনির মধ্যে সে তেমনি শুনিতে পায়। কেহ শোনে—"দ্বিজপদ-দ্বিজপদ-দ্বিজপদ"; কেহ শোনে—"আর পারিনা, আর পারিনা, আর পারিনা।" বাস্তবলোকে নদী বা ট্রেন কথা কয় না, কথা কয় কল্পনার জগতে। নিথর ছম্‌ছমে রাত্রির নিশুতি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো নারীর কঙ্কাল ডাক্তারি বিদ্যার তরুণ ছাত্রের কাছে মৃত্যুপূর্ব পরপারের জীবনের ব্যর্থ প্রেমের হা-হুতাশভরা বেদনার কাহিনী শোনায় কী করিয়া? ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী না-বলা কথা শোনে কী করিয়া? শুনিয়া ভয় পায় কেন? চীৎকার করে কেন? উন্মাদিনী যাহা শোনে, তাহা যে তাহার নিকট নিরেট বাস্তব; যেমন বাস্তব আমি; যেমন বাস্তব তুমি। না থাক্ সেখানে কোনো মানুষ, বাতাসের তারে না বাজুক কোন কণ্ঠ; থাকুক সেখানে কেবল আকাশ, আর কেবল বাতাস; তবুও সে শোনে; চীৎকার করে; ভয়ে কাঁপে। ঐ শব্দ—ঐ কথা তাহার কাছে নিরেট সত্য, মিথ্যা তার এক কণাও নয়। কবি ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের তমসা,—মুরলা,—ভাগীরথী,—বাসন্তী দেবীর কণ্ঠে মানুষের ভাষা উছলিয়া ওঠে কোন্ মন্ত্রে? শকুন্তলায় তপোবন-তরুরা কথা কয় মানুষের ভাষায়। এসব দৈব-বাণী। এসকল দৈববাণীর উৎস কোথায়? কোন্ হিমালয়ে? কোন্ তুষারের রহস্য-শয্যায়? মননশীল মানুষের চিত্তলোকে, ধ্যানের তন্ময়তায়, তন্ময়তার মগ্নময়তায়। মননশীলের চিত্তে যখন বোধির সূর্য ওঠে, তখন প্রকাশিত হন মহাসত্য। সে সত্য যেমন আনন্দময়, তেমনি বাঙ্ময়! সত্য তখন শব্দ-ব্রহ্ম। সত্যের এই শব্দ-মূর্তি ধ্যানীর চেতনায় তখন এমনি প্রখর, এমনি তীব্র, এমনি ভাস্বর, এমনি তেজের চলচ্ছবি, এমনি সর্বাতিগাহী, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, যে ধ্যানীর মনে হয়, তিনি কানে শুনিতেছেন। কান তো ইন্দ্রিয়; সে-ইন্দ্রিয়ের চালক মন; মনের চালক আত্মা। শব্দ সেই আত্মারই বাণীমূর্তি। আত্মায় বলে, আত্মায় শোনে। আত্মায় শোনে বলিয়া মনে হয়, কানে শুনিতেছি, কারণ শ্রুতি বলেন, চক্ষু না থাকিলেও তিনি (ব্রহ্ম) দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন, চরণ না থাকিলেও

চলিতে পারেন। তিনি আত্মা, তিনি ব্রহ্ম; তিনি 'ইদম্' ও 'অদস্'; ঘর ও বাহির; নিকট ও দূর। অতএব সমাহিত চিত্তের সত্যানুভূতির বাণী উপনিষদ্ যুগের ঋষিরা শুনিতে পাইতেন। তাই মেঘের কড়্-কড়্-কড় ধ্বনির মধ্যে তাঁহারা শুনিতেন—'দাম্যত-দত্ত-দয়ধ্বম্'।

উপনিষদ্ যুগের আত্মার বাণীমূর্তি বৈদিকোত্তর যুগের মানসিক কারবারে কল্পনার ট্রেডমার্ক লইয়া বাজারে চালু হইল। একদিকে দেব-সংস্কার, অন্যদিকে আত্মনিষ্ঠ শব্দ-ব্রহ্ম। কল্পনা আসিয়া এই দুইটিকে মিলাইয়া দৈববাণী গড়িয়া তুলিল। বাস্তব মৃগ সোনার মৃগ হইয়া উঠিল। কোথায় মাটির তলাকার কুবেরের যক্ষপুরীতে ঘড়ায় ঘড়ায় লুকানো সোনার তাল, আর কোথায় বা মালিনীর তীর ঘেঁসিয়া বা পম্পা সরোবরের শ্যামল অবগুণ্ঠন-ছাওয়া ধর্মারণ্যের তৃণভূমিতে সঞ্চরমান তপোবন-মৃগ। কল্পনার কী যাদুশক্তি! স্বপ্নের কী মায়াজাল! স্বপ্নেও এমনি সোনার মৃগের সূক্ষ্ম বুনানি। মৃগ পৃথক্; সোনা পৃথক; কিন্তু স্বপ্নের বুনানিতে সোনার মৃগ। স্বপ্নেও দেখি এমনি কত সোনার সুন্দরীদের। তাহাদের কথাও শুনি। জাগিয়া উঠিয়া সব মনে করিতে পারি না। কেবল একটি চাপা নিঃশ্বাস বুকখানিকে দোলাইয়া কাঁপাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায়।

উপনিষদ্-যুগের শব্দের এই চিত্তধর্মিতাকে পুরাণের স্যাকরা-বাড়ী পাঠাইয়া কী চমৎকার অলঙ্কারই না গড়া হইল। এ অলঙ্কার পরিবে কে? মানব-মনের বিশ্বাস। প্রাচীন ভারতবর্ষ যেমন চিত্তের বাণীরূপে বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল দেবতায়। এই দুইয়ে মিলিয়া তিন হইল। তিন কিন্তু একও নয়, দুইও নয়; একেবারে তৃতীয় বস্তু। এই তিনের রূপটি সত্যহীন নয় বলিয়া ভারতীয় মানসিক জমিনে বিশ্বাসের মালিকানায় ইহার পত্তন হইল। সত্যটি ঠিকই রহিল, কিন্তু কোন্ সময়ে কোন্ অতর্কিত মুহূর্তে কল্পনা যে জুড়িয়া বসিল, বিশ্বাসী মন তাহা টেরও পাইল না। অনেক দূরের মানুষ তাই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কল্পনার কার্পেটে এমন চমৎকার ওরিয়েন্টাল প্যাটার্ণ, কেমন করিয়া তোলা হইল, কবে তোলা হইল, তাহা কেউ জানে না, অথচ সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে।

সত্য-কল্পনামিশ্র এই দৈববাণী সোনার পীড়ি পাইল যুগকাব্যে, পুরাণে, লোক-কথায়, কেবল গন্ধবিধুর ছায়া-শীতল কল্পনার আশ্রয়ে। কিংবদন্তীতে কল্পনার লতাবিতানে বিশ্বাসের রঙীন প্রজাপতি আসিয়া বিচিত্র কারুকার্যের নক্সায়-ভরা পাখা মেলিয়া বসিল। সেই-যে বসিল, কথাকাব্যের যুগ পর্যন্ত আর নড়িল না।

মহাকাব্যে ও কথাকাব্যে দৈব-বাণীর ইন্দ্রধনুতে বিশ্বাসের রঙীন ছিলা বাঁধিয়া ঘন ঘন আকর্ষণ করা হইয়াছে। নাটকে ঘটনার মুখ্যতায় দৈব-বাণী বাধা পাইয়াছে বার বার।

কালিদাসের কাঁচা লেখা 'কুমার-সম্ভবে' এই দৈববাণীর অবতরণ দেখি। অনঙ্গ-বিয়োগ-বিধুর রতি নব বৈধব্যের অসহ-তাপে স্বামীর সহিত সহমরণে চিতায় উঠিবেন, অমনি আকাশ-সম্ভবা সরস্বতী ধ্বনিত হইল—

'কুসুমায়ুধপত্নি দুর্লভ-
স্তব ভর্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।'

কথাসরিৎসাগরে মনোরথপ্রভার উদ্দেশে দৈববাণী হইল ;

"মনোরথ-প্রভা, এমন কাজ করিও না, মুনিপুত্রের সহিত তোমার মিলন হইবে।"

দশকুমারে বাসবদত্তার প্রসঙ্গে দৈববাণীর উল্লেখ আছে। বাসবদত্তায় বাসবদত্তার অনুসন্ধানে ব্যর্থ-মনোরথ কন্দর্পকেতু আত্মহত্যায় উদ্যত হইলে পুনর্মিলনের আশ্বাস দিয়া দৈববাণী নীরব হইল।

অতএব কাদম্বরীর শিল্পে দৈববাণীর উপস্থিতি শিল্পবুদ্ধির ব্যতিরেক নয়। উহা প্রাচীন কিংবদন্তীরই অনাহত ধারা, রূপবিশেষ। উহার সহিত একদিকে যেমন পাঠক-মনের ঐতিহ্য-বিলাসী বৃত্তিবিশেষের গ্রন্থিবন্ধন, তেমনি অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাস্নাত স্রোতস্বিনীর জলে চাঁদের আলোয় সাঁতার-কাটা, যেন একজোড়া প্রতাপ-শৈবলিনী। ওরা চাঁদের আলোয় গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে চায়। ইহা ছাড়াও, আর একটা দিক আছে। তাহা হইল নাটকীয়তা। ঔপন্যাসিকের হাতে ঘটনাবৃত্তের শিথিল বন্ধ। অন্ততঃ নাটুকেদের মতো ঘটনাবন্ধের পিনদ্ধ স্বভাবটি ভাবের জোয়ার-ভাটায় ত্বরিতপদে ওঠানামা করে না। কিন্তু বাণের বেলায় দেখা যায়, দৈববাণী কুশীলবগণের অন্যতম। ঘটনায়, ঘটনার বিবর্তনে, ঘটনার উত্তরণে ও উত্তরায়ণে উহার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কাদম্বরী-উপন্যাসে দৈববাণীর আবির্ভাব দুইবার। একবার মহাশ্বেতার কাঁচা প্রেমের ব্যর্থতায়, চিতারোহণ-উদ্যোগ-পর্বের গৌর চন্দ্রিকায়—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের পুনর্মিলনের আশাবন্ধের আশ্বাসে ; আরবার বৈশম্পায়নের মৃত্যুতে বন্ধু-বিয়োগের দৈবদুর্বিপাকজনিত আঘাতে চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুতে। উভয় ক্ষেত্রেই দৈববাণী ঘটনা ও ভাবের বিবর্তনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। দৈববাণী না হইলে পুণ্ডরীকের শবদেহ লইয়া তরুণী সুন্দরী মহাশ্বেতাকে চিতানলে পুড়িয়া মরিতে হইত। ইহাতে

যে আমরা সেই জলন্ত অগ্নিশিখাকে চোখের জলে শান্ত করিয়া ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ বলিয়া শূন্য হৃদয়ে ঘরে ঘরে ফিরিতাম, ক্ষণিকের আনন্দ-প্রতিমাকে বিসর্জন দিয়া চোখের জলে তর্পণ সারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যেখানে ছিলাম, সেইখানে ফিরিয়া আসিতাম, তাহা নহে, মহাশ্বেতার জীবন কাহিনীও সেই চিতায় পুড়িয়া মরিত। তাহার অস্থিটুকু পর্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইত। ইহা যেমন দৈব-বাণীর ঘটনা-ভূমিকার একটি দিক, তেমনি অপর দিক কাদম্বরীর। মহাশ্বেতার যাহা হইত, কাদম্বরীরও ঠিক তাহাই হইত। কোন দিক্ দিয়া গল্প আর দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিত না। আবার ভাবের দিকে মহাশ্বেতার অভিসার-প্রেম কখনও স্বর্গীয় প্রেমের পারিজাত কুসুমে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইত না। না মহাশ্বেতার, না কাদম্বরীর। মহাশ্বেতার নচিকেত-তপস্যা, কাদম্বরীর ভৈরবীতন্ত্র সাধনা। কোথায় থাকিত ইহারা ? ইহারা না থাকিলে কাদম্বরী-মহাশ্বেতার কাহিনী যেমন কাহিনীর রূপ পাইত না, তেমনি পাইত না এই তরুণী-দুইটির মর্ত্য কামনা স্বর্গীয় প্রেমের দিব্যোন্মাদনা। জীবনের অঙ্কুর তাপের অভাবে না ফুটিয়াই ঝরিয়া পড়িত ; মর্ত্যবাসনার পঙ্কিল আর্তি রূপরসগন্ধস্পর্শে উপন্যাসের ফুল হইয়া ফুটিত না, কখনোই না।

দেহান্তর ও রূপান্তর ঃ

রূপান্তর দেহান্তরেরই অনুসিদ্ধান্ত। যেমনি রূপান্তরের, তেমনি দেহান্তরের মূল উৎস হইল জন্মান্তরে বিশ্বাস। ঋগ্বেদের ঋষিদের এইরূপ ধারণা ছিল যে, দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করা চলে। তাঁহারা আরও বিশ্বাস করিতেন যে আত্মার এই পৃথগ্ভাব কেবল মৃত্যুতেই ঘটেনা, অচেতন অবস্থায়ও ঘটে (অন্ত্যেষ্টি সূক্ত)। এই সূত্র হইতে মনে করা যাইতে পারে যে একদিকে যেমন তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, আত্মা অমর ও অক্ষয়, তেমনি বিশ্বাস করিতেন আত্মা দেহকোষ-নির্ভর নহেন, আত্মার স্বভাব মুক্ত ও স্বাধীন। অমর ও অক্ষয় বলিয়া আত্মা একজন্মের দেহ ছাড়িয়া পরবর্তী জন্মে নূতন দেহ ধারণ করিতেছেন এবং মুক্ত ও স্বাধীন স্বভাবের বলিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ সময়ের জন্য এক জন্মেই অপরের পরিত্যক্ত বা নূতন দেহে আশ্রয় লইতেছেন এবং কাজ ফুরাইলে আপাতিক নূতন দেহ ফেলিয়া আবার সেই পুরানো দেহে ফিরিয়া আসিতেছেন। আত্মার প্রথম লক্ষণ অমরতা ও অক্ষরতার ভিত্তিতে জন্মান্তর প্রবাহিত এবং জন্মান্তরের এই কারণ সম্পর্কে প্রাক্তন কর্ম ও অভিশাপ বা কর্তব্যের অবহেলার নজিরটি উত্থাপিত।

আত্ম-বিমুক্ত পরিত্যক্ত দেহ সম্পর্কে তাঁহারা বলেন, শবদেহ আগুনে পোড়ান অথবা মাটির তলায় কবর দেওয়া হইত। ইহার অতিরিক্ত তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা আত্মার জীবভাবে নবদেহ-সংক্রামণের আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষণে তাঁহারা বলিয়াছেন, দেহ হইতে আত্মার এই পৃথগ্‌ভাব কেবল মৃত্যুতেই ঘটেনা, অচেতন অবস্থায়ও ঘটে। অচেতন অবস্থার পৃথগ্‌ভাবের এই সূত্রটির আড়ালে হয়তো কোন প্রাচীন বিশ্বাস লুকায়িত ছিল, না হয়, তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় মৃত্যুর ন্যায় অচেতন অবস্থায় আত্মার পৃথগ্‌ভাবের প্রতিও তাঁহাদের নজর পড়িয়াছে। প্রাচীন বিশ্বাসের কথা বলিতেছিলাম এই জন্য যে একই জন্মে একদেহ ছাড়িয়া অন্য দেহে পরিক্রমণের বিশ্বাসটি যে কত প্রাচীন কালের, তাহাও ঠিক করিয়া বলা কঠিন। "ইজিপ্টের লোক এককালে সত্যিই বিশ্বাস করতো যে, জীবন কায়া ছেড়ে চলে যায় আবার কিছু দিন পরে সন্ধান করে করে নিজের ছেড়ে ফেলা কামিজের মতো কায়াতেই এসে ঢোকে। এই জন্য কায়ার মায়া তারা কিছুতে ছাড়তে পারেনি, ভৌতিক শরীরকে ধরে রাখার উপায় সমস্ত আবিষ্কার করেছিল।"[১]

ইজিপ্টের এই ঘটনা যদি হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই বিশ্বাস আরো হাজার হাজার বছরের পুরাণো। আমাদের প্রাচীনদের মধ্যেও এইরূপ একটা বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে-বিশ্বাস সম্ভবতঃ অনার্য গোষ্ঠীর বিশ্বাস, তাই আর্যগণের পবিত্র সাহিত্যে সে-বিশ্বাস কায়া রক্ষা করিতে পারে নাই, একটু ছায়া রাখিয়া গিয়াছে। সেই ছায়াটুকু আমরা আত্মার অচেতন অবস্থার পৃথগ্‌ভাবের অস্পষ্ট কুহেলীর মধ্যে যেন দেখিতে পাই। দেখিতে যে পাই, তাহার নজির কোনো তত্ত্বগ্রন্থে নাই, আছে লোক-সাহিত্যে। লোক-সাহিত্যের উচ্চবর্ণতা না থাকিলেও সত্য মূর্তি আছে এবং ভোট লইলে লোককথা ভোটের জোরে অভিজাত সাহিত্যকেও হারাইয়া দিবে। তান্ত্রিক শব-সাধনায় বিশিষ্ট লক্ষণ-যুক্ত মৃতদেহে সাধক কিছুক্ষণের জন্য জীবন ফিরাইয়া আনিতেন নিজের স্বার্থে, মৃতের স্বার্থে নহে। বেতাল-পঞ্চবিংশতির সন্ন্যাসী রাজাকে আপন স্বার্থে অনুরূপ উদ্দেশ্যে কতই না নাজেহাল করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর সম্পর্কেও কিংবদন্তী শোনা যায় যে তিনি নাকি কামকলা শিখিবার উদ্দেশ্যে রাজা অমরুর মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া রাণীর নিকট হইতে কামকলার পাঠ লইয়াছিলেন। অতএব একজন্মেই একদেহ ত্যাগ করিয়া অচেতন অবস্থার আশ্রয়ে অন্যদেহ যে ঘুরিয়া আসা যায়,

(১) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোক চেতনায় এইরূপ বিশ্বাস দানা বাঁধিবার ফলে কিংবদন্তীতে ইহা লইয়া অনেক গল্প ফাঁদা হইয়াছে এবং পাঠক বা শ্রোতার মানসে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকায় যাঁহারা গল্প শুনিতেন, তাঁহারও রস পাইতেন প্রচুর। কিন্তু কাদম্বরীতে লেখক কিংবদন্তীর এই বিশ্বাসকে অত সহজে মুক্তি দেন নাই। কাদম্বরীর ঘটনাবিন্যাসের প্রকৃতি হইল জটিল। তাই লেখক কিংবদন্তীর উক্ত বিশ্বাসের সহিত অভিশাপ ও ইন্দ্রজাল টানিয়া আনিয়া ঘটনাবিন্যাসের এক জটিল রূপের অবতারণা করিয়াছেন। তাই চন্দ্রাপীড় বন্ধুবিচ্ছেদে অচেতনতার সুযোগেই কিছুকালের জন্য শূদ্রকের ভূমিকায় ঘুরিয়া আসিলেন; বৈশম্পায়নও মহাশ্বেতার অভিশাপে শুকযোনি ঘুরিয়া আসিলেন। চন্দ্রাপীড়ের হতচেতনতা বোঝা যায় কিন্তু বৈশম্পায়ন মৃত্যুর মধ্য দিয়া, কি হতচেতনতার পথ বাহিয়া, শুকদেহের অভিনয় করিয়া আসিলেন, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। না বুঝিবার কারণ নাটকীয়তা। এই নাটকীয়তার মধ্যে আছে ইন্দ্রজাল। এই ইন্দ্রজালের উদ্দেশ্য পাঠক বা শ্রোতার বুদ্ধির বিভ্রান্তি ঘটানো। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে লেখক বৈশম্পায়নের পতঙ্গযোনিত্ব প্রাপ্তির উপায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া না দিলেও উহাও যে হতচেতনতার আশ্রয়, তাহা বোঝা যায়। অতএব কাদম্বরীর লেখক অভিশাপ, ইন্দ্রজালের সহিত হতচেতনা জুড়িয়া দিয়া দেহান্তর-পরিভ্রমণের বিশ্বাসটিকে প্লটের জটিল সন্নিবেশে আনিয়া শিল্পবুদ্ধির চমৎকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

জন্মান্তরের আনুষঙ্গিক ফল রূপান্তর। রূপান্তর না হইলে জন্মান্তর কি করিয়া সম্ভব? এই রূপান্তরের আবার দুই ধারা; একটি জন্মান্তরের, অপরটি একনিষ্ঠ জন্মের। জন্মান্তরের রূপান্তরের সহিত জড়িত প্রাক্তন কর্ম ও অভিশাপ। প্রাক্তন কর্ম ও অভিশাপ বা বর্তমান কর্মপ্রবাহ অনুসারে নবজন্মের আশ্রয় ভাল কি মন্দ হইবে, তাহা নির্ধারিত হইত একই জন্মে রূপান্তরে বর্তমান জীবনের কর্মপ্রবাহের কুফলের দ্বারা। রূপান্তর বলিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপান্তরকে বোঝায়? বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণরূপ, গৌতমের অভিশাপে অহল্যার পাষাণমূর্তি—প্রাচীন বিশ্বাসেরই ঐতিহ্য-ভূমি। হিতোপদেশের 'মুনি-মূষিক-কথা'য় মুনির মন্ত্র বলে ইঁদুর বিড়াল হইল, বিড়াল বাঘ হইল, আবার ব্যাঘ্র-মহাশয় যে ইঁদুর সেই ইঁদুর। এই রূপান্তরের মধ্যেও প্রাচীন বিশ্বাসের অভিজ্ঞান। ইহা শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সকল দেশের লোককথায় অনুসন্ধান করিলে বহু দৃষ্টান্ত মিলিবে। **Arabian Nights, Fairy tales, Folk-tales of Bengal**, এমন কি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের বাংলা রূপকথা 'ঠাকুরমার ঝুলিতে'ও অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয়

মিলিবে। 'ঠাকুমার ঝুলির' 'ঘুমন্তপুরী' ও 'কিরণ-মালা' গল্পে মানুষের পাষাণে রূপান্তরের কিংবদন্তীগত চেতনায় বিশ্বাসের সাক্ষ্য আছে।

ঘুমন্তপুরীর রাজপুত্র দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। চলিতে চলিতে এক নিস্তব্ধ রাজপুরীর মধ্যে আসিয়া উঠিলেন। 'রাজপুত্র হাঁক দিলেন। কেহ কথা কহিল না, কেহ তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিল না। অবাক হইয়া রাজপুত্র কাছে গিয়া দেখেন, কাতারে কাতারে সিপাই, লস্কর, কাতারে কাতারে হাতী ঘোড়া সব পাথরের মূর্তি হইয়া রহিয়াছে। * * * পাহারারা পাথরের মূর্তি, সিপাইরা পাথরের মূর্তি। * * * রাজসিংহাসনে রাজা পাথরমূর্তি ; মন্ত্রীর আসনে মন্ত্রী পাথর মূর্তি, পাত্র, মিত্র, ভাট, বন্দী, সিপাই লস্কর যে যেখানে, সে সেখানে পাথর-মূর্তি। কাহারও চক্ষে পলক নাই, কাহারও মুখে কথা নাই।'

আবার সোনার মূর্তি! 'ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটে হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলানো রহিয়াছে ; সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন। ঘুমন্ত রাজকন্যার হাত দেখা যায় না, পা দেখা যায় না, কেবল চাঁদের-কিরণ মুখখানি সোনার পদ্মের সোনার পাপড়ির মধ্যে টুল্‌টুল্ করিতেছে। * * * রাজকন্যার শিয়রে এক সোনার কাটী। রাজপুত্র আস্তে আস্তে সোনার কাটী তুলিয়া লইলেন। * * * সোনার, কাটীটি কখন্ টুক্ করিয়া ঘুমন্ত রাজকন্যার মাথায় ছুঁইয়া গেল। অমনি পদ্মের বন 'শিহরিয়া' উঠিল, সোনার খাট নড়িয়া উঠিল, সোনার পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়িল ; রাজকন্যার হাত হইল, পা হইল ; গায়ের আলস ভাঙিয়া, চোখের পাতা কচ্‌লাইয়া ঘুমন্ত রাজকন্যা চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। * * * অমনি রাজপুরীর চারিদিকে পাখী ডাকিয়া উঠিল, দুয়ারে দুয়ারী আসিয়া হাঁক ছাড়িল, উঠানে হাতী ঘোড়া ডাক ছাড়িল, সিপাইদের তরোয়াল ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল ; রাজদরবারে রাজা জাগিলেন, মন্ত্রী জাগিলেন, পাত্র জাগিলেন—হাজার বছরের ঘুম হইতে যে যেখানে ছিলেন, জাগিয়া উঠিলেন—* * * সকলে অবাক হইয়া গেলেন, রাজপুরীতে কে আসিল'।

'কিরণমালা' গল্পে 'রাজপুত্র বরুণ যাইতে যাইতে মায়া-পাহাড়ের দেশে গেলেন। অমনি চারিদিকে বাজনা বাজে, অপ্সরী নাচে,—পিছন হইতে ডাকের উপর ডাক—"রাজপুত্র! রাজপুত্র! ফিরে চাও! ফিরে চাও! কথা শোন! বরুণ ফিরিয়া চাহিতেই পাথর হইয়া গেলেন,—"হায়! হায়! দাদাও আমার পাথর

হইয়াছেন।” বোন কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশে বাহির হইলেন। যাইতে যাইতে সোনার-ফল হীরার গাছের গোড়ায় গিয়া পৌঁছিলেন। হীরার গাছের সোনার পাখীর উপদেশমত ‘কিরণ মালা সোনার ঝারি ঢালিয়া জল ছিটাইলেন, চারিদিকে পাহাড় মড় মড় করিয়া উঠিল, সকল পাথর টক্ টক্ করিয়া উঠিল,—যেখানে জলের ছিটাফোঁটা পড়ে, যত যুগের যত রাজপুত্র আসিয়া পাথর হইয়া ছিলেন, চক্ষের পলকে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া বসেন। * * অরুণ বরুণ চোখের জলে গলিয়া বলিলেন, “মায়ের পেটের ধন্য বোন্”।

যশোহর-ফরিদপুর অঞ্চলে নদের-চাঁদ কুমীরের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। নদের-চাঁদ কিন্তু মানুষ। কামরূপে যাইয়া কুমীর হওয়ার মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে স্ত্রী ধরিয়া বসিল—‘কামরূপ হইতে কী মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছ, একবার দেখাও।’ নদের-চাঁদ বলিল, ‘দেখাইতে পারি কিন্তু তুমি ভয় পাইবে না তো!’ ‘ভয় কিসের? তুমি তো কুমীর হইবে, তবে আমার ভয় কি?’ আচ্ছা, একটা বাটীতে জল আন।’ স্ত্রী জলশুদ্ধ বাটী লইয়া আসিল। নদের চাঁদ জলে মন্ত্র পড়িলেন। স্ত্রীকে বার বার সাবধান করিয়া দিলেন। ‘ঐ মন্ত্রপূত জল যদি কোন রকমে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কুমীর হওয়ার পর আর ফিরিয়া মানুষ হইতে পারিব না। আমাকে সারা জীবন কুমীর হইয়া থাকিতে হইবে।’ ‘না. গো, না, সে দায়িত্ব আমার আছে। মেয়ে-মানুষ বলিয়া কি নিজের ভালমন্দের কাণ্ডজ্ঞানও আমার নেই? হওনা তুমি কুমীর।’ ‘কুমীর হওয়ার পর ঐ মন্ত্রপূত জল আমার গায়ে ছিটাইলে, আমি যেমন মানুষ আছি, আবার তেমনিটি হইব।’ নদের-চাঁদ মন্ত্র পড়িয়া কুমীর হইলেন, যেমনি কুমীর হওয়া, অমনি কুমীর দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া এক লাফে স্ত্রীতো পগারপার। মন্ত্রপূত জলের বাটী মাটিতে পড়িয়া গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, উপুর হইয়া কান্নার জল মাটিতে গড়াইয়া দিল। নদের-চাঁদ কুমীর হইয়া দুই-এক দিন ঘরে কাটাইল। তাহার পর উঠানে, উঠান হইতে খিড়কীর পুকুরে, পুকুর হইতে নদীতে। নদের-চাঁদের আর মানুষ হওয়া হইল না। নদীর জলে চিরদিনের জন্য তাহার বাসর তৈয়ারী হইল। এখনও নদীর তীরে দাঁড়াইয়া যদি কেহ উঁচু গলায় ডাকে ‘নদের চাঁদ’, নদের-চাঁদ কুমীর জল দোলাইয়া নদীর কূলে ভাসিয়া ওঠে। গ্রামের মানুষ কূলে দাড়াইয়া নদীর জলে নদের-চাঁদের জন্য চোখের জল ফেলিয়া যায়।

সাহিত্যেও রূপান্তরের অনেক নজির আছে। বাংলা রামায়ণ-গানে রাবণের প্রতি দেবী চণ্ডীকে চটাইবার জন্য হনুমানের মক্ষিকারূপ ধারণ করিয়া পবিত্র চণ্ডী-

গ্রন্থের অঙ্কুর-অবলোপন ; বিক্রমোর্বশীতে উর্বশীর লতা ও মেঘরূপ ধারণ ; শকুন্তলায় শিশু-ভরতের হাতে বাঁধা মারীচের-দেওয়া পারিজাত ওষধিলতার পিতৃ ভিন্ন অন্য পুরুষ স্পর্শে সর্পত্ব প্রাপ্তির কথা ; মেঘদূতে দৌত্যের ব্যাপারে অচেতন মেঘের মধ্যে চেতনের আরোপে মানসিক রূপান্তর, কথাসরিৎসাগরের গল্পে পিতৃশাপে মকরন্দিকার নিষাদ-কন্যাত্ব প্রাপ্তি ; 'দশকুমার চরিতে'র 'রাজবাহন' চরিতে রাজবাহনের গুল্ফ-দেশে আবদ্ধ রজত শৃঙ্খলের অপ্সরায় রূপান্তর ; 'বাসবদত্তা'য় ঋষির শাপে বাসবদত্তার পাষাণরূপ প্রাপ্তি।

অতএব দেখা যাইতেছে সুদূর প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক যুগের গ্রাম্য সংস্কার পর্যন্ত আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে ও সাহিত্যে রূপান্তরের বিজয় অভিযান। দেহান্তর ও রূপান্তর সম্পর্কে ভারতীয় পাঠক-মানসে বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল এবং এখনও গ্রাম্য জীবন হইতে এ বিশ্বাসের সংস্কার যে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, তাহাও বোঝা গেল। কাদম্বরী সম্পর্কে দেহান্তরের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রূপান্তরের সম্পর্কে আমরা যে দিক্‌টার উপর বেশী জোর দিয়াছি, তাহা একটি মাত্র জীবনের ভূমিকায় রূপান্তরের কথা। চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন-জীবনে সে রূপান্তর আছে। পুণ্ডরীক ও চন্দ্রের ভূমিকায় আছে দেহান্তর। কাদম্বরীতে যুগপৎ দেহান্তর ও রূপান্তরের বিন্যাস।

স্বপ্ন ঃ

কিংবদন্তীতে স্বপ্নের স্থান কোথায়, তাহা বুঝাইবার জন্য স্বপ্নের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মনে অবচেতন হইতে চেতনে বিষয়ের ভাসমানতার নাম স্বপ্ন। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা না থাকিলেও স্বপ্নেও একটা ক্রিয়া আছে। স্বপ্নে-দেখা নিশ্চয়ই মানসিক ক্রিয়া। স্বপ্নের মধ্যে আমরা ভয় পাই, আনন্দ পাই, চিন্তা করি, তর্ক করি—এসব মানসিক ক্রিয়া। জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ক্রিয়ার পার্থক্য হইল, জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের বাস্তব চেতন-সম্পর্ক থাকে, স্বপ্নে তাহা থাকে না ; স্বপ্নে বিষয়ের ছবিগুলি মনের উপর মায়ামন্ত্রে ভাসিতে থাকে। স্বপ্ন তখন নানা দিনের নানা সময়ের নানা ছবি লইয়া গল্প ফাঁদিতে বসে। তখন ইন্দ্রিয়গণের সক্রিয়তা থাকে না বলিয়া স্বপ্নে আমরা পাহাড় হইতে পড়িলেও ব্যথা পাইনা ; প্রাণপণে দৌড়াইলেও অগ্রসর হইতে পারি না, তাড়াতাড়ি লিখিবার চেষ্টা করিলেও লেখা কিছুই হয় না, চীৎকার করিলেও শব্দ বাহির হয় না। নিদ্রিত অবস্থায়ও আমাদের মনে চিন্তাধারা

বর্তমান থাকে। তবে চেতনায় তাহা জাগরূক না থাকিয়া অবচেতনায় সুপ্ত থাকে। অনুভূত ভাবধারা যখন মনের নিম্নতল হইতে ভাসিয়া ওঠে এবং তাহার উপর চেতনার আলো পড়ে, তখনই স্বপ্ন ফেনাইয়া উঠে। অবচেতন হইতে চেতনে ভাসমানতার নাম স্বপ্ন। নিদ্রাকালে যে-সকল চিন্তাধারা অবচেতনে মগ্ন থাকে, স্বপ্নে তাহারা চেতনায় ভাসিয়া ওঠে। কেন এমন হয়? মনের দুই অবস্থা—(১) প্রবহন অবস্থা ও (২) নিয়ন্ত্রণ অবস্থা। নিয়ন্ত্রণ অবস্থার নিয়ামক 'অহম্'। নিদ্রায় আমাদের মনে চিন্তা থাকে ক্ষীণ ও অবসন্ন। যেমন চিন্তাধারার ক্ষীণতা ও অবসাদ, তেমনি তাহাদের নিয়ন্তারও নিয়ন্ত্রণ-শক্তি হ্রাস পায়। তখন শাসনের বাধা না থাকায় মনের ক্ষীণ ও অবসন্ন চিন্তাগুলি মনের উপরিতলে ভাসিয়া ওঠে এবং সেখানে চেতনের আলোকপাতে চিন্তা স্বপ্নের রূপ বোনে। নিয়ন্ত্রণের অভাবেই স্বপ্নের আবির্ভাব হয়। স্বপ্নগুলি সহজ ও স্বাভাবিক না হইয়া যে উদ্ভটরূপ ধারণ করে, তাহার মূলেও ঐ নিয়ন্ত্রণের অভাব। নিয়ন্ত্রণের অভাবে আমাদের মনের মধ্যে চিন্তা ও ভাবসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে ক্রিয়া করে বলিয়া অমনি উদ্ভট স্বপ্নের সৃষ্টি। স্বপ্নের মধ্যে আমাদের মন বিনা চেষ্টায় গল্প বোনে। স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে ন্যায় বা কার্য-কারণ সম্পর্কের কোন সামঞ্জস্য নাই। আমরা কলিকাতায় থাকিয়া দিল্লীর লাল কেল্লার স্বপ্ন দেখি, পাহাড় হইতে পড়িয়া যাই অথচ ব্যথা পাই না, দৌড়াই কিন্তু আগাইতে পারি না, লিখিবার চেষ্টা করি অথচ লেখা হয় না, চীৎকার করি অথচ চীৎকার ফোটে না। স্বপ্নগুলি কাল্পনিক কাহিনী। এই দিক দিয়া কল্পনার সহিত ইহার মিল আছে। বাস্তবতার সহিত ইহার যোগ নাই। পরীর গল্প, ভূতের গল্প, রাক্ষসের গল্প—এগুলির মধ্যেও বাস্তব যুক্তিযুক্ততার যেমন কোন বালাই নাই, তেমনি নাই স্বপ্নের। বাস্তব চেতনা হীনতার দিক্ দিয়া স্বপ্নের সহিত এই সকল গল্পের পার্থক্য হইল এই, গল্পের মধ্যে চেষ্টা আছে, স্বপ্নে চেষ্টা নাই। যেমন স্বপ্ন, তেমনি দিবা-স্বপ্ন—উভয়ের মধ্যেই অনৈচ্ছিক কল্পনা। পার্থক্য হইল, স্বপ্ন নিদ্রিত অবস্থার, আর দিবা-স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার। দিবা-স্বপ্নের মূর্তিতে স্বপ্নের সত্য বিশ্বাস নাই, স্বপ্নে আছে। স্বপ্নে বহির্জগৎ হইতে আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ; দিবাস্বপ্নে বহির্জগৎ আমাদের সম্মুখে। স্বপ্নের উদ্দীপন তিনটি—(১) জাগতিক (২) শারীরিক ও (৩) মানসিক। স্বপ্নের মধ্যেই নিদ্রার মূলধন। তাই ফ্রয়েড বলেন—"Dream is the guardian of sleep."

সকল স্বপ্নের মূল আমাদের কামনায়। ফ্রয়েড বলেন, "Every dream is

the fulfilment of a desire" কামনা দুই শ্রেণীর—(১) অশ্লীল ও কুৎসিত; (২) নির্দোষ ও বালকসুলভ। আমাদের কামনার তো অন্ত নাই। সে কখন যে কী মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া ওঠে, তাহার ঠিক নাই। তাহার চাওয়ার মধ্যেও কোন বিচার-বুদ্ধি নাই, কোন শালীনতা নাই, সংযম নাই, দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। যাহা অন্যায় ও অবৈধ, তাহাও সে চাহিয়া বসে। কিন্তু আমরা সামাজিক মানুষ, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, নীতি-দুর্নীতি বুঝিয়া চলি, সুন্দর-কুৎসিত বিচার করিয়া থাকি, এক কথায়, নীতি মানিয়া চলি। অবৈধ কামনা যখন মাহুত-ছাড়া হাতীর মতো উচ্ছৃঙ্খল হইয়া এমন জিনিস চাহিয়া বসে, যাহা কখনও চাহিতে নাই, তখন শ্লীলতাজ্ঞান, সংসার-সমাজ ও ধর্মজ্ঞান আমাদের লজ্জিত করিয়া তোলে। লজ্জায় মরিয়া আমরা কামনাকে চাপিয়া রাখি। কামনাকে ধর্মবোধে, সমাজবোধে, ও কল্যাণবোধে চাপিয়া রাখিলেও স্বপ্ন কিন্তু সেই চাপা কামনারই অনুসরণ করে। কখনও কখনও দেখা যায়, আমাদের এই চাপা কামনা অশ্লীল মূর্তি ছাড়িয়া শোভন-সুন্দর ছদ্ম মূর্তিধারণ করে। যে-সকল কামনা তাহাদের প্রকৃত রূপ গোপন করিয়া ছদ্মবেশে স্বপ্নের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তাহাদের অধিকাংশ যৌনভাব-মূলক। কামনা অনুসারেই স্বপ্ন হয় বটে কিন্তু স্বপ্নে ঐ কামনা সব সময়ে নিজরূপ ধরিয়া আসেনা, আসে ছদ্মবেশে। ফ্রয়েডের মতে সকল গোপন কামনাই অশ্লীল ও যৌনভাব-মূলক। আসল কথা, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করা কঠিন ব্যাপার।

প্রশ্নোপনিষদের চতুর্থপ্রশ্নে স্বপ্নবিষয়ক আলোচনা আছে। সেখানে স্বপ্নের আলোচনা প্রাসঙ্গিক। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—প্রাণিগণের তিন অবস্থার মাধ্যমে চেতন-পুরুষের আলোচনাই সেখানে মুখ্য। এই তিন অবস্থার সেখানে এক চমৎকার সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের ফলে স্বপ্নের উপর যে আলোকপাত হইয়াছে, তাহার মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের বক্তব্য।

গার্গ্য প্রশ্ন তুলিলেন পিপ্পলাদের নিকট:

দেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া নিদ্রা যায়? কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় দেহরক্ষার নিমিত্ত স্ব স্ব ব্যাপারে রত থাকে? কার্য-কারণের মধ্যে কোন্ দেবই বা অহংপ্রত্যয়-প্রত্যক্ষ ও প্রকাশাত্মক? কেইবা অন্তঃশরীরে জাগ্রৎ-কালীন বাসনাজনিত নানাবিধ পদার্থ স্বপ্নে দর্শন করেন? জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ব্যাপার উপরত হইলে দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত কাহার এই সর্বজনবিদিত সুষুপ্তিকালীন সুখ হয়? কোন্ সে আধার যাহাতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, সবই সম্যকরূপে একীভূত হয়?

পিপ্পলাদ ইহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। পিপ্পলাদ বলিলেন,— যেমন সায়ংকালে অস্তোন্মুখ সূর্যের কিরণসমূহ বিশেষভাব পরিত্যাগ করিয়া একীভূত হয়, পুনরায় দ্বিতীয় দিবসে একতাপ্রাপ্ত সেই কিরণসমূহ উদীয়মান সূর্য হইতে পুনরায় প্রসৃত হয়, সেইরূপ নিখিল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রকাশময় দেবতামনে একীভূত হয়। সেই জন্য স্বপ্নকালে এই পুরুষ শব্দ শ্রবণ করেন না, রূপ দর্শন করেন না, গন্ধ গ্রহণ করেন না, রস আস্বাদন করেন না, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ জানিতে পারেন না, কাহারো সহিত সম্ভাষণ করেন না, হস্তদ্বারা কোন কিছু গ্রহণ করেন না, উপস্থ দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন না, পায়ুদ্বারা মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না, পদদ্বারা গমন করেন না। তখন বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন, "এই লোকটি নিদ্রা যাইতেছে।" অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার দেখা যায়। স্বপ্নে বাসনাময় ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের উপলব্ধি হইলেও ইন্দ্রিয়সকল স্থূল শরীরে নিজ নিজ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বাহ্য শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করে না। মনে ইন্দ্রিয়গণের একীভাবের অর্থ হইল—স্ব স্ব ব্যাপার পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণরূপে মনের অধীন হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতিমাত্র।

জীবাত্মার উপাধিভূত চৈতন্যময় এই মন নানাবিধ পদার্থ-পরিপূর্ণ স্বীয় বিভূতি অনুভব করে। মন জড় হইলেও চৈতন্য-জ্যোতিতে চৈতন্যময় হইয়া কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বপ্ন-জাগরণ আত্মার ধর্ম নহে, মনের ধর্ম। জাগ্রদবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়-যুক্ত মন আত্মার উপাধি এবং স্বপ্নে উপসংহৃত বাহ্যেন্দ্রিয় মনে পর্যবসান লাভ করে। আত্মার সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি মনোধর্ম আত্মাতে আরোপিত হয়। জাগ্রদবস্থায় চোখে যাহা পড়িয়াছে, সেই দৃষ্ট বস্তু বিষয়ক বাসনা হইতে জাত বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ চৈতন্যময় মন স্বপ্নে দর্শন করে। জাগ্রদবস্থায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যেসব বিষয় শ্রুত হইয়াছে, সেই সব শ্রুত বিষয়ক বাসনা হইতে উৎপন্ন শব্দ সমূহ স্বপ্নে শ্রবণ করে। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন কালে প্রতিদিন যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, স্বপ্নে সেই সেই বাসনাময় পদার্থসমূহ অনুভব করে। এই জন্মেও জন্মান্তরে যাহা কিছু চক্ষুর দ্বারা দেখিয়াছে, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিয়াছে, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, সেই সকল স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক যাবতীয় পদার্থ মন স্বপ্নে দেখে। দেব, তির্যক, মনুষ্য প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন বাসনারূপ উপাধি বিশিষ্ট হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের আত্মা স্বরূপ মন এইরূপে নিজেকেই দর্শন করে। সেই মন যখন আত্ম-চৈতন্যের দ্বারা অভিভূত হয় অর্থাৎ বাসনার উদ্বোধক কর্মের বিশ্রান্তি হেতু তিরস্কৃত-বাসন এবং

উপসংহৃতেন্দ্রিয় হইয়া সর্বদেহ ব্যাপিয়া সামান্যরূপে অবস্থান করে, তখন দেহীর সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তিতে, এই বর্তমান দেহে সতত বিদ্যমান ব্রহ্মানন্দ নির্বাত নিষ্কম্প প্রদীপ-প্রভার ন্যায় সম্যকরূপে প্রকাশ পায়। বিভিন্ন দিগ্‌দেশগত পক্ষিগণ যেমন সায়ংকালে আবাস-বৃক্ষে ফিরিয়া সেখানে অবস্থান করে, সেইরূপ মন, বুদ্ধি ও তাহাদের বিষয়সমূহ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা অধ্যস্ত উপাধি বিশিষ্ট হইয়া জবা ফুলের সান্নিধ্যে শুভ্র স্ফটিকের ন্যায় চাক্ষুষ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া দ্রষ্টা, ত্বগিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া স্প্রষ্টা, শ্রবণেন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া শ্রোতা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের আশ্রয়ে ঘ্রাতা-রসনেন্দ্রিয়ের রসয়িতা, মননেন্দ্রিয়ের মন্তা, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বোদ্ধা হইয়া সুবর্ণ-হারে সুবর্ণের ন্যায়, তরঙ্গে জলের ন্যায় নিখিল কার্য-কারণ রূপ উপাধিসমূহ সংরূপে চৈতন্যস্বরূপে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়া ইনিই বিজ্ঞানময় চৈতন্যমাত্র স্বরূপ পুরুষ। জল-প্রতিবিম্বিত সূর্য জলাভাবে যেরূপ সূর্যরূপে অবস্থান করেন, সেইরূপ উপাধি বিশিষ্ট দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিত সেই চৈতন্য উপাধিলয়ে নিখিল জগতের অধিষ্ঠান নিরুপাধিক কূটস্থরূপে অবস্থান করেন।

তাহা হইলে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হইতে পাওয়া গেল—নিদ্রিত অবস্থায় অবচেতনে আশ্রিত বিষয় যখন চেতনলোকে ভাসিয়া উঠিয়া চৈতন্য-প্রদীপ্ত হয়, তখন মানুষ স্বপ্ন দেখে এবং অবদমিত গোপন কামনা মাত্র যৌনভাব-মূলক। ইহা হইতে অন্ততঃ দুইটি সমস্যার সমাধান মেলে না ; (১) একস্থানে থাকিয়া বহু দূরবর্তী স্থানে আমার যে নিতান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু হইল, তাহার বেদনাময় অনুভূতির স্বপ্ন এবং (২) যে অনিন্দ্যকান্তি সুন্দরীকে জীবনে কখনও দেখি নাই, দেখা তো দূরের কথা, নাম পর্যন্ত শুনি নাই, তাহাকে স্বপ্নে দেখা—স্বপ্নে ভালবাসা।

ঔপনিষদিক আলোচনায় এই সমস্যার মীমাংসার অনুকূল ফাঁক আছে। ঋষিরা জীবনকে খণ্ড, বিচ্ছিন্ন ও সীমিত করিয়া দেখিতেন না। তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর অখণ্ড ধারার মধ্যে জীবনের অনন্ত স্বরূপকে বিশ্বাস করিতেন। তাই বাসনালোকে সুপ্ত মানুষের এই জীবনকার অতীত অভিজ্ঞতাই কেবল থাকিবে, একথা মনে করিতেন না ; তাঁহারা মনে করিতেন অতীত জন্মগুলির সংস্কারও বাসনালোকে থাকিবে। তাই পিপ্পলাদকে বলিতে শুনি—"দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চ অনুভূতঞ্চাননুভূতঞ্চ সর্বং পশ্যতি।" তাঁহাদের মতে জাগ্রৎবল, স্বপ্ন বল, সুষুপ্তি বল, সবই চেতনপুরুষে নিরুপাধিক চৈতন্যে অনুস্যূত। সেই নিরুপাধিক কূটস্থ চৈতন্যই

একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহার নিকট অজানা কিছু নাই। বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালের উৎস তিনি। তাই তাহার নিকট দূর ও নিকটের ব্যবধান নাই, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পার্থক্য নাই। নিদ্রা হইতে সুষুপ্তি পর্যন্ত দেখিতেছি একটানা নিম্নমুখী ধারা। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—সকলেই ঘরে ফিরিতেছে। স্বপ্নে যদি সেই নিম্নমুখী ধারা উজান বহিয়া জ্যোতির্ময় মূর্তিতে 'রাধা' হইয়া দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই রাধার সহিত যে হৃদয়-বৃন্দাবনের—অনন্ত বৃন্দাবনের অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জোয়ারের ঠেলায় ভাসিয়া আসিবে, তাহাতে অবিশ্বাসের কী আছে? এক-দিকে অনন্ত বাসনালোকে সংগৃহীত জন্ম-জন্মান্তরের অভিজ্ঞতা, নানা সম্বন্ধ, নানা অনুভূতি, অন্যদিকে সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপক, সর্বসত্য, সর্বসুন্দর, সর্বকল্যাণ অন্তর্যামী কূটস্থ চৈতন্য। এই দুয়ের সমবায়ে কিছুই অসাধ্য নয়—না অজানার, না দূরত্বের, না অপরিচয়ের। দুইটি দৃষ্টান্ত লইয়া বিচার করা যাউক। রামায়ণে ভরতের স্বপ্ন এবং ভাগবতে উষার স্বপ্ন।

ভরত তখন মাতুলালয়ে। কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা লইয়া অযোধ্যায় যে কী ঘটনা ঘটিতেছে, ভরত তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানেন না। ভরত অযোধ্যা সম্পর্কে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুম হইতে উঠিয়াছেন। তাহার মুখখানি বিষণ্ণ।

[১] "ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাহার মূর্তি বিষণ্ণতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্তকীগণ তাহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বন্ধুগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনোরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।" কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মতো মনে হইল। এই দুর্ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন।"—

একদিকে অযোধ্যার অন্তঃপুরে দুর্ঘটনা, অপর দিকে ভরতের দুঃস্বপ্ন;—ইহার মীমাংসা কোথায়? জানিনা ফ্রয়েডবাদিরা ইহার কী উত্তর দিবেন! মনস্তাত্ত্বিকেরা

(১) রামায়ণী কথা।

হয়তো স্বপ্নের সমস্যা অতি জটিল বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। পিপ্পলাদ কিন্তু ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন। কী করিয়া পারিবেন, তাহা একটু পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ভরতের স্বপ্নের বৈচিত্র্য হইল এই, অযোধ্যায় থাকিলে তিনি যাহা উপস্থিত ক্ষেত্রে চোখে দেখিতেন, স্বপ্নের উদ্ভট কল্পনায় সেই ঘটনাটি যথাযথ ঘটে নাই বটে, তবে তাহার একটা বেদনাদায়ক আভাস তাঁহার চিত্তলোক মথিয়া উঠিয়াছে। এখানে সমস্যা যাহা কিছু, তাহা কেবল দূরত্বের।

এখন ধরা যাউক অজানিতের প্রেমের স্বপ্ন। ভাগবতে আছে, উষা অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিবেন ঐ স্বপ্ন দেখার মধ্যে পার্বতীর বর আছে। উষার ভক্তি-মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য শাস্ত্র এখানে পার্বতীকে টানিয়া আনিয়াছেন। আসলে উহা উষার স্বপ্ন। আপত্তি কেহ কেহ তুলিতে পারেন, তাই ও-দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া দিলাম। বাসবদত্তায় কন্দর্পকেতু যে বাসবদত্তাকে স্বপ্ন দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিলেন,—ইহার সমাধান কোথায়? উপনিষদের স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহার মীমাংসা আছে। তাহা ছাড়াও কিংবদন্তীগত ইহার একটি ব্যাখ্যা আছে। কিংবদন্তীর সূত্রে ইহার আলোচনা করিব। ফ্রয়েড বলেন, সকল স্বপ্নের মূলে হইল গোপন কামনা। ধরিলাম কন্দর্পকেতু তরুণ। তরুণ বয়স নারীসঙ্গ ভালবাসে। হয়তো বা কোন সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। তাই সে নারী-মোহটি ছদ্মবেশে বাসবদত্তারূপে স্বপ্নে দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাসবদত্তা যখন সুন্দরী যুবতী-কন্যার সাধারণীকৃত রূপ নয় এবং বাসবদত্তা যখন একজন বিশেষ মানুষ এবং তাহার কথা তো দূরের কথা, নাম পর্যন্তও যখন কন্দর্পকেতু শোনেন নাই, তখন কন্দর্পকেতুর পক্ষে বাসবদত্তাকে স্বপ্নে দেখা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ইহার উত্তরে পিপ্পলাদ বলিবেন, কন্দর্পকেতুর সর্বজ্ঞ কূটস্থ ব্রহ্মের নিকট অপরিচিত কেহ নাই। কন্দর্পকেতু তাঁহার অবচেতনের তারবার্তা পাইয়া ভালবাসিয়াছে এবং অবচেতনের পর্দায়-ধরা ছবিখানি স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়াছে। আধুনিক ভাবের অতীত যাহা, বাসনা-লোকের নজিরে অবদমিত কামনার সূত্রে তাহার সব কিছুরই যে ব্যাখ্যা করা চলে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে মন রাজি হয় না। বর্তমানে যাহা নাই, অতীতে তাহার পত্তন আছে, একথা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা পিপ্পলাদের মতই বলিবেন—'দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ'। আচ্ছা, বর্তমান বুঝিলাম, অতীত বুঝিলাম, কিন্তু ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতে কী হইবে, তাহার স্বপ্ন দেখিব কোন জোরে? নিরুপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মের জোরে। তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি তো কেবল

আমার মধ্যে নাই, বাহির-বিশ্বে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, পূর্বে-পশ্চিমে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে সর্বত্রই ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার পদতলে মহাকাল ; মহাদেশ তাঁহার ইচ্ছার শ্বাস-প্রশ্বাসে ; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নখদর্পণে। তিনি সর্বজ্ঞ ; তিনি জানিবেন না তো জানিবে কে ? তিনি যে অবচেতনে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। সেই বাঁশীর দুই-একটি তান আসিয়া যখন চেতনলোকের সম্বন্ধ পরিবারের উপর দিয়া বহিয়া যায়, যখন বাসনালোকে ঘূর্ণী হাওয়ার সৃষ্টি করে, তখন কত রাধাকে রান্না করিতে বসিয়া নুনের বদলে চিনি দিতে হয়, সাজের ঘরে বসিয়া ঠোটে আল্‌তা এবং পায়ে লিপষ্টিক ঘষিতে হয়। এই অঘটন-ঘটনপটুতা, ইহাই তো স্বপ্নের উদ্ভট কৃতিত্ব। অবচেতন যে মহাসমুদ্র। সে-সমুদ্র তো শব্দহীন, অন্তহীন, তরঙ্গহীন। সে তো মৃত্যুর মতোই স্থির। যদি সেই মহাসমুদ্রের ইচ্ছায় দুই-একটা ঢেউ চেতনার স্বপ্নের উপর পড়িয়া মুহূর্তে ফিরিয়া যায়—যদি চমকে ঝলকে দেখা দিয়া পলকের মধ্যে মিলাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত যে জীবনের জটিল রহস্যের দুই-একটি পাঁপড়ি স্বপ্নে ভাসিয়া উঠিবে, এ বিশ্বাস তাহাদের করিবার বাধা নাই, যাঁহারা জন্মান্তর মানেন—যাঁহারা জগতের অস্তিত্বের মূল ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন।

এখন প্রশ্ন—কিংবদন্তীতে স্বপ্নের স্থান কোথায় ? বিশ্বাসের মর্ম-মূলে। রহস্যের প্রতি অন্ধ আসক্তি প্রাচীন জীবনধারার। সেই রহস্যকে মানিয়া লইবার মূলে আছে আন্তরিক সহজ, সরল বিশ্বাস। যে-রহস্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে প্রাকৃতিক শক্তি দেব-মহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারই কড়াতারে-বাঁধা প্রাচীন ভারতের জীবন-সঙ্গীত। ইহাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বোঝা যায় না, বুঝিতে হয় হৃদয়-ঢালা বিশ্বাসের আন্তরিকতা দিয়া—আকুতি দিয়া—বিশ্বাস করিয়া। যাঁহাদের আদর্শ ছিল জানা মানে হওয়া, তাঁহাদের বুঝিতে হইলে তাঁহাদের আদর্শে বিশ্বাস রাখিয়া বিশ্বাসী হইতে হয়। কিংবদন্তী বিশ্বাসের লীলা-ভূমি। তাই কিংবদন্তীর স্তন্যরসে পুষ্ট যাঁহাদের মন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, স্বপ্নে দেখিয়াও ভালবাসা চলিতে পারে এবং স্বপ্নে যে-সুন্দরীরা দয়া করিয়া অভিসারে আসিতেন, তাঁহাদের দেখিয়াই তাঁহারা ভাল বাসিয়া ফেলিতেন। সেই ভালবাসায়—সেই পূর্বরাগের মাহেন্দ্রক্ষণে পুঁথি ঘাটিয়া কার্য-কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার অবসর তাঁহাদের ছিল না। কিংবদন্তীর এই বিস্ময়-ভাব, বিস্ময়ভাবের বিশ্বাস, বিশ্বাস করিবার মত সহজ সরল শিশু-সুলভ মনোবৃত্তি ভারতের জল স্থল আকাশ বাতাস সূক্ষ্ম শরীর অনন্তকাল তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। কিংবদন্তী ইহাকে কুড়াইয়া লইল। আর

লইলেন তাঁহারা যাঁহারা কিংবদন্তীকে তাহার যথোচিত প্রাপ্য মর্যাদা চুকাইয়া না দিয়াই সাহিত্যকে অভিজাতদের ঘরে তুলিয়া কানে কানে গুরু-মন্ত্র দিলেন। তাঁহারা হইলেন আলঙ্কারিক। পূর্বরাগের প্রামাণ্য উৎসগুলির উল্লেখ করিয়া তাঁহারা নিরুপায় হইয়া অবশেষে কিংবদন্তী-প্রভাবিত স্বপ্নেরও একটা উৎস আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন—নরকেই নারায়ণ বলিয়া রায় দিলেন—

শ্রবনন্তু ভবেৎ তত্র দূতবন্দি-সখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্॥

৩।১৮৯—সাহিত্যদর্পণ।

তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও কিংবদন্তীর নিজের দাবিতেও প্রেমের স্বপ্ন স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

এখন প্রশ্ন—কাব্য-উপন্যাসে আবার স্বপ্ন কেন? থাকিবেই বা না কেন? কেবল জাগ্রৎ অবস্থাই তো জীবন নয়; জাগ্রৎ ও স্বপ্ন—উভয়ে মিলিয়াই তো জীবন। অতএব জাগ্রতের দাবী যদি সাহিত্যে স্থান পায়, তবে স্বপ্নেরও বা ঠাঁই মিলিবে না কেন? ভাষা ও ভাব লইয়া যেমন সাহিত্য, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন লইয়া তেমনি জীবন। জীবনোপন্যাস বা জীবনানুকরণ যদি সাহিত্যের দাবি হয়, তবে সেই জীবনের তোড়ে যেমন ভাসিয়া আসিবে জাগ্রৎ, তেমনি ভাসিবে স্বপ্ন। গানের বেলায় দেখা যায়, কথার অসমাপ্তি সমাপ্তি পায় সুরে, তেমনি জীবনের অসমাপ্তি স্বপ্নে পায় সমাপ্তি। অতএব ভাষায় ও ভাবে-বাঁধা সাহিত্যের ন্যায়, কথা ও সুরে-বাঁধা গানের ন্যায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নে-বাঁধা জীবনও ভাসিয়া ওঠে সাহিত্যের মর্ম-স্রোতে। তাই দেখিতে পাই—

রামায়ণে ভরতের স্বপ্ন, মহাভারতে কর্ণের স্বপ্ন, ভাগবতে উষার স্বপ্ন, রঘুবংশে দশরথের পত্নীগণের স্বপ্ন, উত্তররাম-চরিতে সীতার স্বপ্ন, দশকুমার-চরিতে উপহার-বর্মার স্বপ্ন, বাসবদত্তায় কন্দর্পকেতুর স্বপ্ন; 'মেঘনাদবধ'-কাব্যে সীতার স্বপ্ন, চন্দ্র-শেখরে শৈবলিনীর স্বপ্ন, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন, বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্ন—এমনি কত স্বপ্নের রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক। আবার স্বপ্নাদেশের প্রভাবই বা কম? স্বপ্নাদেশে মুকুন্দরাম ও সীতারামের কাব্য-রচনা; স্বপ্নাদেশে প্রসিদ্ধ স্যাক্সন্ কবি সিড্মনের গীতিশক্তিলাভ। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে, উপকথায়-রূপকথায়, গল্পে-উপন্যাসে শরৎ-প্রভাতের শিশিরভেজা সদ্য চ্যুত শিউলীর মত আকুতিমাখা স্বপ্ন না ছড়াইয়া আছে কোথায়?

কাদম্বরীতে বিলাসবতীর স্বপ্ন, মনোরমার স্বপ্ন; বিলাসবতী স্বপ্ন দেখিলেন

স্বয়ং চন্দ্র তাঁহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। মনোরমা দেখিলেন এক ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার উৎসদেশে একটি পুণ্ডরীক নিক্ষেপ করিলেন। মহাকাব্যের স্বপ্নে অপুত্রকের পুত্রলাভ। যেমন মহাকাব্যের, তেমনি কথাকাব্যের। মহাকাব্যের স্বপ্নে অবতারবাদ আসিয়া কিরণমাখা পাখা মেলিয়া ধরিয়াছে। তাই অবতার-বাদের শ্রদ্ধার সহিত কিংবদন্তীর রহস্য মিশিয়া মাখামাখি হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহার দীপ্তিতে সৌন্দর্যের চিকণ সোনার আকুলতা। অতএব দেখা যায়, স্বপ্নের মধ্যে ঐতিহ্যের একটানা ফেনিল স্রোত। যুগে যুগে নূতন নূতন চেতনার রঙে এই স্বপ্নের পান্না হল সবুজ, চুনি হল রাঙা।

প্রেমঃ

কিংবদন্তীতে প্রেমের স্থান নির্ণয়ের পূর্বে ভারতীয় চেতনায় প্রেমের পটভূমির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাঞ্ছনীয়। বেদ শুচিশুদ্ধ সাহিত্য। ভারতীয় জীবনে অভিব্যক্ত নানা পরিচয়ের উৎস হইল বেদ। তাই একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, দেবতা ও যজ্ঞের প্রয়োজনে গ্রন্থিবদ্ধ বেদে লৌকিক জীবনের—জীব-স্বভাব মানুষের জৈব-প্রবৃত্তির তাগিদের কথা থাকিবে কেন? মানুষের প্রেম দেবতার কোন্ কাজে লাগিবে? যজ্ঞের কোন্ উপকরণ প্রেম, যে প্রেমের উৎসসন্ধানে অপৌরুষেয় বেদের মন্ত্রগুলি ঘাটিতে হইবে? বেদ তো লৌকিক জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য নয়, বেদ ধর্মগ্রন্থ। কল্পান্তে ইনি অন্তর্হিত হন, আবার সৃষ্টির পত্তনে ব্রহ্মার তপস্যায় ইঁহার আবির্ভাব ঘটে। লৌকিক জীবনের সহিত বেদের কোন সম্পর্ক নাই। সত্যই কি নাই? ধর্মজীবন যেমন ভারতীয় জীবনের এক অংশ, লৌকিক জীবনও তেমনি ইহার অপর অংশ। ধর্ম-জীবন ধর্মের জোরে টিকিয়া গিয়াছে—আধ্যাত্মিক চেতনার উৎকর্ষে কালজয়ী হইয়াছে। ধর্মানুশীলনের উদগ্র চেতনায় ধর্ম-রহস্যের পৌনঃপুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আর্যগণের প্রতি-দিনের সাধনাকে উন্মেষশীল চেতনাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য মুখে মুখে সঞ্চরমান বেদকে অনেক পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাই মহাকালের কৃপায় দেবতার অনুগ্রহে আমরা পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গ্রন্থকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি; বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসে আমরা অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছি। লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া বেদের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন ভারতীয় জীবনের নানা সংস্কৃতির কথা জানিতে পারিতেছি। কিন্তু এই বিশুদ্ধ, পূত ঈশ্বরানুগ্রহে উদ্দীপিত ধর্ম-জীবনের পাশে যে বৃহত্তর গণজীবন ছিল, তাহা গেল কোথায়? প্রাচীন মৌখিকী

সাম্প্রদায়িক বিদ্যার স্থায়িত্বে—স্মৃতিশক্তির অনমনীয় প্রাখর্যে পুরুষানুক্রমিকতার মাধ্যমে প্রাচীন জীবনের স্বাভাবিকত্ব ছিল বলিয়া লিখিয়া রাখিবার স্বভাব ভারতবাসীর ছিল না। যেকালে প্রকৃতির বিস্ময়ঘন সৌন্দর্যের শোভায় তন্ময়ীভূত ঋষির মুখ হইতে বৈদিক ভাষায় শ্লোক—বৈদিকমন্ত্র আবেশের বশে রহিয়া রহিয়া খসিয়া পড়িত, সেকালে কি লোকজীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনাকে ধরিয়া রাখিবার মত কোন লৌকিক কবি জন্ম গ্রহণ করেন নাই? ধর্মজিজ্ঞাসায় যাঁহাদের নিখিল চেতনার এমনি অব্যাহত স্ফূর্তি, লৌকিক জীবনে কি সে-চেতনার ঢেউ লাগে নাই? মহাসাগরের পাশে কি মহামরুভূমি জড়ত্বের দুর্বাসার শাপে কেবল খা খা করিত? এই দুইটি জীবনের মধ্যে কি কোন সাধর্ম্য, কোন সামঞ্জস্য, কোন সঙ্গতি ছিল না? একই জাতীয় চেতনার একদিকে শুক্লপক্ষ, অপর দিকে কৃষ্ণপক্ষ ছিল? একই সূর্যমণ্ডলের একদিকে দিন, অপরদিকে রাত্রি ছিল? জাতীয় চেতনাকে অখণ্ড ধরিলে তাহা মানা চলে না। সারস্বত জীবনের মত লৌকিক জীবনের ধারাও অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সেদিন মস্তিষ্কের দাবী চিত্তবৃত্তির চাহিদাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। তবুও পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমণ্ডলে পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাই সারস্বত জীবনে লৌকিক জীবনের ছায়া দেখা যায়। বিশুদ্ধ গ্রন্থে—অপৌরুষেয় বেদে লৌকিক প্রেমের এমনি একটা ছায়া দেখা যায়। সে-ছায়ার ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি আলোচনার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় জীবনে প্রেমের উপযোগী কোন পটভূমি ছিল কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

যুবক-যুবতীর মধ্যে যৌন-সংবেদনাই প্রেমের পাদপীঠ। ঋগ্বেদে ভারতীয় নারীর স্থান মহিমামণ্ডিত। কী পারিবারিক জীবনে, কী যজ্ঞবেদীতে নারীর স্থান ছিল অভিজাত। পরিবারে সে রাজ্ঞী, যজ্ঞবেদীতে সে পুরুষের সমান অধিকারী কিন্তু এই পরিচয়টুকু নিখিল ভারতীয় নারী-জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় নয়। তাহার আর একটা দিক ছিল। ঋগ্বেদেরই সূক্তের মধ্যে পাওয়া যায় যে, সে-যুগেও বঞ্চনা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির সহিত নিষিদ্ধ-সম্পর্ক স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গম, সতীত্বনাশ বা স্ত্রীহরণ,—দাম্পত্যজীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ভ্রূণহত্যা অজ্ঞাত ছিল না। নৃত্যোৎসবে ও ভোজে নারীগণের প্রকাশ্য যোগদানে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। অনেকের ধারণা যে, যে-সকল নারী প্রকাশ্যভাবে ঘরের বাহিরে জনসংহতিতে যোগদান করিতেন, তাহারা ছিলেন গণিকা। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ঋগ্বেদের কালে বহু নিঃস্ব, ভ্রাতৃহীন, রক্ষকহীন নারী গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া গণিকাবৃত্তি যে তখন

সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, একথা প্রমাণিত হয় নাই। বৈদিক সাহিত্যে 'ঘোষা'র ন্যায় পিতৃগৃহবাসিনী অনূঢ়া রমণীর অনেক উল্লেখ আছে। পিতৃগৃহে তাহাদের বয়স বাড়িতে থাকিলেও তাহারা বিবাহের ইচ্ছায় অথবা মনোমত পুরুষ-সংগ্রহের জাল পাতিবার জন্য প্রসাধনে ও বেশভূষায় সর্বদা সজ্জিত থাকিত। 'বাজসনেয়ী' সংহিতায় কানীনপুত্রের সন্ধান মেলে। সংসারক্ষেত্রে নারীর মর্যাদাও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট থাকিলেও, বিবাহ-বন্ধনে ভাটা না পড়িলেও, বহু বিবাহের সদর রাস্তা খোলা থাকিলেও অবাধ প্রেম ও গুপ্তপ্রেমের চাষ চালু ছিল। ঋগ্বেদের অক্ষসূক্তে (৩৪;৪) দেখা যায় একের পত্নী অপরের ভোগ্যা হইতেছে। মহাভারতে দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার মতো সামাজিক মনোবৃত্তির মূল উৎস যে বৈদিক অক্ষ-সূক্ত, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঐ সূক্তের এক কবিতায় (১০।৪০।৬) দেখা যায়, এক রমণী সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইতেছেন। শুক্ল যজুর্বেদের একসূক্তে (৩০।১২) এবং অথর্ব বেদের পরিশিষ্ট সূক্তে 'পুংশ্চলী' শব্দটির উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী সাহিত্যে 'জার' শব্দটি প্রেমিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। অথর্ব বেদে ইন্দ্রজালের মন্ত্রের সাহায্যে নারীপুরুষ উভয়ই প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অভিযান করে। পরবর্তীকালের নিয়োগ-প্রথার উৎস-স্বরূপ বিধবা ভ্রাতৃবধূ দেবর বা তৎস্থানীয় আত্মীয়ের সহিত বৈবাহিকবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইহা হয়তো প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনেরই এক সমাজ-অনুমোদিত উপায় বিশেষ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, বরুণের উদ্দেশে আহুতি দিবার জন্য যেখানে যজমান-স্বামীর সহিত স্ত্রী বসিয়া আছেন, সেখানে অধ্বর্যুর সহকারী পুরোহিত আসিয়া যজ্ঞবেদিতে লইয়া যাইবার সময় যজমানের স্ত্রীকে প্রশ্ন করিতেছেন, "তুমি কাহার সহিত সহবাস কর ?" একের স্ত্রী হইয়া অপর পুরুষের সহিত সহবাস করিলে বরুণের নিকট পাপের ভাগী হইতে হয়। যজমানের পত্নীকে ঐরূপ শ্লীলতা-বিরোধী প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য ছিল এই যে, মনে যদি কোন পাপ থাকে, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিলে পাপের হ্রাস হয়, না করিলে আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতি হয়।

উপরে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে একথা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন বৃহত্তম সমাজ-জীবনে আসঙ্গলিপ্সা বর্তমান ছিল। (১) Drummondও বলিয়াছেন যে মনুষ্য-সভ্যতার আদিম যুগে বিবাহ-প্রথার প্রচলন হইবার অনেক পূর্বে দৈহিক ক্ষুধা মিটাইবার জন্য নারী ও পুরুষ মিলিত হইত এবং বিবাহ বন্ধন চালু হইবার পরও সন্তান না হওয়া পর্যন্ত নারীপুরুষের মধ্যে প্রেম দেখা দেয় নাই।

(১) Henry Drummond এর Ascent of Man পুস্তকে আছে।

বৈদিক জীবনের যে তথ্য পাওয়া গেল, তাহা কামের তথ্য, প্রেমের তথ্য নয়। কাম হইতেই প্রেম জন্মে বলিয়া প্রেমের পাদপীঠ কাম। নর-নারীর মধ্যে এই কামের চেতনা বৈদিক লোকজীবনে শুধু নয়, বিশুদ্ধ বৈদিক সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে। সেখানে কামের মধ্যেও প্রেমের এক অতি সূক্ষ্মরূপ—নানা বর্ণের ছটা-না-লাগা প্রেমের প্রথম উষার সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে কাম সাধারণ ইচ্ছা শক্তিরই এক চেতন মূর্তি। এই কামকে পরমা সৃষ্টিশক্তিরূপে কল্পনা করিবার অভিজ্ঞতা ঋষিরা পাইয়াছিলেন লৌকিক সন্তান-জন্মের চেতনা হইতে। প্রাচীন মানব-সমাজে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ইচ্ছা যে-যুগে জীবনের নানা পরিপ্রেক্ষিত হইতে মাথা তুলিতে লাগিল, সে-যুগ বুদ্ধিবৃত্তির যুগ। শরীরগত এই মানসিক বাসনাকে তাঁহারা অমনি ছাড়িয়া দেন নাই। তাহা লইয়াও তাঁহারা অনেক চিন্তা করিয়াছেন, অনেক ধ্যানন-মনন, অনেক অনুশীলন করিয়াছেন, কিন্তু দেবতত্ত্বমূলক বৈদিক সাহিত্যের ঐশী সাধনার জোয়ারে কিছুই দাঁড়াইতে পারে নাই, কিছুই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। বিজ্ঞানরূপে কাম শাস্ত্ররূপ পাইল বাৎস্যায়নের হাতে। বাৎসায়নের কাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতে বাৎসায়ন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর মুনি। অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদারও এই মতের সমর্থক। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে গুপ্তসম্রাটদের আমলে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে। বাৎসায়ন যে-কালেরই লোক হউন না কেন, তাঁহার পূর্বে কামশাস্ত্রের আরও গবেষক ছিলেন। কামশাস্ত্র যৌন-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানশাস্ত্র কখনও একদিনে রচিত হইতে পারে না। নানা যুগের নানা চিন্তা ধাক্কা খাইতে খাইতে পূর্ব পূর্ব যুগের ফলশ্রুতিরূপে একটি বিশেষ যুগে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করে। বাৎসায়ন কামশাস্ত্রের আদিম ঋষি নন। তাঁহার পূর্বে ছিলেন বাভ্রব্য, বাভ্রব্যের পূর্বে শ্বেতকেতু এবং শ্বেতকেতুর পূর্বে শিবের অনুচর নন্দী। তাহা ছাড়া বাৎসায়ন যাঁহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন—চারায়ণ, ঘোটকমুখ, সুবর্ণনাভ, গোনর্দীয় (পতঞ্জলি) গোণিকাপুত্র, দত্তক ও কুচুমার। বাভ্রব্য ছিলেন পাঞ্চাল দেশের রাজা ; অথর্ববেদের কতকগুলি মন্ত্র ইঁহার রচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে, মহাভারতে শ্বেতকেতু সুপরিচিত। ইঁহার পিতা ঋষি উদ্দালক। সেই কারণে কামসূত্রে ইঁহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে। যৌন অনাচার ও ব্যভিচারের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তিনিই নাকি বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন করেন। এ সম্পর্কে এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একদিন শ্বেতকেতু তাঁহার পিতার নিকট বসিয়া আছেন এবং মাতা

অনতিদূরে গৃহকার্যে রত আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ, বাঘ যেমন শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ে, তেমনি ভাবে তাঁহার মাতাকে কবলিত করিয়া মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। বালক শ্বেতকেতু ইহাতে মনে আহত হইয়া পিতার নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিলে ঋষি উদ্দালক বলিলেন, "বৎস! ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই; ইহা সমাজের নিয়ম।" বালকের মন ইহাতে প্রবোধ মানিল না। এই নিদারুণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্বেতকেতুর মন বিষাইয়া উঠিল। তাই পরিণত বয়সে তিনিই বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন করেন। সুদূর অতীতে বিবাহ-প্রথার প্রচলন ছিল না। যে-কোন পুরুষ যে-কোন স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া উপভোগ করিলে সমাজে নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত না। এই কাম-চেতনা যখন প্রাচীন এবং এই কাম-চেতনা যখন প্রাণীর সুগঠিত দেহাবয়বের সমবয়সী, তখন মনে হয়, বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের পরও চিরকালের অভ্যস্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রাচীন ভারতে এমনকি ঋগ্বেদের যুগেও গণিকা ছিল। Winternitz এর মতে তখন গণিকা থাকিলেও গণিকাবৃত্তি প্রতিষ্ঠানরূপে চালু হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষেও এক শ্রেণীর বেশ্যা ছিল, যাহাদের বলা হইত গণিকা। ইহারা নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং চৌষট্টি কলায় নিপুণ ছিল। এই চৌষট্টি কলার উল্লেখ বাৎসায়নের কামসূত্রে আছে এবং ইহার পরিণত রূপের সন্ধান মেলে ঋগ্বেদের যুগেই। পরবর্তী কালে পাটলিপুত্রের এই শ্রেণীর গণিকাদের কথা সংস্কৃত ও বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। গণিকাদের নির্দেশেই দত্তক গণিকাবৃত্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। প্রাচীন গ্রীসেও উচ্চশিক্ষিতা ও বিভিন্ন-কলা-নিপুণা এক শ্রেণীর রূপোপজীবিনী ছিল। তাহারা দেহ বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিলেও সাধারণ বেশ্যার সহিত তাহাদের পার্থক্য ছিল। সেকালের গ্রীসের জ্ঞানীগুণিরা তাহাদের গৃহে আসিয়া সাংস্কৃতিক-দার্শনিক নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করিত ঐ সকল শিক্ষিত কলানিপুণ গণিকারা। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক আনাতোল ফ্রান্সের Thais উপন্যাসে ঐ ধরণের পতিতালয়ের বর্ণনা আছে। সেই উপন্যাসের পতিতা Thais এর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সঞ্চরমান একটি বাণী হইল—"Nothing but love and carnal desire on earth is true."

তাহার পর রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পার হইয়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রেম-পরিবেশনের পটভূমিকায় 'নাগরকে'র সন্ধান পাই। পাণিনি এই নাগরকদের কথা জানিতেন। রুচির দিক্ দিয়া ইহারা যেমন ছিলেন মার্জিত, তেমনি ইঁহাদের

সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আচার প্রভৃতি ছিল খুব উচ্চমানের। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের প্রেম-কবিতাগুলি ইঁহাদের নিকট হইতে জীবন-রস টানিয়া বাহির করিয়াছিল। তাই বোধ হয় Keith বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পুরোহিতগণের এবং উপনিষদে দার্শনিক ঋষিগণের যে স্থান, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-সাহিত্যে নাগরকগণের সেই স্থান। বাৎসায়নের কামসূত্রে 'নাগরকে'র চিত্র আছে :

জলাশয় বা পুষ্করিণীর পার্শ্বে থাকিত নাগরকের গৃহ। গৃহের সংলগ্ন থাকিত একটি বৃক্ষবাটিকা। বাসগৃহে কতকগুলি কক্ষ থাকিত এবং থাকিত দুইটি মহল—বাহির-মহল ও অন্দর-মহল।

বাহির-মহলে থাকিত বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি রুচিমাপিক সাজানো গোছানো, ফিটফাট। সেখানে একখানি খাট। খাটের উপর বিছানা ; বিছানার উপর পাতা একটি ধপধপে সাদা চাদর, আর দুইটি বালিশ। বিছানা দুইটি ; একটি বড়, একটি ছোট। মাথার দিকে দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটের উপর একখানি তৈলচিত্র। ব্রাকেটের নীচে দেওয়াল ঠেসান দিয়া একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলের উপর ফুলের মালা, গন্ধদ্রব্যের কৌটো প্রভৃতি রাখিবার পেটরা, দাড়িমের ছাল ও পান। মেজের উপর পিকদানি, একটি বীণা, চিত্র-ফলক, ছবি আঁকিবার তুলি ও রঙ., দুই-একখানা বই, ফুলের মালা প্রভৃতি। মেঝের উপর শয্যার পাশে বৃত্তাকার চেয়ার ; দেওয়াল-ঘেষিয়া পাশা ও দাবা খেলিবার ছক। ঘরের বাহিরে দেয়ালে-গাঁথা গজদন্তে পোষা পাখীর খাঁচা ঝুলানো। বাড়ীর মধ্যে নিরালায় নৃত্যগীতের স্থান। ছায়া-নিবিড় উদ্যান-বাটিকার মধ্যে গাছের ডালে নানা বর্ণের কাপড় দিয়া ঢাকা টাঙানো একখানি দোলা ; নীচে একটি বেদি ; ঝরিয়া-পড়া তাজাফুলে বেদিটি সমাকীর্ণ। অন্তঃপুরিকা ও বহিরাগত প্রণয়িনীদের চিত্তবিনোদের জন্য এই সুসজ্জিত বৃক্ষবাটিকা।

তাহার পর তাহার দিন-চর্চার চিত্র। সকালে উঠিয়া তাহার প্রাতঃকৃত্য সমাপন। তাহার পর অনুলেপনের কাজ ; গন্ধদ্রব্যের অনুলেপন। তাহার পর আলতা দিয়া ঠোঁট রাঙান ও পান খাওয়া। আয়নায় মুখদেখা। তাহার পর দিনের কাজ শুরু। প্রত্যহ স্নান ও দুইবার আহার—পূর্বাহ্নে একবার ও অপরাহ্নে আর একবার। পূর্বাহ্নে আহার সমাপনের পর শুক-সারীকে পড়ানো, গৃহমধ্যে কলাক্রীড়াদি, তাহার পর কিছুক্ষণ দিবা-নিদ্রা। নিদ্রা হইতে উঠিয়া কেশবিন্যাস ও উত্তম বসন পরিধান করিয়া গণিকালয়ে বা বন্ধুগৃহে, না হয় কোন গোষ্ঠীতে বন্ধুবান্ধবদের সহিত মেলামেশা। সন্ধ্যাকালে গীতবাদ্যের চর্চা। তাহার

পর পুষ্পসজ্জিত এবং সুগন্ধি ধূপ-সুবাসিত বৈঠকখানা ঘরে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত শয্যায় উপবেশন করিয়া প্রণয়িনীর আগমন-প্রতীক্ষা। প্রণয়িনীর আসিতে বিলম্ব হইলে দূত প্রেরণ; অভিমানভরে না আসিলে স্বয়ং গমন। প্রণয়িনীর আসিবার পর নাগরকের ও তাহার বন্ধুর মধুর বাক্য, মধুর ব্যবহার ও উপাদেয় উপহারাদির দ্বারা মনোরঞ্জনের প্রয়াস। মেঘদুর্দিন দিনে সিক্ত ও ধূলিলিপ্ত অভিসারিকার বেশের নাগরকের স্বহস্তে পরিবর্তন-সাধন এবং প্রসাধন সমাপায়ন। ইহা ছাড়া ঘটা-নিবন্ধন, গোষ্ঠী-সমবায়, সমাপানক, উদ্যান-গমন, সমস্যাক্রীড়া, নাগরকের কর্মসূচীর অন্যতম ছিল। সমস্যাক্রীড়ার মধ্যে পড়ে যক্ষরাত্রি, কৌমুদীজাগর, সুবসন্তক। ইহা ছাড়া বসন্তোৎসব বা হোলি, যব-চতুর্থী, ঝুলন, কুসুমোৎসব, সহকার-ভঞ্জিকা প্রভৃতি নানা ক্রীড়ায় নাগরক অংশ গ্রহণ করিতেন।

এই নাগরকই ঐশ্বর্যচ্যুত হইয়া শিল্পসংস্কারে জলাঞ্জলি দিয়া পরবর্তীকালে লম্পট বা নাগররূপে দেখা দেন।

তাহা হইলে বৈদিক যুগ হইতে বাৎস্যায়নের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত পট-ভূমিকায় ইন্দ্রিয়লালসা বা কামের একটানা রূপের পরিচয় পাওয়া গেল। কাম হইল নরনারীর পরস্পরের যৌন মিলনের জন্য একটি সুতীব্র কামনা। এই কামনা শুধু মানুষের নয়, ইতর প্রাণীর মধ্যেও এই কামনা। ইহার পশ্চাতে যে সুখ আছে, তাহা দেহনিষ্ঠ। তাই দেহের রহস্যে বাঁধা সুখকে পাইবার জন্য মানুষের কী অপ্রকৃতিস্থতা। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, তান্ত্রিক সহজিয়া, বৌদ্ধ-সহজিয়া, বৈষ্ণব ও নাথধর্মের সাধকেরাও দৈহিক সুখের নিশানায় দেহতত্ত্বের রহস্যকে জানিবার জন্য কী সাধনাই না করিয়াছেন। কিন্তু কাম প্রেম নয়। মন্মথ বা কামের জাগরণ হইল শৃঙ্গার। শৃঙ্গার প্রেমের পাদপীঠ—"তদাগমনহেতুকঃ"। পাঁক হইতে পঙ্কজের জন্মের ন্যায় কাম হইতে প্রেমের জন্ম। শৃধাতুর অর্থ হনন করা। শৃঙ্গারে তাই দ্বৈতসত্তার হনন করিয়া নারী-পুরুষের—প্রেমিকযুগলের অদ্বৈতসত্তার প্রতিষ্ঠা।[১]

এখন বৈদিকযুগের প্রেম-বিষয়ক প্রস্তাবে ফিরিয়া আসা যাউক। ঋগ্বেদের ঊষাসূক্তের মধ্যে জাগে লোভ-নিষ্ণাত নারীমূর্তির এক লিরিক আস্বাদ। অপূর্ব

---

1 (a) Derivation of Srṅgāra: Sṛṅgāra is the conventional word for the aesthetic experience of love. It is derived from root śṝ to kill (śṛ hiṁ sāyām), according to unādisūtra "śṛṅgārabhṛṅgāran" (423). The affix is Ārak, ṅ and g are inserted and ṝ is replaced by ṛ (śṛṇāti himsati iti śṛṅgārah). śṛṅgāra is so called because it kills, eliminates the personality of one who has its experience.

(b) A.Bh, vol, I, 302 I Æ. 206.

সুন্দরী উষা। যৌবন-সমুদ্রের মন্থনে জাগে ঐ নারী। ললাটে অরুণের আশীর্বাদ, পরণে রক্তরাগ বসন। নিচোলহীন নগ্ন বক্ষ; অধরে মৃদু মৃদু হাসি; যেন অমৃতের পাত্র হইতে জীবন-সুধা ক্ষরিত হইতেছে; যেন হাসির শাণিত তীক্ষ্ণ শর প্রেমিকের বুকে যাইয়া বিদ্ধ হইতেছে; আলুথালু কেশ; কেশপাশে জড়ানো সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের হীরের মালা। নর্তকী সে। আকাশের রঙ্গমঞ্চে নাচে আর নয়নের কটাক্ষ হানে। কোন্ প্রিয়তমের উদ্দেশে? কার প্রেয়সী সে? ঋষিরা খুঁজিয়া পান না। সে যে চিত্তময়ী; চিত্ত হইতে আকাশে উঠিয়া বুঝি সে নয়নময়ী! এ যেন স্বপ্নে-দেখা মূর্তি! যেন ইন্দ্রজালের সুন্দরী! ঋগ্বেদের ঋষিরা ঐ স্বপ্নময়ীর, ঐ বাসনা-সুন্দরীর ইহার বেশী খবর দিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম দিকে প্রেমময়ী নারীর কেবল আবির্ভাব, আর তিরোভাব। আর কিছু নাই।

তাহার পর একটানা যাইয়া উঠিতে হয় দশম মণ্ডলের সংবাদ-সূক্তে। সেখানে উর্বশী-পুরূরবার, যম-যমীর সংলাপ। পুরূরবা-উর্বশী সূক্তে ১২টি শ্লোক। একদিকে পুরূরবার কাকুতি-মিনতি, অন্যদিকে উর্বশীর বেদনাদায়ক অবহেলা। চুক্তিভঙ্গে উর্বশী পুরূরবাকে ছাড়িয়া আসিয়াছে। পুরূরবার অনুসন্ধানের অন্ত নাই! অবশেষে মিলিল সন্ধান! পুরূরবা উর্বশীকে বলে!

পুরূরবাঃ। চণ্ডি! দাঁড়াও একটু!
ভেবে দেখ একবার।
আমার বেদনার অর্ঘ্য নাও উর্বশী!
এসো, ফিরে এসো,
আমার প্রাণ কাঁদছে।

উর্বশী: তোমার এই কথার কি জবাব দেব?
প্রথম উষার মতো
আমি যে তোমায় ছেড়ে এসেছি।
ফিরে যাও পুরূরবা;
আমি যে বাতাস।
বাতাসকে কী ধরা যায়?
কেন মরবে? কেন ধ্বংস হবে?
কেন পড়বে বাঘের মুখে?
নারীর সাথে কি স্থায়ী প্রেম হয়?
নারীর হৃদয়ে বাসা বাঁধে বাঘিনী।

কিংবদন্তীর অপ্সরা-নিবন্ধে আমরা এ কাহিনীর আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। সেখানে আরও বলিয়াছি, পুরূরবার হৃদয়ে আছে প্রেম, অপ্সরার হৃদয়ে প্রেম নাই, আছে প্রেমার্তির জন্য সমবেদনা।

তাহার পর যম-যমীর সংবাদ। এই সূক্তে আছে দৈহিক মিলনের উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষা ; যুক্তি, বংশ-রক্ষা। যম-যমী ভাইবোন। যমী বলে, বংশবৃদ্ধির জন্য দেবতারাও চাহেন যে, যম যমীর সহিত মিলিত হউক।

যমী : যম ! আমি যে তোমায় ভালবাসি !
তোমার শয্যার পাশে আমায় নাও।
তুমি আমার স্বামী ঃ
তোমায় বিলিয়ে দেব আমাকে।
আমরা দু'জনে হব চলন্ত রথ—
তুমি হবে রথ, আমি হব চাকা

যম চমকাইয়া ওঠে ! ছিঃ ছিঃ এ যে পাপের কথা ! দেবতারা যে জাগিয়া আছেন।

যম : দেবতারা খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে নেই ;
তাঁদের চোখে পাতা পড়ে না।
আশেপাশে দেখ্‌ছ না—
ঘুরছে দেবদূতেরা।
আমায় ছেড়ে দাও স্বৈরিণি !
বেছে নাও অন্য পুরুষকে।
তার সঙ্গে চাকা হ'য়ে
সারো তোমার সমাবর্তন।

যমী : আমার যখন স্বামী নেই,
তোমার ভাই হ'তে আছে বুঝি !
আমি তোমার বোন হ'লে
নিপাত যাবে মানুষের জাত।
নাঃ, আর পাচ্ছিনা ;
তাই বক্‌ছি।
এসো, আমার কাছে এসো ;
আমায় বুকে জড়িয়ে ধরো ;
চাপ দাও তোমার সর্বশক্তি দিয়ে !

যম প্রত্যাখ্যান করে যমীকে। উত্তেজনার সীমা হারায় যমী।

যমী : যম ! তুমি কাপুরুষ !
তোমার মধ্যে নেই কোন হৃদয় ;
নেই কোন সাহস।
গাছকে যেমন জড়িয়ে ধরে লতা
তার পুষ্পিত যৌবন দিয়ে ;—
তেমনি জড়িয়ে ধরবে তোমায় আর কেউ।
আমি হতভাগিনী ;
আমি পার্লুম না।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় মৈত্রায়নী-সংহিতা যমীর প্রেম-চেতনার পাদপূরণে বলেন :

যম গতায়ু হইলেন। যমকে ভুলিয়া যাইবার জন্য দেবতারা যমীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যমী বলিলেন, "কেবল আজ তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" দেবতারা বলিলেন : "যমী যমকে কিছুতেই ভুলিবে না। আমরা রাত্রির সৃষ্টি করিব" : সেই সময় কেবল দিন ছিল, রাত্রি ছিল না। দেবতারা রাত্রির সৃষ্টি করিলেন। রাত্রির পর আসিল পরশ্ব। তখন যমী যমকে ভুলিল।

দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে (১০।৪০।২) অশ্বিনদের জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—তাহারা রাত্রিতে কোথায় ছিল !

বিধবা ভ্রাতৃজায়া তার দেবরকে
যেমন টানে শয্যায়—
যেমন টানে নারী পুরুষকে,
তেমনি কে তোমাদের টেনেছিল
তার ঘরে ?

অথর্ববেদের অভিশাপপ্রসঙ্গে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের কথা আলোচনা করিয়াছি। সেখানকার ঘুম-পাড়ানিয়া একটি মন্ত্র। এ-মন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রিয়তমার নিকট-গোপন অভিসার। প্রিয়তমা অপরের পরিণীতা।

ঘুমাক্ তোমার মা !
ঘুমাক্ ঐ বাঘা কুকুর।
ঘুমাক্ বাড়ীর কর্তা।
ঘুমাক্ আত্মীয়-স্বজন,

ঘুমাক্ যে যেখানে আছে
চারিপাশে। (৪।৫)

আবার দাম্পত্যজীবনের অভিশাপের খাতে প্রেমিক পরকীয় তরুণের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র। সম্মুখে তার প্রেয়সীর প্রতিকৃতি। হাতে তীরধনু। মন্ত্র আওড়াইয়া সে তীর দিয়া স্বামীর বাহুবন্ধনে বাঁধা প্রেয়সীর প্রতিনিধি ঐ চিত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিবে।

প্রেয়সীর হৃদয়-জয়ের মন্ত্র :

অশান্ত আমার প্রেমের আগুন
তোমার শান্তির নীড়ে যেয়ে পড়ুক।
কামের তীর আমার হাতে—
কী তীক্ষ্ণ। কী ধারাল!
এই তীরে বিঁধ্‌ব তোমার হৃদয়।
তৃষ্ণা এর পাখ্‌নায়,
প্রেমের জ্বালা এর কাঁটায়,
ফলায়-মাখা অবুঝ কামনা
বিঁধবে! বিঁধবে! ঠিক সোজা বিঁধবে
তোমার বুকে—
ফাড়বে বুক চৌচির হয়ে!
কামের হাতের এই অমোঘ শর!
তোমার বুকে জ্বল্‌বে আগুন!
আগুনে-পোড়া ঝলসানো মুখ নিয়ে
ছুটে এস মানিনি!
ছুড়ে ফেল তোমার অহঙ্কার;
ছুটে এস' একান্ত আমার হ'য়ে;
কথাকও মিষ্টি মিষ্টি;
হও একান্ত আমার। (৩।২৫)

আবার একই অবস্থার পুরুষের হৃদয়-জয়ের মন্ত্র। এবার নারীর পালা।

প্রণয়িনীর মন্ত্র ঃ

পাগল কর, পাগল কর, পাগল কর—
হে মরুৎ! তাকে পাগল কর,

হে বায়ু! তাকে পাগল কর,
হে অগ্নি! তাকে পাগল কর।
আমার প্রেমে পুড়িয়ে মারো—
পুড়িয়ে মারো মাথা হ'তে পা পর্যন্ত।
আমি মরছি, পুড়ছি, খাবি খাচ্ছি
প্রেমের যাতনায়।
দেবগণ! তোমরা পাঠিয়ে দাও কামকে।
সে পুড়ুক, মরুক, জ্বলুক—
আমার প্রেমে। (১৩০।৪)

আবার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া দিবার মন্ত্র।

সূর্য যেমন প্রদক্ষিণ করে
দ্যাবাপৃথিবীকে—
তেমনি করে, ওগো সুন্দরি!
আমি তোমার মনকে করি প্রদক্ষিণ।
তুমি যেন আমায় বেশি ভালবাস!
যেন ফেলে না যাও আমায়!

ব্রাহ্মণ-সাহিত্য যজ্ঞ ও আধ্যাত্মিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকায় ইহাতে প্রেমের কবিতার আভাস কিছু পাওয়া যায় না। কেবল শতপথ-ব্রাহ্মণে উর্বশী-পুরূরবার কাহিনীটির পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন দেখা যায়, আর দেখা যায় দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীর উল্লেখ। ইহার কারণ কি? কারণ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পুরোহিত-তন্ত্রের প্রাধান্য। আধ্যাত্মিকতায় ও যাগযজ্ঞের চর্চায় পুরোহিতেরা ছিলেন বাম-পন্থী। কালে কালে তাঁহারা এমনি হইয়া উঠিলেন যে দেবতারা তাহাদের হাতের মুঠোয় আসিয়া গেলেন। পুরোহিতের ইচ্ছায় অনায়ত্ত মঙ্গল আয়ত্তে আসিত। ঋগ্বেদের ঋষিদের মতো তাঁহাদের অতো ভুলো মন ছিল না, ছিল না সেই বিস্ময়ভরা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তব-ঘেষা। তাই ঋগ্বেদের ঋষিদের ভুলো মনের ফাঁক দিয়া পৃথিবীর যে কালো ছায়া অধ্যাত্ম সাধনার চন্দ্রমণ্ডলে উঠিয়া চন্দ্র-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিল, সে ভুলো মন ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের বাস্তব-পন্থী পুরোহিত-গণের ছিল না বলিয়া লৌকিক প্রেমের শনি কোন রন্ধ্র-খুঁজিয়া পায় নাই। তাই বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে লৌকিক প্রেমের আভাস নাই—নূতন কোন সংস্কার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এ-স্রোত তখন থামিয়া যায় নাই। ইহা বাঁকা পথে

কিংবদন্তী ও যুগ-মহাকাব্যের নির্মীয়মান উপাদানের উপল পথে একদিকে পালি সাহিত্যে, অপরদিকে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া সোজা হাল-অমরুর বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগ জাতিগঠনের যুগ। আদর্শ ভারত-সন্তান গঠন করিতে যে শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ-তপস্যার প্রয়োজন, মননশীল উদীয়মান জাতির জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মনীতির উৎকর্ষ-সাধন একান্ত আবশ্যিক, ধর্মের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য যে মহত্তম দুঃখবরণের প্রয়োজন, কৃচ্ছ্র-সাধনার কষ্টিপাথরে জীবনকে কসিয়া দেখিবার যে কঠোরতম নৈষ্ঠিকতা আবশ্যিক-রূপে বরণীয়, সে সবই এই যুগমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ। জীবনাদর্শকে বাস্তবতার চাহিদায় এমনি মাংসল পেশীবহুল কঠোর হস্তে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরা—এ যুগের যেমন জীবন-প্রেরণা ছিল, এমনটি আর কখনও দেখা দেয় নাই। তাই সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে যদি কখনও আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টির হিড়িক পড়িয়া থাকে, তবে তাহা এই রামায়ণ-মহাভারতের যুগে। অতিচেতনতা (Seriousness) এই যুগের জীবন-লক্ষণ। তাই কী ক্ষাত্রবীর্যের রূপায়নে, কী প্রেমে, কী নৈতিকতায়, কী রাষ্ট্রচেতনায় সর্বত্রই এই অতিচেতনার খরদীপ্তি। বৈদিক যুগের সহিত ইহার সাধর্ম্য আধ্যাত্মিক প্রখরতায়। বীরত্বপনায় ও বীর্যশুল্কে প্রেমিকার হৃদয়-জয় এ যুগের বিশিষ্ট আকর্ষণ। তাই এই সময়কার প্রেম অন্তঃপুরের প্রেম নয়, ছায়াঘন পান্থনিবাসের সাকীর হাতের পেয়ালা-ভরা ফেনিল জীবন-মদিরা নয়; ক্লান্ত জীবনের বিশ্রামের অবসরে আত্ম-বিনোদনের নর্ম-ক্রীড়া নয়; তরবারির ঝনৎকারে, অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহিতে, রথচক্রের ঘর্ঘরে ও তূনীরের শরবৃষ্টিতে এই প্রেমের বৈজয়ন্তী-উৎসব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—রাজগৃহের গৃহকোণের অসূর্যম্পশ্যা রাজা-দারা নয়। ইহারা প্রেম-বিপ্লবের জাতীয় নেত্রী। জীবনের ঝটিকায় ইহাদের প্রেমের আগুন ঈশান কোণে রাঙা হইয়া দেখা দেয়। ইঁহারা কেবল আদর্শ অতি-চেতনার কাল্পনিক ফানুস নয়, ইহারা জীবন-জিজ্ঞাসার রক্তমুখী কল্লোল। ইহাদের প্রেম মাধবী রাত্রির জ্যোৎস্নাবিলাস নহে, বৈশাখী ঝঞ্ঝার রুদ্র-সাধনা। এই প্রেমের সঞ্চরণ-ভূমি ঘটাকাশ-পটাকাশ নয়, অসীম অনন্ত নীলাকাশ। ইঁহার রাগিনী কলাবতী ধ্রুপদী, ঠুংরি নয়। ইহা আকাশ-ছাওয়া রঙীন চন্দ্রাতপ, ভাজে ভাজে ভাজ-করা কাজ-করা বেনারসী শাড়ী নয়। ইহার গতি বার্ষিকী; পলদণ্ডের হিসাবে পদে পদে মন্থর নয়। সুন্দরকাণ্ডে সীতাহারা রামের বিলাপে দক্ষিণ ভারতের আকাশেও বেদনা-মেঘের বর্ষা নামে। তারা-বিলাপের উষ্ণ অশ্রুস্তে

বাণীর বরপুত্র কালিদাসের মন ভিজিয়া ওঠে। লঙ্কার অশোক-কাননের জীর্ণ পাতা সীতার অশ্রুজলে আজিও কচি-কোমল, শ্যামল-সবুজ। হউক বর্ণনাময়, তবু 'কামগন্ধ নাহি তায়'। এ-প্রেমে প্রবৃত্তি-বন্যার উচ্ছ্বাস নাই, গর্জন নাই, তরঙ্গ নাই, আবর্ত নাই। ইহা শান্ত মেয়েটির মত শান্ত সমুদ্র; মৃত্যুর মত স্থির, নির্বিকার ব্রহ্মের মত শব্দেরও অতীত। কেবল ইহার কূলে কূলে তট-অরণ্যের স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়ায় কিংবদন্তীর প্রেমের গাগরীভরণের স্বপ্নালু কলগুঞ্জন। সেই ছলাৎ ছলাৎ চলাৎ চলাৎ ধ্বনির মধ্যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার, অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার প্রেমের স্বপ্ন মর্মরিয়া ওঠে। এ-যুগে বীর্যশুল্কে প্রেমের মূল্যায়ন। তাই স্বয়ংবর প্রথার প্রচলন। বহু-বিবাহ প্রথা রাজস্বীকৃতি ললাটে বাঁধিয়া অশ্বমেধের মেধ্য অশ্বের মত দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। তবুও এই যুগের প্রদীপের পাদচ্ছায়ায় অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরীকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখি। ইহাদের সকলেরই উপপতি ছিল।

আবার ক্লাসিক্যাল যুগে প্রেমের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নীতিবাদের সামঞ্জস্য। তাই সকল রকম প্রেমকে উল্লঙ্ঘন করিয়া দাম্পত্য প্রেম পতাকা উত্তোলন করে। বহু বিবাহের দাপটে রাজারা "সকৃৎ-কৃতপ্রণয়"। এক রাজার বহু রাণী—নম্বরমারা। টিকিটের নম্বর দেখিয়া খাতাপত্র অনুসন্ধান করিয়া মিলনের দিনক্ষণ নির্ধারণ করিতে হয়। নাম ও ব্যক্তি-জীবন টিকিটের সূতা ছিঁড়িয়া কবে কোথায় যেন হারাইয়া যায়। রাজ্যের প্রেম রীতিমত শাসিত হইয়া বাসা বাঁধে রাজার অন্তঃপুরে। সেখানে মণি-মঞ্জীরের তালের সহিত আনন্দ-ভোগের ধ্বনি ওঠে—নৃত্যে গীতে বাদ্যে সঙ্গীতে অভিনয়ে হাস্যে-লাস্যে-আঁখিঠারে ও দেহ-কদম্বের রোমাঞ্চিত পাপড়ির গণনার ফাঁকে ফাঁকে চলে অশান্ত যৌবনের কামকেলি। বসন্ত-উৎসবে, মদন-উৎসবে, যব-চতুর্থীতে, ঝুলনে, কুসুমোৎসবে, সহকার-ভঞ্জিকায় বাজে এ-প্রেমের জল-তরঙ্গ; পরিণীতা ও অপরিণীতার প্রেমদ্বন্দ্বে চলে অস্থির-পরিণাম প্রেমের ওঠা-নামা—চলে বিজিগীষা। তবুও এ-প্রেম সমাজ-অনুমোদিত। এ প্রেম দাম্পত্য-প্রেম। ক্লাসিক্যাল প্রেম তাই দাম্পত্য-প্রেম—সমাজ ও রাষ্ট্র-অনুমোদিত বৈধ প্রেম।

আবার পতঞ্জলি যে তাঁহার পূর্ববর্তীকালের প্রেমের ছিন্ন ইতিহাসের পুঁথি উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানেও দেখি প্রেমের খেতে ফসল কাটার গান উঠিয়াছে। যবক্রীত, প্রিয়ঙ্গু, যযাতি, বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা ও ভীমরথ প্রভৃতি যে-সকল কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি পাওয়া না গেলেও বাসবদত্তার কাহিনীর উপজীব্য বিষয়বস্তু যে প্রেম ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। কবি পাণিনির জাম্ববতী-পরিণয় প্রেমেরই পটভূমি। সেকালের যে-সকল নষ্ট-কোষ্ঠী কবিতার দুই-একটি

পঙ্‌ক্তি তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে প্রেমের ফুল-চাষ বলা চলে। লাউ, কুমড়ো, বেগুন, আলু, কপি, চেড়সের মত রাখী তরকারি চাষও নয়, একেবারে, বকুল, কামিনী, টগর, গোলাপ, অশোক, শিমুল, পারিজাত-রজনীগন্ধার চাষের মত সকালের শিশির-ভেজা আলোলাগা সদ্যঃ বিকচ প্রেমপুষ্পের চাষ—ডালে ডালে থরে থরে গুচ্ছে গুচ্ছে স্তবকে স্তবকে সাজানো। গোটা ফুল পাওয়া যায় নাই; কোথাও একটা পাঁপড়ি, কোথাও একটা কলি, কোথাও খানিকটা প্রজাপতির গাঝাড়া রেণু। কিন্তু সকলের গায়ে সদ্যঃ ফোটা প্রেমের তাজা গন্ধ। সেই গন্ধের ফাঁক দিয়া আমরা সেকালের লোকজীবনের প্রেমের খেতের অনুমান করিয়া লইতে পারি। এ-প্রেম বাঁধা খাতের প্রেম নয় নিশ্চয়ই, দাম্পত্য-প্রেমেব পাথর-বসানো সোনার কঙ্কন নয়। শরৎ প্রভাতের সদ্যঃ ফোটা লাখ লাখ শিউলী ফুলের মতো এ প্রেম লোক-জীবনের রঙীন প্রভাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুটিয়াছিল।

তাহার পব পিঙ্গল দেখা দিলেন ছন্দের ডালায় প্রেমের অভিজ্ঞান সাজাইয়া। তাঁহার 'বিদ্যুন্মালা'য় আড়াল হইতে প্রিয়তমার লুলিত নয়নের বাঁকা বিদ্যুৎ চমক দিয়া যায়; তাঁহাব 'কনক প্রভা'য় সুতনুর কনকলাবণ্য ঝরিয়া পড়ে, 'তন্বী'ব তনুদেহের তনিমা, 'চারু হাসিনী'র মন চোরা হাসি, 'কুন্দ-দন্তী'র কচি দাঁতেব রুচি হাসি, প্রেমিকের হাতে-রচা 'বসন্ত-তিলকে'ব অনুরাগের ছটা, মধু-যামিনীর শুভলগ্নে প্রেয়সীর গলায় ঝুলিয়ে-দেওয়া বাসন্তী পুষ্পের 'স্রগ্ধরা'—এরা সকলেই সেই লোকায়ত প্রেমেরই—ছটা :

> খনে খন নয়ন কোন অনুসরই।
> খনে খন বসন ধূলি তনুভরই ॥
> খনে খন দশনক ছটাছট হাস।
> খনে খন অধরক আগেকরু বাস ॥

তাই বলিতেছিলাম, পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে প্রেমের বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞান। লোক-জীবনে আগাইয়া চলে এ প্রেম।

তাহার পর বৌদ্ধ গ্রন্থকারের 'নাগানন্দ' গ্রন্থের জীমূতবাহন চরিত্রের উদাত্ত আত্ম-ত্যাগের মধ্যেও এই প্রেমের একটা ছটা যাইয়া নামিয়াছে। ভাস্করগুপ্তের 'লীলাবতী' গ্রন্থের পটভূমিতে শ্রোতা হইলেন এক কাল্পনিক তরুণী। বীজগণিতের গ্রন্থ হইলেও গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে কবিতায় এবং ভ্রমর, কুসুম প্রভৃতি কবিতা-সুলভ সৌন্দর্য-উপকরণের মাধ্যমে অলঙ্কারেরও প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে।

তাহার পর হাল-অমরুর শতক-কবিতা। এই কবিতাগুলির প্রেম ব্যক্তি-জীবনের অন্তর্মুখী প্রেম। ব্যক্তি-জীবনের আশ্রয়ে এই প্রেম ব্যক্তি-প্রবৃত্তির ছটায় নানা রঙের জাল বোনে। রক্ত মাংসের ফেনিল বাসনা এই প্রেমে উপছাইয়া ওঠে। প্রতিটি হৃদয়ের প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষণিক সূক্ষ্মতম বাসনার লুতাতন্তু এই প্রেমে জড়াইয়া ওঠে। ইহা মানব-জীবনের ধারাবাহিক বৃত্তের প্রেম নয়—ইহা ক্ষণিক মেজাজের, বিচ্ছিন্ন বাসনার, বিশিষ্ট নাম-ঠিকানার। তাই এ-প্রেমে প্রবৃত্তির হাসিকান্নার হৃদ্‌স্পন্দন শোনা যায়, ধমনীতে ধমনীতে বাজিয়া ওঠে উত্তপ্ত উন্মত্ত মথিত বাসনার তাপমাত্রা। ইহাতে বর্ষাশেষ আকাশের সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত রামধনু নাই, নাই ইহাতে মাধবী জ্যোৎস্নার স্বপ্নালুতা। ইহা আমাদের ঘরের প্রদীপ। ব্যক্তি-সীমা যতদূর প্রসৃত, ইহা কেবল ততদূর আলোকিত করিয়া তোলে। তবুও সেই সীমিত সীমার মধ্যে ব্যক্তি-জীবনের কামনার আক্রন্দন নিবিড় হইয়া ফুটিয়া ওঠে। এই প্রেমের বৈশিষ্ট্য দূতীসহায়তা। প্রেমিকা মুগ্ধানায়িকা। পরকীয়া-স্বীয়া, পরিণীতা-অপরিণীতা সকল শ্রেণীর বৈধ ও অবৈধ প্রেমের ইহা এক স্ফটিক-খনি বিশেষ। ইহাতে গ্রাম্য জীবনের বিচিত্র সম্ভোগের খবর আছে। ব্যক্তি-কামনার সহিত জাতির কামনা এখানে উদ্বেল। ইহাই রক্ত-মাংসের বাস্তব প্রেম।

ক্লাসিক্যাল কাব্যের প্রেমের দুই ধারা—একটি নীতিনিষ্ণাত, অপরটি কিংবদন্তীর। অশ্বঘোষের কালেও ভোগাত্মক প্রেমের ব্যপ্তি ছিল বেশী। 'সৌন্দরানন্দ'-কাব্যের সুন্দর-সুন্দরীর ভোগ-জীবন তাহার স্বাক্ষর। মানুষের চাওয়া হাতের-কাছে-পাওয়া মানবী সুন্দরীতে মিটিত না বলিয়া স্বর্গের অপ্সরা ধরিতে তাহাদের হাত উঠিত। তাই সুন্দরকে কেবল সুন্দরী-ছাড়া করা হয় নাই, তাহাকে স্বর্গ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া তবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কাব্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা প্রেম নহে, বৌদ্ধধর্মের প্রচার। তাই ক্লাসিক্যাল কাব্যের প্রেমের দুই ধারার মধ্যে কেবল দাম্পত্য-জীবনের প্রেমের ধারা নিবিড় ভোগের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাসের মধ্যে দুই ধারা—একটি রামায়ণ-মহাভারত হইতে অনুসৃত দাম্পত্য-প্রেমের ধারা—অপরটি বৃহৎকথা হইতে অনুসৃত কিংবদন্তীর প্রেমের ধারা। বাস্তব প্রেমে যখন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে না, তখন মানুষের চাওয়ার আগুন পাওয়ার ইন্ধনকে ছাড়াইয়া স্বপ্নলোকের রুদ্ধ দ্বারে মাথা খুঁটিতে থাকে। তাই ভাসকে দাম্পত্য-প্রেমের শরিকানায় কিংবদন্তীর প্রেমকে অর্ধেক জমির দখল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। ভাসের পরে কালিদাসের স্থান। কালি-দাসের মধ্যেও এই দুই ধারার স্বীকৃতি। ধারা-দুইটি নিবিড় ভাবে ফুটিয়াছে

শকুন্তলার মধ্যে। উর্বশী ও মালবিকার মাঝামাঝি শকুন্তলা। কিন্তু কালিদাসের প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—বহির্মুখ প্রেমকে অন্তর্মুখ করিয়া তোলা—ব্যক্তিজীবনের স্বেচ্ছাচারী প্রেমকে—ইন্দ্রিয়জ প্রেমকে ইন্দ্রিয়াতীত করিয়া তোলা—তপস্যায় শাসিত করিয়া সমাজমুখী করিয়া তোলা। ব্যক্তি-সীমার পরপারে নৈর্ব্যক্তিক জগতে উত্তরণের উপায়ন হইল তপস্যা। এই তপস্যার ফলেই বহির্মুখ প্রেম অন্তর্মুখী হইয়া ওঠে। কামনার কাঁচা সোনা তপস্যার আগুনে পুড়িয়া পাকা সোনা হইয়া ওঠে, পঙ্ক পঙ্কজ হইয়া দেখা দেয়। কালিদাসের পূর্ব পর্যন্ত প্রেম ছিল দৈহিক ভোগের বস্তু। কালিদাস তাহাকে মানস ভোগের উপকরণ করিয়া তুলিলেন। সত্য ও শিব-মূর্তির সহিত সুন্দর মূর্তি আসিয়া কালিদাসের দৈহিক প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। কালিদাস মন্ত্র পড়িলেন—"ওঁ ক্লীঁ"; অমনি দেহজ প্রেম দেহাতীত হইল, স্বর্গীয় হইল। স্বর্গ-মর্ত্যের সাঁকোয়-বাঁধা এই প্রেমকে লইয়া আমরা গ্রামে, নগরে, রাজদরবারে সমাজপতিদের ঘরে ঘরে যাইয়া ঘুরিয়া আসিলাম। কালিদাস গাঁট বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাই অনেক পরবর্তী কবি ভবভূতির মুখে শুনিতে পাই—

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাস্ববস্থাসু যদ্-
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্যোরসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য হইল—প্রেমানুভূতির দুইটি রূপ—একটি জীবনের, অপরটি স্বপনের; একটি বাস্তবের, অপরটি কিংবদন্তীর। আমরা স্বপ্নের প্রসঙ্গেই বলিয়া আসিয়াছি, জাগ্রৎ ও স্বপ্ন লইয়া মনুষ্য-জীবনের পূর্ণতা। জাগ্রৎ বৈদিক-যুগের লোকালয়ের লোক-জীবনের, স্বপ্ন বৈদিক কিংবদন্তীর। বৈদিক লোক-জীবনের বাস্তব প্রেমানুভূতি বৈদিক ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রের বাহনে ঋগ্বেদ হইতে অথর্ববেদের সঞ্চরণ ভূমিতে নামিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। কিংবদন্তী-প্রেমের প্রথম আশ্রয়স্থল বেদ—বৈদিক ঋষির চোখের পাতায় নামিয়া-আসা সুদূরের নীলাকাশ। সেই আকাশের গন্ধর্ব-অপ্সরার মধ্যে কিংবদন্তী প্রেমের প্রথম লিপিময় অঙ্কুর। তাহার পূর্বে উষাসূক্তে তাহার প্রথম সোনার-কালির বিদ্যুৎরেখা মাত্র। দশম-মণ্ডলের সংবাদ-সূক্তে উর্বশী-পুরূরবা, যম-যমীর সংলাপের মধ্যে তাহার উন্মেষ। ব্রাহ্মণে, বিশেষ করিয়া শতপথ-ব্রাহ্মণে পুরূরবা-উর্বশী কাহিনীরই পূর্ণাঙ্গতা—দুষ্মন্ত-শকুন্তলা কাহিনীর

উল্লেখ। তাহার পর 'অর্থবাদে'র কাঁধে চড়িয়া কিছুটা পালি সাহিত্যের, আবার কিছুটা রামায়ণ-মহাভারতের ভ্রূণে যাইয়া আশ্রয় লইল। রামায়ণ-মহাভারতের বাছাই মালের অবশিষ্ট রহিল। তাহারও আবার দুই ভাগ। এক ভাগ পড়িল ক্লাসিক্যাল কাব্যের ভাগে, অপর ভাগ কথা-কাব্যের পিতৃদত্তধন গুণাঢ্যের বৃহৎকথায়।

ক্লাসিক্যাল কাব্যের প্রেমের আলোচনায় ইহার পরিচয় দিয়াছি, কেবল কালিদাস সম্পর্কে বক্তব্য কিছু বাকি আছে। কালিদাসের তরুণ বয়সের নব-উন্মেষিত নূতন প্রেমের স্বাক্ষর কুমার-সম্ভব—শিব—পার্বতীর প্রেম—দেব-দেবীর প্রেম। কিংবদন্তীর স্বপ্নের বুকে ইহার প্রথম ফুল ফুটিয়াছিল। দেবার্চনার মুখে সেই ফুল স্বর্গে যাইয়া ওঠে। কালিদাসের স্বর্গীয় প্রেম সেই কিংবদন্তীরই প্রেম। এই কিংবদন্তী প্রেমের দ্বিতীয় সংস্করণ মেঘদূতের যক্ষ-কান্তার প্রেম, বিক্রমোর্বশীর উর্বশীর প্রেম। বাস্তব প্রেমের মাধ্যাকর্ষণের টানে এই প্রেম শকুন্তলায় যাইয়া বাস্তব ও কিংবদন্তী প্রেমের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে। তাই শকুন্তলার জনক মানুষ বিশ্বামিত্র, জননী অপ্সরা মেনকা। শকুন্তলা দুঃখে পড়িলে অপ্সরাতীর্থে যাইয়া বুক জুড়াইয়া লয়। মেনকার সখী অপ্সরা সানুমতী দুঃখের দিনে শকুন্তলার সাহচর্য করে। অতএব দেখা যাইতেছে, লৌকিক প্রেম কিংবদন্তী প্রেমের সাহায্য না লইয়া উড়িতে পারেনা। শুধু কিংবদন্তী প্রেম কেন, কালিদাসের কুমার-সম্ভব, মেঘদূত, বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা—কিংবদন্তীর ছায়ায়-ঘেরা। অভিশাপ, ইন্দ্রজালতো আছেই। 'মালবিকা'—একটি মাত্র ব্যতিরেক। অতএব কালিদাসের মতো মহাকবিও কিংবদন্তীর নেশা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

এখন কিংবদন্তীর দ্বিতীয় ভাগের কথা বলি—বৃহৎকথার ভাগ। বৃহৎকথার নায়ক নরবাহনদত্ত, উদয়নের পিতা। নরবাহনের ছাব্বিশটি বিবাহ। কাহিনীতে গন্ধর্বের. ভূমিকা আছে। এই গন্ধর্বের সান্নিধ্য কিংবদন্তী প্রেমের অন্যতম লক্ষণ। গুণাঢ্যের গল্পের ঝাপিতে প্রাচীন ভারতের লোকজীবনের কিংবদন্তীর স্বপন-বুলানো উপাদান আছে। বেতাল-পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকায় বাস্তব প্রেমের ছায়া ও কিংবদন্তী প্রেমের কায়া। দণ্ডীর দশকুমার চরিত নীতিবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হইলেও ইহাতে বাস্তব কুৎসিৎ প্রেমের উপর কিংবদন্তী প্রেমের আলো পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকে—যেমন ঝিকমিক করে অন্ধকারে খাপমুক্ত বাঁকা তলোয়ার। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় নিষ্কলুষ কিংবদন্তী প্রেম। বাণের কাদম্বরীতে কালিদাসের শকুন্তলার মতো বাস্তব ও কিংবদন্তী প্রেমের রাখীবন্ধন

না হইলেও গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের মতো ইহাতে ক্লাসিক মহাকাব্যের প্রেমের সহিত কিংবদন্তী প্রেমের বন্ধুত্ব ঘটিয়াছে। কাদম্বরীতে কিংবদন্তীই মুখ্য, মহাকাব্যের প্রভাব গৌণ—যেন নৈশ আকাশের চন্দ্রাতপের উজ্জ্বল মণ্ডল-রেখায় তমালতালী-বনরাজিনীলা পৃথিবীর লীলার ছায়াটি।

অতএব কিংবদন্তীর উপাদান সঞ্চয়নে আমরা দেখিয়া আসিলাম, কথাসাহিত্যের সংগঠনে উহাদের সব কয়টির মেলবন্ধন থাকা চাই। একটাকে ধরিয়া টান দিলে সব কয়টি আসিয়া পড়ে। জন্মান্তর, কর্মবাদ, অভিশাপ, দৈববাণী, ইন্দ্রজাল, দেহান্তর, রূপান্তর, স্বপ্ন ও প্রেম—এইগুলি কথাসাহিত্যের জীবকোষ। জীবকোষের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তবেই প্রাণিদেহের তাপ, গতি ও বৃদ্ধি। কাহিনী ইহার প্রাণ এবং সেই কাহিনী-সৃষ্টির তৎপরতায় কবি-প্রতিভার অলৌকিকত্ব। কথা-আখ্যায়িকার প্রসঙ্গে আমরা বলিয়া আসিয়াছিলাম, কাদম্বরীর সাধারকৃণীত গুণাবলীর উপর রুদ্রট যে কথাকাব্যের সংজ্ঞা রচনা করিলেন, সেই সংজ্ঞায় উপাদানের কিছু অপেক্ষিতত্ব আছে। কবির বংশাবলী থাকিবে কিনা, বক্তা কে হইবেন—ইহাই বড় কথা নয়। বড় কথা ইহার জীবন-উপাদান। কিংবদন্তীর উপাদানই তাহার জীবন-উপাদান। কিংবদন্তীর রসই কথাসাহিত্যের রস।

কথা-সংক্ষেপ

রাজধানী বিদিশা। রাজা শূদ্রক। অশেষ গুণের আকর এই রাজা। একদিন তিনি রাজ-সভা আলো করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পরম রূপবতী এক প্রতিহারী আসিয়া নিবেদন করিল, রাজদ্বারে দর্শনপ্রার্থী এক চণ্ডাল-কন্যা। রাজার অনুমতি পাইয়া প্রতিহারী তাহাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল—প্রতিহারী আগে, মধ্যে এক বালক; তাহার হাতে সোনার খাঁচায় এক শুকপাখী; সকলের শেষে এক বৃদ্ধ। তাহারা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া যথারীতি প্রণাম করিল। প্রণামের পালা শেষ করিয়া বৃদ্ধ লোকটি বালকের হাত হইতে খাঁচাখানি লইয়া রাজার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, তাহারা ঐ পাখীটিকে রাজাকে উপহার দিতে দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছে। পাখীটির নাম বৈশম্পায়ন। সে মানুষের মত কথা কয়, সর্বশাস্ত্র ও সকল কলাবিদ্যায় সে নিপুণ। এইভাবে পাখীর নানা গুণের বর্ণনা করিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল। বৈশম্পায়ন তাহার দক্ষিণ চরণ তুলিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিল। একটি আর্যা শ্লোক পাঠ করিয়া রাজাকে অভিনন্দিত করিল। রাজাও সভাসদ্‌গণের সহিত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পাখীটির সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিলেন। তাহার পর শুক পাখীটিকে অন্তঃপুরে পাঠাইবার আদেশ দিয়া তিনি সভা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। স্নান, আহ্নিক ও ভোজনের পালা শেষ করিয়া রাজা বেশ আরাম করিয়া বসিয়া প্রধানমন্ত্রী কুমারপালিতকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কুমার-পালিত আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর ডাক পড়িল শুকপাখীর। শুকপাখীকে অন্তঃপুর হইতে আনা হইলে রাজা তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিতে বলিলেন। শুকপাখী বলিতে লাগিল—

"বিন্ধ্যাটবী নামে এক বৃহৎ অরণ্য। সেই অরণ্যে ছিল এক বিশাল শাল্মলী গাছ। গাছটি যেমন প্রাচীন, তেমনি গগনস্পর্শী। ঐ গাছটির পাদদেশ জড়াইয়া ছিল এক বৃহৎ অজগর। সেই গাছে অনেক পাখী থাকিত। তাহাদের মধ্যে থাকিতেন আমার পিতামাতা। মা আমাকে প্রসব করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। নিরুপায় বৃদ্ধপিতা আমার লালন-পালনের ভার লইলেন। আমি তখন নিতান্ত কচি। আমার পাখা ওঠে নাই। ওড়া তো দূরের কথা, চলিবার সামর্থ্যও তখন হয় নাই। এমনি সময়ে সেই বনমধ্যে মৃগয়ার প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। শবর-বাহিনীর মৃগয়া। বাহিনীর সেনাপতির নাম মাতঙ্গ। মৃগয়া শেষে মাতঙ্গ

চলিয়া গেলে সেই সেনাবাহিনীর অন্তর্গত এক বৃদ্ধ শবর আমাদের সেই শাল্মলী গাছ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। পক্ষিকুল ভয়ে বিহ্বল হইল। পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে তাঁহার দুই জীর্ণ ডানার মধ্যে সারিয়া রাখিলেন। বৃদ্ধশবর পিতাকে নিচে শুক্‌নো ঝরাপাতার উপর ছুড়িয়া ফেলিল। পিতার মৃত্যু হইল কিন্তু আমি তাঁহার পক্ষপুটের মধ্যে থাকায় সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। ভয়ে ও শোকে আমার কণ্ঠতালু শুকাইয়া কাঠ হইল। জল-অন্বেষণে আমি পম্পা-সরোবরের দিকে পড়িতে পড়িতে উঠিতে উঠিতে চলিয়াছি, এমনি সময়ে হারীত নামে এক মুনিকুমার আমার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া আমাকে জলপান করাইয়া আশ্রমে পিতা জাবালির কাছে লইয়া গেলেন। মহর্ষি জাবালি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন। মুনিগণ ব্যাপার কি বলিবার জন্য মহর্ষিকে ধরিয়া বসিলেন। মহর্ষি সবিস্তারে কাহিনী বলিতে লাগিলেন। (কথামুখ)

"অবন্তী দেশ ; রাজধানী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর রাজা তারাপীড। মহিষী বিলাসবতী, মন্ত্রী শুকনাস। শুকনাসের পত্নীর নাম মনোরমা। বিলাসবতী মহারাণী হইয়াও সুখ নাই। নিঃসন্তানার দুঃখ বড দুঃখ। সন্তান-লাভের আশায় তিনি যখন ব্রত-আচার লইয়া মগ্ন, এমনি সময়ে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে চন্দ্র মহারাণীর মুখে প্রবেশ করিতেছে। শুকনাসও স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ মনোরমার কোলে একটি পুণ্ডরীক নিক্ষেপ করিলেন। ইহার পর বিলাসবতীর গর্ভে চন্দ্রাপীড ও মনোরমার গর্ভে বৈশম্পায়ন জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সখ্য জন্মিল এবং রাজার কৃপায় গুরুগৃহে থাকিয়া তাঁহাদের সকল বিদ্যা অধিগত হইল। বৈশম্পায়ন এক অস্ত্রবিদ্যা ছাডা আর সকল বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। গুরুগৃহের পাঠ শেষ হইলে রাজাদেশে সেনাপতি বলাহক ইন্দ্রায়ুধ নামে এক অশ্ব লইয়া বাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারও ঐ অশ্বে আরোহন কবিয়া রাজবাডীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজবাডী আনন্দ-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। তাহার পর চলিল কুমারের মৃগয়া। মৃগয়া হইতে ফিরিবার পর পত্রলেখাকে সঙ্গিনী পাইয়া কুমার খুশি হইলেন। এখন তাঁহার যৌবরাজ্যের অভিষেকের কাল আসন্ন। মন্ত্রী শুকনাস রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য-সম্পর্কে কুমারকে নানা উপদেশ দিলেন। মহারাজের আশীর্ব্বাদ লইয়া তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইহার পর চন্দ্রাপীডের দিগ্বিজয়ের পালা। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি সকল দেশ জয় করিয়া বিশ্রামের জন্য কিরাত-নগর বাছিয়া লইলেন। একদিন সেখানে ইন্দ্রায়ুধে চাপিয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াই দেখেন এক কিন্নর-দম্পতী। তাহাদের ধরিবার জন্য তিনি কৌতূহলী হইয়া ওঠেন।

তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন ঐ কিন্নর-দম্পতীর দিকে। কিন্নর-দম্পতীও ছোটে, ইন্দ্রায়ুধও ছোটে। এমনিভাবে পনের যোজন পথ যে কীভাবে অতিক্রান্ত হইল চন্দ্রাপীড তাহা টেরও পান নাই। তাহার পর কিন্নর-দম্পতী যখন উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে মিলাইয়া গেল, চন্দ্রাপীড তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে অচ্ছোদ নামে এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। সরোবরে নামিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জলপান করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে শুনিতে পাইলেন কোথা হইতে যেন বীণানিক্বণের সহিত সুললিত কণ্ঠের মধুর গীতি বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এ নারীকণ্ঠ। এই নির্জন অরণ্যপ্রদেশে নারী! চন্দ্রাপীডের কৌতূহল বাড়িল। তিনি ঐ সঙ্গীতের স্বর-মূর্চ্ছনার পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে এক শিব-সিদ্ধায়তন দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন ঐ শিব-মূর্তির সম্মুখে বসিয়া জটাজটিল এক সুন্দরী তরুণী সন্ন্যাসিনী। তাহার কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, বক্ষে বীণা, কণ্ঠে সঙ্গীত, নয়নে অশ্রু। এ কী মূর্তি! এ মানবী না দেবী, অপ্সরা না কিন্নরী! অপেক্ষা করি। সঙ্গীত-শেষে আকাশে উড়িয়া যাইবে না তো! সঙ্গীত থামিল! মূর্চ্ছনা তখনও সেই বিজন অরণ্যের পত্রে পত্রে বাজিতে লাগিল! সুন্দরী মানুষের ভাষায়ই কথা কহিয়া চন্দ্রাপীডকে সম্বর্ধিত করিলেন। তাহারই ইঙ্গিত অনুসারে চন্দ্রাপীড তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিকটবর্তী এক আশ্রমে যাইয়া উঠিলেন। সুন্দর হাতের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সুন্দরী বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। কথা না সঙ্গীত-মূর্চ্ছনা।

"গন্ধর্ব-রাজ হংস আমার পিতা, মাতা গৌরী। আমার নাম মহাশ্বেতা। তখন সবেমাত্র যৌবনের প্রথম জোয়ার আমার দেহমনের কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কাচা রঙের নেশায় মন আমার আবিল। মনের পর্দায় কে যেন জালিয়া দিল ইন্দ্রধনুর পঞ্চ-প্রদীপ। আসিল বসন্তের প্রভাত। রঙীন-স্বপ্নে-আঁকা সেই প্রভাতে মাতার সঙ্গে চলিলাম সরোবর-স্নানে। সরোবরের তীরে বাতাসে-মাখা এক অপূর্ব মিষ্ট গন্ধ! অপরূপ! অনাস্বাদিতপূর্ব! এ কী গন্ধ! কিসের গন্ধ! কোথা হইতে আসে এ গন্ধ! গন্ধের অন্বেষণে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম যুগল মুনি-কুমার। তাহার মধ্যে একজন যেন স্বয়ং কামদেব। তাঁহার কানে এক কুসুম-মঞ্জরী। মনে হইল, এই অপূর্ব গন্ধ ঐ কুসুম-মঞ্জরীরই হইবে। কৌতূহলী হইয়া প্রথম কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উনি কে? আর, ওঁর কানে যে মঞ্জরী দেখিতেছি, ও কোন্ ফুলের?" তিনি বলিলেন, "উনি মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র। ওঁর মাতা স্বয়ং লক্ষ্মী।

পুণ্ডরীকে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া ওঁর নাম পুণ্ডরীক। আর ওঁর কানে যে মঞ্জরী দেখিতেছ, উহা পারিজাত-কুসুমের। নন্দন-বন-দেবতা ঐটি উহাকে উপহার দেন।" দ্বিতীয় কুমার আমাদের আলাপ শুনিয়া আমাকে বলিলেন, "চপলে! জিজ্ঞাসা করিয়া আর কী হইবে! যদি তোমার ইচ্ছা হয়. তুমি নাও।" এই বলিয়া সেই মঞ্জরীটি আমার কানে পরাইয়া দিবার সময় তাঁহার হাত হইতে যে অক্ষমালা পড়িয়া গেল, তাহা তিনি টের পাইলেন না। আমি কিন্তু সেই মালাটি কুমারের হাত হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িতে না পড়িতে ধরিয়া ফেলিলাম এবং তাহা লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। প্রথম কুমার তাঁহার মন্মথ-বিকার লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিলে সেই কুমার আমার নিকটে আসিয়া তাঁহার মালাটি চাহিলেন। আমিও তখন এমনি অপ্রকৃতিস্থ যে আমার কণ্ঠের মুক্তামালাটি তাঁহার মালা মনে করিয়া তাঁহাকে দিলাম এবং তাঁহার স্ফটিক মালাটি কণ্ঠে পরিয়া স্নান সারিয়া মাতার সহিত ঘরে ফিরিলাম। তাহার পরই সেই কুমার আমার পরিচারিকা তরলিকার নিকটে আসিয়া আমার পরিচয় লইলেন এবং তাঁহার হাতে আমার উদ্দেশে একখানি প্রেম-পত্র পাঠাইলেন।

দিবাবসানে আমার কাছে প্রথম কুমার কপিঞ্জল হাজির। একে আমি সেই কুমারের জন্য উৎকণ্ঠিত। তাহাতে আবার কপিঞ্জল আসিয়া তাঁহার মন্মথ-ব্যথার কথা শুনাইয়া গেলেন। আমার হৃদয়ে তখন দ্বন্দ্ব চলিতেছে। একদিকে পিতা-মাতা সমাজ-সংসার, অন্যদিকে পুণ্ডরীক। কাহাকে রাখি, কাহাকে ছাড়ি? এই দ্বন্দ্বের নিরসন হইল চন্দ্রোদয়ে। আমি রক্ত-বসনে সাজিয়া তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া অভিসারে চলিলাম। চলিতে চলিতে শুনিতে পাইলাম কে যেন কাঁদিতেছে? ও কার কণ্ঠ? কপিলঞ্জলের না? ছুটিতে ছুটিতে যাইয়া দেখি পুণ্ডরীক চেতনহীন, মৃত। আমি অনেক কান্নাকাটি করিয়া সহমরণে যাইবার জন্য যখন তরলিকাকে চিতা সাজাইতে বলিলাম, তখন চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ কোনো মহাপুরুষ "বৎসে! মহাশ্বেতে! তুমি জীবন বিসর্জন দিও না। ইঁহার সহিত তোমার পুনরায় মিলন হইবে"—এই কথা বলিয়া পুণ্ডরীকের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া আকাশে উঠিলেন। কপিঞ্জলও এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া মৃতদেহ ফিরাইয়া আনিবার জন্যই যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। আমিও বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া সংসারের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা চিন্তা করিয়া সেই অবধি আমার প্রিয়তমের পুনঃ প্রাপ্তির আশায় বুক বাঁধিয়া এই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া আছি।" চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে যথোচিত সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই তরলিকা এখন কোথায়?" মহাশ্বেতা বলিতে লাগিলেন,

"মদিরাদেবীর গর্ভে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের যে কন্যা জন্মে, তাহার নাম কাদম্বরী। সে আমার আবাল্য সখী, আমার দ্বিতীয় হৃদয়। সে আমার কাহিনী শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—"যতদিন মহাশ্বেতার এই শোকার্ত অবস্থার অবসান না ঘটিবে, ততদিন আমি বিবাহ করিব না।" গন্ধর্ব-রাজের অনুরোধক্রমে কাদম্বরীকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য আজই আমি তরলিকাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি।"

পরদিন প্রভাতে তরলিকার সহিত কেয়ূরকনামে কাদম্বরীর এক ভৃত্য মহাশ্বেতার নিকটে আসিয়া বলিল, কাদম্বরী বিবাহে সম্মত হয় নাই। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার সহিত গন্ধর্ব-রাজধানীতে যাইয়া কাদম্বরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাদম্বরীও প্রথম দর্শনে চন্দ্রাপীড়কে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। অবসর বুঝিয়া কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে বসনযুগল ও শেষনামক এক ছড়া হার উপহার দিলেন। চন্দ্রাপীড়ও প্রতিবাতনীয়মান চীনাংশুককেতুর মত কাদম্বরীতে লুব্ধ মনটিকে কোন রকমে টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন তাঁহার স্কন্ধাবার যেখানে আছে, সেই দিকে। অচ্ছোদ-সরোবরের নিকটে আসিয়া দেখিলেন স্কন্ধাবার তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়া বন্ধু বৈশম্পায়নকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। পরদিন প্রভাতে কেয়ূরক আসিয়া কাদম্বরীর অসুস্থ অবস্থার কথা জানাইলে চন্দ্রাপীড় তৎক্ষণাৎ পত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া গন্ধর্ব-রাজভবনের হিমগৃহে কামাকুলা কাদম্বরীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার সহিত ব্যঙ্গ্যার্থপূর্ণ মধুর আলাপ করিয়া তাহার অনুরোধে পত্রলেখাকে সেইখানে রাখিয়া স্কন্ধাবারে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই পিতার পত্র পাইলেন। পত্র পাইয়া পত্রলেখাকে লইয়া যাইবার জন্য সেনাপতি-পুত্র মেঘনাদকে রাখিয়া এবং বৈশম্পায়নের উপর স্কন্ধাবার লইয়া যাইবার ভার দিয়া উজ্জয়িনী চলিয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই মেঘনাদের সহিত উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া কাদম্বরীর পীড়িত অবস্থা এবং কাদম্বরী যাহা যাহা চন্দ্রাপীড়কে বলিতে বলিয়াছিলেন, পত্রলেখা সব কথাই জানাইল।

ইহার পর কেয়ূরক আসিয়া জানাইল কাদম্বরীর অবস্থা খুব সংকটাপন্ন। পত্রলেখাও কেয়ূরকের মুখে কাদম্বরীর অবস্থার কথা জানিয়া চন্দ্রাপীড় খুব উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কাদম্বরীর নিকট ফিরিয়া যাইবার কোন পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। এ-কথা পিতাকে বলা যায় না, আবার না গেলে কাদম্বরীর মৃত্যু নিশ্চিত। এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংকুল মনে তাঁহার রাত্রি কাটিল। সকালে উঠিয়া শুনিলেন, স্কন্ধাবার দশপুরী

পর্যন্ত আসিয়াছে। চন্দ্রাপীড় ভাবিলেন বৈশম্পায়নের সহিত পরামর্শ করিয়া গন্ধর্ব নগরে যাইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। এই ভাবিয়া মেঘনাদকে ডাকাইয়া তাহার সহিত পত্রলেখা ও কেয়ূরককে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন তিনি শীঘ্রই যাইতেছেন। তাহারা বিদায় লইলে তিনি স্কন্ধাবারের প্রত্যুৎগমনের জন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বৈশম্পায়ন আসেন নাই। বৈশম্পায়নের না আসিবার কারণ সম্পর্কে জানিলেন, অচ্ছোদ-সরোবর দেখিয়া বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তিনি ঐস্থান ছাড়িয়া আসিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। এই সংবাদে তারাপীড়, শুকনাস ও মনোরমা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বৈশম্পায়নকে ফিরাইয়া আনিবার সংকল্প লইয়া পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদ-অভিমুখে ইন্দ্রায়ুধকে ছুটাইলেন। কাদম্বরীর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাতেরও একটা পথ মিলিল। পথে মেঘনাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মেঘনাদকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। অচ্ছোদ-সরোবরের বনভূমি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নের কোন চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, একবার মহাশ্বেতার আশ্রম দেখিয়া আসি। হয়তো তিনি সন্ধান বলিতেও পারেন। এই ভাবিয়া ইন্দ্রায়ুধকে মহাশ্বেতার আশ্রমের দিকে ছুটাইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন পরে মহাশ্বেতা আমাকে দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইবেন। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলেন, মহাশ্বেতা শিলাতলে অধোমুখে বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন। তরলিকা ম্লান মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আছে। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি শূন্যহৃদয়ে মহাশ্বেতার নিকটে যাইয়া শিলাতলের এক পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। তরলিকাকে মহাশ্বেতার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তরলিকা চন্দ্রাপীড়ের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া কেবল দীননয়নে মহাশ্বেতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মহাশ্বেতা বসনাঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "একদিন আশ্রমে বসিয়া আছি, এমন সময় আপনার সমবয়স্ক ও সদৃশাকৃতি সুকুমার এক ব্রাহ্মণ যুবককে দূর হইতে দেখিলাম। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কোন হারানো বস্তুর খোঁজ করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া মনে করিলেন আমি যেন তাঁহার পরিচিত। নিমেষহীন নয়নে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া থাকিয়া নানা কথার মধ্য দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন আমাকে তাঁহার চাই। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার গা জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আমি উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

তরলিকাকে ডাকিয়া কহিলাম, ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের অভিপ্রায় ভাল নয়। উহাকে বারণ করিয়া দাও। উনি যেন আর এখানে না আসেন। সেদিনকার মত তিনি ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু মনে হইল, সংকল্প একেবারে ত্যাগ করিলেন না। আর এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি! তরলিকা শিলাতলে শয়ানা। আমিও গ্রীষ্মের খরতর তাপে গুহার মধ্যে শয়ন করিতে না পারিয়া বাহিরের এক শিলাখণ্ডের উপর শুইয়া আছি। আকাশে ভরা-চাঁদের তিথি। জ্যোৎস্নার রূপালি ঢেউগুলি নাচিতে নাচিতে নামিয়া পড়িয়া সমস্ত অরণ্যের মধ্যে পাতায় পাতায় এক শ্বেত স্বপ্নের ঝালর ঝুলাইয়া দিল। চতুর্দিক আলোকে আলোকময়। চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে পুণ্ডরীকের কথা মনে পড়িল। মনে পড়িল, কই, তিনি তো আসিলেন না। তবে দেব-বাক্যও কি মিথ্যা হইল। এমনি সময়ে দূরে কাহার যেন পদধ্বনি। উঠিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেদিকে চোখ পড়িল! ও কি? ও তো সেই লম্পট ব্রাহ্মণকুমার। আজ যেন একেবারে উন্মত্ত! সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত। দুই ব্যগ্র বাহু মেলিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিবার সংকল্প লইয়াই যেন ও আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। কী পাপ? যদি ঐ উন্মত্তটা আমাকে স্পর্শ করে? সে নিকটে আসিল। তাহার ঐ মুক্ত আলিঙ্গনের মধ্যে সে যে আমাকে চায়! তাহার কথা শুনিয়া আমি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম। আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল; শ্বাস-প্রশ্বাসে ছুটিল জলন্ত অগ্নির তীক্ষ্ণ স্ফুলিঙ্গ। ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলাম। অনেক ভর্ৎসনা করিলাম। অবশেষে চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলাম,—"ভগবন্! সর্বসাক্ষিন্! পুণ্ডরীককে দেখা অবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কায়-মনোবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি, যদি আমার হৃদয় তাঁহার ভজন-পূজা-আরাধনায় নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার বাণী সত্য হউক;—তির্যগ্ জাতিতে এই পাপিষ্ঠের পতন হউক।" বলিতে বলিতে সেই ব্রাহ্মণ-কুমার অচেতন হইয়া ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার সঙ্গীরা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, তিনি নাকি আপনার মিত্র।" এই বলিয়া মহাশ্বেতা কাঁদিতে লাগিলেন।

"এ জন্মে কাদম্বরীর সহিত আর দেখা হইল না"—এই বলিয়া শিলাতল হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছেন দেখিয়া তরলিকা মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া চন্দ্রাপীড়কে ধরিয়া ফেলিল। চন্দ্রাপীড় সংজ্ঞাহীন, মৃতদেহের গ্রীবার ন্যায় তাঁহার গ্রীবা ভগ্ন, লুণ্ঠিত; চক্ষু নিমীলিত; শ্বাস নাই, স্পন্দন নাই, জীবনের কোন লক্ষণ নাই।

চন্দ্রাপীড়ের অবস্থা দেখিয়া মহাশ্বেতা বিমূঢ় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। পরিচারকেরা কাঁদিয়া উঠিল। ইন্দ্রায়ুধ চন্দ্রাপীড়ের দিকে নিমেষহীন নয়নে চাহিয়া রহিল। দুই চোখ বাহিয়া অঝোর-ঝরণে জল ঝরিতে লাগিল।

এদিকে কাদম্বরী পত্রলেখার মুখে চন্দ্রাপীড় আসিতেছেন শুনিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া প্রিয়তমের প্রত্যুদ্গমন্ মানসে কতিপয় পরিজনের সহিত মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন সকলেই বিষণ্ণ, সকলের মুখেই শোকের ঘনকালো ছায়া। ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্রাপীড়ের প্রাণহীন চেতনহীন দেহ পড়িয়া আছে। এই দৃশ্যে কাদম্বরী মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া মদলেখা তাহাকে তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলিল। পত্রলেখা অচেতন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত। কিছুক্ষণ পরে কাদম্বরী সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে উঠিয়া চন্দ্রাপীড়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার মাটিতে পড়িয়া মাথায় করাঘাত করিতে লাগিলেন। আবার উঠিয়া চিতানলে প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় চাহিয়া যে মুহূর্তে চন্দ্রাপীড়ের পা-দু'খানি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অমনি চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় এক উজ্জ্বল জ্যোতি উদ্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-বাণী হইল—"বৎসে! মহাশ্বেতে! আমার কথার নির্ভরতায় তুমি বাঁচিয়া আছ। প্রিয়তমের সহিত তোমার মিলন নিশ্চিত; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। পুণ্ডরীকের মৃতদেহ আমার তেজঃ স্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া চন্দ্রলোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের শরীরে আমারই তেজ। ও-শরীরও অবিনাশী। বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শে উহা অক্ষয়। অভিশাপের ফলে এই দেহ এখন জীবন-শূন্য। যোগি-শরীরের ন্যায় ইহাতে পুনরায় জীবাত্মা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের বিশ্বাসের জন্য এ দেহ এখানেই থাকিল। অগ্নি-সংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না। যতদিন পুনর্জীবিত না হয়, ততদিন সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করিও।"

এদিকে চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে যে দিব্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইল, তাহার স্পর্শে পত্রলেখার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে ইন্দ্রায়ুধের বল্গা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে লইয়া অচ্ছোদের জলে ঝাঁপ দিল। ইন্দ্রায়ুধ ও পত্রলেখা অচ্ছোদের অতলে সলিল-সমাধি লাভ করিল। তাহার পর অচ্ছোদের জলতল হইলে জল-মানুষের মত ভাসিয়া উঠিল শৈবাল-সংসক্ত জটাধারী এক তাপসকুমার। তিনিই কপিঞ্জল। কপিঞ্জলের মুখে শোনা গেল স্বয়ং চন্দ্রই পুণ্ডরীকের দেহ চন্দ্রলোকে লইয়া রাখিয়াছেন। কেন

পুণ্ডরীকের দেহত্যাগ হইল, তাহার সম্পর্কে কপিঞ্জল বলিলেন, পুণ্ডরীক চন্দ্রকে অভিশাপ দেন এবং চন্দ্রও পুণ্ডরীককে পাল্টা অভিশাপ দেন। ইহার ফলে উভয়কেই মর্ত্যলোকে দুইবার করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শাপ-অবসান পর্যন্ত পুণ্ডরীকের দেহ চন্দ্রলোকে থাকিবে এবং চন্দ্রকর স্পর্শে তাহার শবদেহ বিকৃত হইবে না। এই অভিশাপের প্রতীকার কীভাবে হইবে, ইহা জানিবার জন্য চন্দ্র কপিঞ্জলকে শ্বেতকেতুর নিকট প্রেরণ করেন। শ্বেতকেতুর নিকট যাইবার পথে কোন বিমানচারীকে উল্লঙ্ঘন করায় তিনি কপিঞ্জলকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের ফলে কপিঞ্জল তুরঙ্গম হইয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার মুখে কপিঞ্জল শুনিলেন, স্বয়ং চন্দ্র তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড়ের অবতার ও পুণ্ডরীক শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়নের অবতাররূপে আবির্ভূত হইবেন। কপিঞ্জল আরও বলিলেন, তিনিই ইন্দ্রায়ুধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন চন্দ্রাপীড়ের বাহন। অশ্ব-জন্ম হইলেও তাঁহার জন্মান্তরীণ সংস্কার অব্যাহত ছিল। তিনি সজ্ঞানেই কিন্নর-মিথুনের অনুবর্তী হইয়া চন্দ্রাপীড়কে এখানে টানিয়া আনিয়াছিলেন। আর যিনি জন্মান্তরীণ অনুরাগের প্রেরণায় ব্রাহ্মণ কুমাররূপে মহাশ্বেতার নিকট আসিয়া শাপে বিনষ্ট হইয়াছেন, তিনিই পুণ্ডরীকের অবতার। পত্রলেখার কী হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে কপিঞ্জল বলিলেন, বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্র-লেখাও বা কোথায় কীভাবে আছেন, তাহা জানিবার জন্য তিনি এখনই মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিবেন। মহাশ্বেতাকে আরও গভীরতর তপস্যার উপদেশ দিয়া কপিঞ্জল গগনমার্গে উঠিয়া পড়িলেন।

মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী স্থির করিলেন, মহাশ্বেতা যেমন তপস্যা করিতেছিলেন, তেমনি তপস্যা করিবেন এবং কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের জীবন ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত শব-দেহের রক্ষণাবেক্ষণ ও শুচিশুদ্ধভাবে পরিচর্যা করিবেন। মদলেখা ও তরলিকা চন্দ্রা-পীড়ের মৃতদেহ হাতে হাতে ধরাধরি করিয়া শীতাতপ-বায়ু-বৃষ্টিহীন এক শিলাখণ্ডের উপর আনিয়া রাখিলেন। কাদম্বরী সরোবরে স্নান করিলেন। রাজকুমারী বাসক-সজ্জার বেশ ছাড়িয়া তপস্বিনীর বেশ ধারণ করিলেন। ধূপদীপ জ্বালিয়া মৃতদেহ চন্দনচর্চায় ভরিয়া কুসুমাভরণে সাজাইয়া চন্দ্রাপীড়ের পাদু'খানি কোলের উপর টানিয়া লইয়া বসিলেন। উপবাসের কঠোরতায় আপন অন্তরে এক অপরূপ বিশুদ্ধ নিষ্ঠা ঘনাইয়া তুলিলেন। দিন যায়, রাত্রি আসে। স্থিরপ্রতিবদ্ধ-দৃষ্টি কাদম্বরী। আসিল শাওন-রজনী। মাথার উপর ঘন জমাট-বাঁধা কালো অন্ধকারের জমাট-গ্রন্থি কালো পাপড়ির ছায়া তাহার মাথার উপর মেলিয়া ধরিল।

বিদ্যুৎ চমক দিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া যায়। ঘন ঘন গর্জিয়া ওঠে মেঘ উচ্চলিয়া ওঠে বজ্র। ঝরে অঝোর ঝরণ। অন্ধকারের বুকে কাঁপে নির্জনতা বিরাজ করে ভীষণ ভয়াল ভয়ঙ্করতা। অন্ধকারের বুক চিরিয়া স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টির মতো রাশি রাশি খদ্যোত জলে নিঃসীম অরণ্যের পাতায় পাতায়। ফেনিলমুখে গর্জন করিয়া ছোটে গিরিনির্ঝরের অবিরাম পতন-ধ্বনি। ডাকে মত্ত দাদুরী কোটি কণ্ঠে ;'মর্মচ্ছেদী কেকা সেই গহীন অন্ধকারের নিথর বুকে করে মুহুর্মুহুঃ ছুরিকাঘাত! ভয়ঙ্কর রাত্রি, ভয়ঙ্করী নির্জনতা, ভয়ে-ছমছম অন্ধকার। সেই ভয়ঙ্করী রজনীর শবদেহের উপর আসন করিয়া—বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া এক ভৈরবী মূর্তি। কে সে? সে কাদম্বরী। মৃত স্বামীর মুখে তাহার দৃষ্টির আঁচলখানি বাঁধা। রাত্রি কাটিল। আসিল প্রভাত। নীলাকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠিল সোনার রবির সোনার লিখন। সেই আলোকে কাদম্বরী দেখিলেন, চন্দ্রাপীড়ের দেহ অবিকৃত, উজ্জলতর। মদলেখা ও মহাশ্বেতাকে ডাকিয়া দেখাইলেন চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুসুন্দর উজ্জলতর দেহকান্তি। দৈব-বাণীর প্রতি বিশ্বাস জমাট বাঁধিয়া উঠিল। চলিল মদলেখা গন্ধর্বনগরে কাদম্বরীর প্রতিজ্ঞার বাণী লইয়া। পিতামাতা শুনিলেন, চন্দ্রাপীড়ের পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত কাদম্বরী মহাশ্বেতার আশ্রমে থাকিবেন। অনুমোদন করিলেন কাদম্বরীর সাধন-ভক্তির। বর্ষা কাটিল। নামিল শরৎ।

চন্দ্রাপীড়ের ফিরিয়া যাইতে বিলম্ব দেখিয়া তারাপীড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সংবাদের জন্য অচ্ছোদ-সরোবরে দূত পাঠাইলেন। দূতগণ আসিয়া স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের অবস্থা দেখিল। সকল ঘটনা রাজাকে জানাইবার জন্য তাহাদের সহিত ত্বরিত নামক এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠান হইল। সংবাদ পাইয়া তারাপীড়, বিলাসবতী, শুকনাস ও মনোরমা মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া চন্দ্রাপীড়কে দেখিলেন, দৈব-বাণীর কথা শুনিলেন। তাঁহারা কাদম্বরীকে পুত্রবধূরূপে সাদরে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রাপীড়ের সেবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া আশ্রমের অনতিদূরে এক নির্জন লতামণ্ডপে তপস্বীবেশে থাকিয়া ধর্মাচরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতিদিন সস্ত্রীক শুকনাসের সহিত চন্দ্রাপীড়কে দেখিয়া যাইতেন।"

মহর্ষি জাবালি এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া যে মুনিতনয় মহাশ্বেতার শাপে তির্যগ্ জাতিতে পতিত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ, এই বলিয়া আমাকে অঙ্গুলির দ্বারা নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদয়কর্ম ও নিখিল প্রাক্তন বিদ্যা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। আমি মানুষের মতই কথা

কহিতে লাগিলাম। মনে পড়িতে লাগিল চন্দ্রাপীড়ের কথা, কপিঞ্জলের কথা, মহাশ্বেতার কথা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, চন্দ্রাপীড় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তোমার পক্ষোদ্ভেদ হইলে বলিয়া দিব। পর দিন কপিঞ্জল আসিলেন। তিনি আমাকে বুকে তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমার পিতা শ্বেতকেতু কুশলে আছেন। তোমার মুক্তির জন্য তিনি এক আয়ুষ্কর কর্ম আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন, যতদিন এই আয়ুষ্কর কর্ম সম্পন্ন না হয়, ততদিন তুমি এ আশ্রম ছাড়িয়া যাইও না।" এই বলিয়া কপিঞ্জল শ্বেতকেতুর নিকট চলিয়া গেলেন।

আমি কিন্তু বন্ধুর কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না। মহাশ্বেতার জন্য আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পক্ষোদ্ভেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি মহাশ্বেতার আশ্রমের দিকে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইলাম। ফলমূল আহার ও জলপান করিয়া এক জম্বুনিকুঞ্জে নিদ্রিত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, আমি এক ব্যাধের জালে আবদ্ধ। সেই ব্যাধ আমাকে লইয়া এক কিরাত-রাজের নিকট উপস্থিত করিল। আমি রাজকন্যার তত্ত্বাবধানে থাকিলাম। হঠাৎ একদিন জাগিয়া দেখি, আমার খাঁচাটি স্বর্ণময় এবং রাজকন্যাকে মহারাজ যেমন দেখিতেছেন, আমিও ঐরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কী, জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে মহারাজের নিকট আনীত হইয়াছি।"

রাজা শূদ্রক শুকের মুখের কাহিনী শুনিয়া চণ্ডাল-কন্যাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। চণ্ডাল-কন্যা আসিয়া বলিল, "আমি বৈশম্পায়নের জননী লক্ষ্মী। আয়ুষ্কর কর্ম সমাপনের কালপর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য আমি উহার পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনিই সেই চন্দ্রাপীড় এবং শুকপাখীটিও আপনার মিত্র বৈশম্পায়ন। আজ আয়ুষ্কর কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, তাই আপনাদের উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দিলাম। এখন আপনি এই শূদ্রকদেহ পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রাপীড়ের দেহ ধারণ করিয়া আপনার প্রিয়তমা কাদম্বরীকে লাভ করুন। এই কথা বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে মহাশ্বেতার আশ্রমে নামিল নবীন বসন্ত। পুষ্পে-পল্লবে লতায়পাতায় এলাইত অরণ্যের শ্যাম দেহে জাগিল বসন্ত-উৎসব। বৃক্ষে বৃক্ষে ফুলগুলি যেন রঙের গাগরী ভরিয়া আবীর ঢালিতে লাগিল। সেই আবীরের রাঙা ছটা পত্রে পত্রে লতায় লতায় যেন কুঙ্কুম হানিতে লাগিল। নীলাকাশ রাঙা হইয়া উঠিল। সোনালী সূর্য যে সোনার রঙ্ ঢালিতে লাগিল তাহাতে আবীরের মধ্যেও ফুটিল

সোনার রেণুগুলি। প্রজাপতির দল সেই রেণুতে দিল গড়াগড়ি। কাঁচা হলুদের পাখা মেলিয়া লুটিয়া পড়িল ফুলের ফুটন্তবুকে। কানাকানি আরম্ভ হইল ফুলে ফুলে। বহিল দখিনা হাওয়া। জাগিল কাঁপন। ফুলের রাঙা অধরে ঠোঁট ডুবাইয়া ভ্রমরেরা পান করিল অধরমধু। ভ্রমরের মাতলামি আর অসম্বৃত প্রলাপে অরণ্যের-যৌবনে জাগিল উদ্দামতা। বকুলশাখায় ডাকিল কোকিল। গন্ধে ছম ছম করিতে লাগিল অরণ্যের লজ্জা। ঘনাইয়া আসিল মদন-মহোৎসব।

কাদম্বরী সায়াহ্নে স্নান সারিয়া অর্চনা করিলেন অনঙ্গদেবের। ধৌত করিলেন চন্দ্রাপীড়ের দেহ। মার্জনা করিলেন স্বহস্তে। স্নান করাইয়া চন্দ্রাপীড়ের সর্ব শরীরে ঘনাইয়া তুলিলেন চন্দন-চর্চা। কণ্ঠে দোলাইয়া দিলেন ফুলের মালা, কানে পরাইয়া দিলেন রাঙা অশোকের স্তবক। নবীনবেশে তাঁহার শিঙার করিলেন। তাহার পর তাহার মুখের উপর নয়ন পাতিয়া চাহিয়া থাকিলেন। সে চাহনি, না নয়ন মেলিয়া ধ্যান, বোঝা কঠিন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বাস্তব-জ্ঞান হারাইলেন—অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। তাহার পর হঠাৎ জীবিতভ্রমে যেমন চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, অমনি চন্দ্রাপীড় নয়ন মেলিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জীবন-ছন্দের নাচনি। কাদম্বরী ভীত হইলেন, তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রাপীড় বলিলেন, "ভয় কি! আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি। আজ আমার শাপের অবসান হইয়াছে। এতদিন বিদিশানগরীতে শূদ্রক নামে রাজা ছিলাম। আজ সে-দেহ ছাড়িয়া আসিয়াছি। শুধু আমি নয়; পুণ্ডরীকও আজ শাপমুক্ত।" এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রলোক হইতে পুণ্ডরীক নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। কণ্ঠে সেই একাবলী মালা, বামে কপিঞ্জল। কাদম্বরী মহাশ্বেতাকে এই আনন্দ-সংবাদ শোনাইবার জন্য ছুটিলেন। এই অবসরে পুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেয়ূরক গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও হংসকে, এবং মদলেখা তারাপীড় ও বিলাসবতীকে এই সংবাদ শুনাইতে চলিলেন। একদিকে তারাপীড়, বিলাসবতী, শুকনাস ও মনোরমা, অন্যদিকে চিত্ররথ, মদিরা, হংস ও গৌরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে। গন্ধর্বপতির সহিত তারাপীড়ের এবং হংসের সহিত শুকনাসের বৈবাহিক সম্পর্ক নির্ধারিত হইল। বাকি রহিল শুভবিবাহ। তারাপীড়ের নির্দেশ-ক্রমে চিত্ররথ ও হংস কন্যা-জামাতা লইয়া আপন আপন পুরীতে বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন করিলেন। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে, পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাকে জীবন-সঙ্গিনী পাইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। একদা চন্দ্রাপীড়ের নিকট কাদম্বরী

পত্রলেখার কী হইল, জানিতে চাহিলে চন্দ্রাপীড বলিলেন, "আমি শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্যালোকে জন্মগ্রহণ করিলে রোহিণী আমার পরিচর্যার জন্য পত্রলেখারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এখন চন্দ্রলোকেই ফিরিয়া গিয়াছেন।"

কাদম্বরী-কাহিনীর যে সংক্ষিপ্ত রূপটি আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণ বাণের নয়। চন্দ্রাপীডের প্রতি কাদম্বরীর প্রেমের যাথার্থ্যের সাক্ষ্য ও কাদম্বরীর বাণী লইয়া পত্রলেখার উজ্জয়িনী-প্রত্যাগমন পর্যন্ত বাণের রচনা। পরবর্তী অংশ ভূষণের কৃতি। বাণ জীবিত থাকিলে গল্পের উপসংহার কিরূপ হইত, তাহার আলোচনা করিয়া লাভ নাই। তবে ভূষণ যাহা দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা এতাবৎকাল সংস্কৃত কাব্য-পাঠকেরা মানিয়া আসিয়াছেন, কোন আপত্তি ওঠে নাই। আপত্তি উঠিবারও কোন সুযোগও ভূষণ রাখিয়া যান নাই। বরং ভূষণের হস্তক্ষেপের মধ্যে যে অধিকতর নাটকীয় চমৎকৃতি আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। অচ্ছোদসরোবরের শীলাতল দেখিয়া বৈশম্পায়নের বৈরাগ্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জননান্তর সৌহার্দের উদয়, নষ্টদ্রব্যের অন্বেষণ করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে যাইয়া অপরিচিত মহাশ্বেতার মধ্যে আবছাওয়া-ভরা অতিপরিচয়ের ভাব ফুটাইয়া তোলা, যাহাকে সে চেনেনা জানেনা, তাহাকে বক্ষের মধ্যে পাইবার জন্য অপ্রকৃতিস্থতা—বিস্মৃতির মধ্যেও জন্মান্তরীণ অন্ধ-সংস্কারের ক্রিয়াকারিত্ব; বসন্ত-সমাগমে অনঙ্গদেবের অর্চনা সারিয়া শিঙারের বেশ পরাইয়া মৃত চন্দ্রাপীডের দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ জীবিতভ্রমে কাদম্বরীর আলিঙ্গন-চেষ্টা এবং তৎক্ষণাৎ জীবনসঞ্চারে চন্দ্রাপীডের চোখ চাহিয়া কম্পমান কাদম্বরীকে দেখার মধ্যে ভূষণের নাট্যিক মেজাজের অভিজ্ঞান ধরা পড়ে। এগুলির মধ্যে যে মঞ্চ-কলার উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহা তো সংস্কৃত যুগের নয়ই, একেবারে আধুনিক যুগের। বিদিশার রাজা শূদ্রকের রাজসভার বর্ণনা দিয়া যে কাহিনীর সূত্রপাত ঘটিয়াছে, তাহাও নাটকীয়। কিন্তু সে কৃতিত্বের পাওনা বাণের। কিন্নর-মিথুন দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে অচ্ছোদসরোবর-তীরে মহাশ্বেতার দর্শন, কুসুম-মঞ্জরী লইয়া মহাশ্বেতার সহিত পুণ্ডরীক-কপিঞ্জলের আলাপ, পুণ্ডরীকের অক্ষমালার সহিত মহাশ্বেতার মুক্তামালার বিনিময়, এমন কি অভিসারিকার বেশে অচ্ছোদের তীরে মহাশ্বেতাকর্তৃক কপিঞ্জলের রোদনধ্বনি শ্রবণ; রোদন শুনিয়া দ্রুততর গতিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে মহাশ্বেতার পুণ্ডরীকের উদ্দেশে ছুটিয়া চলা এবং ধাবমানা মহাশ্বেতার উপস্থিতির পূর্বেই পুণ্ডরীকের মৃত্যু—এগুলি সবই নাটকীয়। কিন্তু এসব বাণের কৃতিত্ব! অতএব ভূষণ যে "মহাজনঃ যেন গতঃস পন্থাঃ" স্বীকার

করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাট্যধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় বাণ অপেক্ষা ভূষণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন বেশী। নাটকের চরমে যে 'নির্বহণে অদ্ভুতঃ'—ভূষণ উপসংহারে সেই অদ্ভুতেরই সংঘটনা আনিয়াছেন। অবশ্য নাটকের দিক দিয়া এই অদ্ভুতরস সৃষ্টির যেমন জোরালো তাগিদ আছে, তেমনি লোক-কথাভিত্তিক কথাকাব্যও এই অদ্ভুতরস সৃষ্টির দাবী রাখে। অতএব ভূষণ যাহা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কী হইতে পারিত, একথা পাঠকের মনেও আসেনা। কথাকাব্যের নাড়ীজ্ঞান ও নাট্যচেতনা যাঁহার আছে, তিনি ভূষণকে প্রশংসাই করিবেন। তবে একথা অতিসত্য, বাণের যে সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল, সে প্রতিভার নিকট ভূষণের প্রতিভা দুর্বল।

কাদম্বরী-কাহিনীর উৎস

সোমদেবের কথা-সরিৎ-সাগরের শক্তিযশ-লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গে নিম্নোক্ত কাহিনীটি পাওয়া যায় :—

"কাঞ্চনপুরী নগরের রাজা সুমনা। একদিন তিনি সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় প্রতীহার আসিয়া জানাইল, এক নিষাদ-রাজকন্যা তাঁহার দর্শনপ্রার্থী। কন্যাটির নাম মুক্তালতা। তাহার সঙ্গে তাহার ভাই বীরপ্রভ। কন্যার হাতে একটি খাঁচা। খাঁচায় এক শুকপাখী। রাজার অনুমতি পাইয়া নিষাদ-কন্যা রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে এমনি সুন্দরী যে তাহাকে দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম হয়। নিষাদ-কন্যা রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেব! শুকপাখীটির নাম 'শাস্ত্রজ্ঞ'। এ চতুর্বেদ, সমস্ত বিদ্যা ও নিখিল কলায় পারদর্শী। পাখীটি স্বয়ং কবি। এ আপনার যোগ্য উপহার। আপনি ইঁহাকে গ্রহণ করুন।" প্রতিহার পাখীটিকে রাজার নিকট লইয়া আসিলে পাখী রাজার পরাক্রমসূচক একটি শ্লোকের আবৃত্তি করিল। পরে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! বলুন! কোন্ শাস্ত্র হইতে কি বলিব!" রাজা তো অবাক। মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! মনে হয়, এ পূর্বে কোন ঋষি ছিল, শাপবশতঃ শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতিস্মর বলিয়া পূর্বের অধীত বিদ্যা এখন ইহার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে।" রাজা শুককে প্রশ্ন করিলেন, "ভদ্র! কোথায় তোমার শুকরূপে জন্ম, তোমার শাস্ত্রজ্ঞানই বা কীভাবে হইল, তুমিই বা কে, এই সকল বিষয় জানিতে আমার খুব কৌতূহল হইতেছে। তুমি সব খুলিয়া বল।" রাজার প্রশ্ন শুনিয়া শুকের দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, "মহারাজ! যাহা বলিবার নয়, তাহাও আপনার আজ্ঞায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"

"হিমালয়ের নিকটে একটি রোহিনী গাছ ছিল। তাহার বিস্তৃত শাখায় অনেক পাখী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে ছিলেন এক শুকদম্পতী। তাহারাই আমার জনক-জননী। আমার জন্মের পরই মাতার মৃত্যু হওয়ায় বৃদ্ধ পিতা তাঁহার ডানার মধ্যে রাখিয়া আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। নিকটস্থ শুকপাখীগুলি যে-সব ফল খাইয়া ফেলিয়া দিত, পিতা সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আমাকে খাওয়াইতেন এবং নিজেও খাইতেন।

একদিন সেই বনে একদল ভিল আসিয়া মৃগয়া সুরু করিল। তাহারা চারিদিকে ছুটোছুটি করিতে লাগিল, প্রাণীর পর প্রাণী-বধ করিতে লাগিল। সারাদিন এইভাবে মৃগয়া করিয়া তাহারা ভারে ভারে মাংস বহিয়া আনিল। কিন্তু এক বৃদ্ধ শবরের ভাগ্যে সেদিন কোন মাংসই জোটে নাই। তখন সন্ধ্যা। সে ক্ষুধার্ত হইয়া একবার রোহিনী-গাছটির দিকে তাকাইল। তাহার পর গাছে উঠিয়া সে শুক ও অন্যান্য পাখী নীড় হইতে টানিয়া বাহির করিয়া তাহাদের মারিয়া ফেলিয়া গাছের তলায় ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল। সে যেন যমদূত। তাহাকে দেখিয়া ভয়ে আমি পিতার পক্ষপুটের মধ্যে লুকাইলাম। কিন্তু সে আমাদের ছাড়িল না। পিতাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার গলাটা মটকাইয়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিল। আমিও পিতার সহিত মাটিতে পড়িলাম। পিতার ডানা হইতে বাহির হইয়া একরাশ পাতার মধ্যে লুকাইলাম। সেই বৃদ্ধ শবর গাছ হইতে নামিল। আগুন জ্বালিল এবং মরা পাখীগুলির কতক আগুনে পোড়াইয়া খাইল, আর কতক লইয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমার ভয় কমিল বটে, কিন্তু দুঃখে যেন পুড়িতে লাগিলাম। এইভাবে রাত্রি কাটিল। আসিল প্রভাত। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। পড়িতে পড়িতে চলিলাম নিকটবর্তী এক পদ্মসরোবরের দিকে। এই সময়ে মরীচি নামে এক মুনি স্নান সারিয়া ঐ পথে ফিরিতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া আমার-মুখে ফোটা ফোটা জল দিতে লাগিলেন। আমি বাঁচিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে পত্রপুটে করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেই আশ্রমের যিনি কুলপতি, তাঁহার নাম পুলস্ত্য। তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিলেন। অন্য মুনিগণ ইহাতে কৌতূহলী হইয়া তাহাকে ধরিয়া বসিলে তিনি বলিলেন, "এই শুক শাপগ্রস্ত। আমি ইহাকে দেখিয়া দুঃখে হাসিয়াছি। আহ্নিক শেষ করিয়া তোমাদের ইহার কথা বলিব। আমার কথা শুনিয়া এ নিজের পূর্বকথা স্মরণ করিবে।" আহ্নিক শেষে পুলস্ত্য বলিতে লাগিলেন—

"রত্নাকর নামে এক নগর। সেখানকার রাজা জ্যোতিষ্প্রভ। মহারানী হর্ষবতী, মন্ত্রী প্রভাকর। প্রভাকরের পুত্রের নাম প্রিয়ঙ্কর। রাজা ছিলেন শিবভক্ত। রাণী স্বপ্নে দেখিলেন যে সোম তাহার মুখে প্রবেশ করিয়াছে। রাণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এসব মহাদেবের বরে। রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন—'সোমপ্রভ'। জ্যোতিষ্প্রভ উপযুক্ত কালে সোমপ্রভকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সোমপ্রভ রাজা হইলে তাঁহার মন্ত্রী হইলেন প্রিয়ঙ্কর।

স্বর্গ হইতে একদিন মাতলি একটি অশ্ব লইয়া সোমপ্রভের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনি ইন্দ্রের সখা বিদ্যাধর। এখন মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্র পূর্বের সখ্য স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুত্র আশুশ্রবা নামক এই অশ্বটিকে আপনাকে উপহার দিয়াছেন। এই অশ্বে উঠিয়া আপনি শত্রুদের অজেয় হউন।" সোমপ্রভের সুখে দিন কাটিতে লাগিল। তিনি পিতার অনুমতি লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িলেন। আশুশ্রবায় আরোহন করিয়া সৈন্যবাহিনী লইয়া সোমপ্রভ নানা দেশ জয় করিয়া হিমালয়ের নিকটে আসিয়া সৈন্যগণকে বিশ্রামের অবসর দিলেন।

এমনি সময়ে একদিন মৃগয়ায় বাহির হইয়া সোমপ্রভের চোখে পড়িল একটি কিন্নর। কিন্নরটিকে ধরিবার জন্য সোমপ্রভ আশুশ্রবাকে দ্রুত ছুটাইয়া দিলেন। কিন্নরটিও প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে এক গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইল। সোমপ্রভ অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। সূর্য তখন পাটে বসিয়াছে। সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রান্তদেহে চলিতে চলিতে সোমপ্রভ একটি বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন। অশ্ব হইতে নামিয়া আশুশ্রবাকে তৃণোদক খাওয়াইতেছেন, এমন সময় শুনিলেন গীতধ্বনি। সেই গীতধ্বনির অনুসরণ করিতে করিতে সোমপ্রভ দেখিতে পাইলেন এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া একটি দিব্যকন্যা গান গাহিতেছেন। বিস্মিত হইলেন সোমপ্রভ। দিব্যকন্যাও সোমপ্রভের উদার আকৃতি দেখিয়া তাহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। দিব্যকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া এই দুর্গম স্থানে আসিলেন?" সোমপ্রভ সব কথা খুলিয়া বলিলেন, তাহার পর সাহসে ভর করিয়া সোমপ্রভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? একাকিনী বা কেন এই অরণ্যে বাস করিতেছেন?" দিব্যকন্যা তখন অশ্রুসজল নয়নে ও বাষ্পমন্থর কণ্ঠে আপন কাহিনী বলিতে লাগিলেন।

"হিমাদ্রিকটকে কাঞ্চনমাভ নামে বিদ্যাধর-নগর। সেখানকার রাজা পদ্মকূট। রাণী হেমপ্রভাদেবী। আমি তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। আমার নাম মনোরথ-প্রভা। বিদ্যাশিক্ষায় আমার অনুরাগ ছিল। দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সখীদের সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আশ্রমে, দ্বীপে, বনে, উপবনে, শৈলশিখরে ঘুরিয়া পিতার আহারের সময় বাড়ী ফিরিতাম। একদা সরোবরের তীরে বিচরণকালে এক সবান্ধব মুনিকুমারকে সরোবরের তীরে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহাদের কাছে যাইয়া বসিলে আমার সহচরী আমাদের

দুইজনের মনের কথা বুঝিয়া তাঁহার বন্ধুকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "দীধিতি নামক মুনি ইহার পিতা। মাতা দেবী শ্রী। শ্রীর মানসজন্মা ইনি। দীধিতিকে পুত্র উপহার দিয়া লক্ষ্মী অন্তর্ধান করেন। দীধিতি পুত্রের নামকরণ করেন—'রশ্মিমান্'। আমার পরিচয়ও তাঁহারা জানিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ জমিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল। অপর এক সহচরী আমাকে মনে করাইয়া দিল পিতার আহারের সময় হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিলাম। আহার-শেষে আমার সখী আমাকে গোপনে বলিল, "মুনিকুমারের বন্ধু আঙিনার দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন। বোধ হয়, আপনাকে কিছু বলিতে চাহেন। তিনি বলিতেছেন, রশ্মিমান্ অনঙ্গপীড়িত। তাই বন্ধুকে ব্যোম-গমনী বিদ্যাবলে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনার বিরহে তাঁহার অবস্থা সংকটজনক।" আমি এই কথা শুনিয়া রশ্মিমানের সঙ্গে সঙ্গেই সরোবরে ছুটিলাম। যাইয়া দেখি চন্দ্রোদয়ে আমার বিরহ অসহ্য হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমি অনেক কান্নাকাটি করিলাম। তাঁহার মৃতদেহ লইয়া যখন চিতায় উঠিতেছি, তখন আকাশ হইতে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আসিয়া রশ্মিমানের শবদেহ তুলিয়া লইয়া আকাশে উঠিলেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক্। আকাশবাণী হইল—"মনোরথপ্রভা, এমন কাজ করিও না। মুনিকুমারের সহিত যথা সময়ে তোমার মিলন হইবে।" সেই সময় হইতে আশায় বুক বাঁধিয়া শঙ্করের পূজায় কাল কাটাইতেছি। মুনিকুমারের বন্ধুও যে কোথায় আছেন, তাহাও জানিনা।"

বিদ্যাধরীর মুখে এই ঘটনা শুনিয়া সোমপ্রভ তাহার সহচরী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্যাধরী বলিতে লাগিলেন—

"সিংহবিক্রম নামক এক বিদ্যাধররাজের কন্যা মকরন্দিকা। সে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়; সে আমার সখী। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া সমস্ত কথা জানিবার জন্য সে তাহার এক সহচরীকে আমার কাছে পাঠায়। আমিও আমার সহচরীকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি।" এমনি সময়ে মনোরথপ্রভার সহচরী আকাশপথে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই রাত্রি সোমপ্রভ আশ্রমে কাটাইল। পরদিন সকালে আকাশপথে দেবজয় নামে এক বিদ্যাধর আসিয়া মনোরথপ্রভাকে জানাইল যে তাঁহার অভীষ্ট ফললাভ না হওয়া পর্যন্ত মকরন্দিকা বিবাহ করিতে রাজী হইতেছে না। মনোরথপ্রভা নিজে আসিয়া বলিলে মকরন্দিকা রাজী হইতে পারে বলিয়া মহারাজ সিংহবিক্রম মনোরথপ্রভাকে মকরন্দিকার কাছে যাইতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সোমপ্রভ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। বিদ্যাধরলোক দেখিবার বাসনা হইল। তিনি মনোরথপ্রভাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আশুশ্রবা এই আশ্রমেই তৃণজল খাইয়া থাকিতে পারিবে।" সকলেই বিদ্যাধর-লোকে যাত্রা করিলেন। অতিথিসৎকার করিয়া মকরন্দিকা মনোরথপ্রভাকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" মনোরথপ্রভা সোমপ্রভের পরিচয় দিলেন। ইহার পরেই দেখা গেল মকরন্দিকা সোমপ্রভের রূপমুগ্ধ। সোমপ্রভও মকরন্দিকার প্রতি আকৃষ্ট। তাহার পর দুই সখীতে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। মনোরথপ্রভা—"তুমি কেন বিবাহ করিতে অমত করিতেছ?" মকরন্দিকা—"তুমি বিবাহ না করিলে কেমন করিয়া বিবাহ করিব!" মনোরথপ্রভা—"তুমি কি জান না, আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কেবল স্বামীর সহিত মিলন এখনও হয় নাই। আমি তাহারই প্রতীক্ষায় আছি।" মকরন্দিকা—"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমি তোমার কথা রাখিব।" তাহার পর মনোরথপ্রভা মকরন্দিকার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন—"সখি! এই সোমপ্রভ দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে তোমার অতিথি হইয়াছেন, তুমি ইঁহার উপযুক্ত অতিথি সৎকার কর।" মকরন্দিকা—"সখি! আর বেশী কী বলিব। আমার এই দেহটি ইঁহাকে অর্ঘ্য দিতে চাই।" ইহার পর মনোরথপ্রভা মকরন্দিকার পিতার সহিত কথা কহিয়া উভয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সোমপ্রভ হৃষ্টচিত্তে মনোরথপ্রভাকে কহিলেন—"দেবি! আপাততঃ আমাকে আপনার আশ্রমে যাইতে হইবে। আমার সৈন্যেরা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হয়তো আপনার আশ্রম পর্যন্ত আসিতে পারে। সেখানে আসিয়াও যদি আমার কোন সন্ধান না পায়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন অশুভ হইয়াছে মনে করিয়া ফিরিয়া যাইতে পারে। অতএব আমাকে যাইতে অনুমতি দিন। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যতশীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব। ফিরিয়া আসিয়াই শুভলগ্নে মকরন্দিকাকে বিবাহ করিব।"

মনোরথপ্রভা রাজী হইলেন। দেবরাজ নামক এক গন্ধর্বকে ডাকিলেন। সোমপ্রভ দেবরাজের অঙ্কে উঠিয়া মনোরথপ্রভার আশ্রমে যাইয়া পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে সোমপ্রভের মন্ত্রী কুমারের অনুসন্ধান করিতে করিতে মনোরথ-প্রভার আশ্রমে আসিয়া উঠিয়াছেন। রাজকুমার মন্ত্রীকে সব ঘটনা বলিলেন। এই সময়ে রাজদূত মহারাজের পত্র লইয়া কুমারের নিকট উপস্থিত হইল। মহারাজ কুমারকে রাজধানীতে অবিলম্বে ফিরিতে লিখিয়াছেন। রাজকুমার মন্ত্রীদের নিকট হইতে

বিদায় লইয়া পিতৃ-উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রার পূর্বে দেবরাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমাকে অবিলম্বে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যতশীঘ্র পারি আমি ফিরিয়া আসিব।" দেবরাজ গন্ধর্বনগরীতে ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইলে মকরন্দিকা সোমপ্রভের বিরহে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সকল কিছুর প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন ; উদ্যানভ্রমণ, সখীসঙ্গ, সঙ্গীত, বসন-ভূষণ সব ত্যাগ করিলেন। আহার পর্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একেবারে উন্মাদিনী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পিতামাতা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন, অনেক সান্ত্বনা, অনেক প্রবোধ দিলেন। কিন্তু কিছুতেই মকরন্দিকা বাগ মানিল না। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—"পাপীয়সী ! নিষাদী হইয়া অতিঘৃণ্য নিষাদ-সমাজে বাস কর। তোর দেহান্তর হইবে না কিন্তু স্বজাতি-স্মৃতি লোপ পাইবে।" মকরন্দিকা নিষাদভবনে পতিত হইলেন। পিতা-মাতা ও কন্যাশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। সিংহবিক্রম পূর্বজন্মে ছিলেন একজন সর্বশাস্ত্রবিদ্ ঋষি। প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে এখন জন্ম হইল শুকযোনিতে। পত্নীর জন্ম হইল শূকরযোনিতে। শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইঁহার শাস্ত্রস্মৃতি লোপ পায় নাই। বৎসগণ ! আমি ইহার কর্মফল দেখিয়াই হাসিয়াছি। এই শুকই একদিন রাজসভায় আত্মকাহিনী বলিয়া মুক্তি পাইবে এবং সোমপ্রভও অভিশাপমুক্ত মকরন্দিকাকে পত্নীরূপে লাভ করিবে। রশ্মিমান এখন রাজা। ঐ সময়ে রশ্মিমানের সহিত মনোরথপ্রভারও মিলন হইবে। সোমপ্রভ পিতার সহিত দেখা করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া মনোরথপ্রভাকে না দেখিয়া শিবের আরাধনায় মগ্ন হইয়াছেন।" ভগবান্ পুলস্ত্যের কাহিনী শেষ হইলে আমার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। মরীচি মুনিই আমাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। আমার ডানা উঠিল। অল্প অল্প উড়িতে শিখিলাম। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধের হাতে পড়িলাম। আজ আমার দুষ্কর্মের ফলভোগ শেষ হইল। এখন আমি মুক্ত।"

সভার মধ্যে এই কথা বলিতে বলিতে শুকের দেহত্যাগ হইল। এই সময় মহাদেব সোমপ্রভকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন—বৎস ! তুমি রাজা সুমনার নিকট গমন কর। সেখানেই তুমি মকরন্দিকাকে পাইবে, পিতৃশাপে মকরন্দিকা ব্যাধকন্যা। তাহার বর্তমান নাম মুক্তালতা। তাহার পিতা শুকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে সেই শুকপাখী লইয়া মহরাজ সুমনার নিকট গিয়াছে। তুমি সেখানে যাও। তোমাকে দেখিবামাত্র তাহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। মহাদেব মনোরথ-প্রভাকেও স্বপ্নে বলিলেন—রশ্মিমান এখন রাজা সুমনা। তুমি তাহার নিকট

যাও। রাজা সভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তোমাকে দেখিয়া তাহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। সোমপ্রভ ও মনোরথপ্রভা এইভাবে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সুমনার রাজদরবারে যাইয়া উঠিলেন। মুক্তালতার পূর্বস্মৃতি ফিরিল। মনোরথপ্রভাকে দেখিয়া পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া আসায় সুমনারও মৃত্যু ঘটিল। তিনি রশ্মিমানের মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া উঠিলেন। সোমপ্রভ মকরন্দিকাকে, রশ্মিমান মনোরথ-প্রভাকে লাভ করিয়া সুখী হইলেন।

এই কাহিনী শুধু সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগরে' নয়, ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরীতে'ও আছে। কাদম্বরী-কাহিনীর সহিত সাদৃশ্য থাকায় ঐ দুইখানি কাশ্মিরী গ্রন্থের নজিরে আমাদের দেশের সংস্কৃত কাব্য-পাঠকেরা ধরিয়া লইয়াছেন যে বাণ কাদম্বরীর কাহিনীটি উক্ত দুইখানি গ্রন্থের অন্তর্গত রাজা সুমনার কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এমত এতাবৎকাল বজায় আছে। প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা কঠিন কিন্তু তবুও ভাবিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে।

'কথাসরিৎ-সাগর' ও 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী'—এই দুইখানি গ্রন্থের উৎস গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা'। 'কথা-সরিৎ-সাগরে'র রচনাকাল ১০৬৩-১০৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী'র রচনাকাল 'কথা-সরিৎ-সাগর'-রচনার পঁচিশ বৎসর পূর্বে। কোনো সময়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে কাশ্মীরের গ্রন্থ দুইখানি বুঝি মূল বৃহৎকথার অনুবর্তী কিন্তু ইহাদের তুলনামূলক আলোচনায় এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত এবং নেপালে প্রাপ্ত বুধস্বামীর 'বৃহৎকথা-শ্লোক-সংগ্রহে'র রূপ হইতে এ ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

'বৃহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহ' গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। ইহার তারিখ ঠিক জানা যায় না, কিন্তু এইরূপ ধারণা করিয়া লওয়া হইয়াছে যে গ্রন্থখানি অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রচিত। Locate-এর মতে বুধস্বামীর আবির্ভাবকাল ৫ম-৬ষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ। কাশ্মীরী ও নেপালী গ্রন্থের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিলই বেশী এবং তাহাদের পার্থক্যের পরিমাণ হইতে মনে হয় উভয়শ্রেণীর গ্রন্থের পশ্চাতে পৃথক্ পৃথক্ কিংবদন্তী ছিল। কাশ্মীরী গ্রন্থ-দুইখানিতে যে অতিরিক্ত গল্পগুলি দেখা যায়, বুধস্বামী সেগুলি বাদ দিলেন কেন? ইহার দুইটি উত্তর হইতে পারে। হয় মূল বৃহৎ কথায় এগুলি ছিল না, অথবা গল্পরসের পরিবেশনের সার্থকতার উদ্দেশ্যে তিনি এগুলি বাদ দিয়াছেন। মনে হয়, কাশ্মীরী গ্রন্থে গল্পগুলির যে বাহুল্য দেখা যায়, মূলে হয়তো তাহা ছিল না। এইজন্যই বোধহয় বুধস্বামীর গ্রন্থখানির এত সুনাম। ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব অপেক্ষা বুধস্বামী যে বিশেষ শ্রদ্ধাভরে মূলের

অনুবর্তন করিয়াছেন, পণ্ডিতমহলে এরূপ ধারণা প্রচলিত। Keith মনে করেন—'The nepalese version, on the otherhand, seems to have adhered more closely to the original and to derive from it." ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব কাশ্মীরে প্রাপ্ত রূপটির উপরেই রঙ্ ফলাইয়াছেন, উহা মূলের যথাযথ অনুবর্তন নয়। মোটের উপর দুইটি দেশের সঙ্কলিত রূপের তুলনামূলক আলোচনা হইতে একথা বোঝা যায় যে, কোন গ্রন্থই মূল বৃহৎকথার আক্ষরিক অনুবাদ বা সারবস্তুর বিশ্বাস্য পুনর্বিন্যাস নয়। এইটুকুমাত্র বলা যায় যে মূল বৃহৎকথার মধ্যে গল্প ও কথারস-পরিবেশনের যে নীতিটি ছিল, তাহারই নিরিখে হয়তো পরবর্তীকালে গল্পগুলির সংখ্যা বাড়িয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলিতে চাই যে রাজা সুমনার কাহিনী কাশ্মীরী রূপ অর্থাৎ 'কথা-সরিৎ-সাগর' এবং 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী'র মধ্যেই আছে, নেপালী রূপ অর্থাৎ 'বৃহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহে'র মধ্যে নাই। আবার কাশ্মীরী ও নেপালী রূপ যদি বৃহৎকথার আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাব-অনুবাদ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুমনার কাহিনী যে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার মধ্যে ছিল, তাহারো কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কাশ্মীরী রূপ-দুইখানির মধ্যে প্রাপ্ত কাহিনীটি বাণপূর্বকালের নয়, উহা একাদশ শতকের। পূর্বেরই যদি না হইল, তবে বাণ যে একাদশ শতকের কাহিনী লইয়া সপ্তম শতকে বসিয়া কাদম্বরীর কাহিনী রচনা করিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। এমনও হইতে পারে যে বাণ ও কাশ্মীরী কবিদ্বয় একই উৎস হইতে গল্পটি লইয়াছেন। লোকপ্রিয় গ্রাম্যকবির অনেক কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে অথচ কোনো প্রসিদ্ধ কবির রচনায় তাহা স্থান পায় নাই। আলোচ্য-মান কাহিনীটি যদি সেই জাতের হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি! বাণ যখন পূর্ববর্তী এবং ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেব যখন অনেক পরবর্তী, তখন তাঁহারা যে বাণের কাহিনীটির সামান্য রূপান্তর ঘটাইয়া তাহাকে লোক-কথার রূপকথার ফ্রেমে আঁটিয়া অকাব্যিক হাল্কা হাতের ছাপ মাখাইয়া গুণাঢ্যের গল্প বলিয়া চালাইয়া দেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে! 'কথা-সরিৎ-সাগর' ও 'বৃহৎ-কথা-মঞ্জরী'র কাহিনীটি যদি নিঃসন্দেহে গুণাঢ্যের বলিয়া প্রমাণ করা না যায়, তাহা হইলে এই সকল তর্ক ওঠাই স্বাভাবিক। আমরা শুধু তর্ক তুলিতেছি, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার সুধী সমালোচকের উপর ছাড়িয়া দিলাম।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বাণ কাশ্মীরী গ্রন্থ-দুইখানি হইতে কাদম্বরী কাহিনীর কাঠামোটি লইয়াছেন, তাহাতেও বাণের পক্ষে লজ্জার কিছু নাই। কাঠ, খড়, মাটি ও রঙ্ লইয়া আমরা দেবী-প্রতিমা রচনা করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিয়া তাহাকে সচন্দন-পুষ্প-বিল্বপত্রে পূজা করিয়া থাকি; 'মা—মা—মাগো!' বলিয়া ডাকিয়া সাশ্রুনেত্রে তাঁহার নিকট কত দুঃখকষ্টের কথাই না জানাই, কল্যাণ, শ্রী, রূপ, জয় ও যশ চাহিয়া লই, শত্রুনিপাতের মানত করি। তাঁহার আগমনে আমাদের আনন্দ আর ধরে না, তাঁহার বিদায়ে আমাদের সকল আনন্দ বিষাদে ভাঙিয়া পড়ে, আমাদের ঘরের সকল আলো নিভিয়া যায় এবং শারদীয় প্রভাতের শিশিরভেজা বিকচ কুসুমের বর্ণ-প্রোজ্জল অসংখ্য মালা শুকাইয়া ঝরিয়া মাটির ধুলায় লুটাইয়া পড়ে; আমাদের আগমনী গান বিজয়ার কান্নায় প্রলাপ বকিতে থাকে। কাঠ, খড়, মাটি ও রঙ লইয়া দেশব্যাপী জীবন-যোগের যদি এমনি হাসি-কান্নার লীলা চলিতে পারে, তাহা হইলে কাদম্বরী-কাহিনীর কাঠামোটি কাশ্মারী হইলেই বা ক্ষতি কি! কাশ্মীরী কাহিনীটি কাদম্বরী-কাহিনীর তুলনায় কাঠ, খড়, মাটি ও রঙ্। ইহার বেশী কিছু নয়। ইহাতে জীবন নাই, আছে অচেতনের জড়তা। বাণ ইহার মধ্যেই জীবন-সঞ্চার করিয়া আমাদের হাসিকান্নার খোরাক জুটাইয়াছেন। সুমনার কাহিনী নিছক রূপকথার কাহিনী। উহা শিশুমনের বিস্ময়ে ভরা। উহাতে চিত্তবৃত্তির গন্ধ নাই। শিল্প নাই, ভাব নাই, সৌন্দর্য নাই। অস্থিপঞ্জর ও মানবদেহের মধ্যে যে পার্থক্য, কাশ্মীরী রূপের গল্পের সহিত কাদম্বরী-গল্পের সেই পার্থক্য। উহাতে লোক-কথার বৈশিষ্ট্য। অতিপ্রাকৃতের অসংযত পরিবেশন। উহাতে মাতলি দেবরাজের নিকট হইতে আশুশ্রবাকে লইয়া রাজদরবারে আসিয়া সুমনাকে উপহার দেয়; মনোরথপ্রভার সহচরী ও বিদ্যাধর দেবজয় আকাশ-পথেই চলাফেরা করে; সোমপ্রভ দেবরাজের অঙ্কে উঠিয়া মনোরথপ্রভার আশ্রমে যাইয়া অবতরণ করে। উহাতে যে অভিশাপ ও পুনর্জন্ম আছে, তাহাও শ্রদ্ধেয় নয়। কন্যার প্রিয়-বিরহের পাগলামির জন্য পিতামাতা তাহাকে অভিশাপ দিলেন। সে-অভিশাপে তাহার দেহান্তর হইল না। সে সোজা নিষাদ-ভবনে যাইয়া মুক্তালতা নাম লইয়া নিষাদকন্যা হইয়া উঠিল। কন্যাশোকে পিতামাতার হইল প্রাণ-বিয়োগ। তাঁহাদের যে জন্মান্তর হইল, তাহা অতি কদর্য নীচ যোনিতে। ইহার জন্য কোন কারণেরও প্রয়োজন হইল না। পিতা জন্ম লইলেন শুকযোনিতে, মাতা শূকরযোনিতে। কী অধঃপতন। তাহার পর বিমর্শ সন্ধির মধ্য দিয়া ঘটনা যেভাবে উপসংহারে যাইয়া

উঠিয়াছে. তাহাতে মনে হয়, এ-যেন কোন প্রকারে গোজামিল দিয়া অঙ্ক মিলান। অবশ্য একথা বলি না যে কাদম্বরীতে অতিপ্রাকৃত নাই। আছে, তবে তাহাতে অত বাড়াবাড়ি নাই। কথাকাব্যে অতিপ্রাকৃত থাকিবেই কারণ কথাকাব্য যে লোক-কথা-ভিত্তিক। কিন্তু তাহার একটা সংযম থাকা চাই। পুনর্জন্ম ও অভিশাপ কাদম্বরীতে থাকিবেই কিন্তু তাহাদের সংঘটনার মধ্যে শৈ'ল্পক স্পর্শ আছে, কার্য-কারণের ঔচিত্য আছে। তাই বলিতেছিলাম, মানুষের কঙ্কাল ও রক্তমাংসে গড়া জীবিত মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য, কাহিনী দুইটির মধ্যে সেই পার্থক্য। চিত্তবৃত্তির আলিম্পনে, কল্পনার ঐশ্বর্যে, ভাষার ইন্দ্রজালে, চরিত্র-নিবিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, ঘটনার কৌশলী গ্রন্থি-বন্ধনে বাণের কাহিনী যুগোপযোগী সার্থক কাহিনী। পরিবেশ-রচনায় বাণ সিদ্ধহস্ত। সাধারণ মানুষকে লৌকিক জটিলতার উর্ধ্বে তুলিয়া তাহার ভাব-সংবেদনার কারুকার্যময় উজ্জ্বল চিত্র আঁকিতে বাণের জোড়া নাই। বিশেষ করিয়া বিমর্শসন্ধিতে ভূষণ ঘটনার যে উপসংহার টানিয়াছেন, তাহার নাট্যকল্পতায় ও জীবনবোধে যে চমৎকারিত্ব ও ঔচিত্য দেখা দিয়াছে, তাহার দ্বারা কাশ্মীরী কাহিনীকে অনেক পিছনে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথার্থ শিল্পীর পরিচয় জীবন-সংবেদনার রূপায়নে। তাই কাদম্বরী-কাহিনী ভারতবর্ষীয় রসিকচিত্তে আজও বাঁচিয়া আছে; কাশ্মীরী কাহিনীকে আমরা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি মাত্র।

কাশ্মীরীয় কাহিনী ও কাদম্বরী-কাহিনীর সৌসাদৃশ্যের স্থান ও নামের পার্থক্য

কাশ্মীরীয় কাহিনী	কাদম্বরী-কাহিনী
কাঞ্চনপুরী	বিদিশা
সুমনা	শূদ্রক
মুক্তালতা	চণ্ডালদারিকা
শাস্ত্রজ্ঞ	বৈশম্পায়ন
হিমালয়ে রোহিনীবৃক্ষ	বিন্ধ্যাটবীতে শাল্মলীবৃক্ষ
মরীচি	হারিত
পৌলস্ত্য	জাবালি
রত্নাকর	উজ্জয়িনী
জ্যোতিষ্প্রভ	তারাপীড়
হর্ষবতী	বিলাসবতী
সোমপ্রভ	চন্দ্রাপীড়
প্রভাকর	শুকনাস
প্রিয়ঙ্কর	বৈশম্পায়ন
আশুশ্রবা	ইন্দ্রায়ুধ
পদ্মকূট	হংস
হেমপ্রভা	গৌরী
মনোরথপ্রভা	মহাশ্বেতা
দীধিতিমান	শ্বেতকেতু
রশ্মিবান্	পুণ্ডরীক
সিংহবিক্রম (বিদ্যাধররাজ)	চিত্ররথ (গন্ধর্বরাজ)
মকরন্দিকা	কাদম্বরী
দেবজয়	কেয়ূরক
সিংহবিক্রম-শুক	পুণ্ডরীক-বৈশম্পায়ন-শুক
রশ্মিবান্-সুমনা	চন্দ্রাপীড়-শূদ্রক

ঘটনা-বিন্যাস

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায় পর্যন্ত সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়া ঘুমন্ত রাজকুমারীর দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন রাজকুমারীর মাথার নিকট হইতে সোনার কাঠিটি কুড়াইয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার পালা। বাণভট্ট যাঁহাদের জন্য কাদম্বরী রচনা করিলেন, সেই ভারতীয় পাঠকগোষ্ঠীর অখণ্ড মানসচেতনা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছি; বিশ্লেষণ করিয়াছি কবি-চেতনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি, তাঁহার বাস্তববোধ, তাঁহার অনুভূতির ঐশ্বর্য, তাঁহার শিল্পবোধ এবং সর্বোপরি তাঁহার উন্মেষশালিনী প্রতিভা। পাঠকচিত্ত ও কবি-প্রতিভাকে পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনার উদ্দেশ্য—সহৃদয়ের সহিত কবির সাজাত্য। একই সভ্যতা, একই সংস্কৃতি, একই প্রতিভা, একই কবিত্বশক্তি না থাকিলে সহৃদয়ত্ব হয়না[১]। কবি এই সহৃদয়ের মুখ চাহিয়া কাব্য-রচনা করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের উপর নাগরকের ছিল অখণ্ড প্রভাব। এখন বলিতে চাই, এই নাগরকদের ডিঙাইয়া যাঁহারা কাব্য-শিল্পের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন—কবির নিকট কাব্যের আদর্শানুগত বিশিষ্ট রূপের দাবি জানাইয়াছেন, যাঁহারা বলিয়াছেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর', তাহারা 'সহৃদয়।' এই সহৃদয়ত্ব কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের জন্যই প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তাহা নহে, ইংরেজী সাহিত্যের উন্মেষের পশ্চাতেও একশ্রেণীর কাব্য-সমঝদার ছিলেন, তাঁহাদের বলা হইত Connoisseur[২]। বঙ্কিম বলিয়াছেন, "রচনা কাহার

(১) "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভব স্ততঃ।"—ভট্টতোতঃ।

(২) (ক) "Connoisseur, has to rise to the level of the artist and to be one with him spiritually, if he is to be able to reproduce artistic vision in himself. In aesthetic experience Connoisseur and artist are spiritually identified. The reproductive activity presupposes also the identity of psychological conditions of the Connoisseur with those of the artist." W. Æ. pp. 509—510

(খ) "The critic may be a small genius, the artist a great one ; the former may have the strength of ten, the latter of a hundred ; the former in order to reach a certain height will have need of the assistance of the other ; but the nature of both must remain the same. To judge Dante, we must raise ourselves to his level . let it be well understood that empirically we are not Dante, nor Dante we ; but in that moment of contemplation and judgement, our spirit is one with that of the poet, and in that moment we and he are one thing. In this identity alone resides the posibility that our little souls can echo great souls and grow great with them in the universality of the spirit." Æ. page—121

জন্য ? যে পড়িবে, তাহার জন্য।" অতএব সমঝদার পাঠকের মুখ চাহিয়া কবিকে কাব্য রচনা করিতে হয়। ইহা চিরকালের প্রথা। যেমন সেকালের, তেমনি একালের। বাণভট্টকেও তাহাই করিতে হইয়াছিল। এখন বক্তব্য, পাঠকের মুখাপেক্ষী এই যে রচনা, এই রচনাও পাঠকের রুচির দাবির দ্বারা প্রভাবিত। কথাটা খুলিয়া বলি, পাঠকের রসচেতনার যেমন মানসিক স্তরগুলি—যেমন তাহার অখণ্ড জীবনবোধ ও কাব্যবোধ, যেমন তাঁহার জ্ঞান ও সংস্কার, বিশ্বাস ও গোঁড়ামি, তেমনি কবিরও। কবি নূতনত্বের অভিযানে যতই না তাঁহার পাঠকবর্গকে দূরে রোমাঞ্চনের বিস্ময়লোকে লইয়া ফেলুন না কেন, তাঁহার সব সময়ই নজর রাখিতে হয় পাঠকের মানসিক সংস্কারের উপর। অবশ্য কবিরাও যে নূতন করিয়া পাঠকবর্গের সৃষ্টি করেন, পাঠকের চেতনায় নূতন চেতনার ঢেউ, নূতন বিস্ময়ের আকুঞ্চিত কম্পন, নূতন রুচির রক্তিম প্রভাত, নূতন সংবেদনার কারুকার্যময় বেদন আনিয়া ফেলেন, তাহা স্বীকার করি। ধাবক-সোমিল্লের পর কালিদাসকেও নূতন যুগের নূতন ডালিতে নূতন মধুপর্ক, নূতন বসন্তের নবমল্লিকার নূতন মদিরা সাজাইয়া আনিয়া পাঠকের দ্বারে আসিয়া কড়া নাড়িয়া বলিতে হইয়াছে—"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।" আমাদের বক্তব্য, এই নূতন চেতনা কবি পান কোথা হইতে ? যুগের নব চেতনার নব বসন্তের হাওয়া হইতে। যে নূতন বসন্তের হাওয়া পাঠকের মনের উপর নাতিশীতোষ্ণ চুম্বন আঁকিয়া চলিয়া যায়, যাহার গোলাপীঅধর পাঠকের ঘুমন্ত নয়নের নিমীলিত পাতার উপর জাগরণের মৃদু চাপ দেয়, তাহার কোন রূপ নাই, বিশেষ আকৃতি নাই। সে কেবল একটু শিহরণ ; সেই শিহরণের গায়ে হয়তো বা বাসনালোকের চন্দনচর্চা, না হয়, অজানিতের পূর্বরাগের রঙখেলার একটু পিচকারীচ্ছটা। এমন রাঙা রঙের পিচকারী কে ছুড়িল, ছুঁড়িয়া কোন চাঁপাগাছের আড়ালে লুকাইল, তাহা কেউ জানিতে পারেনা। কেবল একটু সুগন্ধ শিহরণ, কেবল একটুখানি কম্পিতস্পর্শ পাঠক-চেতনার উপর দিয়া রঙ্ ঢালিয়া গন্ধ বিলাইয়া চমক মেলিয়া চলিয়া যায়। ইহার বেশী কিছু নয়। যুগ-কবির চেতনায় এই নূতন দানা বাঁধে, চোখ-মুখ-নাক-কান লইয়া একটি বিশিষ্ট মূর্তি হইয়া নূতন মদনের মত এই নূতন ভূমিষ্ট হয়। তাই তাহার শুভ জন্ম লইয়া আটকড়াই-ফুটকড়াইয়ের এমনি আনন্দকোলাহল। তাই বলিতেছিলাম, এই নূতন যেমন কবিমনে, তেমনি পাঠকমনে। সহৃদয়কে ছাড়িয়া কবির এক পাও আগাইয়া যাইবার উপায় নাই। যেমন গ্রহজগতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ লইয়া গতির অগ্রগতি, তেমনি কাব্যজগতে কবি-সহৃদয়ের চাওয়া-পাওয়া

লইয়া কাব্যরুচির—কাব্যচেতনার নিত্য নূতন অভিযান। তাই কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে কবির একমাত্র চিন্তা, একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র উপাস্য—সহৃদয়। এই সহৃদয়ের জন্যই কবির ডালায় যেমন প্রাচীন সংস্কারের অশোকগুচ্ছ, তেমনি নবীন-চেতনার নবমল্লিকার মালা। এই দুয়ের সমবায়ে, ঐতিহ্য ও নূতন চিন্তার সমন্বয়ে—কবির কাব্য মাতৃগর্ভজাত শিশুর ন্যায় অখণ্ড মানবচেতনার মাতৃদেহের লাবণ্য-টুকুর, সৌরভটুকুর, আশা-ভালবাসাটুকুর, কামনা-বাসনাটুকুর, খেলা-লীলাটুকুর দোলায় দোল খাইতে থাকে। অতএব কবির কাব্যশিল্পের আলোচনার সময়ে—ঘটনার বিশ্লেষণেও এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঘটনা পাঠকচিত্ত-সম্পর্কশূন্য নয়, পাঠকচেতনা-বহির্ভূত নয়। যাহা ঘটে তাহাই ঘটনা নয়, পাঠকচেতনায় যাহা জন্মে, কবিপ্রতিভার দ্যোতনায় কবিশিল্পের ক্রোড়ে তাহার সুঠাম বহিঃপ্রকাশের নাম ঘটনা।

ঘটনা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে লৌকিক ঘটনার সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাহার অতিরিক্ত কিছু দেখিলেই যেন আমরা চমকাইয়া না উঠি। যখনই কোন আগন্তুক-ব্যাপারকে নূতন বলিয়া মনে করি, তখন 'অনার্যম্ অনার্যম্' বলিয়া চীৎকার না করিয়া আমরা যেন পাঠক-চেতনার দ্বারস্থ হই। তাহা হইলে সবই স্বাভাবিক মনে হইবে, কিছুই অবান্তর মনে হইবে না। অবশ্য জীবনের দাবির মতো কাব্যশিল্পের নিজস্ব একটা দাবি আছে। সে দাবিকেও স্থির করিতে হইবে জীবনদর্শনের নিরিখে অর্থাৎ পাঠক-চেতনায় সংস্কার ও জ্ঞানের—ঐতিহ্যবিলাসী মানসিকতার ও আধুনিক জ্ঞানের ওঠা-নামার মাত্রা-তারতম্যের উপর। শিল্প জীবনের দাবিরই একটা সৌন্দর্য্য-সম্মত রূপবিশেষ।

আধুনিকযুগের উপন্যাসে বাস্তবতার অতিপিনদ্ধ বন্ধন—কার্য-কারণ-সম্পর্কে নিশ্ছিদ্র সূচীবেধ[১]। বাস্তবতার স্মৃতিশাস্ত্রের এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও অবাস্তব

(১) (ক) 'Novel' অবিমিশ্রভাবেই বাস্তব; ইহার মধ্যে কল্পনার ইন্দ্রধনুরাগ সমাবেশের অবসর অত্যন্ত অল্প। ইহার প্রধান কাজ সমসাময়িক সমাজ ও পারিবারিক জীবন-চিত্রণ; সত্যপর্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই ইহার প্রধান গুণ। যতদূর সম্ভব সমস্ত অসাধারণত্বই ইহার বর্জনীয়; কেবল আমাদের জীবন-প্রবাহের মধ্যে যে সমস্ত দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত, যে সমস্ত সংঘাত বিক্ষুব্ধ ও মুখরিত হইয়া ওঠে, সেই রহস্য-মণ্ডিত সত্যগুলির দ্বারাই ইহা অসাধারণত্বের সাময়িক স্পর্শ লাভ করিতে পারে।" বা, সা, উ, পৃঃ ৫৩

(খ) "By this (novel) we mean that, on careful examination of all its details, it shall reveal no gaps or inconsistencies; that its parts shall be arranged with a due sense of balance and proportion; that its incidents shall appear to evolve spontaneously from its data and from one another; that commonplace things shall

অলৌকিকত্ব দেশ ছাড়া হয় না। কল্পনার বাহনে বাস্তবতার জমিনে অলৌকিকত্ব —অতিপ্রাকৃতত্ব রিফিউজি ক্যাম্প খুলিয়া বসিয়া বাস্তবতার সহিত শিল্পের শালিসে একটা বোঝাপড়া করিয়া লয়। সে শালিসে বাস্তবতা পায় সংখ্যা-গরিষ্ঠের পাওনা, অলৌকিকত্ব বা অতিপ্রাকৃতত্ব সংখ্যা-লঘিষ্ঠের। এখানেও দেখা যায় এই অনার্য অলৌকিকত্ব আর্য বাস্তবতার স্বীকৃতি পায়। কেন পায়? পায় পাঠকমনের লাইসেন্সে। বাস্তবতায় বিশ্বাসী ও অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী আধুনিক মন যদি অবশেষে অলৌকিকতার জন্য চার-আনা জমিও ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এই কথাই মনে হয়, মনের দুই ধর্ম—বাস্তবতা ও অলৌকিকত্ব। বাস্তবেব স্তন্যপুষ্ট হইয়া আধুনিক মন যতই বড়াই করুক না কেন, তাহার যমজ ভাই অলৌকিকত্বেব সকল সম্পর্ক সে ছিন্ন করিতে পারে না। কেবল বাস্তবতার মধ্যে জীবনবোধের পূর্ণতা নাই, কেবল অবাস্তবতার মধ্যেও নাই; আছে উহাদের সমন্বয়ে—বাস্তবতা ও অলৌকিকতার সামঞ্জস্যে। যেখানে বাস্তবতার প্রাধান্য, সেখানে বাস্তবতা মুখ্য, অবাস্তবতা গৌণ; যেখানে অবাস্তবতা মুখ্য, সেখানে বাস্তবতা গৌণ। সেকালের মন শিশু-মন, একালের মন ইচড়ে-পাকা। সেকালেব মন অতিরিক্ত স্বপ্ন-বিলাসী, অতিপ্রাকৃতে অতিবিশ্বাসী; একালের মন বাস্তবতার কর্মকোলাহলে জাগ্রত; একেবারে দণ্ডকারণ্যে রামসীতার কুটীরের পাহারায় লক্ষ্মণের মত। তাহার পর কার্য-কারণের সম্পর্ক? সেও উভয়কালের সম্পদ। একালের সাহিত্যে যেমন, ওকালের সাহিত্যেও তেমনি। তবে তাহার চেহারায় কিছু পার্থক্য আছে। সে-পার্থক্যও জীবনচেতনার অনুপাতে। একালের জীবনে ভুল করিলে অনুতাপ হয়, ওকালে ভুলের সূত্রে দেখা দিত অভিশাপ। বুঝিবা কর্তব্যের অবহেলায় উভয়ত্রই দুঃখ ভোগ। একালের বেলায় অনুতাপের কারণকে "ভুল" বলিব, আর ওকালের বেলায় কর্তব্যের অবহেলায় অভিশাপ দেখিয়া বলিব ওকালের চিন্তায় কার্য-কারণ বোধ নাই, ইহা কীরূপ ভদ্রতা, কেমনতর কথা?

তাহা হইলে এখন আসিয়া পড়িল, উপন্যাসের ঘটনা-বিশ্লেষণে একালে-ওকালে কার্য-কারণের সমতা আছে; একালের বাস্তবতা মুখ্য, ওকালের গৌণ; একালের অলৌকিকত্ব অনুপান মাত্র, গৌণ, ওকালের মুখ্য ভেষজ। অতএব চিত্তবৃত্তির

be made significant by the writer's touch upon them; that the march of events, however, unusual shall be so managed as to impress us as orderly and natural in the circumstances; and that the catastrophe, whether foreseen or not, shall satisfy us as the logical product and summing up of all that has gone before. I. S. L. 136-37.

সামগ্রিকতার দিক দিয়া উপন্যাসের ঘটনাবিশ্লেষণকে দেখিতে হইবে। এ্যারিস্টটল বলিতেন, ট্রাজেডিতে চরিত্র থাকুক না থাকুক, এ্যাকশন থাকিবে।[১] পরবর্তী য়ুরোপীয় সাহিত্যে এ্যাকশনের জোয়ারে চরিত্র দানা বাঁধিতে লাগিল—চরিত্র-সৃষ্টির প্রাধান্য দেখা দিল। যাহা ঘটে, তাহাই ঘটনা। ঘটনা নিজে নিজে ঘটিতে পারে না। চরিত্রের আশ্রয়েই ঘটনার ঘটমানতা। তাই ঘটনার সহিত চরিত্র অনেকটা একাত্ম হইয়া উঠিল। একালের ঘটনা বাস্তবাশ্রয়ী। বাস্তবাশ্রয়ী বলিয়া বাস্তব কার্য-কারণ পরম্পরায় অনুসৃাত। ওকালের মানসিকতা স্বপ্ন-বিলাসী বলিয়া অতি-বিশ্বাসী বলিয়া ওকালের ঘটনা মানসিক বিশ্বাস-সংস্কারের কার্য-কারণে আবদ্ধ। একালের ঘটনা স্থূল, ওকালের সূক্ষ্ম। একালের ঘটনার পথ বহির্জগতে; বহির্জগতের আলোড়নে অন্তর্জগতের মথনে; ওকালের ঘটনার পথ অন্তর্জগতে; একালের ঘটনা Objective; ওকালের ঘটনা Subjective-objective. ওকালের ঘটনাই ঘটনার শেষ নয়; উহা স্থায়ী ভাবের উন্মজ্জনের উপায় মাত্র। নায়কের স্থায়িভাবের জাগরণের সমান্তরাল ভাবে পাঠকচিত্তের স্থায়ী ভাবকে জাগান ছিল ওকালের কৌশল। নায়ক-হৃদয়ের সহিত সহৃদয়-হৃদয়ের একাত্মীকরণ—তাদাত্ম্য করণ—ওকালের ঘটনার নিরিখ, ওকালের চিন্তায় রসই মুখ্য, রস পানীয়; পানের জন্য পানপাত্র চাই, নট বা চরিত্র সেই পাত্র।[২] আস্বাদ চরিত্রে নাই, আছে রসিকের চিত্তে। তাই রসাস্বাদনের জন্য কবি, নট ও সহৃদয়—এই তিনের সমান প্রয়োজনীয়তা। তাই বলিতেছিলাম, ওকালের ঘটনার ঐক্য যুগপৎ Subjective ও Objective. Subjective এইজন্য যে আনুষঙ্গিক সকল কার্য স্থায়ীভাব হইতে উৎসারিত। Objective এইজন্য যে ঘটনার সকল কার্য কার্য-কারণ-পরম্পরায় একটিমাত্র পরিণামে উপন্যস্ত। অতএব ঘটনার দিক দিয়া যেমন, চিত্তের স্থায়ী-ভাবের দিক দিয়া তেমনি একই পরিণামবাদ। অতএব সংস্কৃত সাহিত্যের প্লটে দুইটি কাজ—একটি আভ্যন্তরীণ, অপরটি বাহ্য।

সংস্কৃত নাটকে প্লট হইল সন্ধি। সন্ধির অর্থ মিলন—অংশের মিলন অর্থাৎ যেখানে নাটকীয় আখ্যানবস্তু নাটকের লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে অংশে অংশে অগ্রসর হয়। আখ্যানবস্তুর বিন্যাসের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়কে সমান্তরাল

(১) "Besides this, a tragedy is impossible without action, but there may be one without character." P. 231

(২) "নটে তর্হি কিম্। আস্বাদনোপায়ঃ। অতএব চ পাত্রমিত্যুচ্যতে। নহি পাত্রে মদ্যাস্বাদঃ। অপিতু তদুপায়কঃ। তেন প্রমুখমাত্রে নটোপযোগ ইত্যলম্।"

অভিনব ভারতী; ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ পৃঃ ২৯১

রাখিবার জন্য এই মিলনের প্রয়োজন। পঞ্চসন্ধি হইল—(১) মুখ (২) প্রতিমুখ (৩) গর্ভ (৪) বিমর্ষ (৫) উপসংহৃতি। পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্পবিকাশের পাঁচটি স্তর মাত্র। প্রথম স্তরে বা মুখ-সন্ধিতে বীজবপন ও ঘটনার উৎপত্তি; দ্বিতীয় স্তরে বা প্রতিমুখ-সন্ধিতে বিষয়ান্তর সূচনা ও প্রতিকূল অবতারণা; তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ গর্ভসন্ধিতে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ; চতুর্থ স্তরে অর্থাৎ বিমর্শ-সন্ধিতে বিঘ্ন-সমাগম ও অতিক্রম। পঞ্চম স্তরে অর্থাৎ উপসংহৃতিতে পরিণাম।

সন্ধি হইল সমগ্র নাট্যবস্তুগ্রন্থনের অংশবিশেষ। এই অংশটিকে কতকগুলি স্বতন্ত্র কার্য ও ঘটনার মধ্যে আবার ভাগ করা হয়। এই উপভাগগুলিকে বলা হয় সন্ধ্যঙ্গ। এই সকল কার্য ও ঘটনা একটি ক্রমের মধ্যে ধরা দিয়া সন্ধিকে মূর্ত করিয়া তোলে। এই জন্য এই উপভাগগুলিকে সন্ধ্যঙ্গ বলে। সন্ধ্যঙ্গের উদ্দেশ্য হইল কবি ও নটকে যুগপৎ সাহায্য করা। ইহার ফলে, প্রেক্ষকের ঘটনা বুঝিতে সুবিধা হয়। কথাটা সহজ করিয়া বলি। দীর্ঘ ও জটিল একটি বিষয়ের উপস্থাপনায় বিষয়টিকে ভাগ ভাগ করিয়া পরিবেশন করিলে উপস্থাপিত বিষয়ের আবেদন রসিকচিত্তে সহজ হইয়া ওঠে। এই-যে ভাগের ব্যাপার, ইহার ফলশ্রুতি দুইটি; একটি কবি ও নটগত, অপরটি প্রেক্ষকগত। একটি ভাবের প্রযোজনার দিক হইতে, অপরটি প্রেক্ষকের বুঝিবার দিক হইতে। প্লটের দিক হইতে প্লটকে দেওয়া হইল মন্দাক্রান্তা গতি—আস্তে আস্তে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ। প্লটের প্রত্যেকটি ভাগ প্রেক্ষকের কাছে হইয়া ওঠে স্পষ্ট ও কৌতূহলের বিষয় এবং সামগ্রিকভাবে যখন জৈব-সূত্রে ইহারা আবদ্ধ হইয়া ওঠে, তখন তাহারা পরস্পরে, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। ইহারই সুযোগে অতিপরিচিত ঘটনাও উপস্থাপনা-শৈলীর রঙ মাখিয়া প্রেক্ষকের বিস্ময়েরও উদ্রেক করে। এই সন্ধ্যঙ্গগুলির সংখ্যা—৬৪।[১] মুখসন্ধিতে—১২টি, প্রতিমুখে—১৩টি, গর্ভে—১২টি, বিমর্শে—১৩টি এবং নির্বহণে—১৪টি; একুনে ৬৪টি।[১] ইহাদের যথানির্দিষ্ট সংখ্যা

---

(১) (ক) উৎক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনম্ ॥ ৮১ ॥ যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানং বিধানং পরিভাবনা। উদ্ভেদঃ করণং ভেদ এতান্যঙ্গানি বৈ মুখে ॥ ৮২ ॥

(খ) বিলাসঃ প্রতিসর্পশ্চ বিধুতং তাপনং তথা ॥ ৮৭ ॥ নর্ম নর্মদ্যুতি শৈচব তথা প্রগমনং পুনঃ। বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্যাৎ পর্যুপাসনম্ ॥ ৮৮ ॥ পুষ্পং বজ্রমুপন্যাসো বর্ণসংহার ইত্যপি।

(গ) অভূতাহরণং মার্গো রূপোদাহরণে ক্রমঃ ॥ ৯৪ ॥ সংগ্রহশ্চানুমানং চ প্রার্থনা ক্ষিপ্তিরেব চ। ত্রো (তো) টকাধিবলোদ্বেগা গর্ভে স্যু বিদ্রবস্তথা ॥ ৯৪ ॥

যে যথানির্দিষ্ট সন্ধিতেই থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। নাট্যকারের প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন অঙ্গ যে-কোন সন্ধিতে যেমন দেখা দিতে পারে, তেমনি আবার বাদও পড়িতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে, একই সন্ধির মধ্যে একই সন্ধ্যঙ্গ একাধিকবার দেখা দিতে পারে। অবশ্য তিনবারের বেশী ইহার পুনরাবর্তন চলিবে না। আবার এক সন্ধির সন্ধ্যঙ্গগুলি অন্য সন্ধিতে উপস্থাপিত হইতে পারে। অভিনব বলেন, দুইটি সন্ধ্যঙ্গের একই উদ্দেশ্য হইলে দুইটি সন্ধ্যঙ্গকে একটিতে সঙ্কোচিত করিয়া আনা যাইতে পারে।[২]

এই স্তরগুলির অনুগত ৫টি কার্যাবস্থা—আরম্ভ (beginning), যত্ন (effort), প্রাপ্ত্যাশা (height), নিয়তাপ্তি (consequence), ফলাগম (close)। পঞ্চ-সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের সহিত জড়িত আখ্যানবস্তুর পাঁচটি অর্থ-প্রকৃতি—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য। আখ্যানবস্তুর যেখানে নাটকীয় ঘটনার সূচনা, তাহাই বীজ; মূল প্রসঙ্গের সহিত অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোগ-সূত্রের নাম বিন্দু; নাটকীয় আখ্যানবস্তুর ব্যাপক চরিত্র পতাকা। স্থানগত ও সীমাবদ্ধ চরিত্র প্রকরী। সাধনীয় বস্তুর সিদ্ধিতে যাহা সমাপ্ত, তাহাই কার্য। ইহাদের সামগ্রিকতায় সংস্কৃত প্লট। ইংরেজী-সাহিত্যে প্লটের মূল প্রেরণা হইল conflict বা বিরোধ। সংস্কৃতে নায়ক-নায়িকার মিলনের বাধা বা প্রতিকূল অবস্থা। ইংরেজীতে conflict হইতে যেমন নাটকীয় গতি, সংস্কৃতে 'বাধা' হইতে। conflict এর আঘাতে গতির তরঙ্গ যেমন 'একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এই তো নদীর খেলা'—গড়া-ভাঙার মধ্য দিয়া নদী যেমন সাগরে যাইয়া পড়ে, সংস্কৃতেও তেমনি বাধার জোয়ার-ভাটায় মিলন কখনও আগাইয়া চলে, কখনও কূলে আসিয়া ধাক্কা খায়। তবে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য স্থূলত্বে ও সূক্ষ্মত্বে, মাত্রার সিন্ধু ও বিন্দুতে। এ্যাকশন কেবল,

(ঘ) অপবাদোহথ সংফেটো ব্যবসায়ো দ্রবো দ্যুতিঃ। শক্তিঃ প্রসঙ্গঃ খেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনম্ ॥ ১০১ ॥ প্ররোচনা বিমর্শে স্যাদাদানং ছাদনং তথা।

(ঙ) সন্ধির্বিবোধো গ্রথনং নির্ণয়ঃ পরিভাষণম্ ॥ কৃতিঃ প্রসাদ আনন্দঃ সময়োঽপ্যুপগূহনম্। ভাষণং পূর্ববাক্যঞ্চ কাব্যসংহার এব চ ॥ প্রশস্তিরিতিসংহারে জ্ঞেয়ান্যঙ্গানি নামতঃ ॥

সাহিত্য দর্পণঃ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(২) "সন্ধীনাং যানি বৃত্তানীত্যাদি 'শোভামেতি ন সংশয়' ইত্যন্তম্। অর্থভাগরাশিঃ সন্ধি-রিত্যুক্তম্। তত্র সন্ধীনাং সম্বন্ধীনি যানি বৃত্তানি সংবিধানখণ্ডানি। অনুপূর্বশ ইতি, মুখ্যপ্রয়োজন সংপাদনবলোপনতেন ক্রমেণ নতু লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গ-পরিকল্পিতেন। প্রদেশেষাদিমধ্যান্তভাগেষু বর্তনেনাঙ্গানি। কৃত ইত্যাহ স্বস্বাঙ্গিনঃ সন্ধে র্যা সম্পত্তির্নিষ্পত্তিঃ, তত্রগুণবত্বে শেষভাবে যতো যুক্তান্যুচিতানি, সন্ধিসম্পাদকত্বাদঙ্গানীত্যর্থঃ ॥ অভিনব ভারতী; খণ্ড ৩, ৩১

শারীরিক নয়, ইহা মানসিক ও আধ্যাত্মিকও বটে। মানস-বিলাসের বসন্তের হাওয়ায় সংস্কৃত এ্যাকশনে—কেবল ঘটনার রঙ্‌খেলা—আবীর ছড়ানো। শারীরিক উৎসাহ সামান্য, মানসিক উৎসাহই প্রায় সবটা।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ঘটনাবিন্যাসে সন্ধির সহিত সন্ধ্যঙ্গ, কার্যাবস্থা ও অর্থপ্রকৃতির একত্র গ্রথন।

পঞ্চসন্ধি		সন্ধ্যঙ্গ	কার্যাবস্থা	পঞ্চ অর্থ-প্রকৃতি
মুখ	—	১২	আরম্ভ	বীজ
প্রতিমুখ	—	১৩	যত্ন	বিন্দু
গর্ভ	—	১২	প্রাপ্ত্যাশা	পতাকা
বিমর্ষ	—	১৩	নিয়তাপ্তি	প্রকরী
উপসংহৃতি	—	১৪	ফলাগম	কার্য

আধুনিক উপন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির (analytic method) এখানে আরও সূক্ষ্ম বুনানি। অতএব একথা বলা যায় যে, ঘটনার ঐক্যের দিক দিয়া সংস্কৃত-নাটক গ্রীক ও ইংরেজী-নাটককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে কারণ গ্রীক ও ইংরেজীতে মাত্র objective unity আছে।

ইংরেজী নাটকেও ঘটনার পাঁচটি ভাগ—(১) Initial incident—বিরোধের প্রারম্ভিক অবস্থা; (২) Rising action, Growth, Complication—বিরোধের তীব্রতার বৃদ্ধি এবং ফলের অনিশ্চয়তা (৩) Climax, Crisis, Turning Point—বিরোধী শক্তিগুলি মধ্যে একটির মুখ্য-করণ (৪) Falling action, Resolution, De'nouement—জয়ের স্ফুটীভাব (৫) Conclusion, Catastrophe—বিরোধের অবসান।

গ্রীক পরিভাষায় এইগুলির নাম (১) Protasis (২) Epitasis (৩) Peripeteia (৪) Catabasis (৫) Catastrophe।

নাটকে ও উপন্যাসে ঘটনার প্লটরচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। নাটকের প্লটে অতিপিনদ্ধ বন্ধন, উপন্যাসের প্লটে শিথিল বন্ধ। নাটকে সংক্ষিপ্তত্ব ও পরিমিতত্বের ঠাসবুনানির মধ্যে প্লটের চারণভূমি; উপন্যাসে অতো ঠাসাঠাসি, ঠেলাঠেলি নাই। কিন্তু উভয়তঃ ঘটনাবিন্যাসের জন্যই প্লট।

কাদম্বরীর প্লট নাটকীয়। উহার প্রকৃত আরম্ভ অচ্ছোদসরোবরের পটভূমিকায় কপিঞ্জল-পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতার প্রথম সমাগমে। কাদম্বরীর

রস শৃঙ্গার। স্থায়ীভাব বাসনাখ্য রতি। এই রতির প্রথম উন্মেষ পূর্বরাগে[১]—love at the first sight. কপিঞ্জলের মাধ্যমে পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার আলাপ। কোন কুমারী-কন্যার পক্ষে অজ্ঞাত কোন যুবকের সহিত স্বয়ংপ্রণোদিত হইয়া আলাপ প্রগল্‌ভতার লক্ষণ। কিন্তু মহাশ্বেতা প্রগল্‌ভা নন। একে বসন্তকাল ও সদ্যঃ জাগ্রৎ যৌবন, তাহাতে আবার অচ্ছোদের পটভূমির দুষ্টামি। শুধু তাহাই নয়, কুমারীরা ফুল ভালবাসে। সেই পুষ্পপ্রিয় স্বভাবের ঘুমন্ত নীড়ে কুসুম-মঞ্জরীর গন্ধ উষার প্রথম কাকলির মতো ডাক দিয়া উঠিল। মহাশ্বেতার মন কুসুম-মঞ্জরীর অপার্থিব গন্ধে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার মানসিক চাঞ্চল্যের সহিত যোগ দিল, কোথা হইতে এই অপার্থিব গন্ধ ভাসিতেছে, এই অজানাকে জানার কৌতূহল। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাক্ষাৎ ঘটিল ঋষিকুমারদ্বয়ের। ঋষিরা শ্রদ্ধাভাজন, বীতস্পৃহ। তাঁহারা অসঙ্কোচ অভিগমের পাত্র। তাই গন্ধলোভী মহাশ্বেতা-প্রজাপতিটি যদি কুসুম-মঞ্জরীর গন্ধে আকুল হইয়া বিশ্বাসভাজন শ্রদ্ধাভাজন সংসার-বিরক্ত ভাগবত আরাধনায় উৎসর্গীকৃত-জীবন ঋষিকুমারদ্বয়ের একজনের সহিত যাচিয়া আলাপ করিয়া থাকেন, তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাই; মহাশ্বেতার চরিত্রেও প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায় না। যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বসন্তের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জাগ্রৎ যৌবন-ছন্দ। এই যৌবন-ছন্দের সহিত অচ্ছোদের নাচনভরা জলতরঙ্গের যোগ যেমন আছে, তেমন আছে বসন্ত-পিচকারি-রঙের তরল স্বপ্নের, নীলাকাশের নীল চোখের পাতায় রামধনুর স্বপনভাঙার যাদুটির। মহাশ্বেতার একান্ত কৌতূহল ঐ কুসুম-মঞ্জরী। গন্ধের নিশানা হইতে গন্ধরাজের সাক্ষাৎ দর্শন। পুণ্ডরীকের কানে দোলে ঐ পুষ্পমঞ্জরী। পুষ্পমঞ্জরীর সূত্রেই পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার আলাপের সূত্র। বালিকার ফুলের বাসনা—কুসুমমঞ্জরীর বাসনা; সে-কুসুমমঞ্জরী পুণ্ডরীকের কানে। যদি দিয়াই থাকে পুণ্ডরীক ঐ পুষ্পমঞ্জরীটি মহাশ্বেতার হাতে, তাহা হইলেই বা এমন কী দোষ হইয়াছে! দোষ কিছু হয় নাই; কিন্তু মহাশ্বেতার কানে ঐ কুসুমমঞ্জরীটি গুঁজিয়া দিবার কালে মহাশ্বেতার রাঙা গালে পুণ্ডরীকের কড়া আঙুলের ছোঁয়ায় যে তুলতুলে গালটি টোপ খাইল! দোষ ঐ অঙ্গস্পর্শের। পূর্ব-রাগের কারণ এপর্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, শুনি নাই। এক

---

(১) শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে॥ ১৮৮॥
শ্রবণং তু ভবেত্তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনম্॥ ১৮৯॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ। সাহিত্য দর্পণ।

ভবভূতি বলিয়াছেন—"আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ" হেতুটি কী, তাহা বলিতে পারেন নাই। নন্দনতাত্ত্বিকেরা বলেন:—শব্দ, স্পর্শ ও রূপের মধ্যে যত গণ্ডগোল। শব্দ ও রূপ—কথা শোনা ও রূপ দেখা—প্রাথমিক অবস্থা; স্পর্শে বাসনা বাঁধ ভাঙে। প্রকৃতির সুঠাম পরিবেশে বসন্ত ও যৌবনের যুগপৎ জাগরণে অচ্ছোদের আকাশের ডালে-ফোটা জবাকুসুমকে সাক্ষী রাখিয়া পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা উভয়েই উভয়কেই ভালবাসিয়াছিল। সেই ভালবাসা মিলনের পথ খুঁজিয়া পাইল কুসুমমঞ্জরীর আদান-প্রদানের মধ্যে। ইহা সম্পূর্ণ নাটকীয়। একজন কানে কুসুম-মঞ্জরী গুঁজিয়া মহাশ্বেতাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গন্ধের দৌত্যের আশ্রয় লইয়াছে; আর একজন সেই দৌত্যের টানে ছুটিয়া আসিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে গুণ দ্রব্যে উপস্থিত হইয়াছে,—কুসুম-মঞ্জরী গন্ধের রজ্জু দিয়া মহাশ্বেতাকে পুণ্ডরীকের একেবারে বুকের কাছে টান দিয়াছে। মুখোমুখী দাঁড়াইয়া পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা—যেন বীণা ও বাদন-দণ্ড। কিন্তু একী হইল? স্পর্শে কী সুর বাজিল? কী মন্ত্র টানিয়া আনিল স্বেদ, স্তম্ভ, বেপথু। একী! দুইজনেই যে ঘামে, দুইজনেই যে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, দুইজনের শরীরে প্রথম বর্ষার স্পর্শে নীপ-কোরকের মত রোমাঞ্চ জাগে! ওকি রোমাঞ্চ, না বাসনার নবাঙ্কুর, না নীপমঞ্জরী! পণ্ডিতেরা পুঁথি ঘাটিয়া মাথা নাড়িয়া বলিবেন[১] কামদশা। আমরা চাক্ষুষ দেখিতেছি, উহারা উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়িয়াছে। পারস্পরিক স্পর্শে উভয়ের শরীরে যৌন-সংবেদনার বাসনা তরঙ্গ তুলিয়াছে। ইহার পর দেখা দিল আত্ম-অনাদর। কুসুম-মঞ্জরী কানে পরাইবার সময় মহাশ্বেতার জ্বলন্ত যৌবনের আগুনের ছাঁচ লাগিয়া হতচেতন পুণ্ডরীকের হাত হইতে অজ্ঞাতসারে যে স্ফটিক মালা সোজা মাটিতে পড়িতেছিল, সে মালা যে ঐ বালিকা গলায় পরিয়া ঘরে চলিয়া যায়। বেহুঁস পুণ্ডরীক। ভর্ৎসনা করে কপিঞ্জল। মহাশ্বেতাকে ডাকে পুণ্ডরীক—"মালা দিয়ে যাও।"

মহাশ্বেতা ফিরে আসে। মালা ফিরাইয়া দিতে ভুল করিয়া বসে। পুণ্ডরীকের মালা বলিয়া মহাশ্বেতা নিজের কণ্ঠমালা পুণ্ডরীককে ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু ভুল কেন? এরূপ ভুল বৈষ্ণব কবিদের হাতে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা অনেকবার করিয়াছেন। কুঞ্জবনে নিশীথ মিলন সাঙ্গ করিয়া জোরপায়ে কৃষ্ণঠাকুর চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। হুঁস নাই যে, রাধার নিকট হইতে তাড়াতাড়ি বিদায়ের কালে

(১) অভিলাষশ্চিন্তাস্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ॥ ১৯০॥
সাহিত্য-দর্পণঃ, ৩য় পরিচ্ছেদ।

নিজের পীতবাস ফেলিয়া রাধার শাড়ী পরিয়াছেন। চন্দ্রাবলীর ধমক খাইয়া চাহিয়া দেখেন—'তাই তো'। এমন 'তাই তো' আরও আছে। যমুনার তীরে মিলনের বাঁশী বাজিতেছে। বাঁশীর মুখে অসম্বৃত প্রলাপ—"রাধা-রাধা-রাধা"। রাধার মন বলে—'যাই গো যাই'। তবু বাঁশী বাজে; বাজে উদারায়, বাজে মুদারায়, বাজে তারায়। রাধা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অভিসারের ঘণ্টা যে অনেকক্ষণ পড়িয়া গিয়াছে। লেট্ এ্যাটেন্‌ডেন্‌স্! আর দেরি নয়! খুব তাড়াতাড়ি! আল্‌তা চোখে, পায়ে অধররাগ, কণ্ঠে নূপুর, চরণে কণ্ঠহার।[১] এমন কেন হয়? কৃষ্ণের কাছে ধরা পড়েন রাধা—'তাই তো'। সংসারে পান হইতে চূণ খসিলে দণ্ড পাইতে হয়, এমন কি ভুলের গুরুত্ব অনুসারে ফাঁসী পর্যন্ত হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে এমনি ভুল একান্ত বাঞ্ছনীয়। এমনি ভুলের গুরুত্বে ইংরেজী নাটকে ট্রাজেডি হইবার শাস্তি পাইতে হয়,[২] কিন্তু সংস্কৃত-কাব্যে ও বৈষ্ণব পদাবলীতে—এমনি ভুলে রস জমে। দণ্ড যে পাইতে হয় না, তাহা নয়; সে দণ্ড প্রেমের। এমনি 'তাইতো'তে ভালবাসার চৌতুন।

এখানে আর একটু কথা বলি—আধুনিক সাহিত্যের ঘটনার সম্পর্কে; আধুনিক সাহিত্যে প্রথম মিলনের ঘটনা। সে-ঘটনা ঋজু হইতে পারে, বাঁকা হইতে পারে। কিন্তু তার স্থূলত্ব অনেক বেশী। সেখানে মিলনের উপায়কে ঘটনা বলিব, আর এখানে এই 'তাইতো'কে ঘটনা বলিব না কেন? আমতলায় দাঁড়াইয়া জোরে ঢিল ছুড়িয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গাছে চড়িয়া নালশের (লাল-

---

(১) (ক) "ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চর্চ্চিত মঞ্জনং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসার সম্ভ্রমভরাশ্বয়ে জগদ্বিস্মৃতম্"
—'বিদগ্ধ মাধবে'।

(খ) লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥

(২) tragedy এর পরিভাষায় ইহাকে error of judgement বলে।

"........ it denotes an error due to inadequate knowledge of particular circumstances. According to strict usage we should add the qualification that the circumstances are such as might have been known. Thus it would cover any error of judgement arising from a hasty or careless view of the special case; an error which in some degree is morally culpable, as it might have been avoided.

S. H. Butcher: Aristotle's Theory of poetry and fine art. p. 317—18.

পিঁপড়ের) কামড় খাইয়া পাকা আমটিকে পাড়ার বেলায় বলিব ঘটনা, আর ঘরে বসিয়া বৈশাখের অপরাহ্নে বিশেষ মেজাজে আমের রস-খাওয়াকে ঘটনা বলিব না! এ অন্যায় কথা! একদিকে আমটিকে পাওয়ার পক্ষে গলদঘর্ম ঢিল ছোড়া, গাছে ওঠা, নালশের কামড় খাওয়া—এ সব ঘটনা! আর আমের রসটুকু খাইবার বেলায় ঘটনা নয়! এ ঠাট্টা তো মন্দ নয়।

ইহার পর মন্দাক্রান্তা ছন্দে ঘরে ফেরে প্রেমের রাধা মহাশ্বেতা। বিশ্বজগৎ আজ তাহার চোখে কুহেলী। সেই কুহেলীর নীহারিকা ছিঁড়িয়া জাগে এক অচীন প্রেমের জগৎ। সে-জগৎ পুণ্ডরীকময়। অচ্ছোদ-সরোবরের জাগ্রত স্বপ্ন মহাশ্বেতার ভিজা চোখের পাতায় লাগিয়া আছে। অসুস্থচিত্ত মহাশ্বেতা। তাহার পর তরলিকার হাতে তমাল-পল্লবের রসে ছিন্ন বল্কলের বুকে আঁকা পুণ্ডরীকের জরুরি চিঠি; প্রেম-লিপি। মহাশ্বেতাকে না পাইলে তাহার জীবন যায়। চঞ্চল হইয়া ওঠে মহাশ্বেতা। চঞ্চল তরঙ্গের উপর যেন বাতাসের লম্পট হাতের নাড়া। এমনি সময়ে মহাশ্বেতার দ্বারে কড়া নাড়ে কে? ও-যে স্বয়ং কপিঞ্জল। কপিঞ্জল আবৃত্তি করিয়া চলেন পুণ্ডরীকের অনঙ্গদাহের বার্তা! মহাশ্বেতাকে ছাড়া আর বুঝি পুণ্ডরীককে বাঁচান যায় না। মহাশ্বেতার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া শুষ্কমুখে ক্লান্তচরণে ফিরিয়া চলেন কপিঞ্জল। দ্বন্দ্ব জাগে মহাশ্বেতার মনে! একদিকে সমাজ, অন্যদিকে পুণ্ডরীক। একদিকে পায়ে-পরা সমাজের বেড়ী, অন্যদিকে উধাও হইয়া পুণ্ডরীকের কাছে হৃদয়ের ধাওয়া। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ! কী করিবে হতভাগিনী মহাশ্বেতা? অবশেষে সকল সমস্যার—প্রথম বাধার নিরসন করিয়া আকাশে জাগে চাঁদ। পাঁপড়ি মেলিয়া ধরে জ্যোছনার। জ্যোছনার রূপালি আগুনে বাধার বন্ধন পুড়িয়া যায়। একরোখা মন নাচিয়া ওঠে মহাশ্বেতার মনে। মহাশ্বেতা চলিলেন অভিসারে। অচ্ছোদের নিভৃত কুঞ্জে প্রতীক্ষমান মুমূর্ষু পুণ্ডরীক। মহাশ্বেতার উপস্থিতির পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু। রোরুদ্যমান অচ্ছোদের আকাশ, রোরুদ্যমান অচ্ছোদের বাতাস! চিতা সাজাইবার আদেশ পায় তরলিকা। সহসা আকাশের চন্দ্রমণ্ডল হইতে নামিয়া আসেন এক দীর্ঘ পুরুষ—পরিধানে শুভ্র বসন, কর্ণে স্বর্ণ কুণ্ডল, বক্ষে হার, হস্তে কেয়ূর। তিনি পুণ্ডরীকের মৃতদেহ লইয়া আকাশে উঠিলেন। তাহার পশ্চাতে ছুটিল ক্রোধোন্মত্ত যুবক কপিঞ্জল। আকাশে জাগে দৈব-বাণী—"বৎস! মহাশ্বেতা! প্রাণত্যাগ করিও না। পুনরায় পুণ্ডরীকের সহিত তোমার মিলন হইবে।"

এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, পূর্বরাগ, পূর্বরাগের পর অভিসার। কিন্তু মিলন হইল না। ঘটিল পুণ্ডরীকের মৃত্যু। পুণ্ডরীকের এ মৃত্যু কিন্তু নিশ্চল বাধা নহে। কালো মেঘের কোলে সোণালী সূর্যের কিরণের মতো মৃত্যুর কোলে জাগে আশা-বন্ধের আলোকচ্ছটা। এইখানেই ঘটনার প্রথমস্তরের যবনিকা।

দ্বিতীয় স্তরের পটভূমি—অচ্ছোদের তীরবর্তী মহাকালের মন্দির ও মহাশ্বেতার আশ্রম। বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রতায় রোমান্টিক প্রেমের তপস্যা। এ তপস্যা পার্বতীর তপস্যার অনুরূপ হইলেও ইহাতে পার্বতীর নারীত্বের প্রতি শিবের অবহেলার ব্যথা নাই। আছে না-পাওয়ার ব্যথা। চলে পাওয়ার জন্য তপস্যা। কিন্তু দুই প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় মিলও প্রচুর। দুইজনেরই কাঁচা প্রেম। একজনের পিতামাতার জ্ঞাতসারে, অপরের অজ্ঞাতসারে। একজনের ব্যক্তি-নিষ্ঠ প্রেম; অপরের সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিপ্রেমের অভিসার। একজনের প্রেমে অভিশাপ নাই,আছে দেহজ ভালবাসার কাঁচামি; অপরের সামাজিক কল্যাণকে অস্বীকার করার ফলে মৃত্যুর ছদ্মবেশে আবির্ভূত অভিশাপ। মহাশ্বেতার প্রেমে না-পাওয়ার জন্য তপস্যার আগুনে কাঁচা প্রেমও পাকা হয়।

এই স্তরে মহাশ্বেতার সহজ ঋজু কাহিনীর একটু ছায়ারূপ দেখা দেয়। এখানে প্লটের গতি নাই। গতি রোমান্টিকতার শৈবালে হারাইয়া গিয়াছে। সর্বত্রই রোমান্টিকতা। পরিবেশে রোমান্টিকতা, রূপে রোমান্টিকতা, ভজনে রোমান্টিকতা, আলাপে রোমান্টিকতা, কাহিনীতে রোমান্টিকতা। এই রোমান্টিকতায় দুইজন মুখোমুখী বসিয়া। একজন তরুণ রাজকুমার, আর একজন তরুণী সন্ন্যাসিনী। একজনের হৃদয়ে প্রেমের জমিন তৈয়ারী কিন্তু বীজ পড়ে নাই। মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। মাটির বুকচেরা প্রখর সূর্যালোক নাই, আছে রোমান্টিকতার ছায়ায়-ভরা সূর্যের দুঃসহ আলো। বীজ ছড়ায় মহাশ্বেতার আত্ম-কাহিনী—রোমান্টিক সবুজ প্রেমের মায়ায়-ঘেরা নন্দিত স্বপ্ন। চন্দ্রাপীড়-চিত্তের অনাহত বীণায় সুন্দরী যুবতীর কলকণ্ঠের আঘাত পড়ে। সেই আঘাতে নাচে স্বপ্ন, বাজে তরুণ বুকের আসন্ন প্রভাত। এই অংশের প্লটে ঘটনা নাই বলিলে চলে, আছে রোমান্টিকতার ছোঁয়ায় স্থায়ীভাব রতির উন্মেষ। objectivity এর পাদপীঠে subjectivity এর চারু জাগরণ। কিন্তু সূত্র হারায় না প্লট। মহাশ্বেতার জীবন-সূত্রের নূতন দিক জাগিয়া ওঠে; আসিয়া জোটে কাদম্বরী-কাহিনীবৃত্ত। এইখানেই দুইটি কাহিনীর জটিলতার পাক। কেন? কিসের জন্য। কবির কল্পনায় মহাশ্বেতার জীবন কি গতি হারাইয়া ফেলিয়াছে?

নদীর কলকল্লোল কী বালুকারাশির মধ্যে পড়িয়া প্রাণাবেগ চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে? মানবী অহল্যা কি পাষাণী অহল্যায় রূপান্তরিত হইয়াছে? না, তাহা নয়। প্লটের প্রথম অংশে নাটকীয় তড়িৎ গতিতে গার্হস্থ্য পরিবেশে শাশ্বত নারী-জীবনের যে সুষমা, তাহা একে একে পাপড়ি খুলিয়া দেখান হয় নাই, যাহা কেবল মহাশ্বেতার নয়, কেবল কাদম্বরীর নয়, যাহা সর্বসাধারণীকৃত নারীত্বের। সেই শোভার উন্মেষের জন্য এখান হইতে প্লটের কাদম্বরী-মুখী গতি। মহাশ্বেতার আত্মকাহিনী যেন দিল্লী-কাল্‌কা মেল। যেমনি বিদ্যুৎগতি, তেমনি যাত্রাপথের বিশ্রামাগারের সংখ্যাও নিতান্ত সঙ্কুচিত। জংশন স্টেশন ছাড়া ধরে না। অনেক কথাই বলা হয় নাই। তাহা বলিবার জন্যই কাদম্বরী-কাহিনীর আমন্ত্রণ। কাদম্বরীর জন্য কাদম্বরী নয়, মহাশ্বেতার জন্য কাদম্বরী। ইহাতে ফল হইল, মহাশ্বেতার না-বলা কথাও যেমন বলা হইল, তেমনি দুইটি প্রেমচিত্রের পাশাপাশি থাকিবার ফলে plot-এ দেখা দিল paralellism ও contrast. Paralellism এ অনুরূপভাবের দুইটি চিত্রের পারস্পরিক প্রভাবে অনুভূতির গহীনতা;[১] contrast এ ভাব-বৈপরীত্যের স্বচ্ছ মুকুরে দুইটি ভাবের—ভাবকদম্বের আপন আপন সত্তার প্রতিবিম্ব দর্শন। এই দিক দিয়া মহাশ্বেতার কাহিনী মূল কাহিনী, কাদম্বরীর কাহিনী আগন্তুক। মহাশ্বেতা নারী-চরিত্রের অনুভূতিময় সৌন্দর্যের স্বচ্ছ ফটিক, কাদম্বরী রক্তজবা। স্বচ্ছ স্ফটিক-মুকুরে রক্তজবার রক্তপ্রতিবিম্ব পড়িয়া স্বচ্ছ স্ফটিককে রক্ত স্ফটিক দেখাইতেছে। মহাশ্বেতা উপহিত-চৈতন্য, কাদম্বরী চৈতন্যের উপাধি। Plot-এর দ্বিতীয় স্তরের এই উন্মেষ অবস্থা হইতে আগন্তুক উন্নীত অবস্থায় উত্তরণের সাঁকোটি কাদম্বরী-মহাশ্বেতার অভিন্ন-হৃদয়ত্ব, সমপ্রাণতা। শয়ন, ভোজন, লেখাপড়া, খেলাধুলা, নৃত্য, গীত, বাদনায়—কাদম্বরী-মহাশ্বেতার হারানো দিনগুলি একসঙ্গেই কাটিয়াছে। দৈব-দুর্ঘটনার আঘাতে অশ্রুপ্লুত মহাশ্বেতার হৃদয়ের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস কাদম্বরীর হৃদয়ে পড়িয়া "পুষ্পরাশবিবাগ্নিঃ"। কাদম্বরী তাই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, যতদিন মহাশ্বেতার প্রিয়সমাগম না হয়, ততদিন সে বিবাহ করিবে না। এ-যে ধনুকভাঙা পণ! পিতামাতা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কাদম্বরীকে বুঝাইয়া বিবাহে রাজী করিবার জন্য কাদম্বরীর পিতামাতা মহাশ্বেতাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মৌখিক অনুরোধ পাঠাইয়া যখন কাদম্বরীর মন ফিরানো গেল না, তখন মহাশ্বেতাকে গন্ধর্ব-নগরে যাইতে হইল।

---

(১) গহীন শব্দের অর্থ গভীর;

"তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি" -মহুয়া

সঙ্গে চলিলেন, নূতন বন্ধু চন্দ্রাপীড়। তাই বলিতেছিলাম, প্লটের দ্বিতীয় স্তরের পরবর্তী উন্মেষ নিশ্চয়ই মণ্ডূকপ্লুতি নয়। উহা কার্যকারণাত্মক।

অবস্থার ঘনায়মান প্রৌঢ়ত্বে নূতন আবহাওয়া, নূতন হাওয়া। আমরা এতক্ষণ সংসার হইতে অনেক দূরে সৌন্দর্যের অচ্ছোদের তীরে ঘুরিতেছিলাম। অচ্ছোদের বাসন্তী তীর ছাড়িয়া মহাকালের মন্দির, মহাকালের মন্দির ছাড়িয়া একখণ্ড লিরিক স্বপ্নের সৌন্দর্যলোকে মহাশ্বেতার আশ্রমে বসিয়া তাহার আত্ম-জীবনের কাহিনী শুনিতেছিলাম।—শুনিতেছিলাম প্রেমের কাহিনী। এক ঋষিকুমার ও এক কিন্নরকন্যার প্রেমের কাহিনী—সংসার হইতে স্বপ্নলোকে অভিসারের কাহিনী—সাধারণীকৃত নারীত্ব-সংবেদনার অশ্রু-কলধ্বনির কাহিনী—মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বিপ্রলম্ভের কাহিনী। এবার আমরা মহাশ্বেতা-চন্দ্রাপীড়ের সাথে স্বপনপুর হইতে গা-ঝাড়া দিয়া সংসারে আসিয়া উঠিলাম। এ-সংসার আবার রাজার সংসার। এখানে সরোবরের স্বপ্ন নাই, আছে পাথরের স্বপ্ন; ফুল নাই, আছে ফুলের মতো মণি-মাণিক্য হীরাজহরত; ললিতনিকুঞ্জবন নাই, আছে প্রস্তরের শিল্পশোভা; পাখীর কলকাকলি নাই, আছে নারীকণ্ঠের ললিত মধুক্ষরা সঙ্গীত; প্রজাপতির নৃত্য নাই, আছে কলাবতী অঙ্গনার নৃত্য, কোকিল-পাপিয়ার গান নাই, আছে কিন্নরীকণ্ঠের লীলায়িত সঙ্গীত; স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতা নাই, আছে নিয়ম-সংযমের নিয়ামক নীতির স্বর্ণকঙ্কণ! একেবারে গার্হস্থ্য জীবনের কায়াময় স্বপ্নের ছায়া। স্বপ্নে যেমন কায়া দেখি, অথচ হাত তুলিয়া ধরিতে গেলে পলাইয়া যায়, এখানকার কায়া তেমনি স্বপ্ন দিয়া তৈয়ারী, কল্পনা দিয়া আঁকা। ইহা বাস্তবের রোমান্টিক মূর্তি, মিছরির শরবৎ।

এই স্তরে মহাশ্বেতার কাজ খুব সামান্যই। কাজের মধ্যে দৌত্য—প্রেমের দৌত্য—কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের প্রেমের দৌত্য। মহাশ্বেতা এখানে ছায়া। কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের প্রেম এখানে কায়া ধরিয়া উঠিয়াছে। এখানে অবস্থা ভেদে নায়িকা-প্রেমের অভিসারের মধুযামিনী নাই। এখানকার প্রেম নীতির কষ্টি-পাথরে কসিয়া দেখিতে হয়, কাঁচা সোনাকে আগুনে ফেলিয়া পোড়াইয়া খাঁটি কিনা, তাই পরখ করিতে হয়। এ-প্রেম পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেম—এ প্রেম সমাজ-অনুমোদিত প্রেম—নীতিশাসিত প্রেম—দাম্পত্য প্রেম। ঝোড়ো হাওয়ায়—ঘূর্ণী হাওয়ায় সংসার হইতে, সমাজজীবন হইতে, বিশ্ব-বন্ধন হইতে, বিশ্বকল্যাণ হইতে উড়াইয়া লইয়া সংসার-বন্ধন—নীতিবন্ধন হইতে অনেক দূরে—উই—উই কল্পনার অচ্ছোদ-তীরে বিশ্বলোপী সর্ববৈরাগী ব্যক্তিত্বের নিভৃত

নিকুঞ্জে দুইটি নরনারীর হৃদয়ে আটকাইয়া রাখিবার মতো এ-প্রেম নয়। মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের প্রেম যদি কিংবদন্তীর প্রেম, কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের প্রেম তাহা হইলে মহাকাব্যের প্রেম। নৈতিক জীবন এ-প্রেমের 'মাণিক্যের অঙ্গদের মতো'। তবে প্রেম-উন্মেষের সাধারণ পদ্ধতি মহাশ্বেতার প্রেমে যেমন, কাদম্বরীর প্রেমেও তেমনি। সেই চক্ষুরাগ—প্রথম দর্শনে ভালবাসা ; সেই স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, বেপথু—প্রভৃতি সত্ত্বজ ও দেহজ বিকার, সেই চাওয়া, সেই হাসা, সেই চাহিয়া চাহিয়া হাসা, সেই হাসিয়া হাসিয়া চাওয়া, সেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, নাচিয়া খেলিয়া আপন দেহজ যৌবনকে প্রিয়তমের চোখের উপর তুলিয়া ধরা, সেই নয়নের তূণীর হইতে ঘন ঘন পুষ্পবাণের নিক্ষেপ, সেই অধরের রক্তিম কটাহে বাঁকা হাসির আগুন জ্বালা, সেই অশ্রুবন্যায় অমিয় হিয়ার অশ্রুসিক্ত লিপি প্রেরণ—ইহা সর্ব প্রেমের স্বত্বজ ও দেহজ সামান্য লক্ষণ।

কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের প্রেমে—দ্বিধা, লজ্জা, সংশয়, সন্দেহ। পাছে ভুল করিয়া বসে তাই নানা সতর্কতা। যেমন কাদম্বরী, তেমনি চন্দ্রাপীড়, উভয় উভয়ের হাবভাবকে, হেলা-লীলাকে সত্যের সহিত যাচাই করিতেছে। আমি তো ওকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, ওকি সত্যই আমাকে ভালবাসে ? তবে এই-যে আকার-ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা, ইহা কি ছলনা মাত্র ? না, অগ্নিমুখী পতঙ্গের মতো প্রেমের আগুনে ঝাঁপ দিলে চলিবে না। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। উহা প্রেম, না, প্রেমের ছলনা, উহা রজ্জু, না সর্প, উহা মুক্তা, না শুক্তি, উহা মরুভূমির জল, না মৃগতৃষ্ণিকা! এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্লটের এই অংশে ছুটির ঘণ্টা পড়িয়াছে। কিন্তু সংশয়-সন্দেহের দোলা মনের ঝুলনে যতই ঝুলুক না কেন, চিত্ত তাহা মানিবে কেন ? সে কি কেবল আঙিনায় বসিয়া গালে হাত দিয়া দেখিবে রাঙা প্রভাতের দখিনা হাওয়ায় দোদুল দোলায় বকুলের ফুলগুলি রহিয়া রহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে ; ঝরিতেছে, শুকাইতেছে। মালা কি তাহার গাঁথা হইবে না ? কে বলে মালা সে গাঁথিতেছে না। সে যে গোপনে বসিয়া বিনিসুতোর মালা গাঁথিতেছে। তাহার নাভি হইতে যে তাজা বকুলের গন্ধ পাল তুলিয়া ছুটিতেছে। আপনার গন্ধে আপনি যে মত্ত হইয়া উঠিতেছে। সে বলিতেছে, "দিতে চাই, নিতে কেহ নাই"। দিবার বিচারকে ফাঁকি দিয়া কখন যে তাহার হৃদয় চুরি গিয়াছে, অসম্বৃত মন লইয়া তাহা সে বুঝিতেও পারে না। তাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে—
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল—
গভীর রাগিণী।

সত্যি কি সে জাগে নাই! সে কি জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইয়াছে? তবে সে দেখিতে পাইল না কেন? সে কতবার আসিয়াছে, কতবার ফিরিয়া গিয়াছে! কেহ তাহাকে ডাকে নাই! কেহ তাহাকে বসিতে বলে নাই! এখনও যে বাতাসে তাহার গন্ধ ভাসিতেছে, ঘরের ধূলোয় তাহার গন্ধ লাগিয়া আছে। হতভাগিনী সে! গন্ধমাখা ধূলা দিয়া কাজল-পরা ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, বিচার করিতে করিতে বেলা পড়িলেও হৃদয়ের ভাবের জোয়ারে পলে পলে প্রেমের পদ্ম ফুটিতেছে, ভাসিতেছে হাসিতেছে নাচিতেছে, রঙ ঢালিতেছে, গন্ধ বিলাইতেছে।

প্লটের এই অংশে কেবল পরীক্ষা-নিরীক্ষা; কেবল হৃদয়-চন্দন-বিধুর উপহারের প্রবর্তনা।

গন্ধর্ব নগরী Lotos eaters এর দেশও নয়, চন্দ্রাপীড়ও কিছু Ulysis নয়, যে চিরকাল এখানে থাকিয়া যাইবে।[১] তাহার হৃদয় এখনও নিশ্চিন্ত হয় নাই। সে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। কিন্নর-মিথুনের অনুসরণে মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়াছিল। মহাশ্বেতার অনুরোধে, বন্ধুত্বের আকর্ষণে ও কৌতূহলে সে গন্ধর্ব-নগরীতে আসিয়াছে। আসিয়া কাদম্বরীর প্রেমে পড়িয়াছে। অবশ্য ইহার পূর্বপ্রস্তুতিও ছিল। একে উপভোগক্ষম যৌবন। তাহার উপর মহাশ্বেতার আত্ম-জীবনীর প্রেম-কাহিনীর বীজ পড়িয়া তাহার হৃদয় উন্মুখ হইয়া ছিল, কেবল

(১) ইউলিসিস লায়োর্টিসের পুত্র, পিনেলোপীর স্বামী ও টেলিমেকাসের পিতা। ইনি ইথাকার রাজা ছিলেন। ট্রয়যুদ্ধের পর ইনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কালে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি Lotos eaters এর দেশে আসেন। এ বিষয়ে Tennyson এর কবিতা আছে।

"Tennyson's Lotos-Eaters was one of the chief poems in his first important volume, 1833. It is founded on an episode in the wandering of Odysseus (Ulysses) on his homeward voyage from Troy, as related in Bk IX of Homer's Odyssey."

J. H. Fowler

অবলম্বনের অভাবে তাহা স্ফূর্তি পায় নাই। কাদম্বরীর আশ্রয়ে তাহার প্রেমে অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। পরিবেশের মাধুর্যে সে-অঙ্কুর এখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নৃত্য-গীত-বাদিত্রের সমারোহে তাহার চিত্ত "হারিণা প্রসভং হৃতঃ"। অতএব প্রেমের মায়ালোকে সে-উত্তীর্ণ। তবুও আশ্রয়কে হাতে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। কাদম্বরীর বুক ফাটিলেও মুখ ফোটে নাই। তাই আশ্রয়ের দৃঢ়তা সম্পর্কে তাহার এখনও সংশয়। "পুরঃ ধাবতি শরীরং পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ" লইয়া সে স্কন্ধাবারে ফিরিতেছে। কাদম্বরী নিরুপায়! ঐ যে হৃদয়ের চাঁদ চলিয়া যায়! আর বুঝি ফিরিবে না! তাই তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা! ঘন ঘন সংজ্ঞা হারায় সে! আবার পিছু টানে চন্দ্রাপীড়কে! "ওগো! এস! ফিরে এস! ফেলে যেয়োনা হতভাগিনীকে!" কেয়ুরকের হাতে পাঠায় বিলেপন, তাম্বুল, উপহারীকৃত শেষ-হার। চন্দ্রাপীড় আবার ফিরিলেন গন্ধর্ব-নগরীতে। সাথে লইলেন পত্রলেখাকে। আপন হৃদয়ভাবের বিশ্বাস্ত ন্যাসস্বরূপ পত্রলেখাকে কাদম্বরীর নিকট রাখিয়া তিনি স্কন্ধাবারে ফিরিলেন। না ফিরিয়া উপায় নাই। উজ্জয়িনীতে পিতার আহ্বান। মিলনের মুখে আবার বাধার শেওলা আসিয়া ঠেকিল। এখনও তাহার হৃদয় হইতে সংশয়ের মেঘ কাটে নাই। মহাশ্বেতাও আশ্রমে ফিরিলেন।

প্লটের এই অংশে মহাশ্বেতা ছায়া। কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের পশ্চাতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখা যায়। মহাশ্বেতার কাহিনী পিছনে ফেলিয়া কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের কাহিনী অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। এমন হওয়া তো উচিত নহে। এমন হইল কেন? ইহার দুইটি কারণ আছে। একটি কথাকাব্যের দিক দিয়া, অপরটি বাণের উপরে হর্ষবর্ধনের প্রভাব। কথাকাব্য লোক-কথা-ভিত্তিক বলিয়া উহার উপজীব্য কিংবদন্তী-প্রেম। আবার কথাকাব্যের উপর মহাকাব্যের ছায়া আছে বলিয়া উহার দাবী মহাকাব্যের দাম্পত্য-প্রেম। মহাকাব্যের সম্পদ কথাকাব্যে না থাকিলে কথাকাব্যকে আবার লোক-কথার আস্তাকুঁড়ে ফিরিতে হয়। মহাকাব্যের রাজগণের মৃগয়া, দিগ্বিজয়, দাম্পত্য-প্রেম প্রভৃতি কথাকাব্যে ঘটাইয়া বাণভট্ট কথাকাব্যকে মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়াছেন। তাই তাঁহার কথাকাব্যে একদিকে যেমন লোক-কথার প্রভাব, তেমনি অন্যদিকে মহাকাব্যের প্রভাব। কাদম্বরী এই দুইটি প্রভাবের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। তাহাছাড়া বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন। রাজসভার কবিকে রাজা-মহারাজার প্রেমের কাহিনীই শুনাইতে হয়। তাই খানিকটা হর্ষবর্ধনকে খুশি করিবার জন্য, খানিকটা মহা-

কাব্যের মর্যাদা দিবার জন্য বাণভট্ট তাঁহার প্লটের গণ্ডগোল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার উচিত ছিল কোরক হইতে পুষ্পের বিকাশের মত মহাশ্বেতার কাহিনী হইতে জীবনের বেগে কাদম্বরীর কাহিনীকে উৎসারিত করা। তাহা করিতে না পারায় ঘটনার সূত্র দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, আগন্তুক কাদম্বরী-কাহিনী মহাশ্বেতার মূল কাহিনীকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। ঘটনাবিন্যাসের দিক হইতে কাহিনী এখানে মার খাইলেও ইহার subjectivity নষ্ট হয় নাই; নষ্ট হয় নাই রতিভাবের বিকাশ। সংস্কৃত-কাব্যে কোন চরিত্র individual নয়, সবই type—genaralised type। নিখিল নারীত্বের সর্বসাধারণীকৃত ইহার চারিত্র ধর্ম। তাই সেই সাধারণীকৃত নারী-চরিত্রের স্থায়ীভাবের কিছুটা অংশ যদি মহাশ্বেতার মধ্যে, কিছুটা বা কাদম্বরীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে plot-এর subjectivity নষ্ট হয় না। তাই সেকালের সহৃদয় পাঠক এইখানে ঘটনা-বিন্যাসের দুর্বলতা জানিয়াও কোন আপত্তি তোলেন নাই। তাঁহাদের মুখ্য চাহিদা 'রস চাই', তা সে-রস যে-পাত্রেই ঢালিয়া দাও না কেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

প্লটের তৃতীয় স্তরে উজ্জয়িনীর পটভূমি। চন্দ্রাপীড় পিতার আদেশে ফিরিয়াছেন কিন্তু চিত্ত ফেরে নাই। চিত্ত পড়িয়া আছে কাদম্বরীর কাছে। থাকিলে কী হইবে, অগ্নি-পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তো প্রেমের উদ্ধার নাই। তাই উজ্জয়িনীতে আসিয়া সে নিজের মনকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেছে; সুযোগ পাইতেছে তাহার নিরালা মনের উপর কাদম্বরীর প্রেম কতটা জমিন দখল করিয়া আছে, তাহা পরিমাপ করিয়া দেখিবার। মনের ধর্ম সংকল্প-বিকল্প; চিত্তের ধর্ম 'তদাকারকারিতা'; মনেরধর্ম বিচার করা; চিত্তের ধর্ম 'হওয়া'। মন বিচার করিতেছে, কাদম্বরী তাহাকে ভাল না বাসিলে, কাদম্বরীকে ভালবাসা তাহার কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। চিত্ত বলিতেছে, মন, তুমি রহিয়া সহিয়া বিচার কর; আমি এই অবসরে আগাইয়া যাই। তাই বলিতেছিলাম, চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত, কাদম্বরীময় হইয়া পড়িয়াছে। তবুও মনের সহিত চিত্তের মোকাবিলা এখনও হয় নাই। কিন্তু একি হইল? চন্দ্রাপীড় যে এখনও স্থির হইতে পারিতেছে না! সে-অস্থিরতা নিজেও সামলাইতে পারিতেছে না, আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও কহিয়া যে সে-ব্যথা লঘু করিবে, তাহারও উপায় দেখিতেছে না। তাহার হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় ঘন ব্যথা পুটপাকের মতো অন্তরেই সকলের অজানিতে জ্বলিতেছে। এমনি সময়ে গন্ধর্ব নগর হইতে হাজির হইল পত্রলেখা ও বলাহক।

পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সখী; বান্ধবী; তাঁহার হৃদয়ের প্রতিবিম্বের ন্যায়। চন্দ্রাপীড়ের বিরহে কাদম্বরীর যে দশম দশা উপস্থিত, তাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। পত্রলেখা কাদম্বরীর অবস্থার উদাসীন দ্রষ্টা। সত্য-দর্শনের জন্য সংস্কারহীন মনের যে অবস্থা সঙ্গত ও সমীচীন, পত্রলেখার সেই মন। বাড়াইয়া বলিবার বা কমাইয়া বলিবার কোনো প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য পত্রলেখার থাকিতে পারে না। তাহাছাড়া নারীকে নারী যেমন বোঝে, পুরুষ নারীকে তেমন করিয়া বোঝে না; পুরুষের থাকে নারী-সম্পর্কে কল্পনার আধিক্য। পত্রলেখার পক্ষে কাদম্বরীকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিবার যে স্বাভাবিকতা আছে, তাহা কোন পুরুষের, এমন কি কেয়ূরকেরও থাকিতে পারে না। তাই পত্রলেখা-কর্তৃক কাদম্বরীর অবস্থার বিবৃতি, চন্দ্রাপীড়ের নিকট প্রামাণ্য। উদাসীন তৃতীয় ব্যক্তির মুখে কাদম্বরীর বিরহ-অবস্থার অনুলোম-বিলোম তথ্য পাইয়া কাদম্বরীর প্রেমের নির্জলতা সম্পর্কে চন্দ্রাপীড়ের মনে আর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। যেমনি মেঘ কাটিয়া গেল, অমনি প্রেমের আকাশে সহস্র-কিরণ মার্তণ্ডের লক্ষ শক্তিতে আগুনের ঝড় তুলিল। চন্দ্রাপীড় পত্রলেখার বিবৃতির মধ্যে বিরহ-শীর্ণ, বিলোল-কুন্তল আনন, দুর্বল-কপোল কাদম্বরীর প্রেমকে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন। বেদনা-ভারাক্রান্ত-হৃদয় চন্দ্রাপীড়। কাদম্বরীর জন্য কান্নার জল যেন তাহার ফাঁকা বুকের মধ্যে ভরা মেঘের মতো পড়ি পড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রাপীড় উপায়হীন। পিতামাতার কাছে একথা তিনি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না। এমনি সময়ে কেয়ূরক আসিয়া হাজির হইল। কাদম্বরী-সম্পর্কে কেয়ূরকের বিবৃতি কেবল পত্রলেখার বিবৃতির সমর্থক নয়, তাহার বিবৃতিতে প্রকাশ পাইল, কাদম্বরীর আর না বাঁচিবারই কথা। কেবল চন্দ্রাপীড়ের জন্য কাদম্বরীর প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়াও বাহির হইতেছে না। চন্দ্রাপীড় প্রমাদ গণিলেন। মাথায় উঠিল তাঁহার প্রেমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

কাদম্বরীকে যে-উপায়েই হউক বাঁচান চাই-ই। বিলম্বে যে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে! অস্থিরতার তাপমাত্রা যেন শাঁ শাঁ করিয়া বাড়িয়া চলিল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়-তাপমান-যন্ত্রে। এমনি সময়ে সংবাদ আসিল স্কন্ধাবার ফিরিতেছে। অস্থিরচিত্ত চন্দ্রাপীড় ঘোড়া ছুটাইলেন স্কন্ধাবারের প্রত্যুদ্গমনে। উদ্দেশ্য, বৈশম্পায়ন আসিতেছেন। বৈশম্পায়ন পিতামাতার সহিত কথা বলিয়া কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের পরিণয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। এই ভরসায় তিনি ইতিপূর্বেই তাঁহার প্রত্যাগমনের সংবাদ কাদম্বরীকে জানাইয়া

তাহাকে সুস্থ করিবার জন্য পত্রলেখার সহিত কেয়ূরকও বলাহককে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু স্কন্ধাবার ফিরিলেও বৈশম্পায়ন ফেরেন নাই। অচ্ছোদসরোবর দেখিয়া বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তাঁহাকে আর ফিরানো সম্ভব হয় নাই। বৈশম্পায়নের উপর স্কন্ধাবার আনয়নের ভার তিনিই দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন যদি বৈশম্পায়ন না আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য দায়ী চন্দ্রাপীড়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈশম্পায়নকে ঘরে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্বও চন্দ্রাপীড়ের। চন্দ্রাপীড় সে দায়িত্ব আনন্দের সহিত মাথায় তুলিয়া পিতা, মাতা, শুকনাস ও মনোরমার অনুমতি লইয়া ঘোড়া ছুটাইলেন অচ্ছোদের অভিমুখে। আনন্দ এইজন্য, বন্ধুর সহিত ও প্রিয়তমার সহিত মিলনের আপাততঃ একটা পথ খুলিল।

গন্ধর্ব-নগরী হইতে স্কন্ধাবারে ফিরিয়া পিতার যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা তাহার প্রিয়তমার সহিত মিলনের বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিতার আদেশে উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া সে-বাধা যেন আরও মহাশূন্যে আসিয়া উঠিল। কূল হইতে তরঙ্গের পিঠে চাপিয়া যেন মাঝ-দরিয়ায় উপস্থিতি। এখান হইতে ফিরিবার আর কোন উপায় নাই, সম্ভাবনা নাই। যদি তরঙ্গ দয়া করিয়া কূলে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহা হইলেই কূল পাওয়া সম্ভব, নতুবা অকূল পাথারে ভাসিতে হইবে। সংস্কৃতের প্লটে ঘটনা-তরঙ্গের এমনি ওঠা-নামা। ঘটনার এক তরঙ্গ তাহাকে একটি আঘাতে একেবারে উজ্জয়িনীর বুকে আনিয়া ফেলিয়াছে, আর এক তরঙ্গ তাহাকে অচ্ছোদের কূলে ঠেলিয়া লইতেছে। কিন্তু এই তরঙ্গ-ওঠা-নামার নিয়ামক কে? ঘটনার কার্য-কারণ নয়, দৈব। সংস্কৃত-সাহিত্যে বাধার নিয়ামক যেমন দৈব, বাধার অপসারণ করিয়া মিলনের উপায় বাতলাইয়া দেওয়াও তেমনি দৈবের কার্য। কার্য-কারণ কেবল কাহিনীর পারম্পর্য রাখিয়া চলে। গ্রীক-নাটকের দৈব-প্রাধান্যের সহিত সংস্কৃত-নাটকের মিল আছে। ইংরেজী নাটকে যেমন error of judgement এর অর্থাৎ ভুল বুঝিবার সুযোগে চরিত্রের রন্ধ্রপথে tragedy ঘনাইয়া ওঠে, গ্রীক-নাটকে তাহা ঘটে দৈবের ইঙ্গিতে, চরিত্রের ছিদ্রপথে নয়। সংস্কৃত-নাটকে tragedy নাই, তবে বিপ্রলম্ভ আছে। সংস্কৃত-নাটকে দৈব ঘটনার বামপন্থী নহে; কেবল সূর্যমেঘের লুকোচুরি।

প্লটের যে-স্তরে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে মনে হইতেছে বাধার আপাতিক মেঘ সরিয়া গিয়াছে, সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে দীপ্ত দিবসের সূর্যালোক। মনে হইতেছে বৈশম্পায়নকে লইয়া ফিরিবার পথে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে দেখিয়া আসিবেন। ইহার বেশী কিছু নয়। অন্ততঃ সঙ্কট-মুহূর্ত বলিতে যাহা বোঝায়,

তাহা এখনও দেখা দেয় নাই। অতএব প্লটের এই স্তর গর্ভ-সন্ধি কিন্তু গর্ভ-সন্ধি হইলেও সংকট-মুহূর্তের চূড়ান্ত অবস্থা এখনও দেখা দেয় নাই।

অচ্ছোদের মুখে ঘোড়া ছুটাইলেন চন্দ্রাপীড়। দ্বিগুণিত বেগ অশ্বের, চৌগুন বেগ চন্দ্রাপীড়ের মনে। প্রিয়সখাকে এখনই চাই। তাহাকে লইয়া ছুটিব গন্ধর্ব-নগরে। মনের উপর ভাসে কাদম্বরীর অশ্রুস্নাত নীল নলিন-নয়ন-দুটি। অচ্ছোদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বৈশম্পায়ন নাই। তীরভূমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন—বৈশম্পায়ন নাই; লতাগৃহে দেখিলেন—বৈশম্পায়ন নাই। অচ্ছোদের কোথাও নাই। তাঁহার মন খাঁ খাঁ করিয়া উঠিল। এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়ার সহিত মিলনের এত কল্পনা লইয়া যাহার সাচিব্যের দ্বারে আসিলাম—সে নাই! আমার এতদিনের বন্ধু, আমার সমপ্রাণ সখা! আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা-আনন্দসুখের অর্ধভাগী প্রিয়-সুহৃদ্ বৈশম্পায়ন নাই? অচ্ছোদের জলে,স্থলে, আকাশে-বাতাসে, পত্র-মর্মরে বৃক্ষশাখায় কেবল সেই 'নাই-নাই' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া চন্দ্রাপীড়ের বুকে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। আকণ্ঠ বেদনা বুকের মধ্যে কোনমতে সামলাইয়া লইয়া চন্দ্রাপীড় চলিলেন মহাশ্বেতার আশ্রমে। মহাশ্বেতার আশ্রম অচ্ছোদের নিকটবর্তী বলিয়া হয়তো মহাশ্বেতা বৈশম্পায়নের কোন সংবাদ বলিতে পারেন। ক্লান্ত, অবসন্ন চন্দ্রাপীড়। নৈরাশ্য-তারাক্রান্ত আপন শরীরকে কোনমতে টানিয়া লইয়া চলিলেন মহাশ্বেতার আশ্রমে।

আশ্রমে যাইয়া দূর হইতে দেখিলেন—মহাশ্বেতা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে, তরলিকা তাহাকে ধরিয়া। একি! কাঁদে কেন মহাশ্বেতা? তবে বুঝি কাদম্বরী আমার নেই! একে বৈশম্পায়ন নিখোঁজ, তাহার পর মহাশ্বেতার কান্না। এই দুইয়ে মিলিয়া যে-ছবি ভাসিয়া উঠিল তাঁহার মনে, তাহাতে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, কাদম্বরী আর নাই। বৈশম্পায়ন নাই, কাদম্বরী নাই। দুইটি চিন্তার দ্বিমুখী বেদনার আঘাতে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল। সমস্ত নিশ্বাসকে কণ্ঠাগ্রে পুঞ্জীভূত করিয়া একটি মাত্র ফুৎকারে প্রাণ-রূপে বাহির করিয়া দিবার প্রস্তুতি লইয়া তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কী হইয়াছে? তরলিকা মুখ তোলে না, মহাশ্বেতা কাঁদে। বনভূমির নিস্তব্ধতা হইতেও নিস্তব্ধ চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়স্পন্দন। কাটে পল, কাটে দণ্ড। অবশেষে মহাশ্বেতার মুখে যে কাহিনী শুনিলেন, তাহা হৃদয়-বিদারক—মহাশ্বেতার অভিশাপে বৈশম্পায়নের পতঙ্গযোনি-প্রাপ্তি।

বৈশম্পায়ন আর নাই, সত্যি নাই? ঝিম্! ঝিম্! ঝিম্! ঝিম্। অতিকষ্টে একটি কথা বাহির হইল—"কাদম্বরী! এ জীবনে আর তোমার সহিত দেখা হইল না।" ঐ শেষ কথা! ঐ শেষ কথার সহিত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। তরলিকা ও মহাশ্বেতা ধরাধরি করিয়া তাঁহার মৃতদেহ একখণ্ড শিলার উপর শোয়াইয়া রাখিল।

এদিকে পত্রলেখার মুখে চন্দ্রাপীড় আসিতেছেন শুনিয়া কাদম্বরী আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। পূর্ণচন্দ্রোদয়ে স্ফীত সমুদ্রের ন্যায় কাদম্বরীর বক্ষে আনন্দ-সিন্ধু মথিয়া উঠিল। প্রিয়তমের প্রত্যুদ্গমনের মানসে তিনি বাসক-সজ্জা নায়িকার বেশে সাজিলেন। তাহার পর মদলেখা ও পত্রলেখার হাত ধরিয়া জঙ্গম বসন্তঋতুর মতো তিনি মহাশ্বেতার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু ওকি? ওখানে পড়িয়া কে? জীবিতেশ্বর না? নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসিয়া কেন মহাশ্বেতা? প্রাণহীন যেন তরলিকা। দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইলেন কাদম্বরী; মূর্চ্ছিত পত্রলেখা। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কাদম্বরী নয়ন ভরিয়া চন্দ্রাপীড়কে দেখিলেন; মাটিতে পড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার পর সহমরণে যাইবার জন্য যেমন চন্দ্রাপীড়ের পা-দুখানি কোলে টানিয়া লইলেন—অমনি চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। বিদ্যুতের আলোকে সে-স্থান আলোকময় হইয়া উঠিল।

যেমনি আলোকের বিচ্ছুরণ, অমনি দৈববাণী! দৈব-বাণীর দুইটি বিবৃতি। একটিতে মহাশ্বেতার পুণ্ডরীকের সহিত মিলনের পূর্বোত্থিত দৈব-বাণীর সমর্থন; অন্যটিতে চন্দ্রাপীড়ের পুনরুজ্জীবন: চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর মিলনের কথা এবং চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত যত্ন-পরিচর্যার কথা। চন্দ্রাপীড়ের শরীরোদ্ভূত জ্যোতিঃস্পর্শে পত্রলেখার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। সে ত্বরিতপদে উঠিয়া ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া অচ্ছোদে ঝাঁপ দিল। অচ্ছোদের সলিল হইতে ভাসিয়া উঠিলেন কপিঞ্জল।

উপন্যাসের প্লটে এ পর্যন্ত যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, কপিঞ্জল তাহার Synthesis. পুণ্ডরীকের মৃত্যু, লম্পটব্রাহ্মণ-বেশী তরুণের বৈশম্পায়ন-পরিচিতি, চন্দ্রাপীড়ের চন্দ্রাবতারত্ব ও মৃত্যু, কপিঞ্জলের ইন্দ্রায়ুধ-অবতারত্ব—সবই কার্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া উঠিল। উপন্যাসের কাহিনী এখন নাটকের মত জম-জমাট। এই অংশে কপিঞ্জলের আত্ম-প্রকাশ কেবল বিগত কাহিনীর কার্য-কারণাত্মক সমন্বয় নহে, ভবিষ্যৎ সমাপ্তিরও কৌতূহল-বন্ধন।

গর্ভসন্ধিতে সঙ্কটের যেমন চরম অবস্থা, তেমনি বিমর্শেরও সূচনা এইখানেই।

মহাশ্বেতার নিকট বৈশম্পায়নের খোঁজে চন্দ্রাপীড়ের আগমনের পূর্বমুহূর্তেই মহাশ্বেতার অভিশাপে বৈশম্পায়নের তির্য্যকযোনিত্ব-প্রাপ্তি এবং বৈশম্পায়নের মৃত্যু-সংবাদে আহত চন্দ্রাপীড়ের দেহত্যাগ—নাটকীয় পরিস্থিতির চরম সঙ্কট-মুহূর্ত। বৈশম্পায়ন-চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু এবং দৈববাণী ও কপিঞ্জলের আবির্ভাবের মধ্যকার নিরাশ্রয় ফাঁকটুকুর অবস্থা চিন্তা করিলে সঙ্কট-মুহূর্তের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। ইহার পর ঘটনা আর চলিতে পারে না। চলিবার কোন সূত্রই আর অবসিত নাই। মহাশ্বেতার অতীত দিনের দৈববাণীর বৃন্তে-ঝোলানো মিলনের ক্ষীণ আশা যেন আজ কথার কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার সাধনার গুরুত্ব-কৃচ্ছ্রতা কাদম্বরী-কাহিনীর টানে লঘু হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সাধন-ভজন এখন ত্রিসন্ধ্যা-আহ্নিকের কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে। বর্তমানের দৈববাণী সেই ক্ষীয়মান আশাবন্ধকে জোয়ারের জলে টানিয়া আনিল। দীর্ঘায়মান প্রাপ্তির মহাশূন্যতায় কপিঞ্জলের বিবৃতি মহাশ্বেতার চিত্তে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। যাহার সহিত মিলনের আশায় সে শূন্য ভবিষ্যতের নিকট হাত পাতিয়া বসিয়া আছে, সেই-যে লম্পটের ছদ্মবেশে তাহারই কুটীর ঘুরিয়া গেল। তাহাকেই পাইবার প্রার্থনায় তাহার দ্বারাই যে সে শাপগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিল। শাপ বলিয়া সে-যে মাথার পারিজাত মালা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহার মতো অভাগিনী কে আছে! আগুন জ্বলিতে লাগিল মহাশ্বেতার বুকে ধক্ ধক্ লক্ লক্। সে-আগুনের ঝলকে তাহার চিত্ত-বীণার তারে বিলম্বমান দীর্ঘ দিনগুলি ধরিয়া যে মরিচা জমিয়া উঠিতেছিল, বুকের আগুনে তাহা পুড়িতে সুরু করিল। জাগিল হৃদয়ের নবীভূত আকুতি, জাগিল তপস্যার দ্বিগুণিত অনল। এ অনলে চিত্ত পোড়ে, তপস্যা পোড়ে। অতএব গর্ভ-সন্ধিতে যাহা ঘটিল, মহাশ্বেতার দিক হইতে তাহার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাদম্বরী? তাহার তো কোনো অপরাধ নাই! সে কেন এমন আঘাত পাইবে? চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রেমে যদি কোথায়ও কোন অপরাধ ঘটিয়া থাকে, তাহা চন্দ্রাপীড়ের চন্দ্রাবতারকে কেন্দ্র করিয়া। চন্দ্রাবতারে যে দোষ ঘটিয়াছে, চন্দ্রাপীড়-অবতারে তাহার শাস্তি হউক। তাহার জন্য কাদম্বরী দায়ী হইবে কেন? মিলনের মুখে সে এত বড় হৃদয়ছেঁড়া আঘাত পাইবে কেন? সত্য কথা। কার্য-কারণ সূত্রে কাদম্বরীর আঘাত পাইবার কোন যুক্তি নাই। কিন্তু প্রেমের জন্য যুক্তি আছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রেমের আদর্শ কেবল যৌন চেতনার প্রতিফল নয়; ইহা দুইটি দ্বৈত হৃদয়ের অদ্বৈত ভাব। 'শৃঙ্গার'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তলাইয়া দেখিলে বুঝা

যাইবে। তাহা ছাড়া রসাস্বাদের চরম-মুহূর্তে একটি মাত্র আস্বাদ। সেখানেও আস্বাদের দ্বৈত মূর্তি নাই। যৌন-আবেদন হইতে এ প্রেমের উৎপত্তি; যৌন-প্রেমের আঙ্গিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশ এ-প্রেমের উদ্ভেদে কিন্তু পরিণাম অদ্বৈত আনন্দানুভূতিতে। পঙ্কজের জন্ম পঙ্কে কিন্তু পঙ্কজ পঙ্ক নয়। সংস্কৃত-প্রেমে বিবর্তবাদ নাই, আছে পরিণামবাদ। প্রেমের এই আনন্দ-মধুর শুদ্ধপরিণতির জন্য—ইহার নিঃসীম পূর্ণতার জন্য তাপ চাই। ফুলের কুঁড়ি হইতে ফুল ফুটাইতে হইলে তাপ চাই, তপস্যা চাই। তাপের আগুনে কুঁড়ি ফুল হইয়া ফোটে, তপস্যার আগুনে কাম প্রেম হইয়া ফোটে। কাম যখন প্রেম হয়, তখন তাহার বিশ্বমূর্তি, তখন তাহার transcendental রূপ। সে অনন্ত, সে সত্য, সে শিব। সকলে মিলিয়া তাহার আনন্দময় রূপ। সে "রসো বৈ সঃ"। এই রসের জন্য, এই পূর্ণ প্রেমের জন্য, বিশ্বমুখিতা ও সমাজমুখিতার জন্য সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যতার জন্য তার চাই তপস্যা। কাদম্বরীর প্রেমের জন্য সেই তপস্যার প্রয়োজনে চন্দ্রাপীড়ের দেহত্যাগ।

তাহা হইলে দেখা গেল, কেবলমাত্র ঘটনার পারম্পর্য নয়, চিত্তভাবের পরিণতির জন্য এইরূপ সংকট-অবস্থা-সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজন।

তাহার পর বিমর্শ। বিমর্শের সূত্রপাত 'গর্ভে' না থাকিলে কার্য-কারণ টিকিবে কাহার জোরে? বিমর্শে ঘটনার সংকোচ। কাদম্বরী-উপন্যাসের বিমর্শের ৩টি দিক। একটি দিক বিগতপ্রাণ চন্দ্রাপীড়ের শূদ্রক-অবতার, দ্বিতীয়টি বৈশম্পায়নের শুকাবতার; তৃতীয়টি মহাশ্বেতার আশ্রমে মৃত চন্দ্রাপীড়ের রক্ষিত দেহ। এই তিনটি দিকের গ্রন্থিবন্ধন আবার মহাশ্বেতার আশ্রমে।

আমরা এই তিনটি দিকের আলোচনায় নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উপরে উঠিব।

মহাশ্বেতার আশ্রম এখন রীতিমত তপঃক্ষেত্র। একদিকে বৈদিক রীতিতে মহাশ্বেতার উগ্র তপস্যা; অন্যদিকে কাদম্বরীর বিলাস-কোমলা তান্ত্রিক তপস্যা। মহাশ্বেতা কিংবদন্তীর, তাহার প্রেম কিংবদন্তীর প্রেম। উপন্যাসে কিংবদন্তীর প্রেমের আভাস। তপস্যার উগ্রতা লোক-লোচনের অন্তরালে—একেবারে নেপথ্যে। পার্বতীর তপস্যার ছবি আঁকিবার এখানে বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই। মহাশ্বেতাকে পার্বতী করিয়া তুলিবার এখানে কোন তাগিদ নাই। মহাশ্বেতাকে ভালবাসি, পার্বতীকে ভালবাসিতে ভয় হয়। তিনি যে জননী। মহাশ্বেতা আমাদের নিত্য ঘরের অচরিতার্থ বাসনার নিত্যপ্রিয়া। তাহার প্রেমের জন্য তাপ চাই। তাহার তপস্যা তপস্যা নহে, তপস্যার ব্যঞ্জনা। এ ব্যঞ্জনার অর্থ

হৃদয়ে প্রেম-পূর্ণিমার জাগরণ ঘটানো ; মাটির প্রেমকে স্বর্গে তুলিবার তোড়জোড় ; দেহনিষ্ঠ রাঙা বাসনার স্বর্গীয় প্রেমের পীতবাসে শিঙার-সাধন। এর জন্য চাই তাপ ; চাই মানসিক সন্তাপ। সে-সন্তাপ বাহ্য না হইয়া মানসিক হওয়ায় তপস্যার ব্যঞ্জনা। যাহার ব্যঞ্জনাটাই মুখ্য, তাহার জন্য বাহিরে ঘটা করিয়া কী হইবে? তাই প্রেম-সন্ন্যাসিনী মহাশ্বেতা এখন অন্তরাল-বাসিনী। রঙ্গমঞ্চের সৌন্দর্য-পদ্মে যাঁহার প্রেম প্রত্যক্ষগোচর, তিনি কান্তা কাদম্বরী। রাজকন্যার বেশ ছাড়িয়া তিনি এখন সন্ন্যাসিনী হইয়াছেন। তিনি নিরম্বু, তিনি উপবাস-খিন্না। তাঁহার অকুণ্ঠ সেবাযত্নে পরিচর্যায় চন্দ্রাপীড়কে বাঁচাইতে হইবে। মৃতদেহের একটুও যেন বিকৃতি না ঘটে। কত দায়িত্ব! কত সতর্কতা! কত কৃচ্ছ্রতা, নিত্যসেবা, অতন্দ্রিত সেবা, নিরবচ্ছিন্ন সেবা। এতো মৃন্ময়, কাষ্ঠময়, ধাতুময় দেবতার উদ্দেশে নিত্যকর্মপদ্ধতিগত নিত্যনৈমিত্তিক পূজা নয় ; এযে জীবনের আকুতি দিয়া পূজা। মৃত প্রণয়ীকে কোলে রাখিয়া প্রণয়িনীর পূজা। এমনি পূজায় সাবিত্রীর রেকর্ড আছে, বেহুলার রেকর্ড আছে। কিন্তু তাতে এত মাধুর্য নাই, এত নিষ্ঠা নাই। অনূঢ়া যুবতীর কাছে যাহার দেহটি নিতান্ত কাম্য, বাসনার পাদপীঠ, প্রেমের বসন্তোৎসব, সে-দেহটিতে জড়াইয়া আছে কাদম্বরীর কামনা-বাসনা, শ্বাস-প্রশ্বাস, জীবন-মরণ, ইহকাল-পরকাল। ভাগ্যবতী কাদম্বরী! নয়নের উপর ভাসিতেছে প্রিয়তমের অবিকৃত কান্তিময় ভোগায়তন! চলে মার্জনা, স্নান ; পড়ে চন্দনের অনুলেপ ; পোড়ে ধূপ, পোড়ে ধূনা, পোড়ে অগুরু-কস্তুরী। গন্ধে-ঐশ্বর্যে, রূপে-লাবণ্যে অপরূপ প্রিয়তম! "জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু নয়ন না তিরপিত ভেল"। এ সৌভাগ্য বেহুলার ঘটে নাই। বিজন বনভূমি, শ্রাবণ-রাত্রির ঘনঘটা ; "দমকে দামিনী বারে বার"। "তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।" অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের মুখের দিকে! "তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি—ঐ যে আসে আসে আসে!" বিজন-অরণ্যের পত্র-কারাগারে-বন্দী পুষ্পিত গোলাপের মতো তাহার আশাবন্ধ! চন্দ্রাপীড় বাঁচিবে ; তাহার সহিত মিলন হইবে। এই আশাবন্ধের আসনে যে-পূজারিনী বসিয়া, তিনি ভৈরবী ; তিনি তন্ত্র-সাধিকা ; প্রেমের মন্ত্রে তিনি মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার করিবেন। সীমাহীন কাল এই আশায় দুই চোখ পাতিয়া রহিল।

বৈশম্পায়ন শুকযোনিতে জন্মিয়াছে। জাবালীর আশ্রমে তাহার পূর্ব স্মৃতি জাগিয়াছে। কপিঞ্জলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। মহাশ্বেতার কথা বিস্মৃত

যৌবনের মতো মনের সরোবরে ভাসিতেছে, নাচিতেছে। পাখী হইয়া উড়িয়া যাইব আমার সেই জন্মান্তরের প্রিয়ার কাছে। কিন্তু ডানা তো ভাল করিয়া ওঠে নাই। উড়িব কেমন করিয়া? কপিঞ্জলের নিষেধ আরও গুরুতর। পিতা তাহার প্রতিকারের জন্য পুণ্যকর্মে ব্রতী। পুণ্যকর্ম-পূর্তি পর্যন্ত এই আশ্রমে থাকিবার আদেশ। কিন্তু মন তাহার কোন উপদেশ, কোন আদেশ মানে না। কচি ডানা লইয়া সে লাফাইয়া লাফাইয়া চলে মহাশ্বেতার আশ্রমে। ধরা পড়ে ব্যাধের হাতে। আশ্রয় পায় নিষাদ-কন্যার স্বর্ণ-পিঞ্জরে। তাহার আহার রোচেনা, চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়ে, কাঁদে প্রাণ মহাশ্বেতার জন্য! জন্ম-জন্মান্তরীণ প্রিয়া মহাশ্বেতা!

"আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।"

বিদিশার রাজা শূদ্রক। চন্দ্রাপীড়ের অবতার। জন্মান্তরের আবরণে পূর্বস্মৃতি বিলুপ্ত। রাজাকে গল্প বলে পাখী বৈশম্পায়ন। বৈশম্পায়নের আত্ম-পরিচয় সনাক্ত করেন বৈশাম্পায়নের পূর্বজন্মের জননী লক্ষ্মী নিষাদকন্যার ভূমিকায়। স্মৃতির মন্থন চলে শূদ্রকের মনে: জাগে কাদম্বরীর ভালবাসা। আত্ম-সম্বিতের উদ্ধারে ঘটে মৃত্যু। পুণ্যকর্মের পূর্তিতে পুণ্ডরীকজন্মের নীড়ে ফিরিয়া চলে পাখী বৈশম্পায়ন।

অতএব গর্ভ-সন্ধিতে যেমন কাহিনীর কার্য-কারণভাব, তেমনি স্থায়িভাবের আরোহণ। কাহিনীর কার্য-কারণভাবের সমন্বয়ে দেখা দেয় দৈববাণী ও ইন্দ্রজাল[১] ইহারা কার্য-কারণেরই দৈবী পরিভাষা। জীবনের উপর দৈবের অকুণ্ঠ প্রভাব থাকায় জড় কার্য-কারণভাবেরই দৈবী-সংস্করণ।

বিমর্শ হইতে ঘটনার একটানা গতি উপসংহৃতিতে। উপসংহারের একমাত্র কাজ মিলন। এই মিলন আবার কেমন চমকপ্রদ বিস্ময়ভাবে দীপ্ত, তাহাও আলোচনার বিষয়। নাট্য-বিধানে উপসংহারে অদ্ভুতরসের উপস্থিতি থাকা চাই। অদ্ভুত রস ছাড়া বীর বল, শৃঙ্গার বল, কোন রসেরই চমৎকৃতি ঘটে না। আবার চমৎকার-প্রাণ না হইলে রস হয় না।

বসন্ত জাগিয়াছে অচ্ছোদের তীরে তীরে কূলে কূলে। জাগিয়াছে বনে-কান্তারে, বৃক্ষে-লতায়, পল্লবে-পুষ্পে; জাগিয়াছে প্রজাপতির বিচিত্র রঙের

(১) রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সৃষ্টির গতি চলে আকস্মিকের ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাপতালের লয়ে।"

পক্ষপাতে, ভ্রমরের গুণগুণানিতে। জাগিয়াছে কোকিলের গানে; জাগিয়াছে আকাশের আবীরে, বাতাসের গন্ধে; জাগিয়াছে পতঙ্গ-জগতে, পক্ষিজগতে, প্রাণিজগতে। জাগিয়াছে মানব-মানবীর মনে-মনে। আসন্ন মদনোৎসব। অচ্ছোদসরোবরে স্নান সারিয়া অনঙ্গদেবকে অর্ঘ্য দিয়া চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহকে স্নান করাইয়া মার্জনা করিয়া বিলেপন করিয়া ধূপ-ধুনা, গন্ধ-প্রদীপ জ্বালিয়া কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের মুখের দিকে অপলক-দৃষ্টিতে চাহিয়া। বসন্তের আবীরে রক্তাক্ত-যৌবনা কাদম্বরী। যৌবনের আবীর-ছটা মনে যাইয়া ফুটিতেছে। রোমাঞ্চিত কাদম্বরীর মন। প্রথম দয়িতস্পর্শের ন্যায় ভীত-ভীত-কম্পনে দেহে তাহার শিহরণের বিদ্যুৎ-বন্যা। সেই বন্যায় ভাসিয়া গেল বর্তমান; ভাসিয়া গেল বাস্তব জগৎ; ভাসিয়া গেল বস্তুজ্ঞান। দেশ ও কালের অতীতে এক মনোময় অনন্ত অনুভূতির তরঙ্গে তরঙ্গে বাজিতে থাকে হঠাৎ-জাগা জোয়ারের জলকল্লোল। থর থর অঙ্গ কাঁপে কাদম্বরীর; কাঁপে অধর, নাচে বুক; ধমনীতে নাচে রক্তধারা; হৃদয়ে নাচে স্পন্দন; শ্বাস-প্রশ্বাসে নাচে আকুলতার ঘূর্ণী হাওয়া। দেহের গ্রন্থি খসিয়া পড়ে; হানা দেয় মহাপ্রলয়! উচ্ছ্বাসের চরম বন্যায় ভাসিয়া-যাওয়া চন্দ্রাপীড়ের দেহকে বুকে চাপিয়া ধরে; ঝরে অজস্র চুম্বনের করকাপাত!

"ভয় কি ভীরু! এই তো আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি।" লজ্জার জড়সড় কাদম্বরী। ফিরিয়া আসে চেতনলোকে।

শাপমুক্ত চন্দ্রাপীড় শূদ্রকের দেহ ছাড়িয়া আপন পরিত্যক্ত দেহে সবে ফিরিয়াছেন, এই সংবাদে বিদ্যুতের চমক নাই; বিস্ময়ের মূকতা নাই; নাই অদ্ভুতরসে ভরা নাটকীয়তা; নাটকীয়তা আছে, বিস্ময়ের কারণ আছে প্লটের চন্দ্রাপীড়-উজ্জীবনের ব্যাপারে। চন্দ্রাপীড় ফিরিলেন আপন দেহে, বৈশম্পায়ন ফিরিলেন পুণ্ডরীকদেহে, কপিঞ্জল স্বদেহে! পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিজন-পরিচর সকলে ফিরিল। আজ "আনন্দ ওর!"[১]

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয়-পবন বহু মন্দা।[২]

---

(১) কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ —বিদ্যাপতি

(২) বিদ্যাপতি।

মিলনের কী রসোদ্গার! চন্দ্রাপীড় পাইলেন কাদম্বরীকে, পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাকে।

অতএব কী ঘটনার উপন্যাসে, কী ভাবের উদ্ভেদে কাদম্বরীর ঘটনা-বিন্যাস সার্থক। গ্রীকনাট্যতত্ত্বে ত্রিবিধ ঐক্যের কথা আছে;—Unity of time; Unity of place; Unity of action. পরবর্তীকালে Unity of action-এর মধ্যে সকলেই পর্যবসান লাভ করিয়াছে। ঘটনার ঐক্যই ঘটনাবৃত্তের 'সর্বসাধ্যসার'। কাদম্বরী-উপন্যাসে ঘটনার দুইটি বৃত্ত; একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ; প্রথম মৌলিক বৃত্তটি পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার বৃত্ত; গৌণবৃত্তটি কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের। গৌণ-বৃত্তের কাজ হইল মৌলিক বৃত্তটির পুষ্টিসাধন করা। সংস্কৃতের পরিভাষায় বলে আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক। আধিকারিক মৌলিক, প্রাসঙ্গিক গৌণ। কিন্তু উপন্যাসে দেখা যায় দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্ত সীবন-শিল্পে গাঁথা। মহাশ্বেতাকে কেন্দ্র করিয়া এই গ্রন্থি-বন্ধন। কাদম্বরী কি মহাশ্বেতার জীবনে এমনি অপরিহার্য? যিনি যোগাসনে পদ্মাসনে বসিয়াছেন; যিনি পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের সকল অনুরোধ, সজল চক্ষু নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন; তাহার সখিপ্রেম কি এতই বলবান্ হইল যে যোগাসন ছাড়িয়া সংসারাশ্রমে ঘুরিতে হইবে? বন্ধুবাৎসল্যের যুক্তি কিছু আছে বটে! একদিকে চন্দ্রাপীড়-বৈশম্পায়নের সখ্য, অপরদিকে কাদম্বরী-মহাশ্বেতার সখ্য। সখ্যভাবকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না বটে। কাদম্বরী-উপন্যাসে শৃঙ্গার, রস কিন্তু সখ্য, ভাব। সখ্যের জন্য সখ্য নয়, ঘটনা-উপন্যাসের জন্য সখ্য। তাই সখ্যভাব ঘনীভূত; রস-পদবীতে উঠিতে পারে নাই। সখ্যভাবকে যদি ঘটনাবন্ধের জন্য আনা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সংস্কৃত-সাহিত্যের ঘটনা-বিন্যাসের দাবি সে মিটাইতে পারে না। প্লটের objectivity-এর একটা কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে বটে, কিন্তু subjectivity-এর বিন্যাসে তাহার বলিবার কিছু নাই। তবে এমন হইল কেন? অনেকে দোষ দিবেন ভূষণভট্টের; বলিবেন বাণভট্ট জীবিত থাকিলে কী করিতেন, ভূষণভট্টের কৃতিত্ব দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায় না। আমরা বলিব, উহা আসল সমস্যাকে এড়াইয়া যাওয়া। কাদম্বরীর ঘটনার সহিত মহাশ্বেতা-কাহিনীর গ্রন্থি-বন্ধন তো বাণভট্টই করিয়া গিয়াছেন, ভূষণ সেই সূত্রপথেই অগ্রসর হইয়াছেন। উপন্যাসের পরিণাম ত্রুটিহীন; কিন্তু প্রাথমিক বন্ধ দুর্বল। সেই দুর্বলতার ফাঁক ভূষণভট্ট পূরণ করিতে পারেন নাই। উপায়ও ছিল না কিছু। তাহা হইলে ঢালিয়া সাজিতে হইত। উপন্যাসখানির ঘটনার সমীক্ষায় বেশ বোঝা যায়, মহাশ্বেতার কাহিনী লিখিতে লিখিতে কাদম্বরী-কাহিনীর ভূত তাঁহার কাঁধে চাপিয়াছিল। চাপিবার দুইটি কারণের কথা পূর্বেই

বলিয়াছি; হর্ষবর্ধনের রাজসভার প্রভাব ও মহাকাব্যের প্রভাব। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে পরে আসিয়া কাদম্বরী প্রথম পুরস্কার লাভ করে, দ্বিতীয়টি মহাশ্বেতার জন্য পড়িয়া থাকে। কাদম্বরী-ঘটনাবৃত্তের পূর্ণতা আছে; একটি একটি করিয়া পাঁপড়ি খুলিয়া সে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পদ্ম; তাহার আরম্ভ আছে, মধ্যবর্তী অবস্থা আছে, শেষ আছে। আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত একটি পূর্ণবৃত্ত কাদম্বরীর কাহিনী; আর মহাশ্বেতার কাহিনী "সেই" আরম্ভ, আর "এই" সমাপ্তি। মাঝখানের অবস্থায় মস্ত বড় একটা ফাঁক। সে-ফাঁক পূরণ হয় নাই; হইবার মত কোন ঘটনা নাই। অন্যত্র যেটুকু আছে, তাহাও মহাশ্বেতার জীবনের কোন অংশেরই পরিপূর্ণ চিত্র নয়। একটা out-line মাত্র। ঘটনার যেমন ত্বরিত বেগ, তেমনি অসম্পূর্ণতা। অতএব মহাশ্বেতার রূপবর্ণনার মধ্যে যেমন গোটা মহাশ্বেতাকে পাওয়া যায় না, তেমনি পাওয়া যায় না, তাহার জীবনের কোন অংশের সামগ্রিকতার ছবি।

সেই কারণে কাদম্বরী-চিত্রের সম্পূর্ণতায়, জীবনের নিখিলস্তরের আনুপূর্বিক বিন্যাসের সামগ্রিকতায় রস-পিপাসু পণ্ডিতগণ এমনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা কেবল তাঁহাদের সহৃদয়ত্বের অনুভূতির মেজাজে চন্দ্রাপীড়কে নায়ক করিয়া বসিলেন, নায়িকা করিলেন কাদম্বরীকে। আমাদের প্রশ্ন, সত্যই কি চন্দ্রাপীড় নায়ক? কাদম্বরী নায়িকা? আমাদের সন্দেহ হয়, মোটের উপর কাদম্বরী উপন্যাসে নায়ক আছে কি না?

নায়ক-লক্ষণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন:

ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোক স্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান্নেতা॥ ৩০।

সাঃ দঃ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বৃত্তিতে বলিতেছেন—"এবমাদিগুণ-সম্পন্নো নেতা নায়কো ভবতি।" তাহা হইলে বিশ্বনাথের মতে ঘটনার নেতা হইলেন নায়ক। ঘটনার নেতার কি কি গুণ থাকিবে সামান্যতঃ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক 'নায়ক' ও 'নেতা'— এই শব্দ-দুইটির ব্যুৎপত্তি কি? নী (লইয়া যাওয়া)+তৃণ্‌ ক=নেতৃ, প্রথমার একবচন—নেতৃ-শব্দের ব্যুৎপত্তি; নায়ক-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইল—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক ক। অতএব নায়ক ও নেতৃ-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মূল অর্থ হইল পরিচালনার ক্ষমতা—স্বাধীন ব্যক্তিত্বের দ্যোতনায় পরিচালনা! কিসের পরিচালনা? ঘটনার। কাদম্বরী-কাহিনীর ঘটনা চন্দ্রাপীড়ের নেতৃত্বে ঘটে নাই, ঘটিয়াছে আপন স্বভাবে। বরং বলা যায় ঘটনাই ঘটনার নায়ক। যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা

ঘটনাবীজের আত্মিক প্রকাশ। অতএব চন্দ্রাপীড়ের তাহাতে বাহাদুরী কিছু নাই। বরং ঘটনার স্রোতে স্রোতের-ফুলের মতো চন্দ্রাপীড় ভাসিয়া গিয়াছেন। ঘটনার নায়কত্ব চন্দ্রাপীড়ে নাই। অতএব চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরী-উপন্যাসে নায়ক বলা চলে না। নায়ক না হইলে একান্তই যদি না চলে, তবে বলিব, দৈবই নায়ক। আবার নায়কের স্ত্রীলিঙ্গে নায়কের স্ত্রী বলিয়া যদি কেহ নায়িকা হয়, তাহা হইলে সে-তো বিচারের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু যদি এমন হয়, নায়ক নাই অথচ নায়িকা আছে, তাহা হইলেও সেই নায়িকা-মেয়েটির পক্ষে ঘটনা-পরিচালনার ক্ষমতা থাকা চাই। আবার এমনও হইতে পারে, নায়ক নাই, নায়িকা নাই, অথচ উপন্যাস বা নাটক দস্তুর মতো আছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঘটনাই ঘটনার নায়ক। আবার নায়কত্ব দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই, অথচ কাহিনীর বৃহত্তম অংশ যিনি দখল করিয়াছেন, এবং অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে যাহার চরিত্র প্রোজ্জ্বল ও ঐশ্বর্যময়, তাহাকেও যে অনেক সময় নায়ক বলা হইয়া থাকে, ইহা শিথিল ভাবে বলা। তাহারও নায়কত্বের যথার্থ যোগ্যতা নাই। একটা কিছু বলা তো চাই, তাই বলা। অতএব কাদম্বরী-উপন্যাসে নায়কও নাই, যথার্থ নায়িকাও নাই। কিন্তু ঘটনা তো আছে। অতএব ঘটনাই নায়ক। কিন্তু এই ঘটনার কেন্দ্রবক্ষে কে? যদি কেন্দ্রবক্ষে এমন কাহাকেও পাই, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া নিখিল ঘটনার সপ্তপদী গমন ঘটিয়াছে, তাহা হইলে তিনি না হইলেন বা নায়ক বা নায়িকা, উপন্যাসের ঘটনায় তাঁহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইব। কে সে? তিনি মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা-বৃত্তের কেন্দ্রভূমি যে মহাশ্বেতা, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কাদম্বরী-বৃত্তেরও কেন্দ্রভূমি যে মহাশ্বেতা, তাহা বুঝাইয়া বলিবার আছে। মহাশ্বেতার আশ্রমেই চন্দ্রাপীড়ের সহিত মহাশ্বেতার আলাপ-পরিচয়। মহাশ্বেতাই চন্দ্রাপীড়কে সঙ্গে করিয়া গন্ধর্ব-নগরে গমন করেন এবং পূর্বরাগ-সমাপ্তি পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। বৈশম্পায়নকে খুঁজিতে খুঁজিতে চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার আশ্রমে আসেন এবং সেই আশ্রমেই পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত তাঁহার শবদেহ রক্ষা করা হয়। কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের প্রত্যুদ্গমনের জন্য মহাশ্বেতার আশ্রমে আসেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। পত্রলেখা ও তমালিকা কাদম্বরীর সহিত মহাশ্বেতার আশ্রমে আসেন। দৈব-বাণী ঘটে মহাশ্বেতার আশ্রমে। মহাশ্বেতার আশ্রম হইতেই ইন্দ্রায়ুধের সহিত পত্রলেখা অচ্ছোদের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইন্দ্রায়ুধ-অবতার-মুক্ত হইয়া কপিঞ্জল মহাশ্বেতার আশ্রমে আসেন। একদিকে তারাপীড়-বিলাসবতী, শুকনাস-মনোরমা ও তাহাদের পরিজন-

পরিচর, অন্যদিকে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও তাহার পত্নী স্বজন-অনুচর লইয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে আসেন। তারাপীড়ের দল অচ্ছোদের তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া সন্ন্যাস-জীবন যাপন করেন এবং মাঝে মাঝে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ দেখিয়া যান। শাপান্তে শূদ্রকদেহ ছাড়িয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে রক্ষিত মৃতদেহে চন্দ্রাপীড় ফিরিয়া আসেন এবং শাপমুক্ত পুণ্ডরীক কপিঞ্জলের সহিত আকাশপথে মহাশ্বেতার আশ্রমেই প্রত্যাবর্তন করেন। শাপান্তে উজ্জয়িনী-নগরী, কিন্নর-নগরী, গন্ধর্ব-নগরীর যে যেখানে আছে, সকলেই মহাশ্বেতার আশ্রমে মিলিত হয়। অতএব কাদম্বরী-বৃত্তে অচ্ছোদসরোবর লইয়া মহাশ্বেতার আশ্রমের কেন্দ্রটির যে বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন মহাশ্বেতার বৃত্তটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

অচ্ছোদ-সরোবরের তীরে ঋষিকুমার কপিঞ্জল ও পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতার প্রথম দর্শন। ঐখানেই তাঁহাদের পূর্বরাগের উদয়। অচ্ছোদের লতাকুঞ্জে চন্দ্রকান্ত-মণিশিলায় শয্যা পাতিয়া অনঙ্গ-তপ্ত পুণ্ডরীক অভিসারিকা মহাশ্বেতার প্রতীক্ষায় কালযাপন করেন। ঐখানেই তরলিকার সহিত মহাশ্বেতার আগমন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে মহাপুরুষ অবতরণ করিয়া ঐস্থান হইতেই পুণ্ডরীকের শব দেহ লইয়া আকাশে ওঠেন! অচ্ছোদের আকাশ হইতেই পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার মিলনের দৈববাণী হয়। অচ্ছোদের লতাকুঞ্জ হইতেই কপিঞ্জল লাফ মারিয়া মহাপুরুষের অনুসরণ করেন। বৈশম্পায়ন-জন্মে অচ্ছোদের তীরস্থিত রিক্ত শিলাতল দেখিয়া বৈশম্পায়নের মনে বৈরাগ্য জন্মে। চন্দ্রাপীড় কিন্নর অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া অচ্ছোদের জলপান করেন। অচ্ছোদের তীর হইতেই মহাশ্বেতার সঙ্গীত শুনিয়া মহাকাল-মন্দিরে গমন করেন; আবার বৈশম্পায়নের অনুসন্ধানে অচ্ছোদের তীরস্থিত বনভূমি সঞ্চরণ করেন। বৈশম্পায়ন পূর্বজন্মের প্রিয়াকে খুঁজিতে খুঁজিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহাশ্বেতা-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তির্যগ্-যোনি প্রাপ্ত হন। অতএব কী কাদম্বরী-বৃত্তের দিক্ দিয়া, কী মহাশ্বেতা-বৃত্তের দিক্ দিয়া মহাশ্বেতা উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি। অতএব দেখা গেল, ঘটনার গুরুত্ব উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীগণের মধ্যে একা মহাশ্বেতার। অতএব যে unity of action-এর কথা বলিতেছিলাম, কাদম্বরী-উপন্যাসে তাহা কেন্দ্রগত। শুধু তাই বা কেন? কাদম্বরী-উপন্যাসের নামকরণের যোগ্যতাও একা মহাশ্বেতার। নায়ক বা নায়িকার নামকরণ হইতে সাধারণতঃ নাটক-উপন্যাসের নামকরণ হইয়া থাকে। যেখানে নায়ক-নায়িকার সন্ধান দুষ্কর, ঘটনাই যেখানে নায়ক,

সেখানে সাধারণতঃ নামকরণ হইয়া থাকে চরিত্রের ব্যাপ্তির দিক দিয়া। সে ব্যাপ্তি মহাশ্বেতার যেমন আছে, আর কাহারও তেমন নাই। বিশেষতঃ কাদম্বরী তো late comer. অতএব উপন্যাসের নামকরণ কাদম্বরী না হইয়া মহাশ্বেতা হওয়া উচিত ছিল। যে-কারণে বাণভট্ট কাদম্বরী-বৃত্তের প্রাধান্য দিয়াছেন, সেই কারণই নামকরণের দুর্বল কারণ। তাহার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। ইহার পশ্চাতে অন্য কোন যুক্তি নাই।

চরিত্রায়ণ

আধুনিক সাহিত্যে প্লটের সহিত চরিত্রের আত্মিক যোগ। প্লটের মূলতত্ত্বটি হইল গতির আবেগ। যেমন সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে, তেমনি কবি-প্রজাপতির কাব্যসৃষ্টির মূলে। সৃষ্টির পূর্বে যখন জগৎ ছিল না, তখন ছিল আকাশে ছিন্ন ভিন্ন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মেঘ-খণ্ডের মতো ভাসমান গ্যাস। তাহারা আকাশে ভাসিত—কতকাল ধরিয়া যে ভাসিত, তাই বা কে জানে। তাহাদের মধ্যে ছিল না কোন সাড়া, কোন স্পন্দন, কোন গতি, কোন প্রাণ। কেবল ভালো মানুষটির মতো ভাসিত। ভাসিতে ভাসিতে এককালে যখন পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; আবিষ্কৃত হইল গতি, ফুটিল স্পন্দন, বাজিল প্রাণের অনুরণন; জাগিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আবির্ভূত হইল নিয়মের ছন্দ; সেই ছন্দে নাচিয়া উঠিল সৃষ্টির অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টির প্রাথমিক পর্বে ছিল শুধু গতি; গতির আবেগ; শুধু ছুটিয়া চলা, ধাইয়া চলা, আর কিছু নয়। তাহার পর "(১) বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে পুঞ্জ-পুঞ্জ বস্তু-ফেনা উঠে জেগে।" সৃষ্টিতত্ত্বে বস্তুহীন প্রবাহ হইতে যেমন বস্তু-ফেনার জাগরণ, তেমনি নাটকে বা উপন্যাসে এ্যাকশনের গতিবেগ হইতে জাগে ঘটনার নীড়ে

(১) "হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
(ক) বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু-ফেনা উঠে জেগে;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণ-স্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।"

—রবীন্দ্রনাথ; 'চঞ্চলা'

চরিত্র-চক্রের আবির্ভাব। যেখানেই গতি, সেখানেই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের আঘাতে আঘাতে গতির আলোকবিচ্ছুরণ। ঘটনা-চক্রের মৌলিক মধ্যবর্তী বিন্দুতে আছে সেই দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায় কতকগুলি গোটা মানুষ—প্রবৃত্তি-নিচয়ের সমবায়ে গঠিত কতকগুলি আস্ত মানুষ। ঘটনা-চক্রের মৌলিক মধ্যবর্তী বিন্দুতে আবির্ভূত দ্বন্দ্ব নামিয়া আসিয়া চরিত্রগুলির মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং চরিত্রগুলিকে দুইটি বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে ; যেন দ্বন্দ্ব-বিন্দুর এপারে একদল, ওপারে একদল। এই দুই দলের মধ্যে বাজে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষ। জন্ম লয় ঘটনা। ঘটনার সহিত চরিত্রের জাগে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ঘটনা যেমন চরিত্রের উপর আঘাত হানিয়া তাহার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির ফুল ফুটায়, তেমনি চরিত্রও আবার সেই ফোটাফুলের বর্ণে-গন্ধে ঘটনাকে দেয় নূতন চলার বাণী, আলিপনায় আঁকিয়া তোলে নূতন যাত্রা-পথ। তাই বলিতেছিলাম, প্রত্যেকটি চরিত্রের যেমন আছে ব্যক্তি-স্বত্ত্বা, তেমনি আছে ঘটনাও ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আঘাতে আঘাতে উদ্ভিন্ন-করিয়া-তোলা কাহিনীর শিল্পসম্মত বেগপ্রধান design বা কাঠামোর নাম প্লট। আর চরিত্র, সেই গতির কোরক। কোরক হইতে ফুলের অভিব্যক্তি, ফুল হইতে গন্ধের সৌন্দর্য ও পরিণামী ফলের আস্বাদ। আধুনিক সাহিত্যে তাই চরিত্রের ফলশ্রুতি হইল অনির্বচনীয় আস্বাদ ; জীবনের বিচিত্র আবিষ্ক্রিয়ার আস্বাদ। এই-যে দেবসম্পর্কশূন্য মানব-সত্য জীবনের বিচিত্র নূতন আবিষ্ক্রিয়ার আস্বাদ, এই আস্বাদের স্রষ্টা শেক্‌স্‌পীয়র ; এই সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা ইংলণ্ডের নব-জাগৃতি বা রেনেশাসের যুগে। কর্মে ও জীবনে, আশায়-আকাঙ্ক্ষায়, নব নব অভিযানে তখন নূতন আবিষ্কৃতির ঢেউ খেলিতেছে। সেই ঢেউয়ের প্রচণ্ড আঘাত আসিয়া পড়িল সাহিত্যের মানুষের বুকে। তখন মানুষই সত্য ; 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। "Humanity is God" সেই সত্য, অনির্বচনীয়, অসীম, বিচিত্র মানুষের পায়ের তলাকার জমিনটুকু হইল বাস্তবতা। "শেক্‌স্‌পীয়রের চোখে মানুষ তত্ত্বে-গড়াও নয়, ভাবে-গড়াও নয়। এমন কি মানবিক দোষগুণের কৃত্রিম দৃষ্টান্তও নয়, বরং একটা জীবন-রহস্য। প্রতি মানুষই অনন্য ; আবার বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে স্বভাব ও পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতে তার বিশিষ্ট প্রকাশ। চরিত্র 'চিরস্থির' হলেও এ-রূপেই চির প্রকাশমান। গতি-জীবন যেমন বিচিত্র, তেমনি অজস্র মানুষের রূপ। জীবনের পুনরাবর্তন নেই, মানুষেরও নেই পূর্বানুবৃত্তি। এক দিকে বিষয়ের প্রতিক্ষণের বিচিত্রতা, অন্যদিকে প্রতি-চরিত্রের বিচিত্রতা—শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টি-

-প্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই[১]খানে।"— শেক্‌স্‌পীয়রের অঙ্কিত প্রতিটি মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন্ত, অদ্বিতীয় ও সত্য। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ চরিত্র সত্য। বিশেষ পরিস্থিতি ও চরিত্রের সংযোগে সত্যের মূর্ত প্রকাশ।

বাস্তব-সত্য এই মানুষ ক্রমে ব্যক্তিরূপে ধরা দিল সাহিত্যে। তাই আধুনিক সাহিত্যে আখ্যায়িকার নায়ক হইল individual বা ব্যক্তি। "সে[২]-ব্যক্তি কোন economic বা political অথবা religious শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, সে নিজেরই প্রতিনিধি।" আধুনিক সাহিত্যের এই ব্যক্তিত্ববাদেরও পটভূমি আছে। "উনবিংশ[৩] শতাব্দীতে নিত্য নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে দেখা দিতে লাগিল নিত্য অগ্রগতি; এই অগ্রগতির অনিবার্য প্রভাব পড়িল বাণিজ্যের বাজারে; সেখানে দেখা দিল পরস্পরগ্রাসী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা; এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সৃষ্ট হইল 'অবাধ বাণিজ্য'। এই অবাধ উৎপাদন এবং 'অবাধ-বাণিজ্য' ক্যাপিটালিজম্-এর ভিতরে যে একটা চরম রূপ ধারণ করিল, তাহা মানুষকে তাহার সমাজরূপ মাতৃদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়া দিতে লাগিল। সমাজ-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র না হইতে পারিলে, অবাধ উৎপাদন এবং অবাধ বাণিজ্যের চরম ফল ভোগ করা যায় না। সুতরাং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থনের জন্যই আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিতে লাগিল এই স্বাতন্ত্র্যের জয়গান। পুঁজিবাদ-প্রসূত এই যে স্বাতন্ত্র্যের জয়গান, ইহাই উনবিংশ শতাব্দীর সকল কলা-কৈবল্য এবং শিল্পীর একাকিত্ব এবং অসঙ্গত্বের মূলে। কারখানার মালিক যে, তাহার আত্ম-রক্ষার জন্য চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ, রাজা-মহারাজা, জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির আত্ম-রক্ষার জন্য চাই এই স্বাতন্ত্র্যবাদ; এই স্বাতন্ত্র্যবাদকে ফলাও করিয়া তুলিবার জন্য পিছনে চাই আবার দৈব অধিকারের সুযোগটি; নতুবা যে সকলের সঙ্গে সমানে ভাগ করিয়া ভোগ-করিবার একটা প্রশ্ন ওঠে।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই পরিস্থিতির মূলে ছিল শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা; পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় বড় হইবার, ধনী হইবার তাগিদ। যিনি বড় হইলেন, তিনি সমাজকে ছাড়িয়া আত্ম-ঐশ্বর্য সমাজের মধ্যে বিলাইয়া না দিয়া দশকে ছাড়িয়া এক হইয়া উঠিলেন। সেই এক হইলেন যুধ্যমান ব্যক্তি-সমূহের

---

(১) ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা; গোপাল হালদার।

(২) বা, সা, ই।

(৩) শিল্পলিপি, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

আদর্শ। সাহিত্যে সেই আদর্শের ছায়া পড়িল। অতএব আধুনিক সাহিত্যের বাস্তবনিষ্ঠ ব্যক্তিটির উপরও যে আদর্শের সোনার কিরণ আসিয়া পড়িল, সে সম্পর্কে তর্ক তুলিবার আর কোন সুযোগ নাই। এই ব্যক্তিটির সুঠাম রূপ গড়িবার জন্য কবির নির্বাচন-শৈলী। মানুষ যত বাস্তবই হউক না কেন, তাহার মধ্যে নব আবিষ্ক্রিয়ার যত চমৎকারিতাই থাকুক না কেন, যতই "তিলে তিলে নূতন হোয়"[১] না কেন, তাহার সেই বাস্তবের সবখানি কাজে লাগিল না। আবিষ্ক্রিয়ার চমৎকারিতা জাগাইবার জন্য বাস্তবের পুষ্পোদ্যান হইতে বাছিয়া বাছিয়া মানুষের শক্তির—মানুষের শ্রম-যত্ন-আকাঙ্ক্ষার—মনের মত ফুলগুলি লইয়া কবিকে মালাকরের ভূমিকায় নামিতে হইল। অতএব সাহিত্যের ব্যক্তি হইলেন বস্তুনিষ্ঠ নির্বাচন-সৌষম্যের অনির্বচনীয় আনন্দঘন আদর্শ। বস্তুমাত্রই সাহিত্য নয়। বস্তুকে সাহিত্য হইতে হইলে কবিমানসের মানস-সরোবরে ডুব দিয়া সপ্তর্ষির কিরণ-মালায় মণ্ডিত হইতে হইবে। ফুলের মালাগাছি ছিঁড়িয়া ফেলুন, অনুসন্ধান করুণ ঐ মালার প্রত্যেকটি ফুল কি একই পুষ্পশাখার একই বৃন্তে একযোগে এক-পেয়ালায় সূর্য-রশ্মির অমৃত পান করিয়া জীবনোচ্ছ্বাসের মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল, না পুষ্পবাটিকার নানা বৃক্ষের নানা বৃন্তে জন্মিয়া ছিল? মালাকর বৃক্ষবাটিকার পুষ্পবন গাহন করিয়া নানা বৃক্ষের নানা ফুল চয়ন করিয়া সামঞ্জস্য ও সৌষম্যের প্রেরণায় মালা গাঁথিয়া তোলেন। আমরা সেই মালায় জীবনের তাপ ভরিয়া, হয় দেবতার কণ্ঠে, না হয়, প্রিয়জনের গলায় ঝুলাইয়া দি। কবিমালাকরের প্রতিভার হাতে-গাঁথা এই মালাটি আধুনিক সাহিত্যের চরিত্র, আধুনিক ব্যক্তিটি। এই ব্যক্তিটির গায়ে যদি পৃথিবীর দুর্বলতার ছায়া পড়িয়া থাকে, থাকুক; চাঁদে যদি কলঙ্ক দেখা দেয় দিক, সৌন্দর্য-প্রেমের নাগপাশে ফুলের অনাবৃত বুকে যদি বিষাক্ত সর্প বাঁধা পড়িয়া থাকে, থাকুক, গন্ধ-মাল্যের ফুলের উপর যদি তরবারি-হাতে ভ্রমর বসিয়া থাকে, থাকুক, তবুও তাহারা সুন্দর, তাহারা অভিনব, তাহারা জীবিত ও বাস্তব। কবির প্রতিভাগুণে কলঙ্কও চাঁদের সহিত সাজাত্য লাভ করে।[২] তেমনি অসুন্দর ও

(১) "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু রাগবাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥ —কবিবল্লভ

(২) "A Character universalised may, if regarded alone, still be 'ugly', and yet it may contribute to the beauty of the whole, In that sense we can continue to call it 'ugly' only by a kind of abstraction. Or to put it otherwise,—evil regarded in its essential nature may be ugly; but, shown in the action of the comedy to be

কুৎসিত সাহিত্যে সুন্দরে রূপান্তরিত হয়।[১] অতএব সমাজ ছাড়া ব্যক্তির ঠাঁই নাই এবং সাহিত্যের ব্যক্তিটি সমাজ-সম্পূর্ণতার এক সৌন্দর্যময় প্রকাশ। এই প্রকাশের রহস্য কবি-প্রতিভার বিজ্ঞানে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, বস্তুনিষ্ঠ সমাজ হইতে বস্তুনিষ্ঠ মানুষটিকে কুড়াইয়া লইয়া সমাজের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী প্রয়োজনমত চয়ন করিয়া তাহাদের একত্র সংহতির ফলে সাহিত্যিক ব্যক্তিটির জন্ম হয় নাই, জন্ম হইয়াছে আদর্শ-বিলাসী কবি-মানসের কল্পনায়। ছাঁচে ঢালিবার সময় ঐ আদর্শ-কল্পনার যতই বস্তুনিষ্ঠ রূপই প্রকাশ পাক না কেন, তার ব্যঞ্জনায় আছে কবির ভাবাদর্শ-সর্বস্বতা। তাই বস্তুধর্মের মায়ায় তাহাকে বাস্তব বলিয়া মনে হইলেও সে খাঁটি বস্তু নয়, আবার একেবারে অবস্তুও নয়, সে আদর্শের—'স্বপ্নের—সৌন্দর্যেরই বস্তুশ্রয়ী মায়ারূপ। সে রোমান্টিক।

আধুনিক আখ্যায়িকার নায়ক যেমন individual বা ব্যক্তি, সংস্কৃত আখ্যায়িকার নায়ক তেমনি type বা প্রতীক। ইহারা ভাবের প্রতীক। মানুষের মনে অসংখ্যভাব; সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গের মতো এই ভাবগুলির উন্মজ্জন-নিমজ্জন চলিতেছে। প্রাথমিকপর্বে ইহাদের দুইভাগ—স্থায়ী ও অস্থায়ী। স্থায়ীগুলি চিরকাল মানুষের মন আঁকাড়াইয়া থাকে; অস্থায়ীগুলি তরঙ্গের মতোই ওঠে, নামে, বিলীন হইয়া যায়। প্রাচীনেরা তাই স্থায়িত্ব-অস্থায়িত্বের নিরিখে ভাবের প্রাথমিক ভাগ করিলেন—স্থায়ীভাব ও অস্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব আজন্ম-সহচর, কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো। দেহ-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা দেহের মধ্যে উৎসারিত হয়। আধুনিকদের মধ্যে যাঁহারা পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না তাহারা বলেন, এই স্থায়ী ভাবগুলি (Permanent emotions) ঐহিক; প্রাচীনেরা বলেন, বাসনালোকে ইহাদের বাস; ইহারা যেমন এ জন্মের, তেমনি পূর্বপূর্ব জন্ম-জন্মান্তরের বাসনার ফলশ্রুতি। সংস্কৃত সাহিত্যে যতগুলি রস ততগুলি স্থায়ী-

---

nugatory and ridiculous, it ceases to be ugly; it is an element in a fact which is beautiful." S. H. Butcher; Theory of poetry and fine art. p. 373

(১) "এমন কথা মনে হতে পারে, সাবেক কালের কাব্যনাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক-একটা টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা একই জাতীয় অনেকগুলি মনুষের ভাঙাচোরা উপকরণ নিয়ে তৈরী। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত। প্রথম কথা এই যে, ব্যক্তিগত মানুষের শ্রেণীগত ভিত্তি আছে, একান্ত শ্রেণী বিচ্ছিন্ন মানুষ নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে বহু মানুষ, আর সেই সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সেই এক মানুষ, যে বিশেষ। চরিত্র সৃষ্টিতে শ্রেণীকে লঘু করে ব্যক্তিকেই যদি বা প্রাধান্য দি তবু সেই ব্যক্তিকে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অধিগম্য করতে হলে তাতে আর্টিস্টের হাত পড়া চাই।" সা. প; ১৬১

ভাব। ইহাদের মধ্যে আবার আদিম এবং সর্ব-জীব-সামান্য হইল শৃঙ্গার-রসের স্থায়ীভাব বাসনাখ্য রতি। সংস্কৃত-কবিরা সকল রসের মধ্যে শৃঙ্গারের প্রাধান্য দিয়াছেন বেশী। কারণ, মানব-মনে ইহার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন। তাই শৃঙ্গার-রস আদিরস নামে প্রখ্যাত।

আমাদের বক্তব্য, সংস্কৃত-সাহিত্যের শৃঙ্গার-রসের সম্পর্কে আধুনিকেরা উন্নাসিক। ইহা ইতর, অশ্লীল; ইহার গায়ে কাম-গন্ধ; প্রেমের সোনালী সৌন্দর্য, সৌন্দর্য্যানুভূতি, বিশ্বজনীন কল্যাণী মূর্তি ইহার নাই, আত্ম-বিলোপী প্রেম-ধর্মের বিশ্ব-গ্রহিতা নাই, নাই প্রকৃতির সহিত[১] সাযুজ্য ও সার্ষ্টি, নাই মানবতা, মানবতার অখণ্ড চেতনা। ইহা কাম-দাহের অভিশাপে জড়ত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খল। আবার যেমন শৃঙ্গারের রতিভাবের, তেমনি অন্যান্য স্থায়ীভাবের কেবল ভাব-সর্বস্বতা। বাস্তবতার কোন গন্ধ নাই। চরিত্রও অবাস্তব; কেবল ভাব-রূপের সর্বস্বতা।

আমরা বলিতে চাই শৃঙ্গারের পরিণাম অলৌকিক অবাস্তব হইলেও বাস্তবতা উহার বারো আনা। ভারতীয় জীবন-পটভূমিকায় ইহার বাস্তবতার সাক্ষ্য আছে। আমরা বৈদিক যুগ হইতে ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-যুগের মধ্যদিয়া ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সাহিত্যিক প্রেমের পটভূমিতে বাস্তব প্রেমের অফুরন্ত চাষ ছিল। সেই চাষের চাহিদায়ই ভারতের কামশাস্ত্রের চর্চা; কামশাস্ত্রের বিজ্ঞানুশীলনের ফলে বাৎসায়নের আবির্ভাব, আবির্ভাব কামসূত্রের। পৃথিবীর সর্বজাতির যৌন-বিজ্ঞানের আদিমরূপ বলিয়া কামশাস্ত্র দাবি করিতে পারে। সেই কামশাস্ত্রের ভিত্তিতেই অলঙ্কার-শাস্ত্রের রস-প্রকল্প।

মানুষের মতো বাস্তব আর কিছুই নাই, একথা যেমন পাশ্চাত্ত্যেরা বুঝিয়াছিলেন, তেমনি প্রাচ্যেরাও বুঝিতেন। পাশ্চাত্ত্যের বোধ জড়-বিজ্ঞানে নামিয়া আসিল, প্রাচ্যের বোধ জড়কে অবলম্বন করিয়া চৈতন্যে মহাপ্রয়াণ করিল। পৃথিবীর সকল জাতির সকল বোধ তাহাদের জীবন-বোধের উপর। পাশ্চাত্ত্যের জীবন-বোধ প্রাচ্যের জীবন-বোধ হইতে স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্ত্যের জীবন ঐহিক, প্রাচ্যের জীবন সার্বলৌকিক,—লক্ষ লক্ষ জন্ম-মৃত্যুর মালায়-গাঁথা এক অখণ্ড জীবন-প্রবাহ। সেদিনের কবি রবীন্দ্রনাথও এই জীবন-প্রবাহে বিশ্বাসী ছিলেন।

---

(১) সাযুজ্যম্—সহযোগঃ। একত্বম্। তৎ তু পঞ্চধা মুক্ত্যন্তর্গত মুক্তিবিশেষঃ।

যথা-সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।

ইতি শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ঃ।

যাহা বলিতেছিলাম, প্রাচীনকাল হইতে ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত যে বাস্তব প্রেম-চেতনা যুগেযুগে ভাবের পিচকারী হাতে লইয়া রঙ্ খেলিয়াছে, তাহার আদিম বাস্তববোধ কোথায়? নর-নারীর মিলনে মানুষ যে দৈহিক আনন্দের স্বাদ পাইল, আনন্দের সেই আদিম বোধ হইতেই পুরুষ-নারীর পরস্পরের প্রতি এত আকাঙ্ক্ষা, এত কামনা, এত বাসনা। সেই আদিম বোধের দুঃখ, এই দেহ-নিষ্ঠ ক্ষণিক আনন্দকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা জাগিল মনে; দেহের কোন্ উৎসে এই আনন্দ-স্থান? ইহা কি দেহের বিশিষ্ট স্থানের, না, সর্ব দেহাবগাহী? এ-আনন্দের উপলব্ধিতে তো দেহ থাকেনা, কেবল আনন্দ থাকে। এ আনন্দ জড়, না, চৈতন্য? না, জড়-চৈতন্য? জাগিল জিজ্ঞাসা[১]। এই জিজ্ঞাসা কেবল কামশাস্ত্রের জিজ্ঞাসা নয়, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্র-শাস্ত্রেরও ঐ জিজ্ঞাসা। যোগ ও তন্ত্রের অনুসন্ধানের পথ বিভিন্ন; কামশাস্ত্রের পথও বিভিন্ন। সামনের উপর পাইল বাস্তব মানুষকে। ঐ মানুষের দেহ ও মন লইয়া তাহারা গবেষণা আরম্ভ করিল। এ-যুগের ডাক্তারি বিদ্যায় যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ আগারে টেবিলের উপর শবদেহকে শোয়াইয়া রাখিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানুষের দেহযন্ত্রের সকল মেকানিজম্ জানিয়া লইবার প্রয়াস দেখা যায়, তেমনি দেখা দিয়াছিল যৌন-বৈজ্ঞানিক ভারতীয় মনীষার প্রভাবপুষ্ট সংস্কৃত-আলঙ্কারিকদের। আলঙ্কারিকদের নির্দেশে কবিরাও ঐ একই পথের পথিক হইয়াছিলেন। সকলেরই এক চাহিদা; দেহ চাই; বিশেষ করিয়া নারীদেহ। পুরুষের প্রেমের আকর্ষণ নারী; নারীর পুরুষ। নারীদেহে নারী প্রেমের বাস। শুধু যে-কোন অবস্থার দেহ হইলে চলিবেনা। যৌবন-পিনদ্ধ দেহ চাই। নদীকে পুরাপুরি জানিতে হইলে বর্ষার নদী চাই; কূলেকূলে ছাপাইয়া-ওঠা জল, তরঙ্গে-তরঙ্গে নাচিয়া-ওঠা জল, বেগে বেগে

(১) (ক) "মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি একটা অপূর্ব ব্যাপার নহে কি? জীব হইতে জীবের উৎপত্তি বিশ্ব-সৃষ্টির অংশস্বরূপ একটা অপূর্ব বিস্ময়জনক কার্য নহে কি? কেমন শক্তি দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, যাহার প্রভাবে নূতন জীবের উৎপত্তি ঘটিতেছে? সেই দেহস্থ শক্তির পরিচয় পাইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অপূর্বা মহতী শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতে পার। এই দেহতত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বুঝিবে। * * এই দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নাম, রূপ, ভাব, রস—এই চারি পদার্থকে বুঝিতে হইবে।" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) দৈহিক শক্তিগুলির সাহায্যে চৈতন্যরূপ আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করা এবং অখণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া অখণ্ড আনন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে পারা সহজিয়া সাধকদের উদ্দেশ্য। বাউলও বলিয়াছেন—রসের বিকাশ সৃষ্টিতে, মনুষ্যদেহেও তাহার আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে।"

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস।

আবর্তিত-হইয়া-ওঠা জলের ঘূর্ণী, পুঞ্জিত হইয়া-ওঠা ফেনা, তরঙ্গে-তরঙ্গে বাজিয়া ওঠা কল্লোল-গর্জন, যদি চাও, তবে বর্ষা-নদীর কূলে যাও। যেমন নদীর পূর্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য বর্ষা চাই, তেমনি নারী-প্রেমের পূর্ণ পর্যবেক্ষণের জন্য চাই যৌবন; চাই উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী। কোথায় বাসা বাঁধে যুবতীদেহে ঐ প্রেম? দেহটা চাই মনটিকে পাওয়ার জন্য। দেহকে বাদ দিয়া মন নাই, মন নাই বলিয়া প্রেম নাই। তাই প্রেমের গবেষণায় যৌবনোৎফুল্ল নারীদেহ লইয়া তাঁহারা মাতিয়া উঠিলেন। শুধু নারীদেহ হইলে চলিবেনা। নারী-মনের উত্তেজক পুরুষদেহ চাই। পুরুষের জন্য নারী, নারীর জন্য পুরুষ। এ-যেন সোমযজ্ঞের দুইখানি অরণি। ঘষিলে আগুন জ্বলে।

নর-নারীর পারস্পরিক প্রেমের আলম্বন যথাক্রমে নারী ও নর। নর নায়ক, নারী নায়িকা। নারী-রূপের উত্তেজনায় পুরুষদেহে প্রকাশিত ভাব-কদম্ব-বৈচিত্র্যের অনুপাতে তাঁহারা নায়কে প্রথমতঃ চার ভাগে ভাগ করিলেন—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীর-প্রশান্ত। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার—দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ—এই চার রূপের ভেদে নায়কের বৈচিত্র্যসংখ্যা হইল—১৬। ষোলটি রূপের প্রত্যেকটি আবার উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে, একুনে নায়কের বৈচিত্র্যসংখ্যা হইল ৪৮।

নায়িকার ভেদ আরও বিচিত্র। প্রথম ভেদ হইল ৩টি—স্বীয়া, পরকীয়া, সাধারণা। স্বীয়ার আবার তিন ভেদ—মুগ্ধা (youthful), মধ্যা (adolescent) ও প্রগল্‌ভা (mature)। মধ্যা ও প্রগল্‌ভার আবার তিন ভেদ; ধীরা (Possessed of self-command), অধীরা (Not possessed of self-command), ধীরাধীরা (Partly possessing and partly not possessing self-command)। ইহাদের আবার দুইভাগ—কনিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা। অতএব মধ্যা ও প্রগল্‌ভার ভেদসংখ্যা হইল বারো। মুগ্ধাকে লইয়া ভেদসমষ্টি—১৩। একুনে স্বীয়ার তেরো ভেদ। পরকীয়ার দুই ভেদ—পরোঢ়া (another's wife) ও কন্যকা (maiden)। সাধারণার একভেদ। ভেদসমষ্টি হইল ষোলো। এই ষোলো ভেদের আবার অবস্থাভেদে আট ভেদ। ভেদসমষ্টি হইল—১২৮। অবস্থাভেদে নায়িকারা—স্বাধীনভর্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা, বাসকসজ্জা; বিরহোৎকণ্ঠিতা। পূর্বোক্ত ১২৮টি ভেদের আবার উত্তম, মধ্যম, অধমরূপের গণনায় ভেদসমষ্টি হইল—৩৮৪। আলঙ্কারিকেরা এখানেও থামেন নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বলিয়াছেন—অসংখ্য। অসংখ্য তো

বটেই। জীবন-সমুদ্রের ঢেউ কে কবে গণনা করিয়াছে! আমাদের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য হইল, আমরা না গণিয়াই অনন্ততা স্বীকার করি, তাঁহারা গণিবার চেষ্টা করিয়া পরে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা মরিবার পূর্বেই ভূত হই, তাঁহারা ভূত হইবার জন্য অন্ততঃ মরিবার চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষণ-কার্যের পশ্চাদ্বর্তী স্বীকৃতিতে তাঁহাদের জীবন-দর্শনের চেষ্টা ধরা পড়ে। সে-অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বেই আমরা অভিজ্ঞতার ফলাও করি। তাঁহারা practical হইয়া 'না' বলেন, আমরা Theoretical হইয়া "না" বলি।

কেবল নায়িকার ভেদ দেখাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের অলঙ্কারের সংখ্যাও গণনা করিতে আলস্য বোধ করেন নাই। সে সংখ্যা—২৮। সেগুলি সত্ত্বগুণ (mental) হইতে উৎপন্ন। তাহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি অঙ্গজ (born of bodily movement); পরের সাতটি অযত্নজ (without effort); বাকিগুলির সংখ্যা— ১৮। প্রথম তিনটি—ভাব (the slight personal indication of natural emotion), হাব (its stronger expression) , হেলা (the decided manifestation of feeling)—অঙ্গজ। শোভা (brilliancy), কান্তি (loveliness), দীপ্তি (radiancy), মাধুর্য (sweetness), প্রগল্ভতা (boldness), ঔদার্য (meekness), ধৈর্য (steadiness in attachment) —এই সাতটি অযত্নজ। লীলা (mimicry of a lover's manner etc.), বিলাস (flutter of delight), বিচ্ছিত্তি (simplicity in dress), বিব্বোক (affectation of indifference), কিলকিঞ্চিত (hysterical delight), মোট্টায়িত (the mute involuntary expression of affectation), কুট্টমিত (the affected repulse of a lover's endearment), বিভ্রম[১] (fluster), ললিত (voluptuous gracefulness), মদ (arrogance), বিকৃত (the suppression of the sentiments of the heat through bashfulness), তপন (pining), মৌগ্ধ্য (simplicity verging on silliness), বিক্ষেপ (distractedness), কুতূহল (impetuous curiosity, হসিত (giggling),

(১) বিভ্রম :

(ক) ত্বরয়া হর্ষরাগাদের্দয়িতাগমনাদিষু।
অস্থানে বিভ্রমাদীনাং বিন্যাসো বিভ্রমোমতঃ॥ সাহিত্য দর্পণঃ

(খ) বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাস্থান-বিপর্যয়ঃ॥ উজ্জ্বল নীলমণিঃ

উদাহরণং বিদগ্ধমাধবে; শ্রীমদ্ভাগবতে।

চকিত (trepidation), ও কেলি (sportiveness) এই ১৮টি। ইহাদের প্রথম দশটি যেমন নারীর, তেমনি পুরুষের। ইহার পর আবার মুগ্ধা ও কন্যার অনুরাগের ইঙ্গিত, তাহার পর নায়িকা-নির্বিশেষের। পত্র-প্রেরণ, স্নিগ্ধ বীক্ষিত, মৃদুভাষণ, দূতীসম্প্রেষণের দ্বারা মানসিক ভাবের অভিব্যক্তির সহায়তা। তাহার পর অনুভাব। অনুভাবের পর সাত্ত্বিকভাব। সাত্ত্বিকভাব আটটি। সাত্ত্বিকের পরে ব্যভিচারীভাব। ইহাদের সংখ্যা-৩৩। তাহার পর স্থায়ীভাব। ইহাদের সংখ্যা নয়টি। স্থায়ীভাবের পর রস। রস নয়টি। রসের আবার বর্ণ আছে। [১]শৃঙ্গারের শ্যামবর্ণ, হাস্যের শ্বেতবর্ণ, করুণের কপোতবর্ণ, বীরের হেমবর্ণ, রৌদ্রের রক্তবর্ণ, ভয়ানকের কৃষ্ণবর্ণ, অদ্ভুতের পীতবর্ণ, বীভৎসের নীলবর্ণ, শান্তের কুন্দ ফুল বা চন্দ্রবর্ণ। (সাহিত্যদর্পণ)। বর্ণগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মনে করেন— mythological আমাদের মনে হয়-Pathological and metaphysical. কোন একটি emotion এর সময় যদি মানুষের মুখের বর্ণগত ফটোগ্রাফ লওয়া যায়, তাহার heart ও pulse-beat লইয়া scientific investigation করা যায়, তাহা হইলে ভাবের প্রকাশে দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার একটা তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।[২] ইহার কেবল psychophysical analysis করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়।

যাহা হউক, ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা চলে, প্রাচীনেরা অনুসন্ধানের কার্যে নামিয়া কার্য হইতে কারণে উপস্থিতির চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের বিষয় ছিল—আগে দেহ, তাহার পর যৌবন, যৌবনের পরে কাম, কামের পর প্রেম। এই প্রেমের খবর মেলে রসে। রস ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। বাকি অবচেতনের দিকটা তাঁহারা যোগ, তন্ত্র ও দর্শনের উপর বরাত দিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতে-ছিলাম, সংস্কৃতে প্রেমের আস্বাদনায় পূর্ব সূরিদের objective হইতে subjective এ পরিক্রমা।

---

(১) শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতোহাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ৪২॥
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ॥ নাট্যশাস্ত্রে।

(২) According to him (Des Cartes), every emotion is an affection of the soul. The movements of heart, blood, brain and animal spirits, which account for difference in pulse-beat, are only conditions or accompaniments of emotions, but are not identical with them. The signs of emotions are rarely experienced or observed in isolation ; usually several are found mixed together." W. Æ

উপরের আলোচনা হইতে একথা প্রমাণিত হইল যে সংস্কৃত-কবিরা বাস্তব প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব মানুষ লইয়াই প্রেমের গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু প্রেমের আস্বাদ যেখানে, সেখানে তাহা অলৌকিক। আধুনিক প্রেমের অনুভূতি নারী-পুরুষের দ্বান্দ্বিক সত্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া আধুনিকেরা কোন ঘোষণা করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সংস্কৃত-প্রেমের আস্বাদ প্রেমিক হৃদয়-দুইটির অদ্বৈত অনুভূতির মধ্যে। ইহাদের প্রেম ব্যক্তির সূক্ষ্মতম আশ্রয়ে নৈর্ব্যক্তিক। নায়ক-নায়িকার চরিত্রের যে ভাব দেখি, সে-ভাব কেবলমাত্র কল্পনা নয়। নারী-পুরুষের প্রেম-চেতনার যে সামান্য-লক্ষণাক্রান্ত যৌন-বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের অবস্থা-গুলিকে জীবনের তাপে ফুটাইয়া প্রাণের প্রবাহে প্রাচীনেরা বহাইয়া দিয়াছেন। সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইবার কালে সেই সর্বজন-সামান্য-লক্ষণগুলি কবির ভাব-চেতনায় জারিত হইয়া এক অপূর্ব রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। এই দিক দিয়া আধুনিকের ব্যক্তিরও যা গতি, প্রাচীনের প্রতীকেরও সেই গতি। ইহা শিল্পের গতি। তাই ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। আধুনিকেরা চরিত্রের কল্পনায় সামান্য হইতে বিশেষে আসিয়াছেন; প্রাচীনেরা সামান্য হইতে নূতনতর সামান্যে উন্নীত হইয়াছেন। আধুনিকের সামান্যের পটভূমি জীবিত মানুষের সমাজ, সামাজিক মানুষ-গুলির জীবন-উচ্ছ্বাসের নব নব আবিষ্ক্রিয়া; প্রাচীনের সামান্যের পটভূমি সামাজিক পর্যবেক্ষণ হইতে উদ্ভূত যৌন-বিজ্ঞান। এই যৌন-বিজ্ঞান ব্যক্তি-মানুষকে ছাড়াইয়া যাওয়ায়—অসংখ্য ব্যক্তির সামান্য লক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সংস্কৃত-চরিত্র typical বা যান্ত্রিক হইয়া দেখা দিয়াছে। বিশেষ কবির বিশেষ অনুভূতির বিশেষ মানুষটি ধরা পড়ে নাই। বিজ্ঞানকে লইয়া লীলা করায় বিশেষ মানুষগুলির বিচিত্র জীবনানুভূতি হারাইয়া গিয়াছে। যে-কাব্যের যে-নায়কই বা হউক না কেন, প্রেমের বৃত্তে তাহাদের একই গতি। নামটা যেন প্রেমের উপাধি মাত্র। তবে কবি-ব্যক্তিত্বের ছায়া যে ইহাতে মোটেই পড়ে নাই, তাহা বলিতে পারি না। কালিদাসের প্রেমানুভূতি ও ভবভূতির প্রেমচেতনা কখনও এক মাপের নয়। প্রকৃতির প্রেম-বৃত্তের উদ্দীপন হওয়ার স্বভাবটি সংস্কৃত-কবিগণের হাতে একচেটিয়া হইলেও কালিদাসে ইহার ব্যতিক্রম আছে। কালিদাসের প্রকৃতি কেবল উদ্দীপন নয়, উহা জীবনের অংশীদার। কিন্তু আজকালকার প্রেম-চেতনার ধূম্রা সেদিনকার সংস্কৃত-কবিগণের চেতনায় যে লাগে নাই, ইহার কারণ পৃথিবীর বয়স বাড়িয়াছে, যুগ হইতে যুগান্তরে ব্যভিচারী ভাবের ওলট-পালট হইয়াছে, মানুষের চেতনা নীলাকাশের শারদ জ্যোৎস্নার তীর হইতে তারাবলীর সহিত মাটিতে খসিয়া পড়িয়া

মহাকালের রথচক্রতলে গুড়া হইয়া মানব-জীবনের জমিতে নূতন সার ছড়াইয়াছে। চাষের ক্ষেতের ঝরঝ'রে ধূলার মতো একালের জীবন-চেতনা জীবনময় হইয়া উঠিয়াছে। তাই একালের ফুল দিয়া ও কালের ঠাকুরকে পূজা করা চলে না। তবে উভয় কালের ঠাকুরই প্রেমের ঠাকুর।

অতএব সংস্কৃত-চরিত্রের পরিকল্পনা 'পরিকল্পিতসত্ত্বযোগাৎ"। কবির নির্বাচন-শক্তির মধ্যে ভাবনার বিজ্ঞান আছে। নির্বাচিত বস্তুগুলি কবির সৌন্দর্য-চেতনায় স্নান সারিয়া সৌন্দর্য-সৃষ্টির আবেগে কেবল উর্ধ্বমুখী হইয়াছে, তবু তাহাতে জীবনের তাপ আছে। সে-তাপ আধুনিক জীবনের তাপ না হইলেও মানব-সত্যের তাপ। তাই চিত্ত যখন সৌন্দর্যের পেয়ালায় জীবন-অমৃত পান করিতে উন্মুখ হইয়া হাত বাড়াইয়াছে, তখন সে-হাতের স্পর্শ পড়িয়াছে সাকীর হাতে। সে-সাকী আমাদের আধুনিক সমাজের গৃহলক্ষ্মী নয়, সে-সাকী মানব-জীবনের নিত্য কালের সাকী; মানব-জীবনের হৃদয়-উৎস হইতে সে যুগে যুগে জন্মে জন্মে ভাসিয়া আসিয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া হৃদয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। সেখানে পৃথিবীর তাপ নাই, জীবন-ধারণের গ্লানি নাই, সংগ্রাম নাই, অসহযোগ আন্দোলন নাই; তাহা মানব-চিত্তের নির্জনলালিত সৌন্দর্য-বিধুর এক ছায়ানিবিড় লতাকুঞ্জ। মানুষ এখানে আশ্রয় লইয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত, খিন্ন মনকে জুড়াইয়া লয়। .

সংস্কৃত-চরিত্র হৃদয়ানুভূতির চরিত্র, বাসনার বিশুদ্ধীকৃত এক জীবনঘন ধ্যানের চরিত্র। ইহাদের লইয়া সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন ঘরকন্না চলে না, ইহাদের হৃদয়ে লইয়া কেবল কেলি করিতে হয়। কাদম্বরী-উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি হইল—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের চরিত্র, কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের চরিত্র। আর সকল চরিত্র ছায়াময়, মাঝে মাঝে পাঠক-হৃদয়ের আতপ্ত বেদনার উপর স্নেহশীতল হাত-খানি বুলাইয়া যায়। পত্রলেখার চরিত্রের বিরুদ্ধে আধুনিক কালের পাঠকের অনেক অভিযোগ। অতএব সে-চরিত্রও আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত।

কাদম্বরী-উপন্যাসের সকল চরিত্রই সংস্কৃত অলঙ্কারের প্যাটার্নে রচিত। তবুও চরিত্রমাত্রই যে প্যাটার্নের বুনুনি নয়, ইহার কারণ কবি-প্রতিভার, কবি-কল্পনার, কবি-বাসনার বৈচিত্র্য। যদি এই বৈচিত্র্য না থাকিত, তাহা হইলে চরিত্রমাত্রই শাস্ত্রের শ্লোকরূপ হইত। সেদিনকার কাব্যলোকে কবিদের উপর যদি আলঙ্কারিকদের এই অপ্রতিহত সাম্রাজ্যবাদ না থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সংস্কৃত-কাব্যে নিত্য বৃন্দাবন জন্মিত এবং সেই ধারা টানিয়া আধুনিক যুগের ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যে অনেক নবদ্বীপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিতেন। দুর্ভাগ্য

ভারতীয় কবিদের, তেতোধিক দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর। সমস্ত শরীরকে প্রতারিত করিয়া যদি কেবল মুখেই রক্ত সঞ্চার হয়,[১] তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। ভারতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অলঙ্কার-শাস্ত্রের ঠেলায় সেদিন কবিদের মুখ দিয়া অনর্গল রক্ত ঝরিয়াছিল। সেই রক্তে অঙ্কিত সংস্কৃত চরিত্রে তাই জীবন-স্বাস্থ্যের অভাব। এই অলঙ্কার-প্রাধান্যের দাপট বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে অস্থি রক্ষা করিয়া গিয়াছে। কোন জিনিসেরই খাপছাড়া খ্যাপামি ভাল নয়। সকল শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য চাই, সমন্বয় চাই। ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত-কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের মধ্যে সেই সামঞ্জস্যের অভাব। তাই জীবনের জন্য, কাব্যের জন্য অলঙ্কারের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও অলঙ্কার জীবনকে চাপিয়া মারিয়াছে। আমরা কাব্যের মৃতদেহের উপর অলঙ্কারের অলৌকিক প্রতিভা, অসাধ্য অধ্যবসায় লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছি। নিঃসঙ্গ অলঙ্কার-শাস্ত্র ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ অবদান; বিশ্বের মনীষার তুলনায় ইহা একেশ্বর। যদি লক্ষণের গণ্ডী ছাড়িয়া ইহা বাহিরে আসিত, তাহা হইলে সংস্কৃত-চরিত্রের সীতা হরণ হইত না।

মহাশ্বেতার চরিত্রকে এই প্যাটার্নের মধ্যে বাঁধিবার চেষ্টা করিলেও পুরাপুরি বাঁধা পড়ে নাই। পুরাপুরি বাঁধন যে পড়ে নাই, তাহার কারণ মানব-জীবনের নিত্য শাশ্বত দিকের আবর্তন।[২] মানুষ যাহা চাহে, তাহা পায় না। পায় না বলিয়া রঙ্ ও তুলি লইয়া মনের মানুষের ছবি আঁকে। এমনি একখানি ছবি কিশোর কৃষ্ণের। কিংবদন্তীর উপাখ্যানে এমনি মনের মানুষের সন্ধান মেলে। মানব-হৃদয়ের নিত্য আক্রন্দন মহাশ্বেতা-জন্মের বিধাতা-পুরুষ। যুগে যুগে মানুষ অশ্রু দিয়া এই নিত্য মূর্তি গড়ে। তাই তার প্রবণতা শোকে, শোকের সুন্দরতর প্রকাশে—বিপ্রলম্ভে। ঐ শোকের দিকে ঐ বিপ্রলম্ভের দিকে তার যত টান। তাই আমরা মহাশ্বেতার বাল্যকাল দেখিলাম না, কিশোর কাল দেখিলাম না, বয়ঃসন্ধি দেখিলাম না; দেখিলাম একেবারে যৌবনকাল; একেবারে যৌবন-গঙ্গার ভরা পূর্ণিমা। যেন নিছক যৌবনের অপেক্ষায়ই সে কাহিনী-বৃত্তের নেপথ্য-গৃহে বসিয়া

---

(১) রবীন্দ্রনাথ।

(২) "মনুষ্যমাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক ছুটিতে থাকে, এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তি-বশে কোনরূপ অচ্ছোদ-সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।"

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; সৌন্দর্যতত্ত্ব।

কোটাল গণিতেছিল। যেমনি যৌবনের উতরোল তাহার দেহের তটে-তটে কলধ্বনি করিয়া উঠিল, দেহে-দেহে নাচিয়া উঠিল ভরা-বাসনার উচ্ছল তরঙ্গ, তরঙ্গে-তরঙ্গে উচ্চকিত হইল দুইটি ফেন-পদ্ম, অমনি মনের আকাশে নামিল রাঙা আবীর ; চোখে নামিল রঙীন স্বপ্ন, যেন যৌবনের রঙ্গিলা কাচ। বিশ্বজগৎ তাহার চোখে রঙীন হইয়া দেখা দিল। সেই রঙের জোয়ার তাহার দেহ-মনের কূলে-কূলে আছাড় খাইয়া পড়িল। এমনি সময়ে বাজিল বাঁশী ; অচ্ছোদের তীর-ভূমির কুঞ্জ-কুঞ্জ কম্পিত করিয়া নবীন বসন্তের রাঙা অধরের মৃদু চাপে যৌবন-ফুৎকার-ভরিয়া-দেওয়া বাঁশী। সেই বাঁশীর আগুনে ডালে ডালে আগুন জ্বলিল, দিকে দিকে আগুন ঝরিল ; জ্বলিল শিরীষ-বকুল-অশোক-কিংশুকের আগুন ; ঝরিল কোকিল-ভ্রমরের কণ্ঠ হইতে। বাসনার রাঙা আগুন এমনি করিয়া যখন ডালে-ডালে তাথই--তাথই নাচিতেছিল, সেই আগুনকে যখন কোকিল-কণ্ঠের উত্তপ্ত বিগলিত ধারা আসিয়া নূতন করিয়া অগ্নিরসে স্নান করাইতেছিল, তখন আনমনা হইল মহাশ্বেতা। ছুটিল অচ্ছোদের তীরে।

মহাশ্বেতার দেহ ভাবের গঙ্গা। ভাব উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাসিতেছে, হাসিতেছে ; দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে ; তাহার পায়ে বাজিতেছে ঝলমল, নয়নে বাজে ছলছল ; শ্রান্তমুখে জাগে ফেনার পুষ্পবন ; তবুও মাথা খুঁড়িয়াও কূল খুঁজিয়া পায় না। কূল পাইল পুণ্ডরীকের মধ্যে। ভাব চাহে আশ্রয় ; পুণ্ডরীক সেই আশ্রয়। এখন সেই আশ্রয়কে লইয়া ভাবের বসন্তোৎসব। মহাশ্বেতার যৌবনে—দেহে—মনে—প্রেরণা ঐ পুণ্ডরীক। ভাব-কদম্বের আকর্ষণে-বিকর্ষণে দেখা দিল 'রতি'। মনের অবস্থা তখন, যা দেখা, তাই হওয়া। নয়নে নয়নে ঘটিল হৃদয়ের বিনিময় ; দেহস্পর্শে ছুটিল চাওয়ার বিদ্যুৎ।

ঘরে ফিরিয়া মহাশ্বেতার মনে নামে ধ্যান। এক অপূর্ব সুন্দর প্রেমের জগৎ। এ-জগতের রঙ রক্তের মতো রাঙা। এর ফুলফল, আকাশ-বাতাস, সবই রাঙা। মনের বাসনার মতো রাঙা। সেই রক্তলোকের রাঙা বাসনার রক্ত শতদলের উপর বসিয়া রাঙা অধরে বাঁশী রাখিয়া পুণ্ডরীক ডাকে, 'এসো মহাশ্বেতা'। মুগ্ধা সর্পিনীর ন্যায় সেই বাঁশীর তানে ঝিমায় মহাশ্বেতা! এই তার ধ্যান। কিন্তু এই স্বপ্নলোক চিরকাল স্বপ্ন থাকে না। সে বাস্তবে নামিতে চায়। সেই পুণ্ডরীকময় তাজা স্বপ্নে যখন মহাশ্বেতা ঝিমাইতেছে, তখন আসে তরলিকার হাতে পত্র। বাসনায় জাগে জোয়ার। স্বপ্নের বিভোরতায় যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলে মহাশ্বেতা! আবার কে এল? কপিঞ্জল। কপিঞ্জল বলে, "আর না গেলে নয়! জীবন সংশয়

পুণ্ডরীকের।” আগুন জলে মহাশ্বেতার মনে; পোড়ে তার দেহ। “কিন্তু!” “কিন্তু নেই। যেতেই হবে।” “সংসার, ধর্ম, সমাজ! না, পার্বনা”। চলে দ্বন্দ্ব—প্রেমের আকর্ষণের ও সমাজের বাধার।” তাহার পর উঠিল চাঁদ। ঢাকিয়া দিল সংসার কিরণের মায়া-জালে। বহিল স্বপ্নের দরিয়া। সেই দরিয়ায় ডুবিল পিতামাতা, ডুবিল বন্ধুলোক, ডুবিল শিষ্টাচার, ডুবিল কর্তব্যজ্ঞান; ডুবিল ধর্ম; ডুবিল পরকাল। চাঁদের কিরণের এতজোর। অক্টোপাসে-বাঁধা তন্তুগুলিকে ইঁদুরের মতো এমনি করিয়া ছিন্ন করে চাঁদ? অসম্ভব।

অসম্ভব নয়, সম্ভব। কোকিল যদি পারে, চাঁদ পারিবে না কেন? রোহিনীকে চেন? ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’র রোহিনী। সেই রোহিনীর কুল খোয়াইল কে? ঐ কালামুখো কোকিল। অচ্ছোদের তীরে নয়, বারুণীর ঘাটে।

“কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ! রোহিনী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিনীর সেই ঊর্ধ্ব-বিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখি জাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটা করিয়া, ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত। কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না—কার্য-কারণের অনন্ত শ্রেণী-পরম্পরায় এটি গ্রন্থিবদ্ধ হয় নাই—অথবা পাখীর তত পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি ছিল না। মূর্খ পাখী আবার ডাকিল—“কুহু, কুহু, কুহু।”

“দূরহ! কালামুখো।” বলিয়া রোহিনী চলিয়া গেল। চলিয়া গেল, কিন্তু কোকিলকে ভুলিল না। আমাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, কোকিল অসময়ে ডাকিয়াছিল। গরীব বিধবা যুবতী একা জল আনিতে যাইতেছিল, তখন ডাকাটা ভাল হয় নাই। কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে। কি যেন হারাইয়াছি—যেন তাই হারাইবাতে জীবনসর্ব্বস্ব অসার হইয়া পড়িয়াছে—যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্ন হারাইয়াছি—কে যেন কাঁদিতে ডাকিতেছে। যেন এ জীবন বৃথায় গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না।

আবার কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ। রোহিনী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নব প্রস্ফুটিত আম্র মুকুল—কাঞ্চনগৌর, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ-পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুণগুণে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে

সুর বাঁধা। দেখিল—সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,—কোথাও মৌমাছি, কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে সুরবাঁধা। বাতাসের সঙ্গে তার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড় কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল! এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল 'কু উ'। তখন রোহিনী সরোবর-সোপান অবতরণ করিতেছিল। রোহিনী সোপান অবতীর্ণ হইয়া কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

রোহিণী যদি কোকিলের ডাকে কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে পারিল, তবে চন্দ্রোদয়ে[১] অচ্ছোদের জলে কুল-মান-কর্তব্য-ধর্মের কলসী মহাশ্বেতাই বা ভাসাইতে পারিবেনা কেন? চাঁদ ও কোকিলের একই কাজ। মহাশ্বেতার মনে তখন চন্দ্রোদয়ের পঞ্চম লাগিয়াছে। অভিসারিকা মহাশ্বেতা সংসার পিছনে ফেলিয়া ধাইয়া চলিল সংকেত-স্থানে—সেই অচ্ছোদের তীরে চন্দ্রকান্তমণি-শিলার লতাকুঞ্জে; পুণ্ডরীকের আতপ্ত বক্ষের আলিঙ্গনে। মিলনের মুখে নামিল মৃত্যুর বজ্রাঘাত। দগ্ধ হইল চঞ্চল বাসনার চিতা। আসিল বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের কোণে ক্ষীণ আশাবন্ধের রামধনু। মিলনের আশায় বাঁচিতে হইবে।

এতক্ষণ যে-প্রেম দেহমনের বহিরঙ্গ আঙিনায় মুহুর্মুহুঃ বাসনার কলি ফুটাইতেছিল, কলির নৃত্যে যাহার বুকে ফুল ফুটিতেছিল, সে-ফুলের উপর আগুন ঢালিয়া দিল অদৃষ্ট আঘাত। সে-আঘাত যেমন কর্তব্যের অবহেলার অভিশাপ, তেমনি কাঁচা সোনাকে পাকা সোনায় পরিণত করিবার মন্ত্র। যে-মন্ত্রে কাম প্রেম হয়, উহা সেই মন্ত্র[২]। সেই মন্ত্রে দীক্ষা নিল মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতার জীবনে নামে তপস্যা।

---

(১) "কালাদীত্যাদিশব্দাচ্চন্দ্র-চন্দন-কোকিলালাপ-ভ্রমরঝঙ্কারাদয়ঃ।' সাহিত্য দর্পণ

(২) "প্রেম এক হিসাবে Antibiological বা জৈবগতিবিরোধী। কাম Biological বা জৈববন্ধনে আবদ্ধ। জৈব বন্ধনের মধ্যে মানুষ আবদ্ধ। যদি সে বন্ধনের কোন মুক্তির পথ না থাকে তবে সে পথও এই বন্ধনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তাই কাম প্রেমের বিরোধী হইলেও

ইহার পর অন্তরাল-বাসিনী মহাশ্বেতা। যে-আঘাত সে পাইয়াছে, তাহা জুড়াইবার স্থান যেমন ঘনপিনদ্ধ অরণ্যের কাজল মায়ার সজল স্নেহ, তেমনি হৃদয়ের গভীরে নামিয়া অন্ধকারের খনিতে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিবার তাহা উপযুক্ত স্থান। সে-প্রদীপ জ্বলিতে জ্বলিতে পঞ্চ প্রদীপকে প্রদক্ষিণ করে, প্রণাম করে চিত্তাকাশের আকাশ-প্রদীপকে। শোক জ্বলিতে জ্বলিতে হারাইয়া যায়। কান্না হয় গান। সেই গান জ্বলিয়া ওঠে পিনদ্ধ অরণ্যের নির্জনতার পঞ্চমে। ভাসে বাতাসে। আহত হয় অচ্ছোদের তীরে। ভাষা নাই, কথা নাই, কেবল সুর, কেবল হৃদয়ের মূর্চ্ছনা!

চিত্ত যখন স্থির, বেদনা যখন মাণিক্যের মত উজ্জ্বল, প্রেমের রঙে রঙে মনে যখন নিরন্তর ইন্দ্রধনুর ঢেউ, তখন গিরি-নির্ঝরিণীর মৃদঙ্গের তালে তালে মহাশ্বেতা এক তরুণ রাজকুমারকে গল্প বলে এক ঘরছাড়া বালিকার প্রথম প্রেমের গল্প। স্তব্ধ অরণ্য কান পাতিয়া সেই গল্প শোনে; অরণ্যের সবুজ পাতায় তার আখর; বুকে তার লক্ষ মাণিক জ্বালা।

তাহার পর মহাশ্বেতা কেবল আকাশে কান পাতিয়া থাকে। মিলনসূচক দৈব-বাণীর ক্ষীণতম তরঙ্গ এখনও কি আকাশের কূলে কূলে বাজে! সেই কতকালের কথা। শুধু কথা! কোন মূর্তি নাই। চাহে আকাশের কোণে চন্দ্রের তোরণে। নিশীথে শিলাখণ্ডে শয়ন করিয়া নয়ন পাতে আকাশে। আকাশে নামে ছায়াপথ। মহাশ্বেতার ঐ আশাপথ! পুণ্ডরীক ঐ ছায়াপথ বাহিয়া আসিবে। শ্বেতশুভ্র

কামকে অবলম্বন করিয়াই প্রেম উৎপন্ন হয়, পঙ্কে পঙ্কজের উৎপত্তি, অথচ পঙ্ক থাকে গভীর জলের মধ্যে ক্লিন্নতায় অবসন্ন হইয়া, আর পঙ্কজ মৃণালদণ্ডের উপর ভর করিয়া, পঙ্কে নিরুদ্যম হইয়া সূর্যের দিকে, বিশ্বের দিকে, আপন বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আপন সৌরভে বিশ্বের রস আপনার মধ্যে অনুভব করে। কোন একটি হৃদয়ের নিকট যখন সমস্ত আবরণ প্রেমের উত্তাল তরঙ্গে ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হইয়া আসে এবং সেই শিথিল বন্ধনের মধ্য দিয়া মুক্তি-ধারার আনন্দ উপচিয়া উঠিতে থাকে। যে কাম মানুষকে দেহের দিকে টানে তাহার যদি বেগ থাকে, দীপ্তি থাকে, প্রেরণা থাকে তবে তাহা দেহের আবরণের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। দেহের আনন্দ তাহার সহিত মিলিত হইতে পারে। কিন্তু যে প্রেম দেহের বাঁধ ভাঙিয়াছে তাহার কাছে দেহের আকর্ষণের সীমা কোন সঙ্কীর্ণতা আনিতে পারে না। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা অনেক সময়ে বলিয়াছেন যে, শুধু ইন্দ্রিয়ের যে আনন্দ তাহাও যখন গভীর হইয়া উঠে, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করে। আমরা যাহাকে কাম বলি তাহা যখন অন্তরেরই আকর্ষণ তখন তাহা গভীর হইলে যে দেহের সীমাকে লঙ্ঘন করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; রবিদীপিতা; পৃঃ ১৮৭-১৮৮

লঘু মেঘখণ্ডের পালতোলা নৌকায় পুণ্ডরীক আসিবে। সে আসিতেছে। অনেক —অনেক দূরের পথ! সে আসিতেছে। হয়তো ঐ মেঘখণ্ডের আড়ালে দেখা যাইতেছেনা। ঐ মেঘ সরিলে তাহাকে দেখা যাইবে। মেঘ যায়, মেঘ ভাসে, মেঘ আসে ; পুণ্ডরীক আসেনা। শূন্যগর্ভ আশা। কথায়-বাঁধা আশা কি জীবনে ফলিবে? দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায়, মহাশ্বেতার নয়নে ভাসে নিঃশব্দ নিস্তব্ধ আকাশ। আশ্রয়হীন আশা ঝিমাইতে থাকে।

পুণ্ডরীক আসেনা, আসে লম্পট এক ব্রাহ্মণ-কুমার। তাহার নয়নে কামনার দীপ্তি, দেহে বাসনার আগুন। সেই আগুনের ছাঁচ লাগে মহাশ্বেতার গায়ে। সমস্ত অন্তর্লোকে জাগে আলোড়ন। বাহির হইয়া আসে রুদ্ররোষেভরা অভিশাপ। একি হইল, এমন শান্তিরনীড়ে আগুন পড়িল কেন? কেন পোড়ে মহাশ্বেতা? ঐ তো প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষা! ঐ তো স্তিমিত তপস্যায় নাড়া-দেওয়া বাড়বানল। কলঙ্ক বলিয়া সে কাঁদে ; কলঙ্কও নয় ; শুচিতার অগ্নি-স্নান। ঝিমানো প্রেম নাড়া খাইয়া জাগে।

আসে কপিঞ্জল। জানায় জন্মান্তরীণ প্রেমে লম্পট ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে পুণ্ডরীক ঘুরিয়া গিয়াছে এই আশ্রম। চাহিয়াছিল সে মহাশ্বেতাকে। মহাশ্বেতাকে সে পায় নাই, পাইয়াছে অভিশাপ, পাইয়াছে পতঙ্গযোনিত্ব।

জাগে তাপ! জাগে ক্ষোভ! জাগে বেদনা। এই বেদনার কলায় কলায় জাগে প্রেমের আলো। ষোলকলায় পূর্ণ হয় এই আলোর চাঁদ। আসে পূর্ণিমা। সেই পূর্ণিমার উদয়ে মিলনের মধুযামিনী!

এই-তো সংস্কৃত-কবি বাণভট্টের মনের কথা। অলঙ্কার-শাস্ত্রের হীরা-জহরতের খাপে পুরিয়া বাণভট্ট মনের মানুষের এক পুষ্পিত অনুভূতির পরিবেশন করিয়াছেন মহাশ্বেতার মধ্যে। মহাশ্বেতাকে দেখিতে ব্যক্তির মতো ; যেন একটা বিশিষ্ট জীবন আপনার বেগে চলিতে চলিতে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট পরিণামে আসিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসলে সে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির নাম-মুদ্রায় সামান্যেরই বিশিষ্ট সংস্করণ। ভাবের রাজ্যে এমনি হয়। ভাবের রাজ্যে নিয়মই হইল নিঃসঙ্গ একাকিত্ব। সেখানে কিন্তু ভাবের এক ব্যক্তি-রূপ। সেখানে সে একক ; সেখানে সে নূতনতর ব্যক্তি[১] ; কিন্তু অনন্তকালের অনন্তচিত্তের একক

---

(১) "আমরা সহজেই ভুলি যে জাতিনির্ণয় বিজ্ঞানে, জাতির বিবরণ ইতিহাসে, কিন্তু সাহিত্যে জাতবিচার নেই, সেখানে আর সমস্তই ভুলে ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হবে।"—রবীন্দ্রনাথ, সা, প, ৯৭

ব্যক্তি। ব্যক্তি না হইলে আস্বাদ করিব কিরূপে? বাস্তব জগতের ব্যক্তির মতো সে-ব্যক্তি নয়, ভাব-জগতের ব্যক্তি। সূক্ষ্মতম ব্যক্তিত্বের ক্ষীণতম আশ্রয়। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের উপরও জীবনের তাপ আছে। জীবন ঘটনাময়। ঘটনার আঘাতে সে-ব্যক্তি ফুটিয়াছে, চলিয়াছে, একটা বিশিষ্ট সীমায় যাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। অচ্ছোদ হইতে ঘরে ফিরিয়া তরলিকার হাতের পত্র ও কপিঞ্জলের দৌত্যের পর, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবনের তাপ। সমাজ-উপেক্ষায়, কর্তব্যের অবহেলায় পুণ্ডরীকের মৃত্যুর মধ্যে শাস্তি। আবার তপস্যায় যখন ভাটা নামিয়াছে, চিত্তবৃত্তির তারে সংসারলোকের ঘটনার আশ্রয়ে যখন প্রেম-সাধনায় মালিন্য ধরিয়াছে, তখন লম্পট ব্রাহ্মণ-কুমার-রূপে পুণ্ডরীককে দিয়া আঘাত। এগুলি সংসারের—জীবনের তাপ। ভাব ও ঘটনাকে মিলাইয়া মহাশ্বেতার চরিত্রের জঙ্গমতা।

কামনাই প্রেম নয়। প্রেমের জন্য চাই তপস্যা। সে-তপস্যার জন্য দীর্ঘ বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের আগুন চিত্তকে দগ্ধ করে। তাহার পর জাগে শুচিসুন্দর প্রেম। এই প্রেমের স্বভাব আত্ম-সঙ্কোচ নয়, আত্ম-বিস্তৃতি। প্রেমিকের সঙ্গে সমাজ, সংসার সকলকে লইয়া এই প্রেমের পূর্ণতা। মিলন-পর্বে আমরা ইহারও প্রমাণ পাইয়াছি। তাই বলিতেছিলাম, ভাবে ও ঘটনায় মথিত এই চরিত্র।

প্লটের সহিত আত্মীয়তার দ্যোতনায় মহাশ্বেতার চরিত্রের আবার জীবনঘন দীপ্তি। পুণ্ডরীকের সহিত পরিচয়ে কুসুম-মঞ্জরীর নাটকীয়তা; আত্ম-দ্বন্দ্বের মুক্তিতে চন্দ্রের প্রভাব। তাহার পর পুণ্ডরীকের মৃত্যু এবং দৈব-বাণীতে আশাবদ্ধ হইয়া তপস্যাব্রত গ্রহণ। এইসকল অতি সাধারণ ঘটনা কেবল কার্যকারণ-সূত্রে আবদ্ধ। জীবনবোধ এগুলিতে নাই বলা চলে। সন্ন্যাস-জীবনের যে-ভূমিকায় লম্পট ব্রাহ্মণ-কুমারের আবির্ভাব, সেইখানেই মহাশ্বেতার জীবনবোধ অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে। এই অবস্থার পূর্বে কবি মহাশ্বেতাকে গন্ধর্বনগরে টানিয়া লইয়া—কাদম্বরী-চন্দ্রপীড়ের প্রেমের দৌত্যে না নামাইলে মহাশ্বেতার চরিত্রকে সন্ন্যাসের নিষ্ঠার মধ্যে রমনীয়ভাবে ফুটাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসীকে দিয়া প্রেমদৌত্যে কাজ করান হয়তো বাণভট্টের সময়েও প্রচলিত ছিল। দণ্ডীর ভিক্ষুণীরা এইরূপ কর্মে পটু ছিলেন। দণ্ডী জীবনের যে-বৃত্তের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাতে এ-ব্যাপার দুঃসহ নহে। কিন্তু বাণভট্ট ভাল কাজ করেন নাই। তিনি মহাশ্বেতা—চরিত্রের রূপায়নের প্রথম পর্ব হইতে যে কড়াতারে সুর বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। সে-সুর ছিন্ন হইয়াছে মহাশ্বেতার গন্ধর্বনগর পরিক্রমায়। তাই কবির অপরাধের দণ্ড মহাশ্বেতাকে নিজের জীবনে তুলিয়া লইতে হইল।

মহাশ্বেতার সন্ন্যাস-জীবনের কাহিনী যেমন জটিল, তেমনি নাটকীয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার মধ্যে একদিকে যেমন মহাশ্বেতার একনিষ্ঠ প্রেমের শুচিতা-পরীক্ষা, অন্যদিকে তেমনি, সতীত্বগর্বে আহত নায়িকার আঙ্গিকের পরিবেশনে অপূর্ব রস-সৃষ্টি। ইহার ফলে মহাশ্বেতার নাট্য-জীবনের দীর্ঘ বিরতির একঘেয়েমি নষ্ট হইয়া পথ-চলার নূতন ছন্দ বাজিয়া উঠিয়াছে; বিরহী জীবনে মিলনের আশাবন্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে পুণ্ডরীক উজ্জয়িনীরাজ তারাপীড়ের মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্ভূত হইয়া তাঁহারই আদেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বৈশম্পায়ন অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপনীত হইলেন। সরোবরের তীর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সেই লতা-মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হন। ঐখানে আসিয়া তাঁহার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদয় হয়। মনে হইতে লাগিল, এই স্থানটি তাঁহার অতিপ্রিয়। এইখানেই যেন তাঁহার জীবনের প্রিয় সামগ্রী ফেলিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক চিন্তা করিতে লাগিলেন, তবুও কী সে প্রিয় সামগ্রী, তাহা ধরিতে পারিলেন না। যেন তাঁহার স্মৃতির উপর একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। নিবিষ্ট চিন্তাশক্তির দ্বারাও তিনি মনের উপরকার সেই আবরণটি কিছুতেই তুলিতে পারিলেন না। কেবল মনে হইতে লাগিল, কী যেন এখানে হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। তাঁহার মন চঞ্চল হইল। তিনি সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া নষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; লতাগৃহে, তরুতলে, সরোবরের তীরে, দেব-মন্দিরে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিতে লাগিল। বৈশম্পায়নের অনুসন্ধানের আর শেষ নাই। সরোবরে স্নান করিয়া ফলমূল আহার করিয়া দিনরাত তিনি অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন তিনি মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া উঠিলেন। মহাশ্বেতাকে দেখিয়া অতি-পরিচিতের ন্যায় মনে হইল। নিমেষহীন নয়নে অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মহাশ্বেতাকে ব্রহ্মচারিণীর বেশ ত্যাগ করিয়া সম্ভোগ-সুখে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মহাশ্বেতার আদেশে তরলিকা তাহাকে দূর করিয়া দিল। একদিন জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে নিদ্রাহীন মহাশ্বেতা গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে উপবেশন করিয়া চাঁদের দিকে তাকাইয়া আছেন; তাকাইতে তাকাইতে সহসা পুণ্ডরীকের কথা তাঁহার মনে পড়িল! মনে পড়িল— প্রিয়তম তো আসিলেন না! দেববাক্য কি তবে মিথ্যা হইল! এমনি সময়ে দূরে পদধ্বনি হইল। চাহিয়া দেখেন, সেই ক্ষিপ্ত ব্রাহ্মণ-কুমার দুইবাহু প্রসারিত

করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মূর্তি এমন ভয়ঙ্কর, যে দেখিলে ভয় হয়। তিনি আসিয়া মহাশ্বেতাকে বলিলেন—"আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। যাহাতে রক্ষা পাই, তাহাই কর।" তাহার সেই ঘৃণাকর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতার রোষানল প্রজ্বলিত হইল; ক্রোধে সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভর্ৎসনা করিয়া অভিশাপ দিলেন—"দেব পুণ্ডরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি, যদি আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে আমার বচন সত্য হউক! তির্যগ্‌জাতিতে এই পাপিষ্ঠের পতন হউক।" সেই শপথ-বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কুমার ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।

এই অবস্থায় মহাশ্বেতার মানসিক দৃঢ়তা থিতাইয়া যাইবার কথা। বৈশম্পায়ন যে পুণ্ডরীকের অবতার, একথা তাঁহার জানা নাই। ঐ ব্রাহ্মণ-যুবক চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু, একথা জানিয়া মহাশ্বেতা যেন আরও কুণ্ঠিত, আরও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লজ্জা তিন প্রকারের; অসদুদ্দেশ্যে আবিষ্ট ব্রাহ্মণ-যুবকের আচরণের জন্য লজ্জা; তিনি চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু জানিয়া সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ চন্দ্রাপীড়ের বন্ধুর দ্বারা কৃত এই কুৎসিত আচবণের জন্য লজ্জা; তাঁহার অভিশাপে ব্রাহ্মণ-কুমারের মৃত্যুতে চন্দ্রাপীড় আহত হইবার জন্য লজ্জা। এই লজ্জা দেখিতে দেখিতে শোকে পরিণত হইল—চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হইল। কাদম্বরীর স্পর্শে মৃত চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে আলোক-বিচ্ছুরণের সহিত যে দৈববাণী হইল, তাহাতে মহাশ্বেতার হৃদয়ে আবার পুণ্ডরীকের সহিত মিলনের আশা জাগিয়া উঠিল। এই-যে অবস্থা-ভেদে পূর্ব-প্রতিশ্রুতির স্মরণ, নাটকীয় পরিভাষায় ইহাকে 'বিন্দু'[১] বলে। দৈববাণীতে আশা ফিরিল ও জীবন-নাট্য সম্মুখে চলার গতিও ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু মধ্য-পথে দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ-কুমারের আচরণ যেন সন্ন্যাসপূত প্রেমিকার শুচি-সুন্দর সত্তাকে মলিন করিয়া তুলিল। কিন্তু এই মলিনতা একটি আবরণ মাত্র। মহাশ্বেতা যদি জানিতেন যে ঐ ব্রাহ্মণ-কুমার ছদ্মবেশী পুণ্ডরীক, তাহা হইলে তিনি তাহাকে দুশ্চরিত্র বলিয়া তিরস্কার না করিয়া প্রিয়তম বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেন এবং মহাশ্বেতার জীবন-নাট্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটিত। কিন্তু কবি ছদ্মবেশে পুণ্ডরীককে উপস্থাপিত করিয়া নাট্যকলারই পরিচয় দিয়াছেন। ছদ্মবেশের আবরণে মহাশ্বেতা

---

(১) "ইত্যেবং প্রধানানুসন্ধানচেতনব্যাপারঃ কারণানুগ্রাহী স্বয়ং চ পবকারণস্বভাবস্তৈল-বিন্দুবৎ সর্বব্যাপকত্বাদপি বিন্দুঃ বীজং চ মুখসন্ধেরেব প্রভৃত্যাত্মানমুন্মেষয়তি।"

A. Bh. vol. III. 14.

যাহাকে লম্পট মনে করিতেছেন, পাঠক জানেন যে, তিনি সেই মহাশ্বেতার চিরকাম্য পুণ্ডরীক। কিন্তু মহাশ্বেতা তাহা না জানায় তাঁহার নাট্য-জীবনে যে ভাটা নামিয়াছিল, তাহাতে আবার জোয়ার দেখা দিল। প্রেমিকের উদ্দেশে প্রেমিকার যে তপস্যা, তাহার আন্তরিকতারও পরীক্ষা হইয়া গেল এবং মুগ্ধা নায়িকার মাধুর্যের সহিত খণ্ডিতার রোষ-দীপ্তি ও সতীত্বের পুণ্য তেজরাশি মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্রে যে বৈচিত্র্য আনিয়া দিল, তাহাতে রসের দিক দিয়া তাঁহার চরিত্র আরও আস্বাদ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু অজ্ঞানতার মোহাবরণে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহার জন্য মহাশ্বেতার মনে একটা খোঁচা থাকিয়া গেল। কাজ যখন মিটিয়া গিয়াছে, তখন সে-খোঁচা তুলিয়া দিতে হয়। কবিও তুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্রায়ুধ-অবতার-মুক্ত কপিঞ্জলের মুখে মহাশ্বেতা শুনিলেন চন্দ্র ও পুণ্ডরীকের পারস্পরিক অভিশাপের কথা, চন্দ্রাপীড ও বৈশম্পায়ন অবতারের কথা, কপিঞ্জলের ইন্দ্রায়ুধ-অবতারের কথা। ইতিপূর্বে মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীডের মুখে শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি অসদুদ্দেশ্যে আগত ব্রাহ্মণ-যুবকটি চন্দ্রাপীডের বন্ধু ও শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন। কপিঞ্জলের মুখে শুনিয়া বুঝিলেন, তিনিই পুণ্ডরীকের অবতার। জন্মান্তরীণ অনুরাগের আবেগেই তিনি মহাশ্বেতার নিকট আসিয়াছিলেন। মহাশ্বেতা'র অনুতাপ হইল। দুর্বাসার শাপে পরিণীতা পত্নী শকুন্তলাকে না চিনিয়া পরিত্যাগের পর স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়া দুষ্মন্তের শকুন্তলার জন্য যেমন অনুতাপ হইয়াছিল, তেমনি অনুতাপ হইল মহাশ্বেতার বৈশম্পায়নকে পুণ্ডরীকের অবতার না জানিয়া—না জানিয়া জন্মান্তরীণ ও জন্ম-জন্মান্তর-প্রেমিক প্রিয়তমকে প্রত্যাখ্যান করিয়া। কোথায় রহিল চিত্তের দৈন্য, মনের গ্লানি, সৌন্দর্যের ম্লানিমা, সতী-চরিত্রের উপর মিথ্যা-কলঙ্কের আক্ষেপ। দেখিতে দেখিতে পঙ্ক পঙ্কজ হইয়া উঠিল, অশুচি শুচি হইল, কুৎসিত সুন্দর হইল। কবির কাব্যকলার কী বৈদগ্ধ্য। ঘটনা-বিন্যাস ও ঘটনা-অভিব্যক্তির কী চমৎকার শৈলী। মহাশ্বেতার চরিত্রে ব্রাহ্মণ-যুবকের অশিষ্ট আচরণের জন্য আত্মদৈন্যে যে পর্যুষিত ক্লেদ জমিয়া উঠিয়াছিল, এখন তাহা অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অনুতাপের আগুনে বিশুদ্ধ-কান্তি কাঞ্চন হইয়া দেখা দিল। মহাশ্বেতার নিখিল মনে প্রেমের পঞ্চ-প্রদীপের যে স্তিমিত আলোক অশুচি বাতাসে মুহূর্তের জন্য ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া সমস্ত মানসিক পরিবেশকে ঘন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাই আবার ধূম-অপসারণে জ্বলিয়া উঠিয়া আলোক-পুঞ্জের স্বর্ণচ্ছটায় বিদ্যুৎ-বিলাসের পুঞ্জিত রক্ত বেদনায় চিত্তের মণি-মন্দিরে আরতির শতদল ফুটাইয়া তুলিল—অনুতাপের আঘাতে আঘাতে প্রেমের পদ্ম একটি

একটি করিয়া দল খুলিতে লাগিল। দীর্ঘ দিনের তপস্যায় যে-প্রেমের মিলন-আকাঙ্ক্ষা দৃষ্টির বহির্ভূত ধ্রুবতারার মত একটা স্থির আদর্শে নিশ্চল হইয়াছিল, যাহা দিন, ক্ষণ, মাস ও বর্ষের বাহিরে থাকিয়া দৈব-বাণীর মত অমূর্ত হইয়া আকাশের আকস্মিক ঝড়ের কাল গণনা করিতেছিল ; যাহা দূরবর্তী কালে ঘটিবে, নিরেট বর্তমানে যাহার কোন সম্ভাবনার কোন চিহ্ন নাই, সে-প্রেমের আশাবন্ধের মধ্যে কেবল ভাটার টান, জোয়ারের কোন লক্ষণ নাই। মেঘদূতের বিরহিনী যক্ষের নির্বাসন-দণ্ডের কথা জানিতেন—'বর্ষ-ভোগ্যেন ভর্তুঃ'। মারীচের তপোবনে নিয়ম-ব্রত-ধারিণী শকুন্তলার সম্মুখে পুনর্মিলনের কোন আশা ছিল না ; তবে তিনি জানিতেন, দুষ্মন্ত সশরীরে হস্তিনাপুরেই বর্তমান ; কিন্তু মহাশ্বেতাকে নির্ভর করিতে হইতেছে রতির মত কেবল দৈব-বাণীর উপর। যাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাঁহার সহিত মহাশ্বেতার পুনর্মিলন হইবে ; যিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত পুনর্মিলন কীভাবে হইবে, তাহার কোন স্থূলচিত্র মহাশ্বেতার সম্মুখে নাই। শুধু মিলন হইবে, এই বাণীটি তাঁহার মনের বীণায় তানের মতই ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝঙ্কার তুলিতেছে। ইহা লইয়া কাব্য চলে, জীবন চলে না ; কিন্তু কাব্য আবার জীবন ছাড়া নয়। কাজেই জীবনের পরিবেশে দৈব-বাণীতে সংহত পুণ্ডরীকের সহিত মহাশ্বেতার মিলনাকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ বাণীরই মতো নাম-ঠিকানা-হীন একটা বাণী মাত্র। এই বাণীটুকুকেই তপস্বিনী মহাশ্বেতা বল্কলাঞ্চলে গিঁঠ দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মাঝে মাঝে গিঁঠ খুলিয়া দেখিতেছেন, অঞ্চলের নিধি হারাইয়া যায় নাই তো। এমনি অস্পষ্ট কুহেলীময় মিলন-তৃষ্ণায় জীবনের ভাটা না নামিয়া থাকিতে পারে না। কবি মহাশ্বেতাকে প্রচুর অবসর দিয়াছেন ; ধ্যানন-মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি পঞ্চাঙ্গ সাধনার অবসর দিয়া তাঁহার তন্ময় প্রেমকে মন্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। আর বিলম্ব চলে না। ইহার পর মহাশ্বেতার জন্য দুইটি পথ খোলা ; হয়, তাহাকে যোগিনী করিয়া তুলিতে হয়. না হয়, মানবী রাখিতে হয়। যোগিনী করিলে, যোগের পথ ধরাইয়া দিলে চিত্তের মধ্যেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনের মতো একটা দার্শনিক মিলন হইতে পারে। এ মিলন চৈত্তিক ; এ মিলনের স্বরূপ অদ্বৈত। ইহার জন্য কোনো স্থূল রূপের—কোন দ্বৈত সত্তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাব্যে যে মিলন অপেক্ষিত, তাহা দ্বৈত সত্তার মিলন—দুইটি স্থূলের মিলন। কিন্তু তাহা যৌগিক নহে, তাহা শৃঙ্গারিক, তাহা প্রেমিক। দ্বৈতকে অবলম্বন করিয়া দ্বৈতাতীত একটি অদ্বৈত অনুভূতি মাত্র। কাজেই কবি দেখিলেন, কাব্যের খাতিরে মহাশ্বেতাকে শৃঙ্গারিক প্রেমে নামাইয়া আনিতে হয়।

শৃঙ্গারিক প্রেমে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত মিলনকে ঠেকাইয়া রাখা চলে না। জীবন অনন্ত হইলেও কাব্যে আর্টের দাবি মানিতে হয় এবং আর্টের জন্য চাই আরম্ভ—উন্মেষ—পরিণামসহ সুগঠিত একটি বৃত্ত। মহাশ্বেতাকে এই বৃত্তের মধ্যে টানিয়া আনিতে হইলে তাহাকে অনির্দিষ্টকালের জন্ত জপ, তপ ও মন্ত্র দিয়া ঠেকাইয়া রাখিলে কাব্যের কাহিনী পঙ্গু হইয়া পড়ে; সে আর চলিতে পারে না; তাই কবি বৈশম্পায়নের অবতারে পুণ্ডরীককে আনিয়া হাজির করিলেন; অবতারের ছদ্মবেশের সহিত অবতার্যের ছদ্মবেশ পবিবেশন করিয়া মহাশ্বেতার চিত্তে আগুন ধরাইয়া দিলেন। সেই আগুনে ধূম উদ্গীর্ণ হইয়া যাহা রহিল, তাহা প্রেমের পঞ্চপ্রদীপ। ভাটাধরা তপস্যা একটা নাড়া খাইয়া জোয়ারের মতো ফুলিয়া উঠিল। কপিঞ্জলের বিবৃতিতে স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোক একাকার হইয়া চারিদিককে স্পষ্ট করিয়া তুলিল। মিলনের আশা কেবলমাত্র দৈব-বাণীতে আবদ্ধ থাকে নাই; মিলনের কার্য বহুদিন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুণ্ডরীক বৈশম্পায়নবেশে একবার তাঁহারই মন্দির-প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া গিয়াছেন। যাঁহার অভিশাপে পুণ্ডবীকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল এবং যিনি পুণ্ডরীকের শবদেহ আকর্ষণ করিয়া আকাশে উঠিয়াছিলেন, তিনিও চন্দ্রাপীড়ের অবতার গ্রহণ করিয়া তাঁহারই মন্দির-অলিন্দে হতচেতন ও বিগত-জীবন। বন্ধু কপিঞ্জল, যিনি পুণ্ডরীকের মৃতদেহের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে তারাগণের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও ইন্দ্রায়ুধের অবতাবে পৃথিবীতেই ছিলেন; বর্তমানে শাপমুক্ত হইয়া মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর মনে মিলনের আশা সঞ্চারিত করিয়া এইমাত্র চন্দ্রাপীড ও বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পত্রলেখা কোথায় গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত ভগবান্ শ্বেতকেতুর নিকট গমন করিলেন। তাই বলিতে-ছিলাম, কবির লেখনীর যাদুস্পর্শে স্বর্গ মর্ত্যে আসিয়া নামিয়াছে, শব্দসারমাত্র দৈববাণী মানুষের রূপ ধরিয়া মর্ত্যের ভূমিতে নামিয়া মানুষের জীবন-চরিতে সার্থক হইতে চলিয়াছে।

পুণ্ডরীকের মৃত্যুকালীন দৈব-বাণী এবং মহাশ্বেতার আশ্রমে উচ্চারিত দৈব-বাণী—এই দুই দৈব-বাণীব মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান এবং সেই ব্যবধানকে ঘিরিয়া রহিয়াছে মিলন-কামী নিয়ম-ব্রত-ধারিণী অপেক্ষমান নারীর আত্ম-হৃদয়ের শুচিশুদ্ধ এক আতপ্ত মাধুর্য। মহাশ্বেতার মনের মধ্যে এখন মিলনের তিলমাত্র সন্দেহ নাই। যে-মিলন ঘটিয়াও ঘটিতেছে না, তাহার মূলে আছে জন্মান্তরীণ কুকর্মের বহতা ধারা এবং সুকর্মের অভাব। অপ্রসন্ন ভাগ্য-দেবতার নির্দেশে প্রাকৃত কর্মের অবলম্বনে মিলনের যে অন্তরায় এখনও পর্বতের মতো দুইটি উৎসুক হৃদয়কে আড়াল

করিয়া রাখিয়াছে, সেই বাধাকে ঠেলিয়া ফেলিতে হইলে যে মত্ত মাতঙ্গের শক্তির প্রয়োজন, সে শক্তির মূল হইল—ধর্ম-চারণা ; তপস্যা। তাই কপিঞ্জল বিদায়কালে মহাশ্বেতাকে তপস্যা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ তপস্যায় এক দিকে যেমন প্রাক্তন কর্মের ক্ষয় হইবে, অন্যদিকে তেমনি পুণ্য কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধিহেতু সত্ত্বগুণের প্রাচুর্যে চিত্তলোকে বিশুদ্ধ প্রেমের জাগরণ ঘটিবে। নিশান্তে প্রথম উষার আবির্ভাবে, নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের জন্য যেমন রক্ত, নীল, পীত, নানা বর্ণের আলিপনা পড়িতে থাকে, তেমনি মিলনের পূর্বে মহাশ্বেতার চিত্ত-আকাশে অনুরাগের আলিপনার প্রস্তুতির জন্য এই উপদেশ। মহাশ্বেতার উপাস্য মহাদেব। আদর্শ, পার্বতী-পরমেশ্বরের শ্বাশ্বত স্বর্গীয় প্রেম ; "পরস্পবতপঃ[১] সম্পদ্ ফলায়িত-পরস্পরৌ।" এই প্রেম-তপস্যার জীবন্ত উত্তেজনা কাদম্বরী-কর্তৃক চন্দ্রাপীডেব শব-দেহের শুচিশুদ্ধ পরিমার্জনা ও পবিচর্যা। নিঃশেষে যে-হৃদয় ঢালিয়া পতিব্রতা পত্নী মৃত স্বামীকে বাঁচাইতে চাহে, কাদম্বরীর পরিচর্যায় সেই হৃদয়েবই নিঃশেষ অবগাহন। প্রতিদিন উপাসিকাব জীবন্ত উপাসনার এই চিত্র দেখিয়া মহাশ্বেতা ভবানীপতির মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। অতএব অন্তবে ও বাহিবে—নিঃসন্দেহ আশাবন্ধে ও প্রিয়গত হৃদয়েব আকুতিময় তপস্যায় মন্ময়তার যে দীপ্তি ঝরিয়া পড়িয়াছে, সেই দীপ্তি এই অপেক্ষমান কাল ধরিয়া বীণা পাণি মহাশ্বেতার তপস্বিনী মূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তাই দীর্ঘ দিনের নীরব নির্বাক তপস্যার পর—তপ-জপ-অশ্রুপাত-নির্বেদ-দৈন্য মথিত মহাশ্বেতার চিত্তে স্বপ্ন-জাগরণের পর যখন প্রেমেব পরিপূর্ণ বক্ত শতদল আপন রসে ও লাবণ্যে, বর্ণে ও সুষমায়, গন্ধে ও মত্ততায় আপন দণ্ডের উপর স্থির হইয়া দাঁডাইয়া মহাশ্বেতাব নির্মল হৃদয়-মুকুরে প্রেমের রক্তরাগ হানিতেছিল, সেদিন বহির্বিশ্বের প্রকৃতির অঙ্গণেও প্রথম যৌবনোচ্ছ্বাসের রক্ত ফেনের জাগ্রৎ বাণী লইয়া নববসন্তও মহাশ্বেতার অঙ্গে অঙ্গে অন্তরঙ্গে মুহুর্মুহুঃ পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিতেছিল। বাহির ও অন্তবের জাগরণে বিদ্যুদ্দীপ্ত সন্ধিকালে শ্বেতকেতুর পুণ্যকর্ম-পূত পুণ্ডরীকের সহিত তপস্বিনী মহাশ্বেতার মিলন হইল। অতএব প্লটে উৎকীর্ণ মহাশ্বেতার পরোক্ষভাব-প্রাধান্যেব যে নিন্দা আমরা ঘটনার বাস্তববোধের দিক হইতে করিয়াছি, এখন দেখা গেল, সে নিন্দা নিন্দা নয় ; তাহা প্রশংসা ; কারণ Action ত্রিবিধ ; Physical, Mental ও Spiritual. Physical ও mental action এর ন্যায় Spiritual এ্যাকশনও যথেষ্ট মূল্যবান্। ইহা বহিরঙ্গ-সহচর নয় বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গে সর্বসাধ্যসার। মনস্বী নাট্য

(১) কুবলয়ানন্দ

শিল্পী আঁদ্রিভ বলিয়াছেন, "নাটকে ঘটনার গতিই একমাত্র সব নয়—ক্রিয়াহীন তপস্যার মধ্যেই নাটকীয় গতির আধিক্য দেখা যায়। বাহ্য ঘটনার অপেক্ষা সুষুপ্ত সুগভীর অনুভূতির মধ্যেই করুণ রস অধিকতর বিদ্যমান।"

আমরা এতক্ষণ কেবল মহাশ্বেতাকেই দেখিতেছিলাম। পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিলন পর্যন্ত নানা অবস্থাপরিবর্তনের মধ্যে মহাশ্বেতাকে দেখিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে মনেহইতেছিল, মহাশ্বেতার চরিত্র একটা চরিত্র বটে। গ্রন্থারম্ভে মহাশ্বেতা যেমনটি ছিলেন, গ্রন্থের উপসংহারে তেমনটি নাই। একেবারে একটা নূতন মানুষ। যৌবনের একটা প্রাথমিক আঘাতে মনের যে-দ্বার খুলিয়া গেল, সেই খোলা দ্বার দিয়া বাহির হইয়া সাংসারিক ও দৈব অভিজ্ঞতার আঘাতে আঘাতে মনের একতারায় তারের পর তার চড়াইয়া মনটিকে জীবনসঙ্গীতের উপযোগী বহুতন্ত্রী বীণায় পরিণত করিয়া বাহিরের সংসার ও অদৃশ্য দৈবের লীলায় ঘনাইয়া তুলিয়া তিনি ছুটিয়া চলিলেন অশ্রুর উপলপথে অগ্নিমাখা তপস্যার তোরণ দিয়া অজ্ঞাতপ্রেমের অন্তঃপুরে। এই দীর্ঘ পথ-যাত্রার বাঁকে বাঁকে তাঁহাকে বার বার নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে। জীবন-কাহিনীর উপসংহারে নিত্য নূতনতর রহস্যের জীবনভাষ্য হইয়া—পরিপূর্ণ সঙ্গীত হইয়া তিনি আপন জীবন-বৃত্তের শিয়রে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, মহাশ্বেতার জীবন সামগ্রিকতার জীবন, সঙ্গতির জীবন, গতির জীবন, বৈচিত্র্যের জীবন। তাঁহার জীবন আদি-মধ্য-অন্ত্যবিশিষ্ট বৃত্তের উপর সঞ্চরমান প্রাণ-স্পন্দনের বর্ণমালা।

এখন পুণ্ডরীকের কথা। যিনি মহাশ্বেতার ন্যায় রূপবতী ও গুণবতী ষোড়শীর প্রেমের পাত্র হইবেন, তাঁহার যেমনটি হওয়া উচিত, পুণ্ডরীক তাহা হইতে পারেন নাই। সেই কারণে মহাশ্বেতার প্রেম-কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাণভট্টের মানসী কন্যা মহাশ্বেতা, কাদম্বরী নয়।[১] কাদম্বরী উপন্যাসের নায়িকা-রূপে কথিত হইলেও মহাশ্বেতার দীপ্তির-ঔজ্জ্বল্যকে সে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। কবি-মানসের শিল্পকর্মে অনুস্যূত মহাশ্বেতার চরিত্রায়নের পশ্চাতে কবির বাসনালোকের প্রেরণাটি ধরিতে পারিলে এই কথাই মনে হইবে যে

---

(১) সংগ্রহশ্লোক:

চন্দ্রাপীড়োঽনুকূলঃ সকলগুণধরো নায়কোঽস্মিন্ দান্তঃ
নেত্রী কন্যাত্মদীষা মৃদুললিততনুর্ মুগ্ধকাদম্বরী চ॥
পাঞ্চালী নাম রীতি র্বিলসতি বহুলা বিপ্রলম্ভোবসোঽংগী
মাধুর্যাখ্যো গুণো বা কবি-মুকুটমণেঃ কাব্যয়োরত্যমেতৎ॥

মহাশ্বেতাই কবি-সৃষ্টির পুষ্পিত অর্ঘ্য। মহাশ্বেতা কাদম্বরী-উপন্যাসের নায়িকা হইবার যোগ্য কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নায়িকা নন। কাদম্বরী-উপন্যাসে তাঁহার ব্যাপ্তিও বড কম নয়। তিনি সমগ্র ঘটনার কেন্দ্র-বিন্দু। চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরী-প্রেমের গ্রন্থি-বন্ধন তাঁহারই হাতে। তিনি যেন একখানি গ্রামোফোন রেকর্ড—একপীঠে আত্মজীবনের প্রেম-কাহিনীর করুণ সঙ্গীত, অপর পীঠে চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রেমোৎসবের লীলা-সঙ্গীত। অতএব মহাশ্বেতার জীবন-নাট্যের যিনি নায়ক হইবেন, তাঁহার মহাশ্বেতার উপযোগী হওয়া চাই। পুণ্ডরীক আমাদের সে আশায় বাদ সাধিয়াছেন।

পুণ্ডরীক শ্বেতকেতুর ন্যায় দিব্যলোকের এক ঋষির সন্তান হইলেও প্রবৃত্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাঁহার জন্ম। সমুদ্রগর্ভে পুণ্ডরীকে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম পুণ্ডরীক। ঋষি শ্বেতকেতুর সন্তান বলিয়া তিনি ঋষি-জনোচিত শক্তি ও স্বভাব পাইয়াছিলেন। কপিঞ্জলের জোবান-বন্দীতে পাওয়া যায়, ধৈর্য, গাম্ভীর্য বিনয়, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ যেমন তাঁহার ছিল, তেমনি কুল-ক্রমাগত ব্রহ্মচর্য, বিষয়-বৈরাগ্য, তপস্যায় অভিনিবেশ, শাস্ত্রজ্ঞান, যৌবনের শাসন ও মনের বশীকরণ প্রভৃতি শক্তিও তাঁহার ছিল। আবার শূদ্রকের সভায় বৃদ্ধ কঞ্চুকীব মুখে পুণ্ডরীকের শুকাবতারের গুণাবলীর কথা শুনিতে পাই ;—ইনি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, রাজনীতি-প্রয়োগ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, সদ্বক্তা, চতুর, সকল-কলাভিজ্ঞ, কাব্য-নাটক-ইতিহাসের মর্মজ্ঞ, গুণগ্রাহী। বৈশম্পায়ন-অবতারেও দেখা যায়, ব্যায়াম ব্যতিরেকে অপর সকল বিদ্যায় বৈশম্পায়ন চন্দ্রাপীডের অনুরূপ। তাহা হইলে পুণ্ডরীকের তিন অবতারেই দেখা যায় যে তিনি শাস্ত্রবিদ্, উদাত্তচরিত ও শক্তিমান্ পুরুষ। মাতার ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার প্রাচুর্যের ফলে ঋষি-বংশ সম্ভূত পিতৃদত্ত-গুণ-গুলি মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই। পুণ্ডরীক-জন্মে ঋষিপুত্র হইয়াও কামাবেগে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৈশম্পায়ন-জন্মে তিনি কামোন্মত্ত লম্পট ব্রাহ্মণ-যুবক। শুক-জন্মে জাবালির মুখে আত্ম-কাহিনী শুনিয়া পূর্ব-জীবনের বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ার পর পিতৃ-নিষেধ সত্ত্বেও মহাশ্বেতার উদ্দেশে যাত্রার মধ্যে তাঁহার প্রবৃত্তি-প্রাচুর্য ধরা পড়ে। এইখানেই শেষ নয়, পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া জাবালির আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ায় পুত্রের আয়ুষ্কর কর্মে নিযুক্ত পিতার চিত্তে এমনি দুশ্চিন্তা জাগিয়াছিল যে, এ আবার নূতন কোন কুকর্মে লিপ্ত হইতে পারে। সেই কারণে শ্বেতকেতু আয়ুষ্কর কর্ম-সমাপ্তি পর্যন্ত পুত্রকে শবরগৃহে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মী-দেবীকে চণ্ডাল-কন্যারূপে আবির্ভূত হইতে বাধ্য করিলেন। অতএব

পুণ্ডরীকের তিনটি ক্রমিক-জন্ম-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাক্তনের ন্যায় যাহা প্রতিজন্মে তাঁহার সহজাত, তাহা হইল প্রবৃত্তির আগুনে পুণ্ডরীকের আত্ম-সমর্পণ। তাঁহার পিতা মহর্ষি শ্বেতকেতু বলিয়াছেন, এই প্রবৃত্তি-প্রাচুর্যের জন্য তিনি দায়ী নন। দায়িত্বটা মাতার উপর চাপাইয়াছেন। যে-ই দায়ী হউন না কেন, এমন চরিত্র মহাশ্বেতার উপযুক্ত হয় নাই। এমন অনুপযুক্ত অন্তঃসারশূন্য চরিত্র কবি মহাশ্বেতার জন্য কেন সৃষ্টি করিলেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। তাহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথাই বলা চলে যে, পুণ্ডরীকের চরিত্র সবেমাত্র উদ্ঘাটন করিয়াই বাণ পরলোক গমন করেন। কাদম্বরীর নিকট হইতে চন্দ্রাপীড়ের নিকট পত্রলেখার আগমন পর্যন্ত বাণের রচনা। উত্তরাংশ বাণের পুত্র ভূষণের রচনা। অতএব বাণ-পরিকল্পিত পুণ্ডরীক-চরিত্রের খসড়াটি আমরা পাই নাই। বাণ জীবিত থাকিলে পুণ্ডরীকের চরিত্র কিরূপ হইত, তাহাও বলা সম্ভব নয়। তবে মনে হয়, শিব-পার্বতীর অদ্বৈতপ্রেমের আদর্শ লইয়া তিনি পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার প্রেমের কল্পনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রসর হইয়াই প্রমাদ গণিলেন। মহাশিবের চারিত্রিক প্রতিবিম্ব কোন মনুষ্য-চরিত্রের মুকুরে পড়িতে পারে না। শিবের মনুষ্যকল্প রূপের কল্পনার সাহস তাঁহার ছিল না; অন্ততঃ কল্পনা করিতে তিনি ভীত হইয়াছেন। অথচ পার্বতীর ক্ষীণ প্রতিবিম্বরূপে মহাশ্বেতাকে সৃষ্টি করিবার লোভ তিনি দমন করিতে পারেন নাই। তাই মানুষ ছাড়িয়া তিনি কিন্নরকুলের সুন্দরী কন্যা মহাশ্বেতাকে বাছিয়া লইলেন; পার্বতীর নারীত্বের প্রতি শিবের উপেক্ষার পরিবর্তে ঘটাইলেন প্রথম মিলনের মুখে বল্লভের মৃত্যু; পার্বতীর তপস্যার ভীষণতার পরিবর্তে যোজনা করিলেন তপস্যার মৃদু আভাসের সহিত মেঘদূতের বিরহিনী কান্তার বিরহতপ্ত মর্মবেদনার অশ্রুসিক্ত বীণাধ্বনি। শুধু তাহাই নহে, কুমার-সম্ভবের রতির বিড়ম্বিত ভাগ্য তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়া তিনি মহাশ্বেতার পরিকল্পনা করিলেন। পার্বতী, রতি, যক্ষকান্তা, শকুন্তলা ও সীতা—সকলেরই প্রভাব পড়িয়াছে মহাশ্বেতার উপর কিন্তু পার্বতীর প্রভাবই বেশী। তবুও মহাশ্বেতা পার্বতীর অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব।

এই মহাশ্বেতার দিক হইতে তাঁহার নায়কটি কেমন হইবেন, চিন্তা করিলে শিবের কথা মনে পড়ে। শিব-চরিত্রকে কবি কেন যে ধরিতে পারেন নাই, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবি শিবকে ছাড়িয়া মদনকে রুদ্রের অভিশাপের সহিত গ্রহণ করিলেন। পুণ্ডরীক-সৃষ্টির এই মূল তত্ত্বটি কবি মহাশ্বেতার মুখ দিয়া একটি উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অচ্ছোদসরোবরে কপিঞ্জলের

সহিত পুণ্ডরীককে দেখিয়া মহাশ্বেতার মনে হইতেছিল—"যেন রতিপতি প্রিয়-সহচর বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন।" যাহা হউক, কুমার-সম্ভবের এই মদনকে ঋষির বেশে উপস্থাপিত করিয়া কবি পুণ্ডরীকের কল্পনা করিয়াছেন। পুণ্ডরীক যে কামের অবতার, একথা, কবি মুখ খুলিয়া কোথাও বলেন নাই, বরং পুণ্ডরীক-চরিত্রের আসল সত্যটি চাপা দিয়া জন্ম-সহজাত প্রবৃত্তি-প্রাচুর্যের দোহাই দিয়াছেন;—মাতৃ-প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস পুত্রের কবচ-কুণ্ডলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথাই বলিয়াছেন। তাহাতে ফল হইয়াছে এই, তাঁহার ঋষিবেশের কোন সার্থকতা প্রমাণিত হয় নাই। ঋষিচরিত্রের উদাত্ত গুণগুলি মৌখিক হইয়া রহিয়াছে; কোন কাজে লাগে নাই। নিষ্ক্রিয় জীবনের আদ্যোপান্ত কেবল প্রবৃত্তির তাড়না। পুণ্ডরীক-চরিত্র চরিত্রই নয়; ইহা জীবনের যে-সূচনায় প্রারব্ধ, সেই সূচনায় পরিসমাপ্ত। সামগ্রিক জীবনের—গতিশীল পরিবর্তমান জীবনের—আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত জীবনবৃত্তের কোনো গন্ধ ইহাতে নাই।

পুণ্ডরীক-চরিত্রের সকল ত্রুটিই সহ্য করা চলে কিন্তু প্রেমের ত্রুটিতো সহ্য করা চলে না। প্রেমের নামে যাহা আছে, তাহা কাম। অথচ এই কাম সম্ভোগ-স্বাদাত্মক নহে; ইহা উদ্দীপনাত্মক। উপভোগের মুখে শূন্যতায় ভরিয়া অপ্রাপ্তির বেদনায় মথিত করিয়া এই কাম মহাশ্বেতার বাসনার স্নেহে প্রেমের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। প্রেম দ্বৈতসত্তার উপর নির্ভর করে। উভয়ের হৃদয়-বিনিময়ের সূত্র ধরিয়া অপ্রাপ্তির বিরহে জ্বলিয়া মথিয়া কাম প্রেম হইয়া ফলিয়া ওঠে এবং দ্বৈত-হৃদয়ের মিলন-তীর্থে ইহা অদ্বৈত আনন্দ বিকিরণ করিয়া হৃদয়ের বিশ্রান্তি ঘটায়। মহাশ্বেতার প্রথম মিলনের মুখে দৈবের আঘাত তাহাকে তপস্যায় ব্রতী করিয়া প্রেমের পথে লইয়া গিয়াছিল। আশা-বন্ধের স্থির বিন্দুটিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার প্রেম আন্তর তপস্যার ঘূর্ণীচক্রে পড়িয়া যে স্ফুলিঙ্গ উদ্গার করিয়াছিল, তাহাই সমগ্র হৃদয়কে আলোকিত করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ হইয়া হৃদয়াকাশে স্থির হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব মহাশ্বেতার প্রেমের উদ্দীপক—পুণ্ডরীকের কাম। আপন হৃদয়ের নিভৃতকুঞ্জে প্রেমের কলিটিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে তাপটুকুর প্রয়োজন হইয়াছিল, মহাশ্বেতা সেই তাপটুকুকে লইয়াছিলেন পুণ্ডরীকের অচরিতার্থ কাম হইতে—কামের উদ্দীপনা হইতে। কিন্তু পুণ্ডরীকের সহিত হৃদয়-বিনিময়ের কোন সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই। প্রেমের কলিটি দুইটি হৃদয়-ভাবের তাপে মঞ্জুরিত হইয়া হৃদয়লতার বিশেষ গ্রন্থিতে যমজ ফুল হইয়া ফুটিতে পারে নাই।

তাই মহাশ্বেতার প্রেম একতারার প্রেম—বাউলের প্রেম। দুইটি হৃদয়-ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে একটু একটু করিয়া উদ্ভিন্ন হইয়া বহুতন্ত্রী বীণা হইয়া বাজিয়া ওঠে নাই। এই কারণেই বলিতে হয়, পুণ্ডরীকের অপরিণত চরিত্র-চিত্রণের জন্য মহাশ্বেতার চরিত্র খুলিতে পারে নাই। উহা মাত্র একটি আইডিয়া।

পুণ্ডরীক-জীবনের তিন পর্যায়ের মধ্যে বৈশম্পায়ন-অবতারে প্রেমের প্রভাত জাগিতে না জাগিতে মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া দিল সেই প্রভাতকে। অচ্ছোদ-সরোবরের তীরে আসিয়া তাঁহার মনে পড়িল, এখানে যেন তিনি তাঁহার কোন প্রিয় বস্তু ফেলিয়া গিয়াছেন। শিলাতল দেখিয়া তিনি উন্মনা হইলেন। মনের মধ্যে মন মেলিয়া কী সে বস্তু, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না ; অথচ তাঁহার অবচেতনে অন্ধ-সংস্কারের মতো কী যেন ঘা দিতে লাগিল। জন্মান্তরীণ সংস্কার বিস্মৃতির আবরণের তলে পড়িয়া instinct-এর মতো তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। ইহাই 'জননান্তর সৌহৃদানি'। পূর্ব-স্মৃতির প্রবাহ রুদ্ধ বলিয়া পশুপ্রবৃত্তির মতো অন্তস্তলে এই পৌনঃপুনিক আঘাত। এইখানে বৈশম্পায়ন-চরিত্রকে মেলিয়া ধরিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল ; তাঁহার কামকে মৃত্যু-কালীন অপ্রাপ্তির বেদনায় মথিত করিয়া প্রেমে উন্নীত করিবার প্রচুর অবকাশ ছিল এইখানেই। কবি এই অবসরের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই আশ্রমে মহাশ্বেতার দর্শনে তাঁহার পশুপ্রকৃতি কামেরই উদ্দীপনা দেখাইয়াছেন। পূর্বজীবনের মৃত্যু কামের উদ্দীপনায় ; বৈশম্পায়ন-জীবনের মৃত্যুও কাম-উদ্দীপন-জনিত। কবি সুযোগ পাইয়াও তাহার পশু-জীবনের পরিশোধন করেন নাই। সে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইল। হিন্দুশাস্ত্রের মতে মানুষ মৃত্যুকালীন যে বাসনা লইয়া মরে, পরবর্তী জীবনে সেই বাসনারই অনুবৃত্তি ঘটে। সম্ভোগেচ্ছার উত্তেজনায় প্রথম জীবনে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে ; পরবর্তী জীবনে আবার তাহারই যথাযথ অনুবৃত্তি, জীবনে ও কাব্যে, কোন বৈচিত্র্য আনিতে পারে নাই। এইখানে কবির উন্নীততর স্তরের কল্পনা করা উচিত ছিল কিন্তু কবি পুরাবৃত্তেরই আবৃত্তি করিলেন মাত্র। তাহাকে তির্যগ্‌যোনিতে টানিয়া আনিয়া ক্ষান্ত হইলেন। তাহাতেও আপত্তি ছিল না, যদি সেখানেও তাহার কিছু সংশোধন করিতে পারিতেন। সংশোধনের সুযোগও যে ছিল না, এমন নহে। জাবালির তপোবন-আশ্রমে সে পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছে। যে-পাখি মানুষের মতো কথা বলিতে পারে ; বিশুদ্ধ বেদ-মন্ত্রে দক্ষিণ পদ তুলিয়া রাজার প্রতি স্বস্তিবচন উচ্চারণ করিতে পারে ; যে জাতিস্মর ; পূর্বজীবনের সকল কথা যাঁহার মনে ভীড় করিয়া আসে, তাঁহার মনে আত্মকৃত

কুকর্মের জন্য কোন অনুতাপ আসিল না ; বরং উল্টা হইল। তখনও ভাল করিয়া তাহার পাখা ওঠে নাই, স্বচ্ছন্দে চলিবার মতো তাহার শক্তিও জন্মে নাই, তবুও সে মহাশ্বেতার উদ্দেশে চলিল। মহাশ্বেতার অভিশাপের ফলে সে পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পক্ষী হইয়াও তাহার লজ্জা নাই। মহাশ্বেতার অভিশাপের কথা মনে পড়ায়ও তাহার আত্ম-ধিক্কার জন্মে নাই। সে যাহা ছিল, তাহাই রহিয়া গেল ; যাহা ছিল, তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে হুঁচোট খাইতে খাইতে মহাশ্বেতার সন্ধানে চলিল। তাহার এই দুষ্ট মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি শ্বেতকেতু চিন্তিত হইলেন। আয়ুষ্কর কর্মের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার জন্য লক্ষ্মীদেবীকে নিষাদগৃহে পাঠাইলেন। কবি বেশ জানিতেন, তপস্যায় বিশুদ্ধ না হইলে মহাশ্বেতার সহিত তাঁহার মিলন হইতে পারে না। জানিতেন বলিয়া শ্বেতকেতুকে দিয়া আয়ুষ্কর কর্ম করাইলেন। কিন্তু ইহা বহিরঙ্গ তপস্যা। এই তপস্যাকে অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে পারিলে পুণ্ডরীকের চরিত্র কাব্যকলার অনুমোদিত হইত। বহিরঙ্গ তপস্যায় পাপক্ষয়ে পুণ্যসঞ্চয় হইলেও সেই পুণ্য-বিধৌত হৃদয়ে প্রেমের জাগরণ ঘটিতে পারে না। তাহা হইলে পুণ্যাত্মা বিগতপাপ ব্যক্তিমাত্রই প্রেমিক হইতে পারিতেন ; তাহা হইলে জরৎ-মীমাংসকের সৃষ্টি হইত না। অতএব পুণ্ডরীকের চিত্তের পরিশুদ্ধির জন্য শ্বেতকেতুর ভূমিকা কিছুতেই শিল্প-সম্মত নয়। হারীতের প্রশ্নে, জবালির জবাবে, শ্বেতকেতু-কর্তৃক পুণ্ডরীকের পাপকর্মের জন্য পিতার আত্ম-ত্রুটি স্বীকারের মধ্যে হিন্দুধর্মের কর্মবাদকে যতই ফলাও করিয়া বলা হউক না কেন, পুণ্ডরীকের জীবনে প্রেম-উদ্ভাসনের প্রতি তাহা কোন সাহায্যই করিতে পারে নাই। কবি স্বেচ্ছায় বা ভ্রমে পড়িয়া কেবল পুণ্ডরীককে সংহার করেন নাই, উপন্যাসের আর্টকে ধর্মবুদ্ধির হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলি দিয়াছেন। অতএব পুণ্ডরীকের জীবন-বৃত্তের আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইল, সে কামের অবতার। কাম চিত্তের একটি বৃত্তিমাত্র। পুণ্ডরীক সেই বৃত্তিরই রূপক চরিত্র। আখ্যানের দিক্ দিয়া তাই পুণ্ডরীক-চরিত্র একই বৃত্তির বিভিন্ন পরিবেশের সাহায্যে ব্যাখ্যানমাত্র। তাই বলিতেছিলাম, পুণ্ডরীক-চরিত্র কোনমতেই মহাশ্বেতার যোগ্য হয় নাই। আমাদের সৌভাগ্য, কবি বৈশম্পায়ন-অবতারকে টানিয়া আনিয়া পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার মিলন ঘটান নাই।

কাদম্বরী-চরিত্র আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন, উপন্যাসের দিক্ দিয়া মহাশ্বেতার প্রেম-কাহিনী বর্ণনার পর কাদম্বরী-প্রেম-কাহিনী বর্ণনার সার্থকতা কিছু আছে কিনা ? ইহার উত্তরে কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে,—প্রথম

কথা, উপন্যাসখানির রস শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গার বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' বিপ্রলম্ভ ছাড়া কেবলমাত্র সম্ভোগের দ্বারা শৃঙ্গারের পুষ্টি হয় না। শৃঙ্গারের দুইটি চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত হওয়ায় শৃঙ্গারের গাঢ়তা জমিয়া উঠিয়াছে। একই বিষয়ের উপর দুইখানি চিত্ররচনার কাজকে পাশ্চাত্ত্য মতে বলা হয় Paralellism এই Paralellism-এর ক্রিয়া সম্পর্কে Hudson বলেন—"Paralellism is a familiar element in the composition of a plot, especially in the form of the reduplication of motives. An excellent effect is often obtained when the central idea of one part of the action re-appears in another part of it, and each is thus made to illustrate and re-inforce the other."[১] অতএব Paralellism-এর ফলে আদিরস এমনি গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে যে বিভিন্ন উপকাহিনী ও আভিধানিক বিষয়বস্তুর উপর ইহা এক চিন্ময় স্বপ্নের মধুময় আবেশ ছড়াইয়া দিয়া সকলকে পিছনে ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাসের আর সকল বিষয় আবছাওয়ায় মুড়িয়া আদিরস এক জ্যোৎস্নার কারুকার্যময় আঁচল মেলিয়া ধরিয়াছে। ইহা ছাড়া একজাতীয় দুইখানি চিত্রের পরিবেশনের আর কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ চিত্র-দুইখানির সাধর্ম্য অপেক্ষা বৈধর্ম্যই বেশী। কী পরিবেশের দিক দিয়া, কী কাহিনীব দিক দিয়া দুইখানি চিত্রের পার্থক্য অনেকখানি। মহাশ্বেতাব প্রেম-কাহিনী উদ্ঘাটনের পরিবেশ অচ্ছোদসরোবরতীর; কাদম্বরীর গন্ধর্ব-অধ্যুষিত হেমকূট; মহাশ্বেতার প্রণয়ী তাপসকুমার; কাদম্বরীর রাজকুমাব; মহাশ্বেতার প্রেম যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের ফেনিলতায় গর্জনশীল; তরঙ্গে তরঙ্গে ধাবমান; দুর্বার, অপ্রতিহত-গতি; যেমন তাহার স্রোতের বেগ, স্রোতের মুখে তেমনি আচম্বিত আঘাত, আঘাতের এমনি তীব্রতা যে সম্ভোগের উদ্দেশে রচিত আত্ম-নিবেদনের ফুলের ডালায় তপস্যার আগুন জলিয়া ওঠে; কাদম্বরীর প্রেম পুষ্পের মত বিকাশশীল; দুইটি বাঁকা নয়নের তপ্তমধুর একটুখানি আলোর ছোঁয়ায় এক-একটি করিয়া পাঁপড়ির প্রকাশ; তরুণ কিরণের চটুল কটাক্ষে অনাবৃত বক্ষের সলজ্জ কম্পমান কেশরের যেন রেণু-রোমাঞ্চ। এ প্রেমের প্রতিপদক্ষেপ ধীর; কেবলমাত্র পায়ের নূপুরে যতটুকু দোলা দিলে কিঙ্কিণীর বোল ওঠে, এর পদক্ষেপে মাত্র ততটুকু দোলা আছে। মহাশ্বেতার

(১) I. S. L.

প্রেমে আত্ম-গন্ধে-মত্ত কস্তুরীমৃগের চঞ্চল ত্বরিত পদধ্বনি! প্রভাত-রবির ঈষদ্-উদ্ভিন্ন রক্তরেখায়-আঁকা বসন্তের আকাশ; লহরে লহরে লীলায়িত অচ্ছোদ-সরোবর, সরোবরতটে প্রাণাবেগে বেপথুমান লজ্জা-বিনম্র বনভূমি; যৌবনের আবীরঢালা পুষ্পের মিছিল; লতাকুঞ্জ; শিলাতল; প্রকৃতির এই মুক্ত পরিবেশে মিশিয়া আছে পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার প্রথম যৌবনের কিঙ্কিণী-ধ্বনি। কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়-বিনিময়ের মন্থর আভাস জাগিয়াছিল রাজগৃহের পারিবারিক জীবনের ঐশ্বর্যের কারুকার্যময় শিল্প-অবদানের মধ্যে; অনৈসর্গিক বাহ্য আড়ম্বরের রাজসিকতার মধ্যে। মহাশ্বেতার প্রেমের পথ সংসার ও সমাজকে পিছনে ফেলিয়া অভিসারিকার অঙ্গণ দিয়া; কাদম্বরীর প্রেমের পথ সংসার ও সমাজকে স্বীকার করিয়া নৈতিক অনুশাসনের সীমান্ত দিয়া। মহাশ্বেতার প্রেম প্রথম যৌবনের জোয়ারে দেহ ও মনের কূল ছাপাইয়া জাগিয়া-ওঠা এক উদ্দামতা; কাদম্বরীর প্রেম পারিবারিক শিষ্টতায় শাসিত স্বভাবের আলোজলে ফুটিয়া-ওঠা এক সুগন্ধ হৃদয়ের প্রকাশ। মহাশ্বেতার প্রেমে অভিসার আছে, কাদম্বরীর অভিসার নেই, আছে বাসক-সজ্জার মানসিকতা। মহাশ্বেতার প্রেমের দৌত্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাপসকুমার কপিঞ্জল; কাদম্বরীর পত্রলেখা। মহাশ্বেতার প্রেমে সন্ন্যাসের সহিত মাধুর্যের মিশ্রণ; কাদম্বরীর প্রেমে মাধুর্যের সহিত ঐশ্বর্যের মিশ্রণ! মহাশ্বেতার প্রেমে নাটকীয়তা, কাদম্বরীর প্রেমে মহাকাব্যের ছায়া!

আবার সাদৃশ্যের দিক দিয়া দুইজনেই বিপ্রলব্ধা। দুইজনের হৃদয়েই দৈব-বাণীর আশাবন্ধ; দুইজনেই প্রেম-সাধনায় ব্রতশীলা। দুইজনেই মিলনতীর্থে যাইয়া প্রিয়জনের শব-দেহ দেখিলেন। কিন্তু কাদম্বরী ভাগ্যবতী; প্রেমের সাধন-পীঠে বসিয়া তাঁহাকে চন্দ্রাপীড়ের ধ্যান-মূর্তি দেখিতে হয় নাই। বাস্তব শবদেহ তাঁহার দুইটি নিশ্চল নয়নের উপর স্থির হইয়া থাকিয়া কাদম্বরীর নিত্য অর্ঘ্য নিত্যপূজা পাইয়াছে। কাষ্ঠময় বা ধাতুময় দেব-বিগ্রহ ভক্ত-হাতের চুয়া-চন্দন, পুষ্পমাল্য, শৃঙ্গারোজ্জ্বল বেশবাস, নৈবেদ্য পাইয়া ভক্তের তন্ময়তায় যেমন তাহার হৃদ্‌পদ্মে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠেন, চন্দ্রাপীড়ও তেমনি কাদম্বরীর নিঃশেষ সাধনার চুয়া-চন্দন পাইয়া, নিঃশেষ হৃদয়ের দুর্নিরীক্ষ্য জ্যোতির্ময় প্রেমের অমৃত স্পর্শ পাইয়া আবার আপন বিগ্রহেই জীবিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কাদম্বরীর আশাবন্ধে কেবল পুনর্মিলনের দৈব-বাণীটুকুই ছিল না, যাঁহার সহিত মিলনের জন্য দৈব-বাণী, তিনি কাদম্বরীর নিখিল হৃদয়ের মর্মশেষ পূজাটুকু কুড়াইয়া লইবার লোভে হতচেতন আপন দেহ লইয়া কাদম্বরীর কোলের কাছেই

ছিলেন। কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের দেহটুকু পাইলেন, প্রাণ পাইলেন না। তাই তিনি তান্ত্রিক ভৈরবীর মত মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের সংকল্পে সাধন-পীঠে বসিলেন। দেহের অতীতে যে প্রাণের অবস্থিতি, দেহ-বিল্বমূলে সেই প্রাণের বোধনেই তিনি সংকল্প করিলেন। এই সংকল্প-সাধনের মধ্যে তাঁহার সাধনার ইতিহাসের সহিত তাঁহার প্রেমের ইতিহাস ওতপ্রোত হইয়া উঠিল; সাধনার সঞ্জীবনীর সহিত প্রেমের তুরীয় অনুভূতি মিশিয়া একাকার হইয়া উঠিল। যে-প্রেমের নিত্যশুদ্ধ স্বরূপ ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাকে দেহের পাদপীঠে প্রত্যক্ষ করিয়া দেহনিষ্ঠ প্রেমের দেহাতীত ব্যঞ্জনার চমৎকারিত্ব আস্বাদন করিলেন কাদম্বরী কিন্তু হতভাগিনী মহাশ্বেতা? তাঁহার প্রেম-সাধনার সম্মুখে কোন দেহ-বিগ্রহ উপস্থিত ছিল না। ছিল না বলিয়াই বাস্তব প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত প্রিয়জনের শব-দেহকে কেন্দ্র করিয়া যে বিদ্যুদ্দীপ্তি হৃদয়-মনের মহাকাশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিতে চায়, সেই স্বাভাবিক বিদ্যুদ্‌জ্বালা তাঁহার হৃদয়ের পক্ষে সুগম ছিল না। তাঁহার যাহা ছিল, তাহা দৈব-বাণী-আহত মহাশূন্যতা। এই শূন্যতাকে ভরাট করিয়া তুলিতে, এই শূন্যতার যজ্ঞবেদীতে প্রেমের অনাহত অগ্নিকে জ্বালাইয়া তুলিতে তাঁহাকে নচিকেত-অগ্নি-সন্দীপনের সাধনায় দীক্ষিত হইতে হইয়াছে। তাই মহাশ্বেতার প্রেমে যাহা তপস্যায় উজ্জ্বল, কাদম্বরীর প্রেমে তাহা দেহাত্ম-সাধনায় নম্র-মধুর।

কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়-প্রেমের অবতরণিকায় যে মহাশ্বেতার আবির্ভাব, সেই মহাশ্বেতা কেবল গন্ধর্বরাজ হংসের অনূঢ়া যুবতী কন্যা নয়। তিনি তখন প্রখ্যাতা প্রেম-সন্ন্যাসিনী। ভারতবর্ষে ধর্মের জন্য, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য, আত্মোপলব্ধির জন্য সন্ন্যাস লইয়াছিলেন অনেকেই, কিন্তু প্রেমের জন্য সন্ন্যাস লইয়াছিলেন শিব-প্রিয়া পার্বতী। প্রেম-সন্ন্যাসে পার্বতীর পরেই মহাশ্বেতার স্থান। দেবতা ও মানবীর মধ্যে যে পার্থক্য, পার্বতী ও মহাশ্বেতার মধ্যে সেই পার্থক্য। একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ; অপরজন সম্পূর্ণায়মান ও বিশুদ্ধিপরতন্ত্র; একজন বিশুদ্ধ পরমাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশান্তর; অপরজন অশুচির শুচি-সংক্রান্তি; একজন আদর্শ; অপরজন সেই আদর্শেরই পূজারিণী।

যাহা হউক, সেই সন্ন্যাসিনী মহাশ্বেতা কাদম্বরীর আবাল্য-প্রিয়সখা; দ্বিতীয় হৃদয়। একত্র পানাশন, নিদ্রা-জাগরণ, সঙ্গীত-বাদ্য, কেলি-কৌতুকে দুইজনেরই আকৈশোর দিনগুলি কাটিয়াছে। কিন্তু মহাশ্বেতা কাদম্বরীর পূর্বেই প্রেমের কুটিল পথে নামিয়াছেন। নামিয়া আহত হইয়া দৈববাণীতে শান্ত হইয়া তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার প্রেম-সুন্দর নৈষ্ঠিক জীবনের আলোক-বিচ্ছুরণ হেমকূটের

গন্ধর্ব-রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ দিয়া কাদম্বরীর মণিময় পর্যঙ্কের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাদম্বরী সেই জ্যোৎস্নাময় স্বর্ণমুকুরে আপনমুখের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। প্রেম-সাধনায় মহাশ্বেতা কাদম্বরীর আদর্শ হইয়া রহিলেন। একদিকে আজন্ম-সখীর হতভাগ্যে ব্যথিত হৃদয়ের আর্দ্রতা, অপরদিকে তাঁহার প্রেম-সন্ন্যাসের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। এই ব্যথা ও শ্রদ্ধার মিলিতাম্বয়ে কাদম্বরীর মনে বিবাহের প্রতি যে বিরাগ জাগিয়াছিল, তাহারই অপসারণসূত্রে চন্দ্রাপীড়কে লইয়া মহাশ্বেতার কাদম্বরীর নিকট গমন। এই মহাশ্বেতাই কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়-মিলনের সংযোগস্থল।

কাদম্বরীর প্রেম লৌকিক। সংসারে যেমন ঘটিয়া থাকে, ইহা তেমনি। তবে এ-প্রেমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। জ্বলন্ত আগুনের নেশায় পতঙ্গের মতো এই প্রেমে নায়ক-নায়িকা ঝাঁপাইয়া পড়েনা। ঝাঁপ দিবার পূর্বে তাহারা প্রেমটা সত্য কি না তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য বিচারের ভারটা পুরুষের উপরেই পড়ে। নারী, প্রেমে আবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভিভূত হয়। তাই তার আর বিচারের অবসর থাকে না। তখন তাহার বুক ফাটে, মুখ ফোটে না। কিন্তু এই psychology-এর উৎপত্তি কোথায়? জীবনে, তাহার পর কামসূত্রে। কাম-সূত্রের অনুশাসনে অলঙ্কারশাস্ত্রেও জিগির তোলা হইল, আগে নারীর প্রেম বর্ণনা করিয়া পরে পুরুষের প্রেম বর্ণনা করিতে হইবে। তাহা হইলে কথা দাঁড়াইল, নারীর ভালোবাসায় হৃদয়বেগের প্রাধান্য, আর পুরুষের ভালোবাসায় হৃদয়বেগের সহিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়ামক বুদ্ধির তর্ক। এই ভাবটি শকুন্তলায় যেমন দেখি, তেমনি চন্দ্রাপীড-কাদম্বরীর প্রেমে। কিন্তু শকুন্তলার মন মজিলেও প্রিয়সমাগম না হওয়া পর্যন্ত তাহার করিবার কিছুই ছিল না। একটুখানি অপাঙ্গ-বিক্ষেপ, একটুখানি রাঙা ঠোঁটের রাঙা হাসি ছড়ানো; পায়ের কাঁটা তুলিবার নাম করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দুষ্মন্তকে দেখা; লতায় আঁচল বাঁধাইয়া দুষ্মন্তের মুখের উপর দিয়া আপনার স্নিগ্ধ বীক্ষিতটি টানিয়া লইয়া অনসূয়া-প্রিয়ংবদার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া; একটু মুগ্ধভাবের চলা; চলিতে চলিতে 'গাঁথনি পুহপমালা' শরীরখানিকে পিয়াসী প্রেমিকের চোখের উপর একটু মেলিয়া ধরা। ইহার বেশী সে অগ্রসর হয় নাই। না হইবার কারণ সে তপোবনবালা। কিন্তু কাদম্বরী রাজকন্যা। কাজেই প্রেমের ব্যাপারে সে একটু প্রগল্‌ভা। পণ্ডিতেরা তাহাকে মুগ্ধা নায়িকা বলিলেও একালের রসিকের চোখে সে প্রগল্‌ভা।

পিতামাতার নিকট হইতে মহাশ্বেতাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিবার ছল

করিয়া কাদম্বরী অট্টালিকার উপরে উঠে। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন পরিজন। কোনো পরিচারিকা তাহার মাথায় ধরে স্বর্ণদণ্ডের শ্বেতবর্ণের একটি ছাতা। চারটি শ্বেতচামর দোলে আশেপাশে। ঠিক্ ওপারে—ক্রীড়া-পর্বতের শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া চন্দ্রাপীড। চন্দ্রাপীডকে লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হইল কাদম্বরীর যৌবন-লীলার লাস্য। সখী পরিচারিকাদের হাত হইতে লইয়া কখনও-বা চামরের ঝুটিটা মুঠোয় পোরে, কখনও ছাতা কাড়ে, কখনও-বা তমালিকার কাঁধে রাঙা হাত-দুখানি রাখে, কখনও বা মদলেখাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরে, কখনও-বা সখীদের আড়ালে লুকাইয়া চন্দ্রাপীড-পাখিটাকে নয়ন-বাণে আহত করে; কাদম্বরী ছুটিয়া প্রদক্ষিণ করে সখীদেব; সে ছোটা, কী নাচা, বোঝা দায়। গায়ের কাপড যায় উডে; দেখা যায় ত্রিবলীর রেখা। কখনও-বা প্রতীহারীর বেত্র-যষ্টি কাডিয়া লয়। তাহার উপর পাতিয়া রাখে রক্ত কপোলখানি। কখনও ধরে অধরের উপর তাম্বুলবীটিকা; কখনও বা কাণে-পরা উৎপল-হাতে তাডনা করে সখীকে; কয়েক-পা ছোটে; আবার হাসিতে হাসিতে ভাঙিয়া পড়িয়া নয়নবাণে আঘাত করে চন্দ্রাপীডকে। শুধু এইখানেই শেষ নয়। চন্দ্রাপীডকে সে কিছুতেই ছাডিতে চায় না। স্কন্ধাবারে ফেরে চন্দ্রাপীড; আবার পিছু ডাকে তাম্বুল, বিলেপন ও শেষ হার পাঠাইয়া। আবার ফেরে চন্দ্রাপীড।

হিম-গৃহে দেখা পায় কাদম্বরীর: এ আগেব-দেখা কাদম্বরী নয়; এ-যে ফোটা ফুল! পাপডি-পরাগে-কিশলয়ে বর্ণে-গন্ধে-সুষমায় কাদম্বরী-ফুলটি এলাইত লাবণ্য। তাহার যৌবনেব উজ্জ্বল বর্ণের প্রতিটি শাণিত বেখা, গন্ধের প্রতিটি রক্তাক্ত রেণু, স্পর্শ-কাতর আকুলতার প্রতিটি কম্পন—আজ আপন বক্ষের তাপে ফাটিয়া পডিয়াছে; তাই লাবণ্যের ফুটন্ত পাতায় বাজে মর্মব-ধ্বনি।

হিমগৃহের মণ্ডপ। মণ্ডপখানির স্তম্ভগুলি মৃণালময়; মণ্ডপের চারিধারে ঘুরিয়া মরে কর্পূর-বাসিত একটি কৃত্রিম নদী। মণ্ডপের নীচে পুষ্পশয্যা। পুষ্প-শয্যায় শয়ানা কাদম্বরী। হার, কেযুর, বলয়, কাঞ্চীদাম, নূপুর—সবই মৃণালের। তাহার ললাটে চন্দন, নয়নে অশ্রু, বিম্বাধরের পথ বাহিয়া ওডে দীর্ঘনিশ্বাসের কাল-বৈশাখী; দেহ হইতে চুয়াইয়া পড়ে ঘর্ম। শরীর তার দুর্বল। বর্ষার নীপ-কুসুমের মত তাহার শরীরে জাগে শুষ্ক চন্দনের রূপালি রোমাঞ্চ। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে কাঁপে বুকের উত্তরীয়। নিরাবরণ স্তনযুগলে ছায়াপডে দোলায়মান চামরের! ছায়ার পাখায় ভর করিয়া ওরা উডিতে চায় চন্দ্রাপীড়ের নীড়ে! করতল দিয়া আড়াল করে কাদম্বরী। চাহিয়া দেখে ওরা কেমন? কপোল-

খানিকে বার বার চাপে কর্পূর-পুত্তলিকার ললাটে; পায়ে ঘসে গাঢ় চন্দনের প্রতিমূর্তিকে। কানের পল্লব চুমু আঁকে তার গণ্ডে। বুকের উপর মণিময় দর্পণ। ভাবে চাঁদ! বলে, আজ উঠোনা তুমি!

আসে চন্দ্রাপীড়। অভ্যর্থনায় চঞ্চল হইয়া পড়ে কাদম্বরী। কোনোমতে ওঠে। উত্তরীয় বসন স্রস্ত হয়। কাঁপন লাগে উদরের থর-তিনটিতে! কাঁপে রোমরাজি। চন্দ্রাপীড় ভাবে, এ রোগ আমারও। বলে ব্যঞ্জনায়—'অলঙ্কার খুলেছ কেন? কঙ্কণ পরো।' পিতার চিঠির দোহাই দিয়া বিদায় গ্রহণ করে। রাখিয়া যায় পত্রলেখাকে বিশ্বাসের ন্যাসরূপে।

এতদিন পরে এমন একজন সখী পাইল কাদম্বরী যাহার কাছে মনের কথা অকপটে বলা যায় এবং যাহার কাছে বলিলে সে-কথা চন্দ্রাপীড়ের নিকটে পৌঁছাইবে নিশ্চয়ই। সে সখী পত্রলেখা। কাদম্বরী পত্রলেখাকে খুলিয়া বলে মনের গোপন কথা। মনে মনে বলে, পত্রলেখা যেন দৌত্যে নামে।

এদিকে হিম-কর-কিরণে নলিনী জারিত হইতে লাগিল, ওদিকে কাদম্বরী-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য চলে চন্দ্রাপীডের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ পরিক্রমা। খবর আসিতে লাগিল, নলিনী শুকাইতেছে।

কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেম কই? এতো কেবল কামনার দণ্ডে দেহ-লাবণ্যের অমৃত-মন্থন। 'এতো কেবল চাওয়া! প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের কামনা—অধরের জন্য অধরের মৃত্যুপণ! প্রেম কই? বেদনার মধ্য দিয়া চিরন্তন পাওয়ার তপস্যা কই? গন্ধর্বরাজবাড়ী, আর উজ্জয়িনীর রাজ-বাড়ীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ, সে তো আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নয়। তাতল বিচ্ছেদেব জ্বলন্ত আগুন চাই। কই সে আগুন। কোথায় সে আগুন!

কবি শাস্ত্র হইতে এবার জীবনের পথে নামিলেন। শাস্ত্রের উপদেশে যখন কাদম্বরীর মধ্যে প্রেমফুটান সম্ভব হইল না, তখন তিনি দৈবের নিকট হাত পাতিলেন। দৈব পাঠাইলেন বজ্র। সেই বজ্রে চন্দ্রাপীডের দেহত্যাগ। এতদিন পরে কাদম্বরী যথার্থ ফুটিল। প্রেমের তীরে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে এতদিন সে বৃথাই দেহের তীরে নৌকা বাহিয়াছে। আজ সে খুলিয়া ফেলিল সব অলঙ্কার। আজ তাহার নিকট আটাশখানি অলঙ্কারের আর প্রয়োজন নাই। আজ সে হৃদয়ের সন্ধান পাইয়াছে। হৃদয়সর্বস্ব কাদম্বরী মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অমৃত-নদীর সূক্ষ্ম রজত রেখা জীবনের শৈল-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইয়াছে। তাই তাহার সাধনা অমৃতের সাধনা। এই দুর্গম সাধনার ভয়াবহতার গম্ভীর

পরিবেশে সে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। জড় পরিবেশের অতীত লোকে উঠিয়া সে নিথর মৃত্যুর গুহা পার হইয়া অমৃতকে ডাকিতেছে—আয়! আয়! আয়! সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার! সেই অন্ধকারের কালো চিরিয়া দলিয়া ভাঙিয়া মথিয়া হে আলো, হে অমৃত, হে প্রাণ, ফিরে এস আমার প্রিয়তমের শবদেহে। একদিন আলো জ্বলিল। সেইদিন সেই আলোর প্রদীপে দেখা গেল—কিছুই হারায় নাই। দেহের কামনা দিয়া চুম্বনের বিদ্যুৎ হানিয়া কম্পমান আলিঙ্গনের আঘাতে আঘাতে সে প্রিয়তমের প্রাণবহ্নিকে জ্বালাইয়া তুলিল। এইবার সে পুরাপুরি পাইল। পাইল দেহে মনে;—পাইল আত্মার আত্মীয়তায়।

কাদম্বরী-চরিত্র সংস্কৃত চরিত্র-রচনার অনুগত শিল্পের সৃষ্টি। কাম হইতে প্রেমে উত্তরণের জন্য ইহাতে বিস্ময়-ভাবের সাঁকো। তাই বলিতেছিলাম, ভাব-প্রতীকতার যথাযথ অনুবৃত্তি থাকিলেও এই সকল চরিত্রে জীবনের ও তাপ আছে।

তবুও মহাশ্বেতার চরিত্রের সহিত কাদম্বরীর চরিত্র-কল্পনার মৌলিক পার্থক্য হইল, প্রকৃতির ইসারায় মহাশ্বেতার যৌবন-ধর্মে প্রকাশের ব্যঞ্জনা; কাদম্বরীর চারিপার্শ্বে অনৈসর্গিকতার স্বর্ণ-শৃঙ্খল; রুদ্ধদ্বারগৃহে—বাসনামঞ্জুরিত নারীদেহের যেন জৈব-সমীক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রকৃতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। Poetic Convention বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোনো সম্পর্ক নাই।[১] ইহা সম্পূর্ণ Biological. কামচেতনার দিক হইতে জীবতত্ত্বের আখরে কাদম্বরী-চরিত্রের বাণীরূপ।

চন্দ্রাপীড়ের চরিত্র কিংবদন্তীর চরিত্রের উপর মহাকাব্যের ছায়ার মুন্সীয়ানা। সোম হইলেন চন্দ্র। পুণ্ডরীকের অভিশাপে সেই চন্দ্র চন্দ্রাপীড়ের অবতার গ্রহণ করেন। এই অবতারবাদের মূলেও মহাকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট। অপুত্রক তারাপীড়। পত্নী বিলাসবতী উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরে পুরাণপাঠ শ্রবণ করিয়া অপুত্রকের প্রাক্তন পাপের কথা অনুমান করিতে পারেন। রাজার উপদেশে শুকনাসের মন্ত্রণায় শুচিশুদ্ধচিত্তে দেবোপাসনা ও দানধ্যান প্রভৃতি পুণ্যকর্ম করিতে থাকেন। অতঃপর একরাত্রি স্বপ্ন দেখেন, চন্দ্র তাঁহার মুখে প্রবেশ করিতেছেন।

(১) অশাস্ত্রীয় মলৌকিকং চ পরম্পরায়াতং যমর্থমুপনিবধ্নন্তি কবয়ঃ স কবিসময়ঃ।...পূর্বে হি বিদ্বাংসঃ সহস্রশাখং সাঙ্গং চ বেদমবগাহ্য শাস্ত্রাণি চাববুধ্য, দেশান্তরাণি দ্বীপান্তরাণি চ পরিভ্রম্য যানর্থানুপলভ্য প্রণীতবন্তস্তেষাং দেশকালান্তরবশেনান্যথাত্বেঽপি তথাত্বেনোপনিবদ্ধো যঃ স কবি-সময়ঃ। কবিসময়শব্দশ্চায়ং মূলমপশ্যদ্ভিঃ প্রয়োগমাত্রদর্শিভিঃ প্রযুক্তো রূঢ়শ্চ—কাব্যমীমাংসা।

বিশুদ্ধপাত্র ছাড়া দেবতারা অবতারত্ব গ্রহণ করেন না, ইহা যেমন পুরাণের ধারণা, তেমনি মহাকাব্যের ও ধারণা। জন্মের পর নানাবিধ সংস্কার, উপযুক্ত বয়সে বিদ্যার্জনের জন্ত গুরুগৃহে বাস, গুরুগৃহে রাজকুমারের উপযুক্ত নানাবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা—এগুলি সম্পূর্ণ মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য। সমাবর্তনের পর যৌবরাজ্যে অভিষেক এবং অভিষেকের পর দিগ্বিজয়-যাত্রা, মহাকাব্যেরই দস্তুরি। রাজাদের অন্যতম ব্যসন মৃগয়া। চন্দ্রাপীড়ের মৃগয়াবর্ণনার উপর রঘুবংশের দশরথের মৃগয়ার প্রভাব আছে। দ্বিগ্বিজয়ের পথে কিন্নরনগরীর উপকণ্ঠে বিশ্রাম গ্রহণ এবং সেই বিশ্রামকালীন অবসরে মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া কিন্নর-মিথুন-দর্শন, কিন্নর-মিথুনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অচ্ছোদতীরে উপস্থিতি, অচ্ছোদতীর হইতে সঙ্গীতের নিশানায় মহাকালের মন্দিরে উপস্থিতি, সেখানে মহাশ্বেতার সহিত পরিচিতি, মহাশ্বেতার বন্ধুত্বে আকৃষ্ট হইয়া যৌবনসুলভ কৌতূহলের বশে গন্ধর্বনগরে গমন, গন্ধর্বনগরে কাদম্বরীর সহিত পরিচয়;—এইগুলি চন্দ্রাপীড়ের জীবনে একটানা ঘটনা। এ পর্যন্ত ঘটনার কোন বৈচিত্র্য নাই, চরিত্রেরও কোন বিশিষ্ট অভিব্যঞ্জনা নাই। উপন্যাসের ঘটনায় চন্দ্রাপীড়ের প্রথম পদক্ষেপ কাদম্বরীর প্রেমে। সেখানেও শকুন্তলার ছায়া। শকুন্তলাকে দেখিয়া প্রথম দর্শনে দুষ্যন্ত যেমন ভালবাসিয়া ছিলেন, চন্দ্রাপীডও কাদম্বরীকে দেখিয়া তেমনি ভালবাসিয়া ছিলেন কিন্তু শকুন্তলায় দুষ্যন্ত-কর্তৃক শকুন্তলার রূপের ফিরিস্তির যেরূপ আলোচনা আছে, কাদম্বীতে তাহা নাই বটে, তবে শকুন্তলার প্রেমের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুষ্মন্তের মেজাজের মত চন্দ্রাপীড়ের ও একটা মেজাজ দেখা যায়। দুষ্মন্তের এই মেজাজ শকুন্তলা লাভের পূর্বপর্যন্ত, অতএব ক্ষণস্থায়ী কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের এই মেজাজটি বৈষ্ণবপদাবলীর অক্রুর-সংবাদের মত দীর্ঘকালীন। গন্ধর্বনগর হইতে উজ্জয়িনী পর্যন্ত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দীর্ঘ পরিক্রমা। ইহার কারণ ও আছে। দুষ্যন্তের শকুন্তলা ছাড়া রাজত্ব ছিল, রাজকার্য ছিল। চন্দ্রাপীড়ের সে বালাই ছিল না। পিতা তখনও জীবিত থাকিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেছেন। না থাকিবার কারণ, চন্দ্রাপীড়ের ভাব-চরিত্রের বিস্তারে সুযোগ দেওয়া। শুধু চন্দ্রাপীড় কেন, মহারাজ তারাপীড়, প্রধান অমাত্য শুকনাস, বেশি কি, সমস্ত উজ্জয়িনী-নগরীর যে-বাস্তবতা, তাহা স্বপ্নের বাস্তবতা। স্বপ্নে আমরা মানুষ দেখি, বস্তু দেখি, ঘটনা দেখি কিন্তু তাহাদের স্পর্শ করিতে পারি না। স্পর্শ করিবার জন্ত হাত বাড়াইলে তাহারা হাতের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়। কাদম্বরী-উপন্যাসে উজ্জয়িনী-নগরীর বাস্তবতা, সেইরূপ স্বাপ্নিক বাস্তবতা। চন্দাপীড়ের বাস্তবতাও তেমনি,

উহাতে স্থূলত্ব নাই। উহা ভাবের বাস্তবতা। চন্দ্রাপীড় যে-ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন, সেই ভূমিকায় অন্য যে-কেহ আবির্ভূত হইলে ভূমিকা নষ্ট হইত না। কারণ সংস্কৃত কবিগণের চরিত্রায়নে নাম একটা হইলেই হইল, ভাবটি থাকা চাই। এই ভাব নারী-পুরুষের সংসর্গে দেহ হইতে মনে, মন হইতে আত্মার আনন্দ-নিকেতনে পরিক্রমা করে। চন্দ্রাপীড় প্রথম হইতেই দুষ্মন্তের মত কামাসক্ত হন নাই। কাদম্বরীর ছায়া তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছে মাত্র এবং কাদম্বরীর মত তাঁহার কাম-বিকারও ঘটে নাই। তিনি কাম-বিকারের রাজ্যের পথ দিয়া খুব সহজ ভাবে চলিতে পারেন। তাঁহার প্রেম-জীবনের ফলন হইতে দেখা যায় তিনি প্রেমের ব্যাপারে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। বিশুদ্ধ প্রেম নীতির পথ ধরিয়াই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তিনি কামুক নন; তিনি প্রেমিক। তাঁহার প্রেমে সংসার, সমাজ ও বিশ্বের সহিত কোন বিরোধ নাই। কাদম্বরীর প্রতি তাঁহার একটা আর্দ্র সহানুভূতি-সমবেদনা আছে। কাদম্বরীর জন্য অধীর হইলেও তিনি তাঁহার কর্তব্য ভোলেন নাই। তরুণ বয়সে তরুণীকে দেখিয়া তাঁহার মনে কোন ভোগাকাঙ্ক্ষা জাগে না। অনিন্দ্যসুন্দরী মহাশ্বেতাকে দেখিয়া তাঁহার গোপন মনে কোন কামনার বহ্নি জ্বলে নাই। সুন্দরী যুবতীর মুখে প্রেমকাহিনী শুনিয়া তাঁহার মনে কোন স্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটিবার সংবাদও পাওয়া যায় নাই। মহাশ্বেতার আশ্রমে দুইখানি শিলা-খণ্ডের উপর দুইজনে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। তবু সেই নির্জন অরণ্যপ্রদেশের কল্পনাপ্রবণ পরিবেশের মধ্যে যুবতী নারীর অতি নিকটে শয়ন করিয়াও তাঁহার মনে কোন বাসনা পাখা মেলিয়া ওঠে নাই। শুধু মহাশ্বেতা কেন, একই হাতীর উপর চড়িয়া তিনি পত্রলেখার সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, নৈশ শিবিরে তাঁহারই শয্যার সন্নিকটে পত্রলেখা কুথার উপর শয়ন করিয়া আছে, তবুও কামনার কোন বিদ্যুৎ আচম্বিতেও তাঁহার মনের উপর ঘনাইয়া ওঠে নাই। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে,—হয় চন্দ্রাপীড় অবাস্তব, নাহয় ক্লীব। তিনি অবাস্তব নন এইজন্য যে তাঁহার চক্ষে ধ্রুবতারা যখন রূপের স্পর্শ পাঠাইতেছে, তখন আকাশের অন্য তারার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। কাদম্বরী-দর্শনের পূর্বে সখী পত্রলেখা ও বান্ধবী মহাশ্বেতা তাঁহার যুবকমনে কামনার যে কোন প্রতিক্রিয়া জাগাইতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি প্রেমচেতনাকে জীবনের একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় মনে করেন না। প্রেমানুভূতির মতো আরও কতকগুলি বিদগ্ধ মনুষ্যসুলভ অনুভূতি তাঁহার জীবনের বীণায় ঝঙ্কার তোলে। সখ্যভাব, সে নারীর সহিতই হউক, আর

পুরুষের সহিতই হউক, প্রেম-চেতনার সহায়কও নয়, পরিপন্থীও নয়। চন্দ্রাপীড় এমন একজন মানুষ, যাঁহার জীবনে সখ্য, প্রেম, কর্তব্য, শিষ্টাচার, গুরুজনে শ্রদ্ধা—এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে। সাহিত্যে যদি সত্য, সুন্দর ও শিবের—একাত্ম্য হইতে পারে, তবে মানব-জীবনেও বা তাহা হইবে না কেন? পরিবেশবিমুক্ত মানুষ দেবতা। এ-যুগে পরিবেশের প্রাধান্যে মানুষ তিনরূপ—পশুরূপ, মানুষরূপ এবং দেবরূপ কিন্তু পরিবেশবিমুক্ত বা সমরস-প্রধান মানব-মনের উচ্চগ্রামের অনুভূতিগুলির সমন্বয় না হইবার পক্ষে যুক্তি নাই। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই তিন গুণের উৎপত্তি স্বত্ব। আবার স্বত্ব, রজ ও তম সমমাত্রিক হইলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হউক না হউক, সমতা থাকিতে পারে। ভারতবর্ষের মানসিক পরিবেশে এই সমতা বা সমন্বয় যে ছিল, উপনিষদ্ তাহার প্রমাণ। বাণ চন্দ্রাপীড়ের চরিত্রে এই সমন্বয়ের পরিকল্পনা আনিয়াছেন। চন্দ্রাপীডের চরিত্রে জড়-বাস্তব না থাকিয়া ভাব-বাস্তব ঘটায় চন্দ্রাপীড়ের চরিত্র সম্ভব হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, চন্দ্রাপীডের চরিত্রে পুণ্ডরীকের কাম-উত্তেজনা নাই, বৈশম্পায়নের অসহ্য সংবেদনা নাই। তাঁহার চরিত্র ঋষির চরিত্রও নয়, উদাসীনেরও চরিত্র নয়; তাঁহার চরিত্র মানবীয় উচ্চগ্রামের বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যের মধ্যে যেমন প্রেম ছিল, তেমনি ছিল সখ্য-ভাব। সখা বৈশম্পায়নের মৃত্যুসংবাদে চৈতন্যলোপই স্বাভাবিক, মৃত্যু আধুনিক মতে স্বাভাবিক নাও হইতে পারে। কাম-বেদনায় মৃত্যু হইতে পারে, একথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সখার মৃত্যু-সংবাদে অসহনীয় বেদনা সহ্য করিতে না পারায় তাঁহায় মৃত্যু হইয়াছে, একথা তাঁহাদের বিশ্বাস করিবার কথা। আমরা সেকথা বিশ্বাস করি না করি, আমরা বলিব চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু একটা techneque. গল্পের জন্য এ techneque এর প্রয়োজন ছিল। মৃত্যু তাঁহার নিজের কোন উপকার করে নাই, করিয়াছে কাদম্বরীর, করিয়াছে সমস্ত গল্পের। সমস্ত গল্পের গ্রন্থিবন্ধন, গ্রন্থি-উন্মোচন, সবই চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া। তাই বলিতেছিলাম, চন্দ্রাপীড়ের চরিত্র একটি বৃন্তহীন পুষ্প—একটি idea. বাস্তব চরিত্রের মত ইহার জন্য আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত কোন বৃত্তের প্রয়োজন নাই। তাহা পরিণামী নয়। তাহা ভাবের স্বয়ম্ভূ মূর্তি। কাদম্বরী-উপন্যাসে পত্রলেখা অন্যতম চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রকে উপেক্ষিত বলিয়াছেন।[১] রবীন্দ্রনাথের উক্তির সমালোচনার পূর্বে আমাদের কর্তব্য পত্রলেখা চরিত্রের উপস্থাপনা। পত্রলেখা-অবতারের পূর্বে পত্রলেখা

(১) রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন রোহিণী। রোহিণীর সহিত চন্দ্রের দাম্পত্য-সম্পর্ক পৌরাণিক যুগেই স্থিরীকৃত। পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রকে যখন চন্দ্রাপীড়ের অবতার গ্রহণ করিতে হইল, রোহিণী তখন চন্দ্রেরই পরিচর্যার জন্য পত্রলেখারূপে কুলুতেশ্বরের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন। তারাপীডের সহিত যুদ্ধে কুলুতেশ্বর পরাজিত হইলে বন্দিনীরূপে এই বালিকা উজ্জয়িনীরাজ-পরিবারে আসেন। বিলাসবতী এই বন্দিনীকে আপন দুহিতার ন্যায়ই পালন করেন।

পরে চন্দ্রাপীড অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রাসাদে ফিরিলে বিলাসবতী পরিচর্যার জন্য পত্রলেখাকে চন্দ্রাপীডের নিকট পাঠাইলেন। বলিয়া পাঠাইলেন—"ইহাকে সামান্য পরিজনের মত দেখিয়ো না, বালিকার মতো লালন করিয়া নিজের চিত্ত-বৃত্তির মতো চাপল্য হইতে নিবারণ করিয়ো, শিষ্যার ন্যায় দেখিয়ো, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্রম্ভ ব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইয়ো, এবং এই কল্যাণীকে এমত সকল কার্যে নিযুক্ত করিয়ো যাহাতে এ তোমার অতি চিরপরিচারিকা হইতে পারে।" বলিতে কি, মাতার সকল কথা চন্দ্রাপীড অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। মায়ের এই কথাগুলি কেবল উপদেশমাত্র নয়; ঐ কথাগুলির মধ্যে পত্রলেখা-চরিত্রের নাটকীয়তার মূল সূত্র আছে। পত্রলেখা উপন্যাসে নিজের জন্য আসেন নাই, আসিয়াছেন কেবল চন্দ্রাপীডের জন্য। সেই হিসাবে পত্রলেখা 'প্রকরী' চরিত্র।[১] দিগ্বিজয়কালে পত্রলেখা চন্দ্রাপীডের পার্শ্ববর্তিনী। সেখানেও নির্বাক পত্রলেখা। তাহার পর দ্বিতীয়বার ইহাকে দেখিলাম গন্ধর্বনগরে কাদম্বরীর গৃহে। রাজকুমার রাজকুমারীর সহিত হৃদয়-বিনিময়ের কার্যে অগ্রসর হইয়া পিতার আদেশে উজ্জয়িনী ফিরিবেন। অনঙ্গের বাণে এমনিভাবে কাদম্বরীকে আহত করিয়া উজ্জয়িনী গমনের পর আর কি তাঁহার কাদম্বরীর কথা মনে পড়িবে? যদি মনে না পড়ে! শিহরিয়া ওঠে কাদম্বরী। মুখে কথা কয় না, নয়নের জাল পাতিয়া উড়ো পাখীকে ধরিতে চায়। চন্দ্রাপীড কাদম্বরীর মনের কথা বোঝেন। তাই কাদম্বরীর বিশ্বাসের জন্য তিনি পত্রলেখাকে রাখিয়া যান। অতএব উপন্যাসের জীবনে ইহা একটা মস্ত ঘটনা না হইলেও কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড প্রেমের মনস্তত্ত্বের দিক

---

(১) (ক) ফলং সংকল্প্যতে সন্তিঃ পরার্থং যস্য কেবলম্।
অনুবন্ধেন হীনস্য প্রকরীং তাং বিনির্দিশেৎ।

N. S. Ch. 21. V—25-6.

(খ) যতশ্চ ততঃ (?) পরার্থমেব কেবলম্ সর্বমনুতিষ্ঠতি সা প্রকরী।

A. Bh. Vol—III. 15.

দিয়া ইহার বিশেষ মূল্য আছে। শকুন্তলার দুইপাশে দুইটি শ্বেতচামরের মতো দুই সখী ছিল অনসূয়া-প্রিয়ংবদা। দুষ্মন্তের প্রেমের কুটিলপথে চলিতে আরম্ভ করিয়া সে হয়তো তাহার মনের গোপন কথা অভিন্নহৃদয়া সখীদের বলিয়া থাকিবে। সখীরা হয়তো তাহার মন বুঝিয়া মালিনী-নদীর তীরস্থিত কুঞ্জবনে প্রথম মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; হয়তো বা গান্ধর্ব-বিবাহে তাহাদের সমর্থন ছিল। কিন্তু কাদম্বরী গন্ধর্বরাজগৃহের সখীর মিছিলের মধ্যে থাকিয়াও একাকিনী। তাহার মনের কথা শুনাইবার মতো কেহ নাই। শুনিয়া মিলনের কুটিল পথটিকে ঋজু ও জঙ্গম করিয়া তুলিবার মতোও তো কেহ নাই। তাই কাদম্বরীর নিকটে পত্রলেখার অবস্থিতি অনিবার্য। সে-পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের পরিচারিকা নয়, "অতিচির-পরি-চারিকা"; চন্দ্রাপীড়ের সুহৃদ্, চন্দ্রাপীড়ের শিষ্যা। অতএব দুইটি পরস্পরমুখী নদীকে জুড়িয়া দিতে পত্রলেখার মতো খাল আর কোথায়? পত্রলেখা যেন দুইটি হৃদয়ের গ্রন্থিবন্ধন। বৈষ্ণবপদাবলীতে সখীর যে প্রাথমিক স্থান,[১] কাদম্বরীতে পত্রলেখার সেই স্থান। দুইটি হৃদয়ের মোকাবিলার জন্য সখীত্বের পরিকল্পনার প্রথম উৎস কামসূত্রে, প্রতিষ্ঠা অলঙ্কার-শাস্ত্রে, রসোত্তীর্ণ-পরিণাম বৈষ্ণবপদাবলীতে। এই সখীত্ব কেবলমাত্র নাটকীয় কার্যের জন্য 'প্রকরী'র ক্ষীণতম ভূমিকা অবলম্বন করিয়া দেখিতে না দেখিতে কর্পূরের মতো উবিয়া যায় না। মানব-হৃদয়ে ইহার একটি স্থায়ী রস আছে। দুইটি হৃদয়ের মিলন ঘটাইতে এই প্রকরী-হৃদয়ের সুখ। সে পিপাসিনী ও নয়, উদাসীন ও নয়। আপন হৃদয়ের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া সে এই দৌত্যে অবতীর্ণ হয় না। সে জিতেন্দ্রিয়া মহারমণী হইয়াও একার্যে অবতীর্ণ হয় না। দুইটি হৃদয় হৃদয়-নদীর দুই তীরে বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই অশ্রু-সজল দুইটি হৃদয়কে জুড়িয়া দিবার মধ্যে আত্মভোগের অতীত একটা প্রীতিরস আছে। সেই শুভ্রসুন্দর উজ্জ্বল প্রীতিরসের একটি শ্বেতশুভ্র ভূমিকা হইল সখীত্বের ভূমিকা। নিজেকে চাওয়া ও নিজেকে পাওয়া একটা সাধারণ কথা; জীবধর্মের ঘণ্টাধ্বনি মাত্র। আত্মনিষ্ঠ সুখেরউপরও আর একটি সুখ আছে। সে-সুখ নিজের জন্য নয়, বিশ্বজনের জন্য। বিশ্বসুখের ধাক্কায় আত্মসুখ যে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইতে পারে, তাহা আমরা বুলি-প্রধান বর্তমান যুগের তপ্ত পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া বুঝিতে পারি না। শৃঙ্গার আদিরস স্বীকার

(১) সখী—

প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবেচ্যতে॥—উ, নী

করি কিন্তু আদি বলিয়া উহা মানবতার মাথা কিনিয়া লইতে পারে না। উহার "পঞ্চীকৃত"[১] রূপের মধ্যে মানব-মনের ভাব-বিশদতার এমন চমৎকারিত্ব জাগে, যাহা ব্যষ্টির সুতোয় ঘুড়ির মতো উড়িয়া চলে মানব-সংবেদনার সমষ্টির সাধারণী-কৃত নীলাকাশে। পল্বলে-পুষ্করিণীতে পদ্ম ফোটানো সহজ ; সমুদ্রে পদ্ম ফোটাইতে পারে কয় জন? সমুদ্রে পদ্ম কেন? ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়াও পদ্ম ফোটানো সম্ভব। মহাপুরুষদের জীবনে এমনি ব্রহ্মাণ্ড-পদ্মের বিকাশ ঘটে। সাংখ্য-দর্শনের সাক্ষীচৈতন্যের কাজ কি? তিনি তো মায়ার সুখদুঃখে আবিষ্ট হন না। সখীত্ব সাক্ষাৎ চৈতন্যের উপমা নয়। সাক্ষাৎ চৈতন্যের মতো সখীত্বের চেতনা বটে, তবে তাহার রঙটি শাদা নহে, রঙীন। বাসনালোকের রঙ মানবিক চেতনার মধ্যে ঠিকরিয়া পড়িলে চেতনার যে রসাশ্রয়ী মূর্তি, সখীত্বের সেই রঙীন মূর্তি। এইসব সখীরা আত্ম-হৃদয়কে বিশ্বের মধ্যে উৎসর্গ করিয়া একটা সর্বজনীন সমূহালম্বনাত্মক ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন। বাসরঘরে নববধূর পার্শ্ববর্তিনী যে সকল নর্মকুশলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার দল অবস্থান করেন, তাঁহারা কি মনে মনে ঐ বরটিকে কামনা করেন, না, বর-বধূকে সর্বাঙ্গীন মিলনের জন্য আগাইয়া দেওয়া তাঁহাদের কাজ? এইরূপ কাজের একটি মার্জিত আত্মভোগশূন্য সর্বভূমীন ভূমিকা হইল সখীত্বের ভূমিকা। পত্রলেখা কাদম্বরী-উপন্যাসের এমনি এক সখীত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সহস্রসখীর মধ্যেও একাকিনী কাদম্বরী। তাহার নূতন প্রিয়-বান্ধবী পত্রলেখার নিকট নারী-জীবনের সকল লজ্জার কূলছাপানো হৃদয়-বন্যার গোপন কথা খুলিয়া বলে। খুলিয়া বলে, চন্দ্রাপীড়কে স্বপ্নে-দর্শনের কথা ; খুলিয়া বলে তার স্বপ্নে বাস্তব বাসনার কায়াময়তার কথা। স্বয়ম্বর সভা ডাকিবার মতো বুকের পাটা তার নাই ; মুখ ফুটিয়া চন্দ্রাপীড়কে হৃদয়-বেদনার কথা জানাইবার বড় শত্রু তার লজ্জা। সে কী চন্দ্রাপীড়ের জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে? চন্দ্রাপীড়কে ছাড়িয়া সে মরিতেও পারিবে না। তাই সে কাঁদে, আর মূর্চ্ছা যায়। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়ে। অবশেষে শয্যা-শরণ্য হইয়া পড়ে।

কাদম্বরীর এ-অবস্থা পত্রলেখার চোখে দেখা। আপন হৃদয় মেলিয়া সে চন্দ্রাপীড়ের জন্য কাদম্বরীর দীর্ঘনিশ্বাস কুড়াইয়া লইয়াছে, লইয়াছে বেদনা-তাপে গলিত হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু। এই জীবনক্ষয়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ও দ্রবীভূত হৃদয়ের অশ্রু

---

(১) পঞ্চীকরণম্—অনেকটা Chemical dilation'এর মত।

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।

স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চপঞ্চ তে॥ পঞ্চদশী ১।২৭

অঞ্চলে বাঁধিয়া সে উজ্জয়িনীতে যাইয়া চলে, নিবেদন করে চন্দ্রাপীড়কে। চন্দ্রাপীড়ের নিকট হইতে আবার ফেরে কাদম্বরীর কাছে আশ্বাসের বাণী লইয়া ; চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর নিকট আসিতেছেন—এই বাণীটুকু।

ইহার পর আর কি পত্রলেখার বিশেষ প্রয়োজন আছে ? কাদম্বরী যে নিজেই চলিলেন প্রিয়তমের প্রত্যুদ্গমনের জন্য মহাশ্বেতার আশ্রমে। সেখানে চন্দ্রাপীড়কে মৃত দেখিয়া কাদম্বরীর সহিত পত্রলেখাও মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তাহার বিদায়-পালা। সে-দৃশ্য যেমন করুণ, তেমনি হৃদয়-গ্রাহী। চন্দ্রাপীড়ের অঙ্গ-বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের আলোকে তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর—এ কোন্ পত্রলেখা ? এ-যে শোকে উন্মাদিনী। চন্দ্রাপীড়ের জন্য কাঁদিল না, যে-কাদম্বরীর জন্য সে গন্ধর্বনগর ও উজ্জয়িনী এ-পাড়া ও-পাড়া করিয়া তুলিয়াছে, সেই কাদম্বরীকেও কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া ধরিল না। জড়াইয়া ধরিয়া কাদম্বরীর বুকের উপর মাথা খুটিল না। জীবন্ত শোকাচ্ছ্বাসের মত, দুর্নিবার বেগে অগ্রসরমান কাল-বৈশাখীর মত, ক্ষিপ্ত সমুদ্রের প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মতো সে ছুটিয়া চলিল ইন্দ্রায়ুধের কাছে। বলিল, "চন্দ্রাপীড় যখন চলিয়া গিয়াছেন, তখন আর তোর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া লাগাম ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিতে টানিতে ইন্দ্রায়ুধকে লইয়া সে অচ্ছোদের জলে ঝাঁপ দিল। তাহাতে যত জল ছিটকাইল, সে-জলে অশ্রুর শাওণ নামিল। কবি দেখাইলেন, একটা জীবন্ত মানুষ। কাদম্বরীর শোকে কী এত বিদ্যুৎ চমক দিয়া গিয়াছে ? শুধু এইটুকু বক্তব্য, চন্দ্রাপীড়ের সহিত মিলনের দিনে পত্রলেখার কথা কাদম্বরীর মনে পড়িয়াছিল। হায় ! পত্রলেখা ! তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, কিন্তু মিলনের দিনে তুমি নাই। এ মিলন যেন তোমার অভাবে অপূর্ণ।

কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাহার 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নিবন্ধে পত্রলেখার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সে-আলোচনার মৌলিক রসটি ধরিতে না পারায় অনেকে বিভ্রান্ত হইয়াছেন এবং পত্রলেখার জন্য বাণভট্টকে অভিসম্পাত করিতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা যে কেবল যৌন-সংবেদনার দিক হইতে, ইহা বুঝিবার প্রয়োজন আছে। যৌন-সংবেদনার দিক হইতে নারী-পুরুষের সহাবস্থানের ফলশ্রুতি হইল প্রেম। প্রেমই নারীত্বের পূর্ণতা। পত্রলেখা আছে, নারীত্ব নাই, প্রেম নাই—এ কী রূপ কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত এই দিক দিয়া নাড়া খাইয়া একটি স্বতন্ত্র কাব্য-রচনা করিয়াছে। ইহাকে 'আক্ষেপ কাব্য' বলা চলে। ইহাতে কাদম্বরী-উপন্যাসে

ব্যাপ্ত পত্রলেখা-চরিত্রের পূর্ণ দিগ্‌দর্শন নাই। কেবলমাত্র নারীত্বের দিক হইতে পত্রলেখার প্রয়োজনীয় অংশ কুড়াইয়া লইয়া কবি-চিত্তের অশ্রু-নির্ঝরে তাহাকে স্নান করাইয়া তাহার পর তাহাকে লইয়া আপন মনের মাধুরী দিয়া এক নূতন কাব্য রচনা।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি নারীত্বই নারীজীবনের একমাত্র কথা নয়। অবশ্য ফ্রয়েডের মতে সকল emotion-এর মূলে আছে Sexual emotion। Sexual emotion-এর চোখ দিয়া জীবনদর্শনে হয়তো তাহা মনে হইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সত্য ও জীবন-সত্য এক নহে। এ-যুগে চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য কত তোড়জোড়, কেহ কেহ চন্দ্রলোকে জমি কিনিবার জন্য advance booking-ও করিতেছেন। তবু আমরা চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকি। মধু-যামিনী-উৎসবে ঐ চন্দ্র আমাদের শরণ্য। আমাদের ঘরের গবাক্ষের ফাঁক দিয়া যখন দুগ্ধধবল-শয্যায় শয়ানা আমার নববধূটির মুখের উপর চন্দ্রকিরণ আসিয়া পড়ে; যখন নীল আকাশের সোণালী চিঠি লইয়া আমার অর্গলবদ্ধ দ্বারে বার বার আঘাত করে, তখন থাক্ আমার বিজ্ঞানের জ্ঞান, যে এমনি করিয়া আমার প্রিয়ার মুখলাবণ্যের অ-দেখা অংশের সবটুকু দেখাইয়া দিল, যে আকাশ হইতে আনিল কল্পনা, হৃদয় মথিয়া বাহির করিয়া লইল অচরিতার্থ বাসনা, তাহাকে কি অমনি করিয়া দূর-দূর করিয়া বিদায় দিতে আছে। সুখে থাকুন বৈজ্ঞানিক। আমার ও-বিজ্ঞানে কাজ নাই। বিশ্ব-কারখানায় বিজ্ঞানের হাতুড়ি সমানতালে পড়িতে থাকুক, আমি ইত্যবসরে একটু স্বপ্ন দেখিয়া লই। আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মে চন্দ্রের ঐ সম্মোহন মূর্তিটিকে ক্ষণকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিতে দাও।

তাই বলিতেছিলাম, যৌন-বিজ্ঞান সত্য হউক, কিন্তু উহা মানব-জীবনের সবটুকু নয়। আমাদের জীবনে উচ্চতারের যে ভাবগুলি বাজিতেছে, যৌনভাব তাহার অন্যতম হইলেও সবটুকু নয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মানসিক পরিবেশে একটি অপূর্ব সমন্বয়-ধর্ম ছিল। এক নারী-দেহের মধ্যে নানা ভাবের কী অপূর্ব সমন্বয়। একই নারী—কখনও কন্যা, কখনও জায়া, কখনও বা মাতা।[১] কন্যা-নারীর পিতার সহিত আচরণ, জায়া-

(১) (ক) অতো মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিন্নত্বেঽত্র মনোময়ী॥ —পঞ্চদশী

(খ) ভার্যা স্নুষা ননান্দাচ যাতা মাতেত্যনেকধা।
জামাতা শ্বশুরঃ পুত্রঃ পিতেত্যাদি পুমানপি॥ —ভ, র,

নারীর স্বামীর সহিত আচরণ এবং মাতা-নারীর পুত্রের সহিত আচরণের পার্থক্যের সমন্বয় আছে ঐ একই নারীদেহে। কাজেই শাস্ত্রকারেরা নারীত্বের দুইভাগ করিলেন—অন্নময়ত্ব ও মনোময়ত্ব। আলম্বন অনুসারে ভাবের বিকাশ। কাজেই, নারী শুধু অন্নময়ী নয়, সে মনোময়ী, সে চিন্ময়ীও। প্রাচীন ভারতবর্ষে চিত্তের উদার ভাবগুলির মধ্যে সমন্বয় ছিল বলিয়া আলম্বন অনুসারেই তাহাদের চিত্তের ক্রিয়া হইত। জোর করিয়া সীমানার বেড়া দিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা হইত না। চিত্তের ভাবগুলি এমনি শিক্ষিত ছিল যে আলম্বনের তাগিদ অনুসারে তাহারা সহজেই চলিতে পারিত। তাহার জন্য অন্তর্লোকের সহিত বহির্লোকের অন্তর্দ্বন্দ্ব বাধিত না। এই ট্রেনিং তাহাদের ছিল বলিয়া নারীপুরুষ মুখোমুখী হইলেই কেবল যৌন-সংবেদনার তরঙ্গ উপছাইয়া পড়িত না। পড়িত যে না, তাহার দৃষ্টান্ত যেমন শকুন্তলায়, তেমনি কাদম্বরীতে। তরুণী শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়াছিল কিন্তু অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ভালবাসে নাই। কেন, তাহারাও তো শকুন্তলার মত উদ্ভিন্নযৌবনা। একই পরিবেশে একই যৌবন-অবস্থায় যুগপৎ দুষ্মন্ত-দর্শন। যে-কারণে শকুন্তলা মজিয়াছিল, সেই কারণে অনসূয়া-প্রিয়ংবদারও মজিবার কথা। কিন্তু দেখা গিয়াছে, শকুন্তলা মজিয়াছে, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা মজে নাই। কাদম্বরীতে রবীন্দ্রনাথ পত্রলেখা-চন্দ্রাপীড়ের সহাবস্থানের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিংকরীও নহে, পুরুষের সহচরী। এইরূপ অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো। কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়! নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে, তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাধাটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করেনা কেন!"

কবিগুরুর এই আক্ষেপ কেবল পত্রলেখার সম্পর্কে কিন্তু মহাশ্বেতার সম্পর্কে কবি তো একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই। বুঝিলাম, মহাশ্বেতা অন্য পুরুষকে হৃদয় দিয়া দিয়াছেন, কাজেই চন্দ্রাপীড়কে একেবারে নির্জন আশ্রমে পাইয়াও তাঁহার যুবতী-হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্য উঠিতে পারে না কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের সম্পর্কে তো সেকথা উঠিতে পারে না। উপভোগক্ষম পূর্ণযৌবন তাঁহার। এখনও পরিণয় করেন নাই কিন্তু পত্নী-গ্রহণের উপযুক্ত সময়ে তিনি অবতীর্ণ। বিশেষ করিয়া মহাশ্বেতার আশ্রমের সেই নির্জন স্বপ্নালু পরিবেশে অমনি অনিন্দ্যকান্তি সুন্দরী যুবতীর চাঁদমুখ দেখিয়া কোন্ তরুণের না হৃদয় নাচিয়া ওঠে। একে কল্পনাঘন

পরিবেশ, তাহাতে নির্জন স্থান, একাকিনী মহাশ্বেতা। তাহার পর সেই নীল অরণ্যের হরিদ্রাবর্ণের পত্রে পত্রে বিপ্রলব্ধা তরুণীর বিড়ম্বিত-জীবনের প্রেম-কাহিনীর আখর ঝিমঝিম করিতেছে। সেখানে তরলিকা নাই। চন্দ্রাপীড় ও মহাশ্বেতা মুখোমুখি বসিয়া। একজন প্রেমের গল্প বলে; আর একজন শোনে। দুইজনের মধ্য দিয়া কল্পনার সবুজ বর্ণস্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া কুলুকুলু ধ্বনিতে ছুটিয়া চলে। এইখানেই সমাপ্তি নয়। রাত্রিকালে সেই নির্জন অরণ্যে চাঁদের কিরণ গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় তরুণ জীবনের স্বপ্নের শ্বেত ঝালর ঝুলাইয়া দেয়। যখন নির্ঝরিণীর জলকল্লোল নূপুর-পায়ে নর্তকীর মত নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছে, যখন চন্দ্রের কিরণে আর ঝর্ণার গানে লুটোপুটি খাইতেছে, মোহিনী অন্ধকার কালো তারে রহিয়া রহিয়া সুর তুলিতেছে, সুরে সুরে বাজিতেছে তাল, তালে তালে নাচিতেছে রক্তের ফেনা, ফেনায় ফেনায় কাঁপিতেছে বাসনা-জনিত কম্পন, তখন সেই বিজন বনভূমির একটি শিলাখণ্ডে মহাশ্বেতা শুইয়া, অপরটিতে চন্দ্রাপীড়। সাতখুন মাপ—মহাশ্বেতার। কিন্তু চন্দ্রাপীড়ের শরীরে মহাশ্বেতার সুগন্ধ নিশ্বাস কি কোন রোমাঞ্চ জাগাইতেছিল না? নির্ঝরিণীর তরঙ্গের মতো কী তাহার হৃদয়ে রক্ত-তরঙ্গ ওঠা-নামা করিতেছিল না? সে নিশীথ রজনীতে পল্লব-ভূমিষ্ঠ শ্যামল আর্দ্র শাখার হাওয়া খাইয়াও কি চন্দ্রাপীড় ঘামিয়া উঠিতেছিল না? তাহার সর্বাঙ্গ কি পার্শ্ববর্তিনী মহাশ্বেতার মৌন আকর্ষণের চৌম্বিক টানে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল না? যে-কয়টি লক্ষণের কথা বলিলাম, ইহার কোন একটা লক্ষণও চন্দ্রাপীড়ের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। তাহার চিত্তেও কোন কল্পনার মৃদু তরঙ্গও জাগে নাই। জাগে যে নাই, ইহা সেকালের জীবন-পরিবেশের ট্রেনিং। এই ট্রেনিং কবিদের যেমন ছিল, পাঠকেরও তেমনি ছিল। তাই পাঠকেরাও কোন আপত্তি তোলেন নাই। শুধু চন্দ্রাপীড় কেন, কপিঞ্জল? পুণ্ডরীকের প্রেমের দৌত্যে নামিয়া কপিঞ্জলও একাকী মহাশ্বেতার কুটীরে গিয়াছিল। সেও তো বন্ধুর প্রেমদৌত্যে নামিয়া মহাশ্বেতাকেও আত্মপ্রেমের নিবেদন করিতে পারিত। ঋষিকুমারের মন টলাইবার মত যথেষ্ট সৌন্দর্য ছিল মহাশ্বেতার যৌবন-সন্নদ্ধ মাধুরীতে। কিন্তু কপিঞ্জল তাহা করে নাই; করে যে নাই, তাহার মূলেও ঐ ট্রেনিং। প্রাচীন কালের বাস্তব যৌন-প্রবৃত্তির পশ্চাতে একটা religious toleration ছিল। সাহিত্য-চেতনায় তাহার পূর্ণ বিকাশ।

প্রাচীন কালের নজির না হয় নাই তুলিলাম, কিছুকাল পূর্বে পল্লীজীবনেও

দেখা গিয়াছে, পাড়ার কোন তরুণ প্রতিবেশিনী কোন তরুণীকে তাহার শ্বশুরালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছে। দুই-তিন দিনের পথ। নৌকাযোগে ভ্রমণ। একত্র আহার, একত্র শয়ন। তাহাতে কোন disciplene ভঙ্গ হয় নাই। ইহা কচিৎ-কদাচিতের ঘটনা নয়। এইরূপ ঘটনা সমাজ-জীবনে নিত্যই ঘটিত। কিন্তু সেকালের তুলনায় একালের পিতামাতা তাহার তরুণী কন্যাকে নিশ্চয়ই প্রতিবেশী তরুণের সহিত সিনেমায় যাইতে অনুমতি দিবেন না। একালের সমাজ-চেতনায় যৌন-চেতনাই নারীর সবটুকু। তাই শরচ্চন্দ্র তাঁহার কোন উপন্যাসে প্রদীপ-নিভিয়া-যাওয়া অন্ধকার ঘরে একমাত্র তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া একমাত্র পুরুষ-পাত্রের মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন, "অন্ধকার নির্জন ঘরে তোমরা নারী-পুরুষের একটিমাত্র সম্বন্ধের কথাই জানো।"

প্রাচীন সমাজে মানুষ গড়িবার ট্রেনিং ছিল। ট্রেনিং যে ছিল, 'আশ্রম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি ভাঙিলে তাহার হদিস মিলিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষের আশ্রম সমগ্র ভারতীয় আর্যজাতিকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে সাংগাঠনিক লৌহ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। সেই পরিকল্পনায় প্রত্যেকটি ভারতীয় সন্তানকে নিজের জন্য শ্রম স্বীকার করিতে হইত। আশ্রম-প্রভাবের সেই সুচারু, মার্জিত, রুচিবোধ সাহিত্যে শিব, সুন্দর ও সত্যের সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া কাব্যলোকের জীবনানুভূতির ছবি আঁকিয়াছে।

আজ আমরা যাহা চাহিতেছি, শিক্ষা-বিচ্যুত গ্রাম্য-জীবনে যে তাহা ছিল না, তাহা নয়। একটু নমুনা দি।

ঔন্নিদ্র্যং দৌর্বল্যম্
চিন্তালসত্বং সনিঃশ্বসিতম্।
মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে—
সখি। ত্বামপ্যহহ পরিভবতি।

কোন নায়িকা নায়ককে খুশি করিবার জন্য দূতী পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ধৃষ্টা দূতী নায়িকার বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া নিভৃতে নায়কের সহিত আত্ম-তৃপ্তি সাধন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নায়িকা বুঝিতে পারিয়াছেন ব্যাপারটা। তাই ব্যঞ্জনার সাহায্যে বলিতেছেন—

হায়! হায়! সখি! মন্দভাগিনী আমার জন্য নিদ্রাহীনতা, চিন্তাজনিত আলস্য ও ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস তোমাকে কতই না পীড়া দিতেছে।'[1]

(১) লক্ষণগুলি সুরতাত্ত্বিক।

ইহাতে জীবনানুভূতির গ্রাম্যতা। সংস্কৃত-মহাকাব্যে নীতি-নিষ্ণাত মঙ্গলোজ্জ্বল রুচিসুন্দর জীবন। জীবন-মন্থনের কড়া তারে যে সুর বাজে, সংস্কৃত-সাহিত্যের সেই সুর।

তাই বলিতেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের রচনাটি পাঠক-হৃদয়ের একটি বিশেষ অনুভূতির হৃদ্‌স্পন্দনে আঁকা। উহার সহিত কাদম্বরী-উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ সম্পর্ক নাই। উহা পাঠক হৃদয়-বেদনার নূতন সৃষ্টি, নূতন আবিষ্ক্রিয়া ; নূতন কবিতা।

চরিত্রায়নে আমরা দেখিয়া আসিলাম, উপন্যাসে নারীচরিত্র যেমন প্রোজ্জ্বল, পুরুষ-চরিত্র তেমন দুর্বল।

উপসংহার

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা ॥"

আমাদেরও ধান কাটিতে কাটিতে বরষা আসিয়া গেল। কবিসৃষ্টির দুই তীরে রাশি রাশি ধান থৈ থৈ করিতেছে। কত ধানই বা আর কাটিতে পারিলাম। অথচ বর্ষা আসিয়া গেল। এখন যে ধান কাটিলাম, তাহা কোন্ সোনার-তরীতে তুলিয়া দিব? সে-সোনার-তরী সহৃদয়ের হৃদয়। কোন কবিকে যদি বিশেষ-কালে আবদ্ধ করিয়া কেবল বিশেষ সংস্কারের চোখ দিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি সুবিচার করা হয় না। বিশেষকালের বিশেষ মানব-চেতনার গণ্ডী কবি-কৃত সত্যবস্তুর অলঙ্কার মাত্র। কবিরসৃষ্টি যেমন সুন্দর ও মঙ্গল, তেমনি সত্য। সত্য বলিয়াই তাহা নিত্য। কবি-প্রতিভার এই নিত্যতা, এই সত্যরূপ কেবল সত্যত্ব ও নিত্যত্বের জন্যই যে আছে, তাহা নয়; আছে অনন্ত কালের অনন্ত মানব-হৃদয়ের জন্য। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কবি-ভবভূতি বলিতে পারিতেন না—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্
জানন্তু তেঽপি তান্প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে ঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥[১]

তিনি বলিয়াছিলেন আপন প্রতিভার সত্যানুভূতির জোরে। বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধিকাল কবি-প্রতিভার চরম লক্ষ্য। মহাকবিগণের উদার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হইল নিত্যত্ব। তাই কবির কাল হইতে 'শতবর্ষ পরে' যদি কেহ তাঁর কাব্য পাঠ করেন, তাহা হইলে ঐ 'শতবর্ষের' মসীমাখা দিগন্ত হইতে তিনি কবি-প্রতিভাকে দেখিতে পান জ্যোছনার স্বপ্নে। কবির কালে যাহা বাস্তব, কবির কালের রসিকেরা,

(১) 'মালতীমাধবম্'—ভবভূতি।

সেই বাস্তবের যে একটা মোহনীয় রূপ আছে, তাহা জানিতে পারেন না, জানিতে পারেন ভবিষ্যতের প্রবাসী রসিকেরা। তাই কালিদাসকে যেমন গ্যেটে, শিলার ও রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, এমনটি বোধহয় কালিদাসের কালের রসিকেরা ও বোঝেন নাই। ইহার কারণ কি? দূর হইতে দেখার একটা মূল্য আছে। নিকট ও দূরের ব্যবধানের মধ্যে আছে এক সৌন্দর্যময় অবগুণ্ঠন। সেই অবগুণ্ঠন-বতীকে দেখিয়া দূরের কালের মানুষেরা মুগ্ধ হয়। তাহাদের মুগ্ধচিত্ত বলিয়া ওঠে —"কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।"

কিন্তু এই দূর হইতে দেখাই একমাত্র দেখা নয়। নিকট ও দূর মিলাইয়া সামগ্রিক দেখার পরিমাপ। কবি যেমন নিত্যকালের মানুষ, তেমনি তাঁহার কালেরও বাস্তব মানুষটি। তাঁহার যুগের আলো-বাতাস, তাঁহার যুগের ফুল-ফল, বসন্ত-বর্ষা, তাঁহার যুগের সমাজ-চেতনা, ধর্ম-চেতনা, কলাচেতনা—ইহাদের স্তন্যরসে তাঁহার কবি-মনের পুষ্টি। অতএব যে-যুগে কবি জন্মিয়াছেন, সেই যুগের গণমনের নিখিল সংবাদটুকু না জানিলে কেবল দূর হইতে কবিকে দেখাও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার কবির কাল আদি-অন্ত্যহীন কেবল মধ্য-অবস্থামাত্র নয়। তাঁহার কালের ও আদি আছে। সে-আদির সহিত তাঁহার কালের ও নাড়ীর যোগ আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, একটি বিশিষ্টকালের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় একটি বিশিষ্ট জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি দানা বাঁধে। তাহার পর স্বচ্ছন্দগামিনী স্রোতঃস্বিনীর ন্যায় সেই সভ্যতাও সংস্কৃতি কলকলধ্বনিতে কাল হইতে কালান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে, মন হইতে মনান্তরে ছুটিয়া চলে। এই ছুটিয়া চলার তাগিদে সে কতবারই না বাঁক ফেরে—কখন ডাইনে, কখনও বামে, কখনও বা সোজা, কখনও বা একেবারে উল্টো। বাঁকের যত বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, যত ওলটপালট ঘোটুক না কেন, ধারা তার অবিচ্ছিন্ন; উ-উই—আর এই। কিন্তু এক; অচ্ছেদ্য; অবিচ্ছেদ্য; পৃথক নয়। তাই 'আজি হ'তে শতবর্ষ পরে'র বর্তমানকালের অভিজ্ঞান দিয়া তাহাকে যেমন দেখিতে হইবে, তেমন দেখিতে হইবে বিশেষ দেশের মানব-সংস্কৃতির গোমুখীপ্রবাহ হইতে। কোন কালের সহিত কোন কালের সম্পর্ক নাই, এ যাহারা বোঝেন, তাঁহারা কোন কালকেই বুঝিতে চেষ্টা করেন না। তাঁহারা হাতখানিকে বোঝেন, পা-খানিকে বোঝেন, গোটা-মানুষকে বোঝেন না। তাঁহারা আত্ম-বঞ্চনা করেন। একালের বাতাসে যে প্রাণের বীজ ওড়ে, তাহার সবটুকুই কী একালে ফলে? তা ফলে না। এ কালের হাওয়ায় অনেক না-ফলা বীজ পরবর্তীকালের মাটিতে যাইয়া লুটাইয়া পড়ে। তাই

বলিতেছিলাম, জীবনের জন্য যে আক্রন্দন, তাহা সর্বকালের ; কবি-প্রতিভা সেই আক্রন্দনেরই শ্লোকরূপ। বাণের প্রতিভার ব্যাখ্যায় তাই আমরা বৈদিকযুগ হইতে তাঁহার যুগ এবং তাঁহার যুগ হইতে আমাদের যুগ—এই আদি-মধ্য ও অন্ত্যযুগের এক অখণ্ড বৃত্ত টানিয়াছি। বৈদিক কাল হইতে তাঁহার যুগের চেতনাকে লক্ষ্য করা এবং আমাদের যুগের দূরত্ব হইতে তাহার প্রতিভার-মূল্য-না দেওয়া সম্পদ্‌কে মূল্য দেওয়া—এই উভয়বিধ প্রযত্ন দেখা দিয়াছে আমাদের দেওয়া ব্যাখ্যায়। আমরা কেবল আমাদের হৃদয়ভাব দিয়া বাণের প্রতিভার মূল্যায়ন করি নাই ; আমরা ভারতীয় আর্যজাতির সামগ্রিক চেতনা দিয়া, ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তীর প্রামাণ্য তথ্য দিয়া তাঁহার প্রতিভার মূল্যায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আধুনিক কালের উন্নাসিকতা—সংস্কৃত-সাহিত্যে পড়িবার কী আছে? উহা অবাস্তব। আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি বাস্তববোধ—একদিক দিয়া নিত্য, অন্যদিক দিয়া অনিত্য। নিত্য কবির দিক দিয়া ; অনিত্য যুগ-চেতনার দিক দিয়া। কবি-অনুভূতির প্রত্যক্ষকল্পতা—মানস-গোচরতা—mental visualisation-ই নিত্য বাস্তবতা। ইহা সকল যুগের সকল মহাকবিগণেরই আছে। যুগ-চেতনার অনিত্যতা যে বাস্তব, তাহা যুগে যুগে খোলোস পাল্টায়। অতএব সত্যদর্শী যাঁহারা, তাঁহারা যুগ-পারিভাষার শীলমোহরটি ভাঙিয়া নিত্য সত্যটি দেখিয়া লইতে পারেন। ওকালের কবিরা মানুষের যে দিক্‌টার উপর বেশী জোর দিতেন, এ-কালের কবিদের সেদিকে লক্ষ্য নাই, আছে অন্যদিকে। সেই অন্যটাই যে বড়ো, তাহা চিরন্তনরূপে প্রমাণ করিবার কোন সম্বল নাই। আমি যদি কোন সুন্দরীর দুইটি চোখ দেখিয়া থাকি, আর তোমার লক্ষ্য যদি তাহার অধরের পরে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ দেখাটা ভাল, ইহা লইয়া তর্ক করিয়া যেমন লাভ নাই, তেমনি কোন্ যুগের দৃষ্টিভঙ্গী বড়, ইহা লইয়াও তেমনি কবিত্বের সুবিচার হয় না। যদি বল প্রয়োজনের কথা ; উহা তো কলার বিচারেই আসে না। সাহিত্যের উপনিষদ হইল আনন্দ। সেই আনন্দ একটি বিশেষ আঙ্গিকের মধ্য দিয়া আসে। যাঁহারা আনন্দ হইতে আঙ্গিককে প্রাধান্য দেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আমাদের নীরব থাকাই ভাল। শকুন্তলা সর্বভারতের—বিশ্বের মানবজাতির জন্য কিন্তু আধুনিক কাব্য অধুনাতন কালের গোষ্ঠী-বিশেষের জন্য। এইভাবে দেখিলে উন্নাসিকতার কোন অবকাশ থাকে না। আমরা যে-যুগে বাস করি, সে-যুগ মানবতার যুগ। মানব-সমাজে যেখানে যে-কীর্তি রহিয়াছে, সেই কীর্তিকে শ্রদ্ধা করা মানবতার ধর্ম।

আমরা সে-ধর্ম পালন করি না। আমরা আত্মীয়কে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিই মানবতার বুলি আওড়াইয়া; লোক-সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া যে ভাগকে দূর করিয়া দি, সে-ভাগের নাম 'ছোটলোক'। কিন্তু অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কৃত করা, দূরকে নিকট করা, অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য করা, চির-ব্যথিতের ব্যথা দূর করা, ভাষাহীনের মুখে ভাষা তুলিয়া ধরা, অচেতনের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করা—মানুষের ধর্ম। আমাদের সে-ধর্ম যতটা মৌখিক, ততটা আন্তরিক নয়। আন্তরিক নয় বলিয়া আমরা কাছের মানুষকে জানিতে চাই না, বুঝিতে চাই না, বুকের মধ্যে টানিতে চাই না। ইহাকে কী বলিব? অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার জন্য সংস্কৃত-সাহিত্য উপেক্ষিত। অথচ আমরা যে জাতির, সংস্কৃত-সাহিত্য যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই আমাদেরই জাতির। সেই প্রাচীন জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মবোধ, নীতিবোধ, কলাবোধ—এককথায় জীবনবোধ আমরা জানিতে চাহি না। চাহি না বলিয়া আমরা নিজেদেরও জানি না।

একালের জীবনে সীমা বড় প্রত্যক্ষ, বড় স্পষ্ট। একালের মানুষের আনন্দ সেই সীমার উপর বেড়া দেওয়া। আমরা আকাশ-যানে উঠিয়া যত অল্প সময়েই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করি না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলগ্রহের মধ্যে ঢুকিবার জন্য যত তোড়জোড়ই করিনা কেন, সে-কেবল ঐ সীমার লোভে—সীমার উপর জাতিবিশেষের, রাষ্ট্র-বিশেষের মালিকানা শীলমোহর করিবার জন্য। তাই একালের মানুষের কাছে জীবনটা যতটুকু দেখা যায়, সেই প্রত্যক্ষতাই আমাদের সত্য। যে-জীবনটায় আমরা বাঁচিয়া আছি, সেই জীবনটাই আমাদের কাছে পরম সত্য। ইহার পূর্বেও কিছু নাই, পরেও কিছু নাই। কেবল ঐ মাঝখানের প্রত্যক্ষতাটুকু আমাদের ব্যাঙের আধুলি। উহা লইয়াই আমাদের জীবনের কারবার, সাহিত্যের বেসাতি। যদি ঐ নিরেট প্রত্যক্ষতার বাহিরে আমাদের জীবনানুভূতি প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা নিন্দনীয়। সাহিত্যেও তাই। সাহিত্যেও ঐ মাপাজোখা জীবন। বাণ যে-জীবন লইয়া সাহিত্যের কাঠামো তৈয়ারী করিলেন, তাহা কেবল প্রত্যক্ষ নয়। তাহা যেমন অনাদি, তেমনি প্রত্যক্ষ, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য উদ্বৃত্ত। এই নিরবচ্ছিন্ন জীবন-ধারায় যেমন কবির বিশ্বাস ছিল, তেমনি বিশ্বাস ছিল পাঠকের। জন্মান্তরকে একটি খাপে পুরিয়া সাহিত্য-রচনার চেতনা সংস্কৃত-কবিগণের ছিল। জীবনে যে বিশ্বাস ছিল, সাহিত্যেই বা তাহা থাকিবেনা কেন? সাহিত্য তো সেই জীবনেরই ভাবানুকীর্তন। এই চেতনা

সর্বপ্রথম নাড়া দেয় মহাকবি কালিদাসকে। তিনি একটু আভাস দিলেন শকুন্তলায়। বাণ সেই চেতনা লইয়াই উপন্যাস রচনা করিলেন। জন্মান্তরবাদ কল্পনা নয়, সত্য; অন্ততঃ ভারতবর্ষের মানুষ এককালে ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের মধ্য দিয়া বাণের কালের ভারতবাসীরা এই জন্মান্তরবাদকে নিরেট সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পারম্পর্যহীন একটি খণ্ডিত জীবন লইয়া যদি সাহিত্যরচনা চলে, তবে দুইটি বা তিনটি জীবনের একটি খাপেই বা সাহিত্য হইবে না কেন? হইতে বাধ্য।

তাহার পর, কবি তাঁহার কালের যেমন বাস্তব সত্য, তেমনি সত্য তাঁহার কালের পাঠকেরা, পাঠকের জীবন-চেতনা। আধুনিক সাহিত্যের পটভূমি আধুনিক সমাজ, আধুনিক সভ্যতা, আধুনিক সংস্কৃতি। সেই সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি আধুনিক সাহিত্যের পরিভাষা। এই পরিভাষার মাধ্যমেই জীবন-রস মথিয়া তুলিতে হয়। প্রাচীন সাহিত্যের পটভূমিতেও তেমনি সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমন্বিত একটি দুরন্ত জীবনবোধ ছিল। সে জীবনবোধ আধুনিক জীবনবোধের সহিত মেলেনা। মিলিবে কী করিয়া? দুইটি জীবনবোধ যে পৃথক্। এ-কালের জীবনবোধ প্রত্যক্ষকে লইয়া; জীবন-বোধের যে প্রত্যক্ষতা প্রতিপদে জীবনেরই দুর্বার দুরন্ত স্রোতে ভাঙিয়া যায়, জীবনের সেই ভাঙা-পরিণাম আধুনিক জীবনবোধের। যুগে যুগে এই প্রত্যক্ষ ভাঙিতেছে, শুকাইয়া ঝরিতেছে, মাটিতে মিশিতেছে। আমরা প্রত্যক্ষকে দেখিতেছি, দেখিয়া তন্ময় হইতেছি। এমনি তন্ময় হইতেছি যে কখন নিষ্ঠুর বিধাতা 'অয়মহং ভোঃ' বলিয়া যে আমাদের অঙ্গনে উঠিয়া সাড়া না পাইয়া প্রত্যক্ষকে অভিশাপ দিয়া যাইতেছেন, আমরা সেদিকে একেবারে বেহুঁস। জাগিয়া দেখি বিধাতার শাপে আমাদের প্রত্যক্ষ ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে। স্পষ্ট হইয়া ওঠে জীবনের ক্ষণিকতা, স্বল্পায়ুত্ব। এতো মায়া; এতো নিত্য গড়ে, নিত্য ভাঙে। ইহা লইয়া কী করি? এই নিত্য ভাঙা-গড়ার মধ্যে যে সত্যটুকু আছে, তাহাই 'কখনও আছি, কখনও নাই' এর মধ্য দিয়া লীলা করিয়া যাইতেছে। ঐ সত্যটুকুকে ধরিতে হইবে। উহা "কেবল আছি" বা "কেবল নাই" নয়; উহা "আছি ও নাই" এর লুকোচুরির মধ্যে সনাতন সত্যের অনির্বচনীয়তা। তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ, সত্য হইবে কেন? প্রত্যক্ষ যদি সত্য হয়, পরোক্ষও সত্য হউক। কিন্তু প্রত্যক্ষের যেমন অভিনয়োপযোগী নেপথ্যবিধি, পরোক্ষেরও তাই। এ দুইটিই তো পরস্পরের

antithesis. Synthesis কই? Synthesis মানব-জীবনের বাসনালোকের নিত্যপদার্থে। ইহারা অরূপ, তাই মাঝে মাঝে রূপ পাইয়া ভাসিয়া ওঠে। যাহা নিত্য ও সত্য, তাহার আবার কালাকাল কি? তাহাকে সৌন্দর্যের গ্রন্থিতে বাঁধিয়া রূপ দিতে হয়। সংস্কৃত-কবি বাণভট্ট তাহাই করিয়াছেন। তিনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন মানুষের মনের সেই নিত্যবস্তু কোথায়? কোথায় মানুষের সেই নিত্য কান্না, নিত্য আনন্দ। তাই তিনি বৈদিকযুগের ঋষিদের পাশে পাশে ঘুরিয়াছেন; ঘুরিয়াছেন যজ্ঞবাটে, ঘুরিয়াছেন আরণ্যকের অরণ্যে, ঘুরিয়াছেন উপনিষদের কাছে, ঘুরিয়াছেন সূত্রসাহিত্যের দ্বারে, গাথার দ্বারে, পুরাণের দ্বারে। তাহাতেও তাঁহার আশা মেটে নাই। তাই মানব-জীবনের রহস্যভরা কিংবদন্তীর স্বপ্নলোকে রূপকথার রাজকুমারের মতো পক্ষিরাজের পিঠে চাপিয়া সাতসমুদ্র তেরনদীপারে ঘুমন্ত রহস্যকে আপন জিজ্ঞাসার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগাইয়া তুলিয়া মানুষের জীবন-রহস্যের সোনার কৌটা খুলিয়া দেখিয়াছেন। তাই তাঁহার শিল্পের উপাদান মানবজাতির কেবল প্রত্যক্ষতা নয়, মানব-জীবন-রহস্যের নিত্যতা। সেই নিত্যতাকেই তিনি আর্টের শুচিসুন্দর বেশ পরাইয়া অনন্তকালের মানবজাতির উদ্দেশেই অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন। তাই বস্তু অপেক্ষা বস্তুর অতীত যে অনির্বচনীয় ভাব, সেই ভাবের দিকে কেবল বাণভট্টের কেন, সকল সংস্কৃত-কবিরই লক্ষ্য ছিল। তাই সংস্কৃত-কবিদের কাব্যে ভাবের লীলা। বস্তু যাহা আছে, তাহা উপলক্ষ মাত্র। আবার এ-ভাবের স্বরূপ স্বকপোল-কল্পনা নয়; ইহা মানব-জীবনের নিত্যভাব, চিরস্থায়ী ভাব—বাসনালোকের ভাব। তাই বলিতেছিলাম, আধুনিকযুগের বস্তুপ্রাধান্য যদি কাব্যশিল্পের চাহিদা মিটাইতে পারে, তবে সংস্কৃত-কবিগণের ভাব-প্রাধান্যই বা সংস্কৃতযুগের চাহিদা মিটাইতে পারিবেনা কেন? আধুনিক যুগের বস্তুপ্রাধান্যও শেষপর্যন্ত চিত্তভাবের রহস্যে উঠিয়া বিশ্রান্তি লাভ করে। সংস্কৃত-কাব্যের বীজমন্ত্রে সেই ভাবের নিত্যতা। তাই সরস্বতীর দরবারে তাহার নিত্য স্থান। নিত্যকালের মানবতার পতাকা লইয়া তাই সে যুগ হইতে যুগান্তরের তোরণ দিয়া ছুটিয়া চলে নিত্যকালের মহামানবের সাগর-তীরে। কালজয়ী হইবার এই দাবি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃতিতেই প্রত্যক্ষ, আধুনিক সাহিত্যের কবি-প্রতিভায় অপেক্ষিত।

বাস্তবতার মূলতত্ত্বটির কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।[১] এখন সেই

(১) 'বাণের জীবন চরিত'—দ্রষ্টব্য।

বাস্তবতার আধুনিক পরিভাষা-সম্পর্কে দুই-একটি মন্তব্য করিতে চাই। আধুনিক কালের সাহিত্যে আমরা কবির বাস্তবতার প্রকরণে যে পটভূমির চাহিদা উপস্থিত করি, সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাব-ব্যঞ্জনার মূলে যে সে-বাস্তবতা ছিল, তাহাও আমরা নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।[২] জীবনের যে-পরিবেশে কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বাণের জীবন-চরিতের প্রসঙ্গে আমরা তাহারও আলোচনা করিয়াছি। একদিকে দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে নানা শিল্পে নিপুণ বন্ধুদের সাহচর্য তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে একটা উদার দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছিল। তাহার পর রাজা হর্ষবর্ধনের সান্নিধ্য তাঁহার ধর্মমতের মধ্যেও একটা সর্বধর্ম-সমন্বয়ের তাপ সঞ্চার করিয়াছিল। বৈদিক ধর্ম হইতে লৌকিক ধর্ম—কিছুই তাঁহার সাহিত্যে অনুপস্থিত নাই। তাঁহার কালে ভারতবর্ষে খুব পুরাণ-চর্চা হইত। কাজেই পুরাণ-জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁহার শিল্পপরিবেশন করিতে হইয়াছে। এদিকে বাস্তব রাজা হর্ষবর্ধন, অন্যদিকে কিংবদন্তী-পুরাণ-কথিত রাজগণের প্রভাব, জনরুচির অলোক-সামান্যের প্রতি ঝোঁক তাঁহার সাহিত্যে বাস্তব-অবাস্তবের লুকোচুরি খেলিয়াছে। জরদ্‌-বিড়ের চিত্র একটি বাস্তব-চিত্র। উজ্জয়িনী-বর্ণনায় যতই স্বপ্নের তরলতা থাকুক না কেন, উহার মধ্যে তখনকার লোকজীবনের উর্মি-মুখর কলধ্বনি শোনা যায়। মানুষ যাহা চাহিত, যাহা ভাবিত, যাহা প্রাণপণে বিশ্বাস করিত, যাহা স্বপ্নে দেখিত, যাহা পাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিত, তাহাই সে-যুগের যুগ-বাস্তবতা। বাণের রচনায় সে-বাস্তবতা পুরাপুরিই আছে। আসল কথা, বাস্তব-চেতনা হইল একটি বাস্তব যুগের পিনদ্ধ মানস-চেতনা। বাণ সে-চেতনাকেই উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহার কাব্যে আপন প্রতিভার ক্রান্তদর্শিতার নৈপুণ্যে।

মানুষের যে রূপটাকে আমরা বাস্তববলি, তাহাতো রক্তমাংসে-গড়া রূপ।[৩]

(২) 'প্লট'—দ্রষ্টব্য।

(৩) (ক) "ঘুঁটেকুড়োনীর সঙ্গে রাজকন্যার প্রভেদ নেই। এখানে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁকে যে চক্ষে দেখেন, সে চক্ষে রসবোধ নেই, আছে কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।"

—রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে।

(খ) অতো মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিন্নতেহত্র মনোময়ী॥

(গ) সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়-ধীময়ৌ।
মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ। পঞ্চদশী

(ঘ) ভার্যা স্নুষা-ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
জামাতা শ্বশুরঃ পুত্রঃ পিতেত্যাদি পুমানপি॥ ড, র

সে-রূপ তো খাঁটি রূপ নয়। খাঁটি রূপ তাহার ভাবের রূপ। এই ভাবের রূপ তো রাস্তাঘাটে মেলে না। এর জন্য কবির কত চিন্তা, কত সতর্কতা। ইহার জন্যই চাই পরিবেশ। সেই পরিবেশে বিশিষ্ট মনোভাবে-দীপ্ত মানুষের প্রেরণায় বাসনায় যে আগুন ধরে, সেই আগুনে মানুষের যে-রূপ ফোটে, তাহা ভাবের রূপ। এইজন্যই সাহিত্যে পরিবেশ চাই, মানব-মানবী চাই। প্রকৃতি এই পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রাচীন সাহিত্যে। আধুনিক সাহিত্যে যে ভাবটি দরকার, সেই ভাবের জন্য মানুষের নির্বাচন যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তাহার প্রয়োজন পরিবেশের। জড় জীবনের জড় পরিবেশ। আধুনিক পরিবেশ যেন মিলনের একটি পাতা জাল। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের একক পরিবেশ ; সে পরিবেশ—প্রকৃতির পরিবেশ। কিন্তু কেন? প্রকৃতি ছাড়া মানুষ কখনও পূর্ণতা পায় না। একটি শিশিরসিক্ত বসন্ত-প্রকৃতির ফুল-ফুটানো কুঞ্জবনে প্রজাপতির মিছিলে-ঢাকা রঙবেরঙের ফুলের মাঝখানে একখানি সুন্দরী মুখ বসাও, পাখীর গানে গানে আঁকিয়া দাও স্বপ্ন, মেলিয়া ধর শ্যামল নিস্তব্ধতা, ঢালিয়া দাও আকাশের রাঙা আবীর, সম্মুখে ধরিয়া রাখ আর একখানি যৌবন-স্নাত পুরুষের মুখ। এইবার চাহিয়া দেখ ঐ কামিনী-মুখের লাবণ্য। দেখিতে পাইবে, রক্ত-মাংসের মুখের ওপর ভাবের নর্মলীলা। কিন্তু কেন অমন হয়? মানুষও প্রকৃতি যে পরস্পর অপেক্ষিত। মানুষের যে অবস্থায় ভাবের মূর্তি খোলে, সে অবস্থা বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যের অবস্থা নয়, সে-অবস্থা চিত্তসর্বস্বতার, প্রাণ-সর্বস্বতার। অতি-বুদ্ধি বা মন যে ভাবের পরম শত্রু।[১] তাই এই প্রাণসর্বস্বতার ছবি যেমন প্রকৃতি, তেমনি মানুষের ভাব-জীবন। তাই প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের ভাবের লেনদেনে মানুষের চরম রূপের প্রকাশ। প্রকৃতি ছাড়া মানুষের এরূপ ফোটে না। তাই ভাবরূপ ফোটানোর জন্য প্রকৃতির নিবিড় আলিঙ্গন চাই। প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের নিবিড়যোগ—প্রাণের যোগ। আবার প্রকৃতির সহিত মানবের মিল প্রাণময়-কোষে—মনোময়, বিজ্ঞানময় বা আনন্দময়-কোষে নয়। প্রকৃতি যেমন মানুষ ছাড়া অসম্পূর্ণ, তেমনি

---

(১) "কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশুদেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতাগাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়, তবে ঐ সরস শ্যামল দারুজীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়। তবে চিন্তায় উহার চিক্কণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জপত্রের মতো পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ওঠে, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মতো কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারিদিনের মধ্যে সর্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে ; বর্ষাশেষে ঐ গুঁটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা আর কি ভরিয়া যায়।" —রবীন্দ্রনাথ ; মন, স, ম

মানুষও প্রকৃতি ছাড়া অসম্পূর্ণ। প্রাচীন সাহিত্যে তাই প্রকৃতি-বর্ণনায় এত তাগিদ। যে-সাহিত্যে প্রকৃতি-বর্ণনা নাই, সে-সাহিত্য আবার কেমন সাহিত্য? বাণভট্টের কাদম্বরীতে এই প্রকৃতির চিত্রশালা। ইহার প্রত্যেকটি চিত্র স্বতন্ত্র অনুভূতির ইন্দ্রজাল। তাঁহার দৃষ্টিতে—প্রকৃতির দুইটি কাজ; একটি কাজ প্রকৃতির নিজের; যে-কাজে পাখী গান গায়, ফুল ফোটে, পাতার বুকে মর্মর জাগে, নির্ঝরিণীর চলায় জাগে ছন্দের দোলা—ইহা এক কাজ। সমস্ত প্রকাশের মধ্যে প্রকৃতির নিজস্ব একটি জীবন-স্পন্দন আছে। সেই স্পন্দন, প্রকৃতিকে ভাল বাসিয়া তাহার অনাবৃত বক্ষে কান পাতিয়া শুনিতে হয়; শুনিতে হয় নিখিল ধরিত্রীর জীবযাত্রার মঞ্জুল ছন্দঃস্পন্দ। ইহাতে কবির কিছু করিবার নাই, আছে দেখিবার, অনন্ত কাল ধরিয়া দেখিবার—নিমেষহীন নয়ন-দুখানিকে কেবল সবুজতার পুষ্পপাত্রে মেলিয়া ধরিবার—আর অনুভব করিবার। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এই যে প্রাণযাত্রার উতল উতরোল, যাহা গাছের লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে, নির্ঝরিণীর জলে, সরোবরের তরঙ্গে, কোকিলের গানে, ময়ূরের নাচে, পশু-জাতির বক্ষে বক্ষে আহত হইয়া মানবের হৃদয়-দ্বারে করাঘাত হানিয়া আকাশে প্রতিহত হয়, প্রতিহত হয় গ্রহলোকে, প্রতিহত হয় ব্রহ্মাণ্ডের চলার ছন্দে, ইহাই প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-আবেগ। এ আবেগ কবিকে কেবল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। এমনি প্রকৃতির একখানি ছবি বাণের পম্পাসরোবর।

প্রকৃতির অপর কাজ মানুষের জন্য। অচ্ছোদের তীরে তীরে রাঙা পায়ের ছাপ আঁকিয়া এই কাজ ঢুকিয়া গিয়াছে মহাকালের মন্দিরে ভজন-নিরতা অশ্রুময়ী বালিকার উদ্দেশে।[১] সেখানে মহাশ্বেতার হৃদয়-ভাবটির বর্ণালি প্রকাশ করা তাহার বিশেষ কাজ। সেই কাজ করিবার জন্য সে মহাশ্বেতাকে বাপ-মায়ের কোল-ছাড়া করিয়া আনিয়াছে। নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে কলমুখর সংগ্রামশীল সমাজকে—নির্বাসিত করিয়াছে মনুষ্যলোককে। একেবারে নিথর নির্জনতা—নৈঃশব্দের মৌনী সন্ন্যাসিনী! সাবধান! একটুও যেন কোলাহল না হয়, একটুও ক্রন্দনে-গর্জনে যেন শিল্পীর ভাবস্বপ্ন—ধ্যানপ্রবাহ ভাঙিয়া না যায়। তাই প্রকৃতির জনহীন নির্বাক-স্টুডিওতে মহাশ্বেতার ভাবমূর্তির অঙ্কণ। নানা রঙের তুলি বাণের হাতে। বাণ ছবি আঁকেন—আঁকিতে আঁকিতে তন্ময় হইয়া পড়েন। মাঝে মাঝে নিরালা অরণ্যের শ্যামল রসে তুলিটি ভিজাইয়া লন, কখনও-বা প্রজাপতির বর্ণ লইয়া খেলার

(১) "নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে-ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য।" —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রসে, কখনও-বা নাম-না-জানা পাখির গানের ফুটন্ত রসে। সমস্ত প্রকৃতির নির্জন-লালিত মাধুর্যটি নিঙ্‌ড়াইয়া তিনি জীবন হইতে জীবন-সুষমা টানিয়া তোলেন! জীবিত হইয়া ওঠে মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতার ভাব-নীহারিকার আলো পড়ে গাছে-গাছে লতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে; ঢেউ তোলে নির্ঝরিণীর নৃত্যল তরঙ্গে-তরঙ্গে। অরণ্য মিশিয়া যায় মহাশ্বেতার মধ্যে, মহাশ্বেতা মিশিয়া যায় অরণ্যের স্বপ্নে—স্বপ্নের জীবনে—জীবনের ঘন রহস্যে। সেই রহস্যের কড়া-সুরে-বাঁধা তারে ঝঙ্কার ওঠে নিখিল অরণ্যের নিখিলতায়—নিখিলের নাড়ীতে নাড়ীতে—

মহাশ্বেতা! মহাশ্বেতা! মহাশ্বেতা! মহাশ্বেতা!

গ্রন্থবিবরণী

1. Æsthetic : Benedetto Croce.
2. Ancient India : Dr. B. G. Gokhale.
3. The concept of Guṇá and
   Alaṁkāra : Dr. P. C. Lahiri
4. Comparative Æsthetics : Dr. K. C. Pandey.
   Vol. I & II :
5. Classical Sanskrit Literature : A. Berriedale Keith.
6. Dhvanyāloka : Uddyota : I & II
   Prof. Bishnupada Bhattacharya.
7. A. History of Sanskrit literature : Arthur A. Macdonell.
8. A. History of Sanskrit literature : A. Berriedale Keith.
9. A History of Indian literature : W. Winternitz.
10. History of Sanskrit literature : Dr. S. K. De.
11. The Harṣa-Carita of Bāṇa : E. B. Cowell & F. W. Thomas.
12. History of Indian philosophy : M. Hirianna.
13. An Introduction to the study of literature : William Henry Hudson.
14. Kavya Prokash : Mammata.
15. Kavya mimansa : Rajasekhara.
16. Natya Sastra of Bharatmuni : M. Kavi.
17. The number of Rasa : V. Raghavan.
18. Poetics : Aristotle.
19. Principles of literary criticism : I. A. Richards.
20. The Principles of Criticism : W. Basil Worsfold.
21. Psychological study of Rasa : Dr. Rakes Gupta.
22. Papers on Inscription : Dr. D. C. Sarker
23. The Sanskrit Drama : A. Berriedale Keith.
24. Some problems of Sanskrit Poetics : Dr. S. K. De.
25. Sahitya Darpana : Visvanath Kaviraja.

26. Sahitya Mimansa : Prof. Bishnupada Bhattacharya.
27. Treatment of love in Sanskrit literature : Dr. S. K. De.
28. Taine's History of English literature : A. Nicoll.
29. Theory of Drama : A. Nicoll.
30. Towards A theory of the Imagination : Dr. S. Sen Gupta.
31. Vedic Mythology : Art-hur A. Macdonell.
32. Subandhu's Vasavadatta : Louis H. Gray.
৩৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : কালিদাস
৩৪। উজ্জ্বল নীলমণি : রূপগোস্বামী
৩৫। উদ্ভট :
৩৬। উত্তররাম চরিতম্ : ভবভূতি
৩৭। ঋগ্বেদভাষ্যম্ : সায়নাচার্য
৩৮। কঠোপনিষৎ
৩৯। কুবলয়ানন্দ : অপ্যয় দীক্ষিত
৪০। কাব্যাদর্শ : আচার্য্য দণ্ডী
৪১। কাব্যালঙ্কার সূত্রবৃত্তি : ভামহ
৪২। কুমার সম্ভবম্ : কালিদাস
৪৩। তত্ত্বকৌমুদী
৪৪। দশরূপকম্
৪৫। দশকুমার চরিতম্
৪৬। প্রশ্নোপনিষৎ
৪৭। পঞ্চদশী
৪৮। বেদান্ত-পরিভাষা
৪৯। বামনঃ
৫০। বিক্রমোর্বশীয়ম্
৫১। বাসবদত্তা
৫২। ভক্তিরসায়নম্ : শ্রীমধুসূদন সরস্বতী
৫৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্
৫৪। মালতীমাধবম্ : ভবভূতি
৫৫। মেঘদূতম্
৫৬। মালবিকাগ্নিমিত্রম্

৫৬ ক। রসসমীক্ষা : ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
৫৭। রুদ্রট:
৫৮। রঘুবংশম্
৫৯। রত্নাবলী
৬০। রসগঙ্গাধর :
৬১। শিশুপালবধম্
৬২। হর্ষচরিতম্
৬৩। ইংরেজী সাহিত্যের ভূমিকা : গোপাল হালদার
৬৪। এরিষ্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব : ডাঃ সাধন ভট্টাচার্য্য
৬৫। কাব্য বিচার : ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
৬৬। কালিদাস : রাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ
৬৭। কৃষ্ণকান্তের উইল : বঙ্কিমচন্দ্র
৬৮। গল্প : যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৯। চন্দ্রশেখর : বঙ্কিমচন্দ্র
৭০। চিত্রা : রবীন্দ্রনাথ
৭১। দুর্বাসার অভিশাপ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৭২। ধর্মবিষয়ক রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৩। ধ্বন্যালোক : সুবোধ সেনগুপ্ত
৭৪। প্রাচীন সাহিত্য : রবীন্দ্রনাথ
৭৫। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা : শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
৭৬। বলাকা : রবীন্দ্রনাথ
৭৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন
৭৮। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৯। বঙ্কিম সাহিত্য : বিপিন চন্দ্র পাল
৮০। বঙ্কিমচন্দ্র : অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত
৮১। বঙ্গ সাহিত্য-পরিচয় : দীনেশ চন্দ্র সেন
৮২। বাংলা সাহিত্যের কথা : ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৩। বৈষ্ণব পদাবলী
৮৪। মহুয়া : রবীন্দ্রনাথ
৮৫। রজনী : বঙ্কিমচন্দ্র

৮৬। রবি দীপিতা : ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
৮৭। রামায়নী কথা : দীনেশ চন্দ্র সেন
৮৮। শিল্প ও দেহতত্ত্ব : অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
৮৯। শিল্পলিপি : ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৯০। সঙ্কলন : রবীন্দ্রনাথ
৯১। সাহিত্য : ঐ
৯২। সাহিত্যের পথে : ঐ
৯৩। সাহিত্যের স্বরূপ : ঐ
৯৪। সাহিত্য শিল্প : ডাঃ মনোমোহন ঘোষ
৯৫। সৌন্দর্য তত্ত্ব : রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

অ

আ

ঈ

উ

বিষয় পত্রাঙ্ক

ফ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০	২	আখ্যয়িকা	আখ্যায়িকা
৬২	২৩	পারীক্ষিতাবঃ	পারীক্ষিতাঃ
৬৪	২১	সত্যাদর্শী	সত্যদর্শী
৬৫	১৬	বর্নিতা	বর্ণিতা
৬৯	১৬	তুলনমূলক	তুলনামূলক
৮৪	২১	গন্ধ	গল্প
১৪৩	৩০	সহত	সহিত
১৫৯	১৭	পোরুষের	পৌরুষের
১৮৬	৩০	সে	যে
২১৭	৮	শুক নামের	শুকনাসের
২২২	৭	অপরাধ	অপরার্ধ
২২৩	১১	থমবসিস	থ্রমবসিস
২২৭	৬	বিশ্রাম	বিশ্বাস
২২৮	১১	মালতির	মাতলির
২২৮	২৯	দৈবসভা	দেবসভা
২৩২	২০	সাহিত্য	সাহিত্যে
২৩৪	২৯	কেলীর	কেশীর
২৩৬	২১	যে	সে
২৩৭	৪	অন্যা	অপ্যা
২৪৩	১৮	সাধক	কাঠক
২৪৪	৮	এজং	এবং
২৪৭	১৯	কাদম্বিনীর	কাদম্বরীর
২৪৮	১২	সেগুলির	যেগুলির
২৪৮	২২	রোধ	রোগ
২৪৯	২	অভিষোজন	অভিযোজন

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫২	৩০	এমনটি	যেমনটি
২৫৫	২	সেখানেই	যেখানেই
২৫৫	২	সেখানেই	যেখানেই
„	৩	সেখানেই	যেখানেই
„	১৭	বিজৃম্ভন	বিজৃম্ভণ
„	১৭	বিঘূর্নন	বিঘূর্ণন
„	১৭	তদাকারীকারিতা	তদাকারকারিতা
২৫৬	৭	সন্মুখে	সম্মুখে
„	১৪	ঔষধি	ওষধি
২৯১	১৭	ব্যপ্তি	ব্যাপ্তি
৩০৫	২১	ইহয়া	হইয়া